১৫ই আগষ্ট, ১৯৬০

প্রকাশক :
বীরেন নাগ
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
১৯.এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
বিভূতি সেনগুপ্ত

যার ১০ই শ্রাবণ জন্মদিনটি বার বার ভুলে যাই

যে রাগে অনুরাগে আমার সবচেয়ে আপনার, সেই

শ্রীমতী শিউলি কে

দিল্লীপ্রাসাদকূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কাদের কণ্ঠে গগনমন্থে, নিবিড় নিশীথ টুটে—
কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে?

রবীন্দ্রনাথ

বেগমরিজিয়া, কালিঘাটের ঘরসংসার, জেবুন্নিসা, সিরাজের ফৈজী, রূপে অরূপে মহামায়া, নজরানা, নূপুরছন্দ, আলেয়া মঞ্জিল, সরদানা, আকাশ-কন্যা, নর্তকী নিকী, রমনাবাঈ, মেমবৌ (গল্পগ্রন্থ) বিবর্ণপলাশ, পুতলীবাঈ, নাম নেই ছেলেটির (কিশোর উপন্যাস) এর শেষ নেই (নাটক)

আকবরের রাজত্বকালে প্রথম কয়েক বছর ছিল কলঙ্কময়। প্রথমে তিনি ছিলেন অপরিণত, তারপরে হয়েছিলেন বিলাসী। অন্তঃপুরের বিলাস প্রমোদের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রথমে অভিভাবক ছিলেন, বৈরাম খান। পরে অন্তঃপুরের জেনানারা রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করেন।

ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ এই 'জেনানা শাসন' এর নাম দিয়েছিলেন Petticoat Goverment। এ সম্বন্ধে তার উল্লেখ লিপিবদ্ধযোগ্য—'The young monarch, as his biographer repeatedly observes, remained behind the veil, and seemed to care for nothing but sport. He manifested no interest in the affairs of his kingdom, which he left to be mismanaged by unscrupulous women, aided by Adam Khan Pir Muhammad and other men equally devoid of scruple.'

সূর্যের স্নিগ্ধ প্রখরোজ্জ্বল রশ্মি প্রাসাদের শীর্ষচূড়া চুম্বন করেছে। কক্ষের মধ্যে স্বর্ণবর্ণের এক ঝলক রোদ্দুর। জাফরীর ভেতর দিয়ে এসে হর্মতলে দেহ মেলে দিয়েছে। আজানের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের আকুতি বাইরে থেকে এসে হৃদয় দ্রবীভূত করছে! নহবতখানায় সানাইয়ের মধুর রাগিণীও আছে, তবে ফকির নূরউল্লার কণ্ঠসঙ্গীতই সোচ্চার।

এই সময় কেন, সে গভীর রাত্রি থেকে যখন পৃথিবী সুষুপ্তির কোলে নিমজ্জিত হয়। কোন কোন দিন রূপালী চাঁদ আলোর বর্ণাঢ্য নিয়ে উদিত হয়, কিম্বা আকাশ সেদিন অন্ধকার পক্ষে। নূরউল্লা অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়ে কি এক অসহনীয় বেদনার গান গেয়ে চলে। তার গান জেগে ওঠে অতিথিশালার নিম্ন প্রকোষ্ঠে কিন্তু সে গানের সুর সেই ক্ষুব্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার অবাধ গতি প্রাসাদের চতুর্দিকে। যেন নির্জীব প্রস্তরময় দেয়ালের কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করে মহলের পর মহল ছুটে বেড়ায়।

গভীর রাত্রি থেকে ঊষার মুহূর্ত পর্যন্ত। ফকির নূরউল্লা যেন কার বিহনে ব্যথাতুর। রোদনের ভাষার সঙ্গেই যেন এই গীত সুরের সম্পর্ক। কেমন যেন সুর কানে পৌঁছলেই হৃদয়ের মাঝে গোপনে লুকানো প্রিয়জন হারার বেদনা জেগে ওঠে। আর চোখ দিয়ে আপন থেকেই জল নেমে আসে।

কান্না ভাল নয়। কাঁদতে কারই বা ইচ্ছা জাগে। তবু যখন এমন কোন প্রিয়জন হারিয়ে যায়, যাকে কিছুতেই মন

থেকে মুছতে ইচ্ছা করে না, তখন বক্ষ আলোড়িত করে তার জন্যে চোখের কোলে অশ্রুনদী স্রোতস্বিনী হয়। তেমনি এক অশ্রুস্রোত ফকিরসাহেবের গান শুনলে বেরিয়ে আসে। সুপ্ত শোক আবার জাগ্রত হয়ে অন্তর মথিত করে।

কিশোর আকবর এই ফকির নূরউল্লাকে কালানৌর দুর্গে থাকাকালীন এক দরগা থেকে নিয়ে এসেছিল। সেদিনও কিশোর আকবর এই ফকিরের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। ত্রিশোত্তীর্ণ একটি শীর্ণকায় মানুষ। ছিন্ন ও মলিন একটি আলখাল্লা পরিধানে। কোটরগত দুটি চক্ষু। ভগ্ন গণ্ডদ্বয়। থুতনিতে কয়েকগুচ্ছ দাড়ির চিহ্ন। বক্ষের পাঁজরগুলি গোনা যায়।

শুধু গান শুনে নয়, দীন দরিদ্র মানুষটিকেও দেখে রাজকুমারের কিশোর মন আপ্লুত হয়েছিল। ছুটে গিয়ে হাত ধরে বলেছিল তুমি আমার সঙ্গে যাবে ফকিরসাহেব।

ফকির নূরউল্লা জৌলুসে রাঙানো রাজকুমারের পোষাক দেখে অভিভূত হয় নি। বরং নিস্প্রভদৃষ্টিতে ম্লান হেসে আকবরকে অভিবাদন করেছিল। তারপর বলেছিল—গোস্তাখি মাফি হয় জাঁহাপনা। আমি কোথায় যাবো? দুনিয়ায় আমার স্থান কই?

আকবর তবু বলেছিল—তুমি অমত কর না ফকিরসাহেব। তোমার গান আমায় মুগ্ধ করেছে। তোমার গান আমার কাছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য উৎপীড়ন করছে। তুমি যে খোদার মেহেরবানি পেয়েছ তা জগতে দুর্লভ। তুমি চলো মিঞাসাহেব, আমি তোমায় আরামের মধ্যে রাখবো।

'আরাম!' ফকিরসাহেব ম্লান হেসেছিল।

এই দুনিয়ার সমস্ত আরাম আমার বিদায় নিয়েছে জাঁহাপনা।

কি তোমার দর্দ আমি জানি না। তবে তোমার গানের মধ্যে যে দর্দ আছে, তা আমার অন্তর স্পর্শ করেছে।

ফকিরসাহেব এর পর হাতজোড় করে বলেছিল—আমার গান

আপনার দিল কেড়েছে, তার জন্যে আমার সেলাম গ্রহণ করুন জাঁহাপনা। শুধু আমাকে মেহেরবানি করে আপনার প্রাসাদে যেতে বলবেন না। রাজসিক বৈভব আমার অন্তর কেড়ে নেবে। আমি ভুলে যাবো তাকে, যাকে সর্বদা আমি গানের সাথে কাছে পেতে চাই। তাছাড়া আমি দরিদ্র মানুষ, আমার স্থান এই দীন দরগাতেই শোভা পায়।

আকবর একটু বিরক্ত হয়েছিল, হঠাৎ বিরক্তি চেপে না রাখতে পেরে বলেছিল—আমি যদি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাই। তুমি নিশ্চয় জানো, আমার পিতা ভারত সম্রাট হুমায়ুন। আমি তার পুত্র। ভাবী সম্রাট।

নূরউল্লার ঠোঁটে সেই ম্লানহাসি। ভীত না হয়ে নিস্পৃহকণ্ঠেই বলেছিল—আমার দেহটাই আপনি অধিকার করতে পারবেন, অন্তর যাবে না আপনার রাজপ্রাসাদে। আর যে গানের জন্যে আপনি আমায় নিয়ে যেতে চাইছেন, সে গানও আর কণ্ঠ থেকে বের হবে না।

কিশোর আকবর সেইমুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল, বলপূর্বক শত্রু ধ্বংস করা দায়। বল প্রয়োগে দুনিয়ার সবকিছু সমাধান করা যায় না। তাই লজ্জিত হয়ে বলেছিল—ভুল হয়ে গেছে ফকির সাহেব। আমি মাফি চাইছি।

তারপর আকবর হাতজোড় করেছিল।

আমার বিনীত অনুরোধ। তুমি যেমনভাবে থাকতে চাইবে থাকবে, তবু আমার কাছাকাছি থাকবে। তুমি গান গাইলে যেন আমার কানে গিয়ে প্রবেশ করে।

কাতর প্রার্থনা। অন্তরের একান্ত চাহিদা। অন্তস্পর্শী আবেদন অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা কারো নেই।

ফকির নূরউল্লা তাই প্রত্যাখান করতে পারে নি। আকবরের সাথেই কালানৌর দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

কালানৌর দুর্গেও ফকির থাকতো প্রাসাদের বাইরে একটি মসজিদ প্রাঙ্গণে। সেখান থেকেই গাইতো গান, আর শুনতো রাজকুমার আকবর অলিন্দে দাঁড়িয়ে। রাত্রের নিদ্রা তাঁর চোখ থেকে সরে যেত। চোখ দিয়ে নেমে আসতো দরবিগলিত ধারায় অশ্রু। ব্যথা নেই কিন্তু কি এক বেদনার কম্পন রাজকুমারের হৃদয় মথিত করে বেরিয়ে আসতো। হয়তো মনে পড়তো তাঁর, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মানুষের মৃত্যুর পরিত্রাহি চীৎকার। তিনি তাই ভেবেই হয়তো কাতর হতেন। এক এক সময় মনে হত বন্ধ করে দিতে সেই গান। যে গানে হৃদয় জখম হয়, দিল কেড়ে নেয়, মন দুর্বল করে দেয়, শক্তি লুপ্ত হয়—সেই গান বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু বন্ধ করে দিতে কোথায় যেন বাধা জেগে ওঠে।

পিতৃবন্ধু বৈরাম খান একদিন বললেন—শাহাজাদা, ঐ বেসরম ফকিরকে গান বন্ধ করে দিতে বলো। ওর গান সৈনিকদের দুর্বল করে, ঐ গান আর কিছুদিন চললে আমরা সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত হব। যদি ও উল্লাসের গান গাইতে পারে তাহলে তাই গাইতে বলো। প্রাণের এখন প্রাচুর্য দরকার। আমাদের এখন উৎসাহ দরকার। উৎসাহের গান গাইলে আমরা তাকে যুদ্ধের সময় সঙ্গে নিয়ে যাব।

কথাগুলি একেবারে অসত্য নয়, এ গান প্রাণের আনন্দ কেড়ে নয়, শুধু কান্না পায়। তবু যেন কাঁদতে ইচ্ছা করে। কাঁদলে যেন অনেক আরাম। নূরউল্লার বেদনার সাথে বেদনা মিশিয়ে কাঁদতে পেলে যেন আর কিছু ইচ্ছে করে না। রাজকুমার এই কান্নার মাঝে প্রশান্তির রূপ দেখতে পেয়ে বৈরাম খানের আদেশ উপেক্ষা করলো।

কিন্তু তখন রাজকুমার আকবরের শক্তি কতটুকু! সে বালক মাত্র। তার বুদ্ধি পোক্ত হলেও সে নাবালক। হয়তো ফকির-

সাহেব নূরউল্লা দুর্গ থেকে বিতাড়িত হত, যদি না হঠাৎ এক দুর্ঘটনার সংবাদ ছুটে আসতো।

ছুটে এল। বাতাসের পূর্বেই সেই অসহনীয় দুঃসংবাদ ছুটে এল। মুহূর্তে দুর্গের মাঝে শোকের হিমস্রোত প্রবাহিত হল। সম্রাট হুমায়ুন অপঘাতে মারা গেছেন।

জেনানামহল থেকে রমণীদের কান্নার রোল উঠলো। আকবরের মা হামিদা তখন পুত্রের কাছে। তিনি হর্ম্যতলে আছড়ে পড়লেন। এ কি সংবাদ তাকে শুনতে হল? শেষকালে অপঘাতে মৃত্যু হল অতবড় একজন পুরুষের! এ যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

স্বামীর বিগত দিনের কথা ভেবেই হামিদা আরো রোরুদ্যমনা হল। একদিনও মানুষটি জীবনে শান্তি পেল না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষের সন্তান হয়ে, ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে শুধু ঘুরে বেড়ালেন।

হামিদার কণ্ঠই জেনানামহল ছাপিয়ে বাইরে প্রতিধ্বনিত হল। তাঁর অভিযোগ অনেক। মৃত সেই মানুষটির জীবনের অনেকগুলি দিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কত বিনিদ্র রাত্রি, কত বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি। রাজ্য হারিয়ে ভ্রাতাদের চক্রান্তে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে—অথচ কোমল মনের সেই ক্ষমার দৃষ্টি। তিনি শুধু ক্ষমা করেই গেছেন! আর নসীবের ওপর করাঘাত করে বলেছেন— এ তাঁরই ভাগ্যের ফল। মানুষের দোষ কি?

আকবর জ্ঞান হবার পর থেকে পিতার এই টানাপোড়েন চাক্ষুস দেখেছে। আর মাতার কাছ থেকে শুনেছে পিতার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস কিন্তু মাতার স্নেহক্রোড় ও পিতার আলিঙ্গনও বা সে কদিন পেয়েছে! তার সব লালন পালনের ভার ধাত্রীদের ওপর। সে এক রকম পরের কাছেই মানুষ। মাতা থাকতেন পিতার সঙ্গে সঙ্গে। আর পিতা রাজ্যোদ্ধারের জন্যে ছুটে ছুটে

বেড়াতেন। পিতামাতার স্নেহ একরকম তার কাছে স্বপ্নের মতই। অন্তত এই চোদ্দ বছর পর্যন্ত। বরং তাদের স্নেহ দুর্লভ হতেই কিশোর আকবরের মন তাদের স্নেহের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতো।

আজ সেই পিতা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। একান্ত আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু। অন্তত সংবাদ আসবার আগে পর্যন্ত কেউই ভাবতে পারে নি, এমনটি কখনও হতে পারে।

মা হামিদা আর জেনানামহলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রোদন করলেন না, কয়েকঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল তিনি দিল্লী যাবার জন্যে তৈরী হয়েছেন। সঙ্গে খুব বিশেষ কেউ নেই, শুধু কয়েক-জন দেহরক্ষী সৈনিক ছাড়া। যাবেন অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে। শুধু অবরোধ থাকবে মুখের ওপর একটুকরো কাপড়ের ঘেরাটোপ। এমনভাবে বহুবার তিনি স্বামীর সাথে দূর দূর দেশে গমন করেছেন, তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সুফী গুরু মীর্জা আকবর জামীরের কন্যার সম্মানই তিনি রেখেছেন।

তিনি যখন আকবরের কক্ষে এসে বেটা বলে দাঁড়ালেন, আকবর বিস্মিত হল না। বরং সে মায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হল, মার চোখে একবিন্দু জল নেই। মুখখানি বিষণ্ণ কিন্তু সে মুখে সূর্যের দীপ্তি। দীপ্তি ব্যক্তিত্বের, দীপ্তি কর্তব্যের। তিনি শুধু ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—বেটা, সাবধানে থাকবে; খাঁ সাহেবের কথা শুনবে। ভুলে যেও না এখন তোমার কর্তব্য অনেক। তিনি চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন তোমার জন্যে অনেক গুরুভার। সেই গুরুভার যদি বহন করতে পারো, তবেই জানবে তুমি তার উপযুক্ত পুত্র!

হামিদা বানু আর দাঁড়ালেন না, পুত্রকে কোনকিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত কক্ষ পরিত্যাগ করলেন।

আর আকবর একান্ত অসহায়ের মত নিশ্চুপ হয়ে অনাদি অনন্তকাল ধরে সেই কক্ষের হর্মতলে দাঁড়িয়ে রইলো।

চোখের সামনে তাঁর কিছু নেই। সামনে শুধু একখানি প্রস্তরময় দেয়াল। দেয়ালের এক কোণে একটি ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির মধ্যে একটি শ্বেতমর্মরখচিত ফুলদানী। সেই পাত্রের ওপর প্রাসাদের অম্বুরী বাগের রক্ত গোলাপ। গোলাপগুলি থেকে যেন তাজা রক্ত নিঃসৃত হয়ে পাথরের বক্ষ রক্তাভ করেছে।

কিন্তু রাজকুমার সে সব কিছুই দেখছিল না। সে তখন সমস্ত অনুভূতির বাইরে। চোখের সামনে কালো অন্ধকারের কুহেলিকা। মনের মধ্যে অনেক আলোড়ন কিন্তু মনে হয় কোথায় যেন সব স্থির হয়ে গেছে। কোন উন্মাদনা নেই, কোন অস্থিরতা নেই। বিশাল সমুদ্র কোথায় যেন ঢেউহীন হয়ে স্থির হয়ে গেছে। জলের মাঝে কোথাও বুদ্বুদ নেই। কোথাও সাড়া নেই।

যে শব্দ ধরে এতটুকু পথ এগিয়ে চলা যায়। তাই মা চলে যাবার পর আকবর এমন প্রদেশে গিয়ে বাসা বাঁধলো, যেখানে কোন প্রাণীর পৌঁছবার ক্ষমতা নেই। সে পিতৃহীন হয়েছে। অবলম্বন হারিয়েছে। পাহাড় সরে গেছে, এবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র। দুস্তর মরুভূমির ওপর দিয়ে একা তাকে ছুটতে হবে। পাশে কেউ থাকবে না বরং ছুরিকা উত্তোলিত করে শত্রু পিছু নেবে।

সেই মুহূর্তে এসব চিন্তাও আকবরের ছিল না। এসব চিন্তা যদি মনে আসতো, তাহলে মন্ত্রী, সেনাপতির কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো। এ সমস্যারও হয়তো সমাধান হত। মা হামিদা তাকে সে সম্বন্ধে সচেতন করে গেছে। এখন তার কর্তব্য অনেক। শক্ত মুঠিতে তরবারী ধরতে হবে।

আকবরকে হারেমের অনেকে সান্ত্বনা দান করলো। পিতার অন্যান্য বেগমরা যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে অনেক সান্ত্বনার কথা বললো। অন্যান্য রমণীরা ও অন্তঃপুরের শালীনতা বজায় না রেখে ছুটে এসে আকবরের কক্ষে দাঁড়ালো। এলো মন্ত্রী, সেনাপতি,

মনসবদার। তারা স্ব স্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী জানালো এখন থেকে তারা নবীন সম্রাটের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

আকবর কিন্তু নিরুত্তর। তাঁর মুখে কোন ভাষা নেই। তাঁর দৃষ্টিতে কোন শোভা নেই। তাঁর দৃষ্টি বিবশ। মনের গতি স্থির।

একবার তাঁর শুধু মনে হয়েছিল, মার সঙ্গে দিল্লী চলে গেলে কেমন হত? পিতার মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অশ্রুবর্ষণ করলে কি সান্ত্বনা মিলতো না? শক্তি আহরণ করা যেত না?

কিন্তু এ চিন্তাও মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কারণ তখন থেকেই কক্ষের মাঝে লোক আসতে শুরু করেছে। সংখ্যাতীত সান্ত্বনার মোলায়েম বাণী। অন্য সময় এই স্তুতি কানের মধ্যে গেলে হয়তো মনে গর্ব সৃষ্টি হত। কিন্তু এ সময়ে সেই সান্ত্বনায় যেন কোথায় আন্তরিকতা ছিল না। শুধু ছিল আগামী দিনের সম্রাটের কাছ থেকে কৃপালাভের ছলনা।

তাই কিশোর আকবর তেরো বছর পূর্ণ হয়ে চোদ্দ বছরে পড়বার মুখে, তাঁর সমস্ত মানসিক চিন্তাধারা হঠাৎ পরিণতির মুখে এসে পৌছলো। যেন সেইদিনের সেই মুহূর্তে তার বয়স তেরো থেকে তিপান্নতে পরিণত হল।

শোকের নাম সবার শোনা কিন্তু শোকের আসল আকৃতি অনেকেই উপলব্ধি করতে পারে না। কিশোর আকবর পিতার মৃত্যুতে কাঁদতে চেয়েছিল। মা হামিদার মত কেঁদে পিতার স্নেহের প্রমাণ দিতে চেয়েছিল কিন্তু চোখে আসে নি একবিন্দু জল। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল, তবে কি সে পিতাকে শ্রদ্ধা করে না? নাকি পিতার প্রতি তাঁর মনে কোন অবজ্ঞা আছে?

এই সন্দেহের পরিসমাপ্তি ঘটলো, রাত্রিবেলা সেই ফকির নূরউল্লা

যখন তার ব্যথার গান গেয়ে উঠলো। তখন কিশোর আকবর বুঝতে পারলো, তাঁর অবরুদ্ধ কান্না কোথায় যেন সহসা বন্দী হয়ে গিয়েছিল। গানের সুরে সেই বন্দী মুক্তি পেয়ে অশ্বারূঢ় হয়ে ধাবিত হল। সে গতি রোধ করবার সাধ্য কারো থাকলো না।

আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে সেই কান্নার স্রোত কিশোর আকবরের বক্ষ ভাসিয়ে নির্গত হল।

ফকির নূরউল্লা গান গায়। সমস্ত দুর্গের পরিধি ঘিরে শোকের ছায়া অবগুণ্ঠনবতী রমণীর মত ঘুরে বেড়ায়। প্রাসাদের বিলাসকক্ষে রাত্রির উৎসব স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘুম নেই কিন্তু নিদ্রার ইচ্ছাও কারো নেই। রমণী, পুরুষের সবার চোখেই জল। যেন নতুন করে ফকিরসাহেব এসে নতুন মেজাজে কণ্ঠে সুর পরালো। আর সে সুর মৃত সম্রাট বিহনের জন্যে।

এইসময় ফকিরসাহেব নূরউল্লাকে কিশোর আকবরের বড় ভাল লেগেছিল। এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সময় সে গান শুনতে শুনতে কেমন যেন বিভোর হয়ে সেই ভগ্ন মসজিদে চলে গিয়েছিল, যেখানে বসে নূরউল্লা গান গায়। গান শুনতে শুনতে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রাজকুমার বার বার শপথ করেছিল, যতদিন এই পৃথিবীতে জীবনধারণ করবে, সঙ্গীতকে কখনও বিস্মৃত হবে না। সঙ্গীতই হবে তাঁর প্রাণস্পন্দনের সঙ্গী।

কিশোর আকবরের সেই কৈশোরের শপথ কখনও পথভ্রষ্ট হয় নি।

পিতার মৃত্যুর পরের সেই আটচল্লিশ ঘণ্টা আকবরের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিনের প্রতিটি মুহূর্ত বড় নিদারুণভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। পাশে কেউ নেই, কোন আত্মীয়স্বজন। সকলেই পরমাত্মীয় কিন্তু পরমশত্রু।

এরই মাঝে পিতা যাঁকে সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন, অভিভাবক

ও সেনাপতি বৈরাম খান চোদ্দ দিনের মধ্যেই আকবরকে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এর পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে সেই কালানৌর দুর্গে তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেল।

আকবর ক্রীড়নকমাত্র। কোমরবন্ধে তরবারী রাখা আছে, আছে একখানি বক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা কিন্তু তা থেকে লাভ কি? সে যাদের প্রহরাধীনে বাস করছে তাদের একটি ইঙ্গিতেই তো তার মৃত্যু! সুতরাং সে পরাধীন, সে নাবালক। উত্তরাধিকারী হিসাবে তাকে সিংহাসনে বসালেও বুদ্ধি নাকি তার রাজকার্য্যের উপযুক্ত নয়, সেইজন্যে নামে মাত্র সম্রাট হয়ে শাসনকার্য্যের দায়িত্ব পিতৃবন্ধু বৈরাম খানই গ্রহণ করলেন।

পিতা গেছে। আপন বলতে আছে মাত্র গর্ভধারিনী মা। মা কি তাঁর গর্ভের সন্তানকে ভুলতে পারবেন! সেই আটচল্লিশ ঘণ্টার পর হঠাৎ আকবর তাঁর মাকে দেখার বাসনা পোষণ করলো। আকবর প্রকৃতিতে ছিল গম্ভীর ও একরোকা। তার ইচ্ছার অর্থ, পালন করা। আর পালিত না হলে আকবর সহজে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে না।

বৈরাম খান বোঝালেন দিল্লীর অবস্থা না বুঝে সেখানে যাওয়া সমীচিন হবে না। অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করা হয়েছে, সে সুসংবাদ নিয়ে ফিরলেই সেখানে যাওয়া হবে। সম্রাটের মৃত্যুর পর বহু শত্রু গোপনে লুকিয়ে আছে, তাদের প্রকৃতি না দেখে গেলে বিপদ অনিবার্য।

কিন্তু আকবর কিছুতেই কোনকথা শুনলো না। বললো—আমার মা যখন সেখানে আছেন, তখন আমার কোন ভয় নেই। মা যদি শত্রু কবলিত হয়ে থাকেন, তখন সন্তানের আত্মগোপন করা কি উচিত?

বৈরাম খান তবু বোঝালেন—তুমি সম্রাট, তোমার মা মৃত-সম্রাটের পত্নী। তোমার প্রাণের মূল্য ও তোমার মায়ের প্রাণের

মূল্য এক নয়। বুদ্ধিহীনের পরিচয় দিয়ে তুমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিও না।

আকবর তবু মাথা নেড়ে বললো—আমি যখন মনে করেছি, তখন আমি যাবই। আমার মা আপনাদের কাছে তুচ্ছ হতে পারে, আমার কাছে এই রাজ্য ও রাজত্বের চেয়ে মূল্যবান।

অগত্যা দিল্লী যাওয়াই স্থির হল।

২

তবে এসব কাহিনী আরো তিন বছর আগের।

গত রাত্রের কথাই এখানে লিপিবদ্ধ যোগ্য।

গভীর নিশুতি রাত্রি। সেদিন আকাশে শুধু স্বচ্ছ নীলিমার মাঝে শুভ্র মেঘের আলপনা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। চাঁদ উঠেছে। প্রকৃতি সেজেছে রহস্যময়ী সাজে তবে চাঁদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। শুধু রূপো আলো ঝরে পড়ছে নিশুতি রাত্রির বুকে।

সেদিন দিল্লীর প্রাসাদে তারা বাস করছিল না। দিল্লী পরিত্যক্ত হয়েছে পূর্ব সম্রাটের অপঘাত মৃত্যুতে। এখন আগ্রা প্রাসাদ। প্রাসাদের কোল ছুঁয়ে যমুনা বয়ে চলেছে। রাত্রি সেই যমুনার কালোজলে যৌবনপ্রাপ্তা কিশোরীর মত খেলা করছিল। সেই কিশোরীর রক্তিম অধর কাঁপছিল, চোখে লজ্জা নেমে আসছিল। সু-উন্নত বক্ষ উদ্বেলিত হচ্ছিল।

নতুন করে আবার রাজপ্রাসাদ পোষাক পরিবর্তন করেছে। এখন তার নতুনরূপ। বৈরাম খানের খুশির ওপর প্রাসাদের প্রাণ-স্পন্দন। সম্রাট নাবালক। তার বয়স আরো তিনবছর যোগ হয়েছে বটে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি বরং মানুষের চক্রান্তে বুদ্ধি আরো

কমেছে। আকবর এখন প্রত্যহ একবার করে দরবারের সময় সিংহাসনে বসে বটে। তার নামে খোতবাও পড়া হয় কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সমস্ত ক্ষমতার অধীশ্বর সুচতুর ঐ খানখানান বৈরাম খান। তাঁর হুকুমে প্রতিটি কর্মচারী মাথা নত করে। তাঁর বিচারে অপরাধী শাস্তি ভোগ করে। আকবরের সেখানে কোন ক্ষমতা নেই। তার নামে পাঞ্জা আছে বটে কিন্তু সে পাঞ্জা সম্রাট নিজে ব্যবহার করতে পারে না। ছেলেমানুষের হাতে যেমন হাতিয়ার দিলে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে তেমনি আকবরের অবস্থা। অবশ্য এসব উক্তি পদস্থব্যক্তির, বৈরাম খানের—। সুতরাং আকবর ছেলে মানুষ বলে তার নাবালকত্বের দোহাই দিয়ে বৈরাম খানই রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

পিতৃবন্ধু। পিতা এঁর সাহায্যে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন। তাই মৃত্যুর সময় এঁকেই দিয়ে গেছেন তার পরিবারের ওপর সমস্ত কর্তৃত্ব। কিন্তু কেন যে পিতা এইকাজ করে গেলেন? তিনি কি একবারও ভাবেন নি, মানুষ ক্ষমতার অধীশ্বর হলে বিশ্বাস রাখে না। তাঁর দোস্ত যখন ঐশ্বর্যের অধিকার পাবে, তখন যে বেইমানি করতে পারে—এ কথাটা ভাবলেই তিনি অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। তবে পিতাকেই বা দোষ দেওয়ার কি আছে?

তিনি সারাজীবন এমনিভাবেই আঘাত পেয়ে পেয়ে তবু বিশ্বাস করে গেছেন। এরজন্যে অবশ্য সম্পূর্ণাংশে দায়ী তাঁর কোমল মন। পিতার মনটাই ছিল বেইমান। অন্তত সুলতানের পক্ষে এমনি নরম মন থাকা উচিত হয় নি। যুদ্ধ তিনি করেছেন। একটি দিনের জন্যে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। নিজের ভায়েরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। ক্ষমাই তার বাহুর সমস্ত শক্তি হরণ করেছে।

আকবর আজ পিতার সমালোচনা করতে পারছে। পিতার

প্রকৃতি সে যত স্মরণে আনছে, তার চরিত্রের এক দৃঢ়তার ছাপ পরিস্ফুট হচ্ছে। অন্তত তাঁকে যদি রাজ্য পরিচালনা করতে হয়, পিতার স্বভাবের দুর্বলতাগুলি পরিহার করতে হবে।

যুদ্ধ তাদের পরিবারের জীবনের প্রধান অঙ্গ। যুদ্ধ ব্যতিরেকে জীবনধারণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের জাতি যুদ্ধের জন্মে সৃষ্টি, তাই ছোটবেলা থেকে সে নিপুণভাবে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ব করেছে। এখন অন্তত এই বাহুতে একখানি তরবারির দ্বারা একশত লোকের মহড়া নিতে পারে। তার প্রমাণ দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ।

সেই বিরাট যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা একাই গ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তার নিজের। অথচ জয়োল্লাস পেল তারই অভিভাবক বৈরাম খান। যুদ্ধক্ষেত্রে কে একটি তীরের দ্বারা হিমুর চক্ষু বিদ্ধ করেছিল? যুদ্ধের কোলাহলে সে কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল, জয়ই যুদ্ধের প্রধান লাভ, কেমন করে জয় হল কেই বা জানতে চায়?

তবে বৈরাম খানের জন্মেই যে কতকটা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার হল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আজ পাশে বৈরাম খানের মত ব্যক্তি না থাকলে যে কি হত, ভাবাই যায় না। পিতার মৃত্যুর পর যেটুকু মুঘল অধিকারে ছিল সব গেল। গেল দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র। হিমু হয়ে উঠলো হিন্দুস্তানের সম্রাট।

হিমুর আসল নাম ছিল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করলো।

আজ আকবরের বলতে কোন লজ্জা নেই। সে তখন জেনানা হারেমের সাথে আওরতের পোষাকে আত্মগোপন করেছে। সংবাদ রটনা হয়েছিল, মহারাজা বিক্রমাদিত্য আকবরকে খুঁজছেন। কারণ আকবরকে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলেই মুঘল রাজ্যের অবসান হয়।

এদিকে মুঘল সৈন্যরা ভীত ও সন্ত্রস্থ।

দিল্লীর শাসনকর্তা তরদী বেগ সামান্য খণ্ডযুদ্ধের পর সরহিন্দে

পলায়ন করলেন। আলী কুলী সাইবনীও আত্মগোপন করলেন। অগত্যা বৈরাম খানকে ত্বরিৎপদে হারেম সরানোর ব্যবস্থা করতে হল। কারণ এই হারেমে আছে পূর্বতন সম্রাটের বেগম, খুবসুরত রমণী নর্তকী, পরিচারিকা প্রভৃতি। হুমায়ুনের পিতৃদেব বাবরের বহু পত্নী ও উপপত্নী, হুমায়ুনের নিজের বহু মহিষী তাছাড়া আরো নতুন নতুন অনেক খুবসুরত আওরত প্রত্যহ এসে হারেম শোভা করেছিল। তাদের কেন আনা হচ্ছিল আকবর জানে না, তবে তাদের চলে যেতে কখনও দেখেনি নাবালক সেই বালক। আওরতদের কেন প্রয়োজন—এখনও সে অভিজ্ঞতা আকবরের হয় নি। তবে যারা গানও নাচ করতে পারতো, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আকবর ছোটবেলা থেকেই গান-নাচের ভীষণ ভক্ত ছিল। রমণীদের এই ক্ষমতার প্রতি আকবরের তীব্র দৃষ্টি ছিল বলে সে রমণীদের এই পর্যায়ে সম্ভ্রম করতো।

হিমু যেদিন দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করলেন, তখন গোপনে এই হারেমটি স্থানান্তরিত করলেন, বৈরাম খান। আর সেই হারেমের সাথে রমণীর পোষাক পরে আকবরকেও যেতে হয়েছিল। প্রথমে মর্দানা সম্ভ্রমে আঘাত লেগেছিল আকবরের, নিজের পৌরুষ জলাঞ্জলি দিতে স্বীকৃত হয় নি কিন্তু বৈরাম খানের হুকুম। তিনি কঠিন দৃষ্টিতে সেই বালককে বাধ্য করালেন তাঁর হুকুম তামিল করতে।

আকবরকে পালাতে হল জেনানা হারেমের সঙ্গে লাহোরের দিকে। অন্ধকার রাত্রিতে দুর্গম পথ পরিক্রমা করে তাঞ্জামের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে লাহোরের পথে যেতে হল।

আকবর যদি বয়ঃকনিষ্ঠ না হত তাহলে হয়তো মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করতে এমন দ্রুত আন্দোলন জেগে উঠতো না। শেরশাহের আকস্মিক মৃত্যুর পর হুমায়ুন রাজ্যোদ্ধার করলেও শূরবংশীয় আফঘানরা বিনষ্ট হয় নি, বরং তারা মুঘলশক্তি প্রতিহত করবার

ক্ষমতা জয় করছিল। হুমায়ুনের মৃত্যু হতেই শূরবংশীয় আফঘানরা আবার জেগে উঠলো।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তার চার পুত্র ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল তখন জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল খান শূর রণথম্ভর এবং কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খান রেওয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। শেরশাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু আমীররা শেরশাহের মৃত্যুর পাঁচ দিনের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খানকে তার কর্মদক্ষতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং শৌর্যবীর্যের জন্যে কালিঞ্জর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। জালাল খানের রাজ উপাধি ছিল ইসলাম শাহ।

এই ইসলাম শাহের সঙ্গেই পরবর্তীকালে হুমায়ুনের বহু সংঘর্ষ হয়েছিল, তবে ইসলাম শাহ পিতার মত রণকৌশলী ছিল না, তাই রাজ্যবিস্তার করার বাসনা পোষণ করলেও রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হয় নি'

হুমায়ুন জীবিত থাকতেই ইসলাম শাহের মৃত্যু হয়েছিল। ইসলাম শাহের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র ফিরুজ সিংহাসনে বসেছিল। কিন্তু শেরশাহের ভ্রাতা নিজাম খানের পুত্র মুবারিজ খান শূর এই কিশোরকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এই মুবারিজ খানই পরবর্তীকালে মুহম্মদ আদিল শাহ উপাধি ধারণ করেন। এই আদিল শাহ ছিলেন হীন চরিত্র, অকর্মন্য ও বিলাসপ্রিয়। সুরার পাত্র ও রমণী সুঠাম তনুর লীলায়িত ছন্দ ছাড়া তার মনে রাজ্যের কোন চিন্তা ছিল না।

প্রজারা এই রাজার অকর্মন্যতায় বিরক্ত হয়ে উপহাস করে আদিল বা অর্ধ-সম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছিল। আদিল শাহ যেমন নিজে দুর্বল ছিলেন,, কতকগুলি দুর্বললোক তাঁর মোসাহেব ছিল। এবং নিসঙ্কোচে তাদের রাজসম্মানে সম্মানিত করতে দ্বিধা করেন

নি। এইসব রাজসম্মানিত লোকেরা দেশের ও সমাজের কোন মঙ্গল সাধন করে নি, তবে আদিল শাহকে উচ্ছন্নের পথে নিয়ে যেতে এতটুকু বিলম্ব করে নি। তবে এদেরই মধ্যে একজন লোক পরবর্তীকালে বিশেষ ক্ষমতা ও শ্রদ্ধালাভ করেছিল, তার নাম হেমচন্দ্র ওরফে হিমু।

বিশ্বস্ততার জন্যে হিমু ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন। প্রথমে হিমু ছিলেন ইসলাম শাহের বিশ্বস্ত কর্মচারী। পরে আদিল শাহ তাকে বিশ্বাস করেন। তিনি শতদোষে দোষী হলেও হিমুকে অবিশ্বাস করেন নি। সমস্ত পাপের বুঝি এখানেই প্রায়শ্চিত্ত।

আদিলশাহের দুর্বলতার সুযোগে বহু আফঘান আমীর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাজখান কররাণী বিহার অঞ্চলে, ইব্রাহিম খান শূর দিল্লী অঞ্চলে এবং আহম্মদ খান শূর সেকেন্দর খান শূর উপাধি নিয়ে পাঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন! বাঙ্গলার শাসনকর্তা মহম্মদ শাহ শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করে মহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করেন। এরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্যে ঈর্ষা, বিবাদ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল।

সেকেন্দর শাহ লাহোর থেকে আশী হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম শূরকে আক্রমণ করলো। ইব্রাহিম সেদিন পরাজিত হয়ে এটাওয়ায় পালালো।

এই সুযোগে হুমায়ুন কাবুল থেকে আবার হিন্দুস্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। মুঘল শক্তি সেদিন যেন নতুন করে আবার রাজত্বের স্বপ্ন দেখলো। হুমায়ুন যদি এই সুযোগ সদ্ব্যবহার না করতেন, তাহলে পিতৃদেব বাবর শাহের মুঘল রাজত্ব চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত। মুঘল রাজ্য আর কোনদিনও মাথাতুলে দাঁড়াতে সক্ষম হত না।

সেদিনের জন্যে বার বার আকবর পিতাকে সেলাম জানায়। যে পুরুষ বার বার রাজ্য জয় করতে গিয়ে পরাজয়ই বরণ করেছেন,

তারই এই উদ্দম প্রশংসার যোগ্য। বিফলতাই যে মানুষকে দৃঢ় হতে শেখায়, হুমায়ুনই তার প্রমাণ।

পিতৃরাজ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্যে, মুঘল শক্তিকে আবার জাগাবার জন্যে হুমায়ুন অতর্কিতে লাহোর অধিকার করলেন।

এদিকে সেকেন্দর লোদী ইব্রাহিম শূরকে পরাজিত করে পাঞ্জাবে হুমায়ুনকে প্রতিরোধের জন্য উপস্থিত হলেন। দীপালপুরের কাছে মাছিওয়ারার যুদ্ধে আফঘান সৈন্য পরাজিত হল। এবং সেকেন্দর শূর্ সরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করলেন।

তারপর মাত্র আটটি মাস গত হয়েছিল।

মুঘল পতাকা তখন দিল্লী প্রাসাদের উচ্চচুড়ায় বাতাসের স্পর্শে আন্দোলিত হচ্ছে। প্রাসাদের মহলে মহলে নেমে এসেছে নতুন আনন্দের সাড়া। মহলের কক্ষে কক্ষে নতুন ঝাড়ের ওপর রঙিন আলোর ঝিলিক।

বাবরের বিজয়ী দিল্লীর সিংহাসন আবার এসেছে পুত্র হুমায়ুনের হাতে। হুমায়ুন কি তখন দিল্লীর সিংহাসনে বসে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন?

কে জানে, তখন তাঁর মনোভিপ্রায় কি হয়েছিল? মাত্র আটটি মাস। কতদিন আর? একটি রাজ্যের জীবনে কি খুব বেশীদিন? নতুন করে প্রাসাদ সংস্কৃত করতেই তো অনেকদিন লাগে! হুমায়ুন জীবনে একটি দিনের জন্যে পেলেন না একটু স্বস্তি! পেলেন না নির্বিঘ্নে একদিনও শয্যার ওপর শুয়ে নিদ্রা যেতে!

নেমে এল তাঁর শিরে চরমতম এক শাস্তির খড়্গ। শাস্তি নয় এবার বুঝি শান্তিই তিনি পেলেন। সম্রাটের পুত্র হয়ে কি করে অকর্মন্য জীবন যাপন করেন! তাই তাঁকে বার বার

যুদ্ধ করেই জীবন ধারণ করতে হয়েছে। তাই আর যুদ্ধ নয়। এবার শান্তি।

পিতৃ অধীকৃত সিংহাসন হস্তান্তরিত হয়েছিল, আবার ফিরে পেতে—যিনি অলক্ষ্যে আছেন তিনি তাঁর পূর্ণগৌরব ফিরিয়ে দিয়ে তুলে নিলেন।

শেরমণ্ডল নামক গ্রন্থাগারের শিলা সোপান থেকে তাঁর পদস্খলন হল। আর তারপরই মৃত্যু।

এই মৃত্যুই আবার মুঘল বংশের জীবনে বিপদ ডেকে নিয়ে এল।

হিমু হুমায়ুন বেঁচে থাকাকালীন আগ্রা আক্রমণ করেছিল। সেই সময় হুমায়ুনের দিল্লীতে মৃত্যু হয়। হিমুর আর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকলো না। সে অতিসহজেই গোয়ালিয়র অধিকার করলো, তারপর আগ্রা। আগ্রা জয় করে দিল্লীতে আসতে আসতেই বৈরাম খান আকবরকে নিয়ে দিল্লী পোঁচেছিল কিন্তু তখন মুঘল সৈন্যরা ভীত ও সন্ত্রস্থ, তাদের কিছুতেই আয়ত্ব আনতে পারা গেল না।

হিমুর তখন সৈন্যবল, লোকবল অজস্র। দেশের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়েছে। তাই তার সৈন্যসংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে, লক্ষাধিক তুর্ক, আফঘান, রাজপুত সৈন্য। আর তাছাড়া পেয়েছে দিল্লীর রাজকোষ। হিমু তখন আদিল শাহের প্রভুত্ব মুক্ত হয়েছে। সে নিজেই একচ্ছত্র স্বাধীন রাজা। সমস্ত আফঘানরা তখন আদিল শাহের আচরণে বিক্ষুব্ধ। তার কারণ আদিল শাহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করে, হত্যা করে যথেষ্ট অন্যায় করেছে। সমস্ত আফঘানরা তখন হিমুর প্রভুত্ব চাইলো। আর হিমু এই সুযোগ প্রত্যাখান করলো না। মহারাজা বিক্রমাদিত্য নাম নিয়ে দিল্লীর দুর্গেই নিজের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলো।

কিন্তু সে রাজত্বও মাত্র দু-পক্ষকাল স্থায়ী হয়েছিল।

আকবর সেদিন জেনানাদের সাথে তাঞ্জামে চড়ে কিছুতে যেতে চায় নি। বারবার তার বিবেকে আঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। মুঘল বংশের পূর্বপুরুষদের জীবন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছিল, বাবর শাহের কথা ভেবেছিল, তিনি যখন পিতার রাজ্য ফরঘণা পান, তখন তাঁর বয়স কত ছিল? মাত্র এগারো বছর। তিনি কি তাঁর মত এমনি আওরত সেজে তাঞ্জামে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন?

তবে সে কেন যাবে?

সেদিন অন্ধকার রাত্রি। দিল্লী থেকে প্রধান সড়ক দিয়ে আঠারো খানা তাঞ্জাম চলে নি, চলেছিল ঘুরপথে। কারণ হিমুর সিপাহীরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আকবরকে। নাবালক সম্রাটকে খতম করতে পারলেই রাজত্ব কায়েম। সেইজন্যে ঘুরপথে বহু বন জঙ্গলের বেষ্টনী দিয়ে পার হতে হচ্ছিল।

আকাশে সেদিন মসীলিপ্ত অন্ধকার। অন্ধকার মেঘের সীমান্তে শুধু নক্ষত্রের ফুলকি। সঙ্গে মাত্র দশটি সশস্ত্র সৈনিক ছাড়া কেউ নেই। তারা নিঃশব্দে অশ্বারূঢ় হয়ে আঠারো খানি তাঞ্জামের প্রহরায় চলছিল।

যদি এখুনি কোন শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে তাহলে নিশ্চিত পরাজয়। বৈরাম খান জেনে শুনেই এই অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে দিয়েছিল। জেনানারা যদি পথে আক্রান্ত হয়, লুণ্ঠিত হবে। তার জন্যে ভাবলে কি হবে? রাজ্য যদি জয় হয়, তাহলে আবার নতুন করে হারেম সৃষ্টি করলে হবে। দেশে কি সুন্দরী আওরতের অভাব?

কিন্তু আকবর? নবীন মুঘল সম্রাট? তার নিরাপত্তার জন্যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল? যদি এখুনি হিমুর সিপাহী তাঞ্জাম অধিকার করে?

একটি তাঞ্জামের মধ্যে আকবরের মা হামিদা, ধাত্রীমা জিজি আনাঘা ও আকবর। আকবরকে তখন পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল না, পরণে সালোয়ার, কামিজ মাথায় ওড়নার আবরণ। একটি পরচুলা দিয়ে রমণীর মত চুল বিন্যাস করা হয়েছে। অধরে রক্তরাগ, চোখে সুর্মা, গণ্ডে গুলাবী আভা। তবু কি আকবরকে রমণী বলে মনে হচ্ছিল? বিরাট মুখের আদলটা কোথায় যাবে? কোথায় যাবে প্রশস্ত বুকখানি? পুরুষচিহ্ন যে সবই আকবরের ছিল।

হামিদা আকবরের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। বার বার তাই রুদ্ধ তাঞ্জামের মধ্যে পুত্রের হাত চেপে ধরেছিলেন। তাঁর জীবনে এই মুহূর্তটি নতুন নয়, তিনি এরকম বহু সময়ের মুখোমুখি হয়েছেন। স্বামীর সাথে তাঁর সর্বদা থাকতে হত। বিপদ সর্বদা তাঁদের জীবনে আসতো।

তিনি তখন ভাবছিলেন পুত্রের কথা। আগামী দিনের সম্রাটকে রক্ষা করা তাঁর একান্ত কর্তব্য। শুধু পুত্র নয়, মুঘল বংশের ভবিষ্যৎ। স্বামীকে যেমন সর্বদা ছায়ার মত তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছে, আজ তেমনি পুত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি যেন কেমন বুদ্ধিভ্রষ্টা হয়েছেন? রক্ষার কোন সন্ধানই খুঁজে পারছেন না। স্বামীর মৃত্যুতে শোক পর্যন্ত করতে সময় পেলেন না। দুদণ্ড কাঁদতে পেলে বুঝি মনের শক্তি আবার ফিরে আসতো।

মাত্র কদিন শুধু স্বামীর সঙ্গত্যাগ করেছিলেন। পুত্রকে অনেকদিন দেখেন নি বলে দিল্লীতে গিয়ে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কালানৌর দুর্গে গিয়েছিলেন। তারপরেই খবর গেল, নিদারুণ সে সংবাদ।

হামিদা আজ তাই বার বার ভাবেন, সেদিন স্বামীর কাছ ছাড়া না হলেই বুঝি ভাল হত। কাছ ছাড়া হয়েছিলেন বলেই

বোধ হয় খোদা অলক্ষ্যে মৃদু হেসে সুস্থ মানুষটিকে সরিয়ে নিলেন।

সেদিনের সেই ঘটনা কিছুতে মন থেকে মুছে যায় না। বার বারই কেমন করে যেন চোখের দুই কোণে নোনাজলের স্রোত বেরিয়ে আসে। বক্ষ হয় উদ্বেল। বুদ্ধি যেন কোথায় কোলাহলের মাঝে হারিয়ে গেছে।

শুধু ভয়। সে ভয়টা স্বামীর পাশে থাকতে কখনও তাঁর জাগে নি। বরং সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন, বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে স্বামীকে অনুমতি দিয়েছেন।

আজ যে কি হল? এই বিপদে পুত্রকে কোন উপদেশই দিতে পাচ্ছেন না। শুধু ভয়ে পুত্রের হাত বার বার চেপে ধরছেন।

তাঞ্জাম চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। বন জঙ্গল ডিঙিয়ে, নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে, বন্যজন্তুর আক্রমণকে প্রতিহত করে তাঞ্জাম চলেছে। গন্তব্যস্থান মানকোট রাজগিরির। সেখানে পৌঁছতে অনেক দেরী, অন্তত যে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছলেই শান্তি।

এই সময় আকবর তাঞ্জামের রুদ্ধ দ্বার খুলতে চাইলো।

হামিদা চমকে উঠলেন। হাত চেপে ধরে বললেন—বেটা দুঃসাহসের কাজ কর না। তোমার ওপর নির্ভর করছে মুঘল রাজবংশের ভবিষ্যৎ।

আকবর একবার থমকে মাতার কথাগুলি শুনলো, তারপর চাপাস্বরে বললো—তাহলে ছেড়ে দাও মা, দুঃসাহস মুঘল রাজপুত্রেরই শোভা পায়।

কে জানে কি ভাবলেন আকবর জননী হামিদাবানু। হঠাৎ হাতের গ্রন্থি তাঁর শিথিল হয়ে গেল। বুঝি মনে পড়ে গেল স্বামীর কথা। কত কষ্টে উদ্ধার করা তাঁর রাজ্য।

তবু একবার তিনি কাতরকণ্ঠে বললেন—কোথায় যাবে বেটা?

আকবর মাথা নাড়লো। জানি না। তবে যাবার জন্যেই মন ব্যগ্র হচ্ছে। যেতে হবেই। দিল্লী উদ্ধার করতে হবে। ওখানে আছে আমার পিতার নিঃশ্বাস। ওখানে আছে আমার পূর্বপুরুষের স্পন্দন।

কিন্তু তুমি যে বড় ছেলেমানুষ বেটা!

সে বাধা আমাকে লঙ্ঘন করতেই হবে।

নেমে এল আকবর তাঞ্জাম থেকে। তারপর একটি সৈনিকের সাথে পোষাক পরিবর্তন করে তারই অশ্বে সওয়ার হয়ে বসলো।

চোদ্দ বছর ক'মাস তখন বয়স মাত্র আকবরের।

সেই অন্ধকার মসীলিপ্ত রাত্রে সহায়হীন এক নবীন সম্রাট রাজ্য পুনরুদ্ধারে জন্যে ছুটলো আবার পশ্চাৎমুখী। তখন যদি কিছু সংখ্যক শত্রুসৈন্য এই কিশোরের সন্ধান পেত—একা কতক্ষণ আর ঐ কিশোর—বলশালী যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করতো?

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ জয় করেছিলেন বৈরাম খান। লোকে বলে, ইতিহাসকাররাও সেই উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আকবর যদি সেদিন তাঞ্জাম পরিত্যাগ করে মুঘল সৈন্যদের মাঝে না গিয়ে দাঁড়াতো, তাহলে কি যুদ্ধে জয়লাভ হত? নবীন সম্রাট আকবরকে দেখেই তো মুঘল সৈন্যরা হৃতশক্তি পুনঃলাভ করলো। নব বলীয়ানে তারা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে শত্রু ধ্বংসের ব্রত গ্রহণ করলো।

আকবরের সে সময়ের মূর্ত্তি বড় দর্শনীয় হয়েছিল। কে বলবে তার বালকসুলভ আকৃতি? শত্রু ধ্বংসের জন্য সৈন্যদের মাঝে তার মুখমণ্ডল হয়েছিল পশুসদৃশ, ভয়ঙ্কর। তরবারী হাতে নিয়ে যখন সৈন্যদের মাঝে দাঁড়ালো, তাঁর পেশীবহুল বাহুর ভঙ্গি দেখে দৈত্যের মত মনে হল' এদিকে সর্বদেহে রাজবংশের আভিজাত্য বিদ্যমান। প্রশস্ত ললাট, খর্ব নাসিকা, উদ্ধত গ্রীবা, আয়ত উজ্জ্বল দুই চক্ষুর দৃষ্টি দেখে মুঘল সৈন্যরা যেন নতুন করে

সাহস আহরণ করলো। মনে মনে তারা তাদের নবীন সম্রাটকে হাজারো সেলাম পেশ করলো।

এই জন্যেই কি পাণিপথের যুদ্ধ জয়লাভ হয় নি? তবু কেন ঐতিহাসিকরা ভুল তথ্যের উপর নির্ভরশীল হলেন? কেন তাঁরা বৈরাম খানকেই দিলেন শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান?

মুঘল সৈন্যরা নবীন সম্রাট আকবরের সমক্ষে যে শপথ গ্রহণ করেছিল, তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সমস্ত শক্তি তারা নিয়োগ করে মুঘল রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে।

না হলে হিমুর অপরিমিত শক্তির কাছে জয়লাভ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। হিমু ছিল হিন্দু। হিন্দুরাজ্য গঠন ও দেশের স্বাধীনতা সৃষ্টির জন্যে দেশমাতৃকার আহ্বানে দেশের লোক সৈন্যসাজে এসে হিমুর পাশে দাঁড়িয়েছিল।

সেই পাণিপথের রণক্ষেত্র। যে বিস্তৃত ক্ষেত্রভূমিতে শুধু রক্তচিহ্ন, মানুষের কঙ্কাল। আর বাতাসে শোনা যায়, যুদ্ধের বাদ্য, রণকোলাহল ও মানুষের আর্তনাদ।

প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল দুইদলে—ইব্রাহিম লোদীর সাথে বাবর শাহের। সেই যুদ্ধে যদি বাবর পরাজিত হতেন, তাহলে মুঘল বংশের ভারতে রাজ্যবিস্তার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেত। সেখানেও এক দারুণ ভাগ্য পরীক্ষা হয়েছিল।

পরবর্তী দ্বিতীয় পাণিপথ যুদ্ধে একই ভাগ্যপরীক্ষা। এখানেও সেই মুঘল শক্তির সাথে দ্বিতীয় ও শক্তিশালী শক্তির ভাগ্য নিরূপণ। যে হারবে তাকে দিল্লী ছাড়তে হবে। দিল্লীতে উড়বে বিজয়ীর পতাকা।

যুদ্ধ এক সময়ে আরম্ভ হয়েছিল। দু'দলই শক্তিশালী। দু'দলেরই রণক্ষমতা তুলনাবিহীন।

সূর্য সেদিনও মধ্যগগনে উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করে প্রান্তর আবোরিত করেছিল।

একদিকে হিমু তার তুর্ক, আফঘান, রাজপুত বাহিনী নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। অন্যদিকে বৈরাম খান ও আকবর। বৈরাম খান তখনও আকবরকে নাবালক ভাবছিলেন। যেখানে আকবর অশ্বপৃষ্ঠে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তার চার-পাশে কয়েকজন বেশ দক্ষ সৈনিক। এক রকম আকবরকে প্রহরার মধ্যে রেখেছিল। খান সাহেবের হুকুমে এই ব্যবস্থা হয়েছিল। বৈরাম খান তখনও আকবরের নিরাপত্তার জন্যে চিন্তিত। যদি কোন মারণাস্ত্র অতর্কিতে এসে বন্ধুপুত্রের জীবন নাশ করে, তাহলে তাঁর আক্ষেপের আর অবধি থাকবে না।

কিন্তু আকবর এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিল। সে নাবালক হতে পারে বটে তবে ভীরু বা কাপুরুষ নয়—একি পিতৃবন্ধু ও অভিভাবক বৈরাম খান জানেন না? নাকি জেনে শুনেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। যদি যুদ্ধে জয় হয়, তাহলে সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর নিজের—আর যদি পরাজয় হয়?

সে সময় আকবর আর কিছু ভাবতে পারে নি। শুধু চীৎকার করে সৈন্যদের উৎসাহদানের জন্যে বলেছিল—ভাইসব, তোমরা নিশ্চয় শুনেছ, এই পাণিপথের ক্ষেত্রেই এর আগে আর একটি বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই যুদ্ধ আর আজকের এই যুদ্ধ প্রায় একই। সেদিন মুঘল সম্রাট বাবর শাহ দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, জয় হয়েছিল মুঘলদের। আজ মুঘলরা কি হিমুর বিস্তৃত বাহিনী দেখে পিছু হটবে? তারা তাদের অতীত গৌরব রক্ষার জন্যে প্রাণসমর্পণ করবে না? মুঘল সম্রাট বাবর শাহ নেই কিন্তু তারই বংশধর আকবর শাহ তোমাদের সম্মুখে আছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে—জয়, নয় মৃত্যু। তবু পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না।

মুঘল সৈন্যরা আকবরের এই সগর্ব উক্তিতে রণতাণ্ডব অনুভব

করলো এবং রণহুঙ্কারে মুঘলশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ভীষণ বিক্রমে হিমুর বাহিনী আক্রমণ করলো।

বৈরাম খান আকবরের রণনীতিতে কি চমকিত হন নি? তখনও কি তিনি আকবরকে বালক ভাবছিলেন? কে জানে? তাঁর অভিপ্রায় কি—জানবার কোনই সুযোগ ছিল না।

এদিকে হিমু্ এমন বিক্রমে আক্রমণ করলো যে সমস্ত মুঘল সৈন্য ধূলার সাথে কোথায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পরাজয় বুঝি অবশ্যম্ভাবী।

তখন বৈরাম খান কি করেছিলেন? ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের সবশে ফিরিয়ে আনার জন্যে মরীয়া। কিন্তু বিপক্ষের বিক্রমের কাছে মুঘল সৈন্যরা তখন প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যস্ত।

এদিকে আকবর প্রহরার মধ্যেই যুদ্ধ করে চলেছে। সে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। একেবার অগণিত শত্রুর সামনে। অসংখ্য মৃত্যুর মুখোমুখি। কিন্তু আকবরের ভয় নেই! তবে কি সে সাহস দেখাবার জন্যে এতদূর এগিয়েছে? কিন্তু যদি অতর্কিতে কেউ চরম আঘাত হানে?

সত্যিই আকবরের তখন কিছুই মনে ছিল না। বোধ হয় তার তখন রক্তে বংশের প্রচলিত ধারার ঢল নেমেছে। মুঘল বংশ যুদ্ধের বংশ। রণ ছাড়া যে জাতি কখনও জীবনধারণ করে নি। সেই রণতাণ্ডবের হুঙ্কার বুঝি আকবরের স্পন্দনের সাথে যুক্ত হয়েছে। অগণিত তীর সে নিক্ষেপ করে সৈনিক বধ করে চলেছে। সামনে যে আসছে, তাকে তরবারীর আঘাত। এক আঘাতেই ভূমিশয্যা। কে বলবে তখন আকবর বালক? বয়স তার মাত্র চোদ্দ।

আকবর তখন বুঝতে পারছিল, তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ —তার এই যে শত্রুর বাহিনীর মধ্যে বেপরোয়া হয়ে প্রবেশ— পরিণাম অচিন্তনীয়। তবু সে যেন গতিরোধ করতে অক্ষম।

শুধু এগিয়ে যাচ্ছে। জয়লাভ করতেই হবে। জয় না হলে ফিরেও যাওয়া হবে না। মুঘল রাজপুত্রের মৃত্যুই তখন হবে সকল গৌরবের সমান।

আকবর শুধু সেইজন্যেই কি যাচ্ছিল? এছাড়া কি আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু তার দুটি আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু লৌহজালের মধ্যে দিয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে কি সন্ধান করে ফিরছিল? এইসময় একটি তীক্ষ্ণধার তীর এসে আকবরের বামবাহুতে বিদ্ধ হল। আকবর ক্ষিপ্রহস্তে তীরটি স্থানচ্যুত করলো। রক্ত ছুটলো প্রবল বেগে। মুহূর্তে রক্তে তার কামিজ ভিজে গেল।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আকবর যাকে খুঁজছিল, তাকে হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে দেখতে পেল।

হিমু সেই সন্ধানী ব্যক্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে আকবরের হাত থেকে ছুটে গেল একটি সুতীক্ষ্ণ তীর। অব্যর্থ লক্ষ্য। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মুখের লৌহজাল ছিন্ন করে একটি চক্ষুর মাঝে সেই তীর হল সন্নিবিষ্ট। চক্ষুর অন্তনীলে গহ্বরের মাঝে যেন তীরের ফলা এক নতুন ইতিহাস রচনা করলো। মহাপরাক্রমশালী হেমচন্দ্র ওরফে মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমস্ত শক্তি হারিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

দলপতির আঘাতে বিজয়ী সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়লো, এই অবসরে মুঘল সৈন্যরা হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করলো।

জয়ের পতাকা উঠলো পাণিপথ ক্ষেত্রে মুঘলের বিজয়বার্তা বহন করে। দ্বিতীয় পাণিপথ যুদ্ধ আবার ইতিহাসের পাতায় লিখিত হল মুঘলের প্রতিষ্ঠাকে নতুন কালিতে রঞ্জিত করে।

সেই বালক আকবর। বালকই তাকে বলতে হবে। সবাই তাকে ক্ষুদে সম্রাট বলে।

দিল্লীতে যখন বিজয় বাহিনী গিয়ে পৌছলো, তখন জয়ধ্বনি

শুধু সম্রাট আকবরের নামেই হল না। সঙ্গে বৈরাম খানের জয়ধ্বনিও শোনা গেল।

আকবরের প্রতিবাদ করবার বাসনা জেগেছিল, গর্জন করে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল—এ ভুল। বৈরাম খান তার অভিভাবক হতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তার। সে না হিমুকে বধ করলে এই জয়ধ্বনি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার প্রতিবাদের তখন কোন ক্ষমতা ছিল না। সে একটি হস্তীর পৃষ্ঠে শুয়ে বাহুর অত্যাধিক রক্তক্ষরণে ক্লান্ত। তাছাড়া যন্ত্রণাও তার সমস্ত উৎসাহ হরণ করেছে।

তখন তার বিশ্রামই দরকার। একযুগ বিশ্রাম। একটি সুকোমল শয্যা, কিছু আহার্যবস্তু। আর কোমল হাতের সেবা। মা যদি এখন কাছে থাকতেন? মায়ের স্পর্শের জন্যে তার মন লালায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মা তখন কোথায় কে জানে? মানকোট কিম্বা কাবুলে সেই আঠারোখানি তাঞ্জাম পৌঁচেছিল কিনা কেউ জানে না। অন্তত তার কাছে কেউ তাদের নিরাপত্তার সংবাদ প্রেরণ করে নি। কে জানে, তার মা বেঁচে আছে কিনা! যদি না থাকে, তাহলে এই জয়ের কোন আনন্দই সৃষ্টি হবে না।

বিজয়বাহিনী দিল্লী প্রাসাদের মধ্যে পৌঁছবার আগেই আকবর জ্ঞান হারিয়েছিল।

বাহুর ক্ষতর জন্যে নয় অবশ্য। বীরপুরুষদের এই ক্ষত সামান্যই। আকবর অপরিণত বয়স্ক যুবক হলেও বীর যে, সে বিষয়ে অস্বীকার করা যায় না। তবু সে জ্ঞান হারিয়ে থাকলো।

প্রাসাদের সবচেয়ে আরামদায়ক কক্ষে রাজসিক শয্যার ওপর নিস্পন্দ দেহে অনেকদিন পড়ে থাকলো। রাজবৈদ্য চিন্তিত হল। বৈরাম খানের মানসিক অবস্থা বোঝা গেল না, তবে নবীন সম্রাটের আরোগ্যের জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

বিজয়ী সেনারা নতুন সম্রাটের জ্ঞান ফেরার জন্যে একান্ত

উদ্বেগে অপেক্ষা করতে লাগলো। মসজিদে মসজিদে পীরসাহেবরা নবীন সম্রাটের জন্যে প্রার্থনা করতে লাগলো।

প্রকৃতিও বুঝি আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সূর্যদেবের প্রখররশ্মি কোথায় যেন লুকিয়ে গেল। আকাশ হল মেঘাচ্ছন্ন। মনে হল বুঝি এখুনি কান্নায় সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হবে। ঝড় উঠলো। ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবে ঝাউবীথিকায় প্লাবন জাগলো। যমুনার শ্রোতে জোয়ার উঠলো। বৃন্তচ্যুত হল ফুলতনু।

নির্মূল হল প্রাসাদের অম্বুরীবাগের সমস্ত পুষ্পসজ্জা। বিত্যুৎ চমকাল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে শুধু আলোর প্রতিফলন। ডমরু যেন বেজে উঠলো। এবার নাচবে প্রলয়রূপী ভয়ঙ্কর জটাধারী মহাদেব।

যেন কাল বৈশাখী এসে পৌঁছলো। অথচ সেটা বৈশাখ মাস ছিল না। অকালে অকাল প্রলয় আর কি। সেটা ছিল রমজানের পর শওয়াল মাস। পবিত্র রমজানের পর এ মাসটাও নাকি পবিত্র। এ মাসে কোন অঘটন ঘটে না। প্রকৃতি থাকে শান্ত। মঙ্গল হয় সব শুভকাজের। রমজানের আগে শাবান মাস যেমন, ঠিক তেমনি।

অথচ ধরিত্রীর এই প্রলয়রূপ ঘটলো।

কিন্তু যতই ঝড় উঠলো, গর্জন আকাশসীমা লঙ্ঘন করলো— বৃষ্টি ঝরলো না। আকাশের চক্ষু থেকে কান্নার জল পড়লো না। শুধু কিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেল। বৃক্ষশাখে যে পত্রটি খসবে না বলে প্রাণপণে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল, সে আর রক্ষা পেল না—এক ধাক্কায় কোথায় যে চলে গেল, কোন্ মহাশূন্যে উড়তে উড়তে কেউ তার ঠিকানা জানে না। এমনি হারিয়ে গেল অনেক নতুন পত্রগুচ্ছ। যারা অনেক সম্ভাবনা বুকে ধারণ করে বৃক্ষশাখে জন্ম নিয়েছিল, বাতাসে মৃত্নমন্দ স্পর্শে দোল খেয়েছিল,

তারা কি জানতো এই বাতাসই একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রবল শক্তি দিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে ?

শুধু বৃক্ষপত্রই জীবন আহুতি দিল না। যমুনার জলের নীরবধি সেই ঝরণার গান হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তার পরিবর্তে তার বুকে লাগলো দারুণ জোয়ার। সে নিজেই নিজের মধ্যে ভীষণ হয়ে নিজেকে প্রহার করতে লাগলো। তার সেই রূপ দেখে কে বলবে অতীতে সে ছিল সঙ্গীতিকা। মধুর সুরে সে গান গেয়ে পারের মানুষকে নিদ্রাসুখ বিতরণ করতো !

৩

আকবরের জ্ঞান ফিরলো।

তার জ্ঞান ফিরলো কার যেন কোমল করস্পর্শে।

প্রকৃতি তখন আবার স্ব অবস্থায় ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে পৃথিবী স্বচ্ছ একনীল মেঘের স্নিগ্ধতা নেই। দু একটি পারাবতকেও দূর দূর উজানে চক্রাকারে দেখা যাচ্ছে।

আকবর দুটি ব্যাকুলদৃষ্টি নিয়ে তার শয্যার পাশে তাকালো। সে তখন তার মাকে বোধ হয় খুঁজছিল কিন্তু যার কোমলহাতখানি তার কপালে ছিল, সে যে মা নয়—এই ভেবে তার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হল। ইচ্ছে করলো পাশে বসে থাকা ধাত্রীমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার মা-কি ফিরে আসেন নি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সরম জাগলো। সে যে এখন শিশু নেই, এই বোধটা তাকে ভুলতে হবে। এখন মায়ের জন্যে উতলা হওয়া যে শোভন নয়, তাছাড়া সে এখন সম্রাট, বালক নয়—এজন্যেও তাকে সংযম ধারণ করতে হবে।

কি কষ্টকল্পিত যে এ সংযম—যে বেদনা না বুঝবে, উপলব্ধি

করতে পারবে না! কিন্তু মা-কি প্রাসাদে ফেরেন নি? ফিরলে তার শিয়রে কি না এসে পারতেন? তাঁর পুত্র যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, এতে তাঁর কি গর্ব হয় নি? তিনি গর্বিতা নন! কে জানে, দিল্লীতে খবরটা কিরকমভাবে পরিবেশিত হয়েছে। হয়তো বৈরাম খান নিজেই সমস্ত কৃতিত্ব আত্মসাৎ করেছেন। আর সবাই তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বালক যুদ্ধে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে বলে অসুস্থ হয়েছে। হয়তো মাও তাকে সেই সহানুভূতির চোখে দেখবেন, বললেন—বেটা, তুমি এখনও অপরিণত, নিজেকে তৈরী কর, তারপর যুদ্ধে যেও।

কিন্তু মা যদি প্রাসাদে থাকতেন, একথা শুনেও তো পুত্রের শিয়রে এসে উদ্বিগ্নমনে বসতেন! তার যে পুত্র স্নেহ অগাধ! তিনি যে তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে কখনও বিস্মৃত হন না?

যদিও আকবরের লালন পালন সদ্বংশীয় ধাত্রীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। পিতা হুমায়ুন দেশদেশান্তরে রাজ্যোদ্ধারের জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন বলে ধাত্রীর হেপাজতে পুত্রকে রেখে দিতেন। তখন সঙ্গে হামিদাবানুও থাকতেন। সেইজন্যে মায়ের স্নেহ আকবর অল্পই পেয়েছে।

তবু স্নেহের কাঙালপণার যেন শেষ নেই। মায়ের স্নেহ না পাওয়ার জন্যেই আকবরের মনের মধ্যে হাজারো আকাঙ্ক্ষা জমা হত। তাই মাকে যখন পেত, কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে আর মাকে সহজে ছাড়তো না। মাও তাকে কোন সময়ে অবহেলা করেন নি। কিন্তু বড় হয়ে তাকে সেই ছেলেমানুষি ত্যাগ করতে হয়েছে। এখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার বাসনা জাগলেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। কারণ বাধা অনেক। সে বড় হয়ে গেছে। লোকে বলবে কি?

আজও সেই জ্ঞান ফিরে আসবার পরে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে তার লজ্জা করতে লাগলো। অনেক ইতস্তত করে, গবাক্ষের

মাঝে অনেকক্ষণ ধরে চোখদুটি ন্যস্ত করে তারপর এদিকে ফিরে জিজি আনাঘার দিকে সে তাকালো।

এ রমণীটির বয়সও মায়ের মত। তবে মনে হয় মায়ের চেয়ে কিছু ছোট! কারণ এখনও তার শরীরের বাঁধুনিতে আছে মায়ের মতই রমণীয় স্বাস্থের লক্ষণ। দেহের লালিমা চন্দ্রের সুষমার মত দীপ্তিময়। চোখের দুটি কালো তারায় আছে পুরুষের হৃদয় হারানোর আকর্ষণ।

সেই মুহূর্তে এসব কথা অবশ্য আকবর ভাবেনি। সে শুধু চুপ করে চোখ বুজে শয্যার মধ্যে পড়েছিল।

আর জিজি আনাঘা তাকিয়েছিল ব্যাকুলদৃষ্টিতে পুত্রসম সম্রাট আকবরের দিকে।

শুধু বেতনভোগী ধাত্রী ছিল না এই জিজি আনাঘা। আকবরের যখন তিনবছর বয়স তখন থেকেই এই রমণী তাকে পালন করে আসছে।

আকবরের শৈশবকাল ছিল একটি উপন্যাসের মত চমকপ্রদ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ছিল তখন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ। মধ্যযুগ বিলীয়মান। সর্বদেশের চিন্তাকাশ তখন নব-চিন্তার নবারুণরাগে উদ্ভাসিত। ইউরোপে রেনেসাঁ, ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট বিরোধ, পারস্যে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ, ইসলামে মাহাদী নূতন ধর্মসংস্থাপক আন্দোলন, ভারতে সুফী ধর্মপ্রবাহ—বহু ফকীর সাধুসন্ত ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব হয়েছিল। সে এক অপূর্ব মিলনের সুর। সেই যুগে সকল দেশেই বিশেষ শক্তিশালী রাজবংশ, শক্তিমান রাজা রাজপুরুষের আগমন হয়। সকল রাষ্ট্রেই তখন রাষ্ট্র-শাসনে নূতন ব্যবস্থার সূচনা লক্ষিত হয়েছে।

এই মহা চাঞ্চল্যের যুগেই হয় আকবরের জন্ম। আকবরের

জন্ম ইতিহাসও বেশ চমকপ্রদ। হুমায়ুন তখন পলায়নমুখী। হঠাৎ খবর পেলেন তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে।

হামিদা তখন আশ্রয় লাভ করেছিল, সিন্ধুর অন্তর্গত থর ও পার্কর জিলার মাঝামাঝি অমরকোটে রাণা বীরশালের গৃহে।

হুমায়ুন তখন অমরকোট থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে নিজের শিবিরে। পুত্রজন্মের সংবাদ পেয়ে তিনি আনন্দে সৈন্যসামন্তকে একখণ্ড কস্তুরী ভেঙে দান করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই কস্তুরীর সুগন্ধের মতই তাঁর পুত্রের যশ পরিব্যাপ্ত হবে।

পিতা তার পুত্রের জন্যে সর্বদা উত্তম ভবিষ্যদ্বানীই প্রকাশ করে। এটাই স্বাভাবিক। হুমায়ুন পিতৃকর্তব্যই পালন করেছিলেন। পরে সেই ভবিষ্যদ্বানী সফল হয়েছিল কিনা, সে কথা পরে বিবেচ্য।

তখন শুধু ভূমিষ্ট শিশুসন্তানকে নিয়ে হামিদা রাণা বীরশালের গৃহে। অবশ্য রাণা বীরশাল তাদের কোন অযত্ন করেননি। তবু তো অনিশ্চতার ওপর জীবন! স্থিতি কোথায়? অন্তত সদ্যভূমিষ্ট শিশুকে রক্ষার ভিন্ন অনেক দায়িত্ব আছে কিন্তু উপায় কি? রাজ্যহীন পিতা যেখানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁর পুত্রের রাজ অট্টালিকা, সুকোমল শয্যা কোথায় মিলবে? আত্মীয়-স্বজনও তখন বিমুখ ছিল।

আকবরের জন্মের একমাস পাঁচদিন পর ঝুনের শিবিরে হামিদা তাঁর পুত্রকে নিয়ে স্বামীর কাছে পৌঁছেছিলেন।

হুমায়ুন খুশি হয়েছিলেন পত্নী ও পুত্রকে দেখে কিন্তু তাঁর তখন এতটুকু অবসর ছিল না। শত্রু পশ্চাতে, সম্মুখে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব শত্রু। সকলেই তরবারী উন্মোচিত করে ছুটে আসছে সংহার করতে।

হুমায়ুনের তখন তিনটি ভাই-ই শত্রু। কামারণ, আসকারী, হিন্দাল। হিন্দাল তো একবার বাগে পেলেই হয় হুমায়ুনকে। তার মনের মানুষকে বৈমাত্রেয় ভাই অধিকার করেছে, ক্রোধ কি

সহজে মেটে? আজ হামিদা তারই বেগম হত। কোত্থেকে হুমায়ুন এসে হাজির হল। হমিদাকে দেখলো সে। ওমনি চারচক্ষে মিলন হয়ে গেল। হামিদা অবশ্য প্রথমে রাজী হয়নি কিন্তু হিন্দালের মাই আগ্রহান্বিতা হয়ে এই মিলন করিয়ে দিলেন।

এ ছাড়া অধিকার নিয়েও হিন্দাল হুমায়ুনের ওপর ক্ষিপ্ত। রাজ্যের অধিকার নিয়ে একই কারণে কামরাণ, আসকারীও হুমায়ুনের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। এমন কি তাঁরা বিদেশী শেরশাহের হাতে রাজ্য তুলে দিয়েছিল, তবু ভ্রাতাকে সাহায্য করে নি।

হুমায়ুন যখন ঝুনের শিবিরে বসে পুত্রের মুখদর্শন করছেন, প্রিয়ার বাহুডোরে নিজেকে সঁপে দিয়ে একটু স্বস্তির আশা করছেন, এমনি সময়ে সংবাদ পেলেন ভ্রাতা আসকারী দশহাজার সৈন্য নিয়ে ঝুন শিবির আক্রমণ করতে আসছে।

হুমায়ুন মহাচিন্তায় পড়লেন। তাঁর সৈন্যবল খুব পর্যাপ্ত নয়। অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই। ভ্রাতার অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল। সুতরাং পালানো ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কোথায় পালাবেন? সঙ্গে আছে এক মাসের শিশু পুত্র।

হঠাৎ হামিদার অনিচ্ছার ওপরই হুমায়ুন ব্যবস্থা করলেন, শিশু আকবর ভ্রাতার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় এখানে পড়ে থাকবে। যদি তার ইচ্ছা হয় তাকে রক্ষা করবে, কিম্বা শত্রু ভেবে ঐ শিশুকে মেরে ফেলবে।

হামিদা শুনে মুখে হাত চাপা দিয়ে ক্রন্দনভারে ভেঙে পড়লেন—এও কি সম্ভব? একটিমাত্র পুত্র জন্মের পর যাকে দেখে কত আনন্দ মনে জেগেছে। শিশুর সরল মুখখানির ওপর বসরাই গোলাপের মত ঔজ্জ্বল্য।

তাকে ফেলে যেতে হবে? আমি মা না রাক্ষসী!

কিন্তু উপায় কোথায়? শিশুকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে এই দুর্গম পথ

অতিক্রম করে নিয়ে যেতে গেলেও তো মৃত্যু ঘটবে। আর তাছাড়া পথে পথে কত নিয়ে ঘুরবে? মৃত্যু তো তাতেই হবে।

রোরুদ্যমানা হামিদা তবু কিছুতে নিজেকে প্রকৃতস্থ করতে পারলেন না। কি করে পারবেন? দশমাস ধরে কি তাকে কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয় নি? কি নিদারুণ যে এই অবস্থা?

হুমায়ুন সে সময় পত্নীকে বোঝাবেন কি? অত বড় যোদ্ধা, বালকের মত পত্নীর সামনেই কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। তাঁরও মনে হচ্ছিল, শিশুর বুঝি আর পরিত্রাণ নেই। তার মৃত্যুও কেউ রোধ করতে পারবে না। ভ্রাতা আসকারী তাকে না পেয়ে তার পুত্রের ক্ষুদ্র দেহই এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে।

কিন্তু আর ভাববার সময় ছিল না। অন্ধকার পথ দিয়ে বেগে ছুটে আসছে অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। যেন কাড়া নাকড়া, দুন্দূভি কেউ বাজাতে শুরু করেছে।

আর যদি ভাবতে শুরু করেন, তাহলে নিশ্চিত ধরা পড়তে হবে।। সুতরাং এখুনি পালাতে হবে। হুমায়ুন চোখের অশ্রু ত্যাগ করে, মনের দৃঢ়তা আহরণ করে সৈন্যদের সরে পড়তে বললেন এবং নিজে হামিদাকে সামনে তুলে অশ্বে উঠে বসলেন।

পড়ে থাকলো একমাস পঁচিশ দিনের বালক তাঁবুর একটি খাটিয়ার ওপর। অনিশ্চিত তার জীবন। বাঁচবে কি মরবে কেউ জানে না। কেউ জানে না শিশুর নিরাপত্তা কেমন করে রক্ষিত হবে! শিশু আকবর শুধু তখন তাঁবুতে প্রজ্বলিত একটি মশালের দিকে চেয়ে নিজের মনে হাসছে।

কোথাও কোন লোক নেই। শুধু বাইরে আছে উন্মুক্ত ক্ষেত্র, আর জোনাকিদের ঐক্যতান।

এইসময় আসকারী তার দলবল নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। উন্মুক্ত তরবারী হাতে শিবিরে শিবিরে ভ্রাতার অন্বেষণ

করতে লাগলো, তারপর একটি শিবিরে ভ্রাতুস্পুত্রকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ তরবারী উত্তোলিত করে শিশুকে হত্যা করতে যেতেই কেমন যেন শিশুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে পত্নীর কথা স্মরণে এল। বেগম সুলতানম্ আজও একটি সন্তান লাভ করে নি। তার অন্তর সেইজন্যে বুভুক্ষ হয়তো এই সন্তানটি ক্রোড়ে পেলে তার মুখে হাসি ফুটবে।

এছাড়া এ সন্তানকে বাঁচালে একদিন ভাইকে হাতে পাওয়া যাবে। কারণ সে পুত্রের নিরাপত্তার জন্যে নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এই ভেবে আসকারী সেই সন্তানকে বুকে তুলে নিল ও পত্নীর সমীপে পৌঁছে দেবার জন্যে দ্রুত অশ্ব চালিত করলো।

আসকারীর বেগম সন্তানহীনের বেদনা ভুলে হুমায়ুন পুত্রকে সযত্নে দু'বছর পালন করেছিল।

এই শিশু আকবরকে মধ্যস্থ করে দুই ভ্রাতার মধ্যে বহুদিন ধরে সংঘর্ষ চলেছিল। বিনাযুদ্ধে আসকারী এই পুত্রকে হস্তান্তরিত করে নি। হামিদা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন, নিজে স্বহস্তে চিঠি লিখে পুত্রের বিনিময়ে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন, তবু না।

শেষকালে আসকারী হুমায়ুনের হস্তে পরাজিত হল। আসকারীর বেগম সুলতানম্ আকবরকে নিয়ে পলায়ন করলো।

হুমায়ুন তখন পর পর দেশ অধিকার করছেন। কান্দাহার অধিকার করলেন, কাবুল অধিকার করলেন। হুমায়ুনের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হতে লাগলো। কাবুল অধিকার করবার সময় কামরাণ পরাজিত হল। কামরাণের হারেমে ছিল শিশু আকবর। সেখানে আশ্রয় পেয়েছিল আসকারীর বেগম সুলতানম্।

কাবুল অধিকার করবার পর কামরাণের হারেম থেকে হুমায়ুন আকবরকে উদ্ধার করলেন, তখন আকবরের বয়স তিন বছর ন মাস।

জিজি আনাঘা তখন থেকেই আকবরের ধাত্রী।

শামসউদ্দীন ছিল হুমায়ুনের সেনাদলের একজন বিশ্বস্ত সেনা। হুমায়ুন যখন কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই সময় এই শামসউদ্দীন তাকে বাঁচায়।

এই শামসউদ্দীনের পত্নীই ছিল জিজি আনাঘা। বুদ্ধিমতী এই মুঘল রমণীকে দেখে শামসউদ্দীনের মতই তাকে বিশ্বাস করেন হুমায়ুন। তাই তাঁর পুত্রের পরিচর্যার ভার অর্পণ করেন।

জিজি আনাঘা এত বছর ধরে সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছে। নিজের একটি পুত্রসন্তান আছে কিন্তু তার ওপর যত না সে দৃষ্টি দেয়, ততদৃষ্টি তার এই পালিত পুত্রের জন্যে। বেতন ভোগই শুধু নয়, আন্তরিকভাবে তার আগ্রহ এই প্রভুপুত্রের জন্যে!

সে থাকাকালীনই আরও কটি ধাত্রী আকবরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল কিন্তু তারা চাকরীই বজায় রেখেছে, জিজি আনাঘার মত কেউ আন্তরিকতা প্রকাশ করে নি।

আকবর ও এই জিজিমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো। নিজের মায়ের পর আর কোন রমণীকে যদি সে ভালবাসে, তাহলে এই জিজিমাই তার ওপর জন। তবু সেই সময় সেদিন আর কাকেও ভাল লাগছিল না। মাকে কাছে পেলে বুঝি সে সমস্ত অবসাদ মুছে ফেলে উঠে দাঁড়াতে পারতো।

সেইজন্যে একান্ত নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—অন্দরমহলের সবাই কি ফিরে এসেছে?

জিজি আনাঘা আকবরের কথার অর্থ বুঝতে পারলো না। শুধু কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ, রাজকুমার। সকলেই ফিরে এসেছেন।

'আমার মা!' এ কথাটা জীবের তালুতে এসে গিয়েছিল

কিন্তু কণ্ঠ ঠেলে অভিমান এসে বাকরুদ্ধ করে দিল। না, জিজ্ঞাসা সে করবে না। মা যখন তাঁর সন্তানের জন্যে ব্যগ্র নয়, তখন কেন সন্তান মায়ের জন্যে উতলা হবে?

মা আপন গর্বে অন্যচিন্তা মনে স্থান দিন্। অন্য কাউকে তাঁর স্নেহ দান করুন, তার কিছু তাতে এসে যায় না। হয়তো মা তার পুত্রের ওপর সব আস্থা পরিত্যাগ করেছেন, সেইজন্যে বোধ হয় এই অবহেলা। বীরের পত্নী বীরকেই ভালবাসে। পুত্রকে কাপুরুষজ্ঞানে পরিত্যাগ করেছেন। ভালই করেছেন।

আকবরের দু'চোখে জল এসে পড়লো, কিছুতেই সে তা রোধ করতে পারলো না।

জিজি আনাঘা বোধ হয় রাজকুমারের মনকষ্ট বুঝলো এবং অনুমান করলো কিছু। তাই সে সান্ত্বনার স্বরে বললো—বেগম মহিষী প্রাসাদে ফেরেন নি। কাবুলে শাহজাদা মির্জার মাতা তাঁকে দু একদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে রেখেছেন। সংবাদ নিয়ে লোক কাবুলে গেছে, বোধ হয় শীঘ্রই তিনি আসবেন। তিনি তোমার সংবাদ শুনলে আর একদণ্ডও অপেক্ষা করবেন না।

আকবর মনে মনে নিজেকে সংযত করলো। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিল। নিজের মাকেও সে সময়ে সময়ে ভুল বোঝে! এই সন্তানের মৃত্যুও যে ভাল ছিল! ছোটবেলায় অনেক বিপদ জয় করে সে আজ এই বয়েসে এসেছে। তার জীবন অনেক ক্ষয়ের পর এই পর্যায় পৌঁচেছে। অথচ সে দৃঢ় হয়ে ওঠেনি। কত ছোট্ট উপলব্ধিতে ভেঙে গুড়িয়ে যায়! কত মৃদু আঘাতে সে শয্যাশায়ী হয়! হায়রে!

সেদিনই সে শয্যাত্যাগ করলো ও রাজকার্যে নিজেকে ব্যাপৃত করলো।

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাসাদে কোন উৎসব হয় নি। আকবরের আরোগ্য লাভে সেই উৎসব ঘোষিত হল।

বৈরাম খান হলেন সেই উৎসবের কর্তা।

আকবর অল্পবয়স্ক বলে উৎসবের আদিম আনন্দে তার কোন অনুমতি থাকলো না। নাচমহল সাজানো হল। অন্দরমহলের বিশেষ নর্ত্তকীরা অপরূপ সাজে সজ্জিত হল। সরাবের অপর্যাপ্ত ভৃঙ্গার চতুর্দিকে পরিবেশিত হল। আমীর ওমরাহরা মূল্যবান বসনে ভূষিত হয়ে কানে আতরের খসবু লাগিয়ে মদির নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখে নাচমহলে এসে ঢুকলো।

আকবর নিজের খাসকক্ষেই থাকলো। উৎসবের জন্য তার কক্ষে ভৃত্যরা একপ্রস্থ মুল্যবান পোষাক নিয়ে এল, আর নিয়ে এল কিছু মূল্যবান খানা।

সে কোন কিছুই স্পর্শ করলো না। বরং সে সন্ধ্যাবেলা তারই কক্ষের পাশের অংশ থেকে শুনতে পেল নারীপুরুষের কলকাকলি। অনেক আলো আর তার রোশনাই। অনেক মধুর বাদ্যধ্বনি ও তার সাথে রমণীকণ্ঠের গীত। গীতের সাথে ঘুঙূরের ঐক্যতান।

আকবর নিজেকে আর দমন করতে পারলো না। হঠাৎ দারুণ আগ্রহে সে কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে এল।

দরজার কাছে প্রহরী বসেছিল, সে আকবরের পথরোধ করে বললো—হুজুর, কসুর মাপ করবেন। আপনার বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই।

আকবর ঘুরে দাঁড়ালো—কার হুকুম!

ভীত হয়ে প্রহরী বার তিনেক সেলাম করে করে বললো—বান্দার গোস্তাখি মাফি হয় জাঁহাপনা। হুজুর খানসাহেব আজ রাত্রে আপনার বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে গেছেন।

কেন?

তা জানিনা হুজুর।

আকবর জানতো তার অভিভাবক বৈরাম খানসাহেব তাকে

বালক জ্ঞানে বড়দের আনন্দ উৎসব থেকে সরিয়ে রেখেছেন। আপাততদৃষ্টিতে অবশ্য এই আচরণ উপকারের ছোট মনে বড়দের স্বরূপ প্রকাশ হলে অকালে পঙ্গু ভয় থাকে। আকবর বড় হতে চায় না। চিরকাল যদি সে ছোট থাকতে পায়, তাহলে বেশ ভাল হয় কিন্তু তা যদি হত? আস্তে আস্তে সবই তার প্রকাশ হতে শুরু হয়েছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি। বড়রা তাকে কেন এড়িয়ে চলে? বড়রা কি আনন্দ এই উৎসবের ভেতর থেকে আহরণ করে? কেন অন্দরমহলে নৃত্যনতুন সুন্দরী আওরত এনে রাখা হয়? সব, সব সে বুঝতে পারে। সেই জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ তার মধ্যে আস্তে আস্তে চোখ মেলছে বলেই আজ সে বাইরে যেতে চায়। এই উৎসবের মাঝে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিতে চায় কিছু অভিজ্ঞতা। বিনিময়ে যদি কিছু আনন্দ মনে পরতে জমা হয়, ক্ষতি কি? অন্তত যে কৌতূহলতার মধ্যে জমা হয়েছে, তার নিবৃত্তি হবে।

সে সম্রাট ছোট আছে বলে তার অভিভাবক রাজ্য পরিচালনা করছে। চিরকাল তো সে আর ছোট থাকবে না। মুঘল রাজ্যের সূর্য যাতে প্রখর আলোদান করে সমস্ত ভারতবর্ষের অধিকার বিস্তৃত করতে পারে, তা তাকে দেখতে হবে। আর তারই জন্যে তাকে বড় হতে হবে। বয়স সেই পরিণতিতে আসতে সময় নিলেও বুদ্ধি তাকে বড় করে দেবে।

সেইজন্যে সে খানসাহেবের নিষেধ লঙ্ঘন করবে বলেই মনস্থ করলো। প্রহরীকে বললে—পথ ছেড়ে দাও, আমি বাইরে যাবো।

হুজুর, আমার নোকরী থাকবে না, আমার গর্দ্দান যাবে।

আমি সম্রাট আকবর। তোমার কোন অপরাধ নেই, আমি নিষেধ অমান্য করছি, যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয় আমি দেব।

আকবর আর দ্বিরুক্তি না করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে আলোয় এলে যেমন অবস্থা হয়, আকবরের অবস্থা সেরূপ হল।

রোশনীভরা রাত্রি। যেন পূর্ণিমা চাঁদের আলো প্রাসাদের মর্মরদেয়াল ধৌত করেছে। চতুর্দিকে কোলাহলের মুখরতা, তার সাথে বর্ণাঢ্য। রমণী পুরুষের পোষাকে আজ লেগেছে বেলোয়ারী ঝাড়ের দ্যুতি। কত বিভিন্ন সুরের প্রাণমাতানো বাদ্যধ্বনি। শুধু হাসি, কান্না নয়। শুধু আনন্দ, দুঃখ নয়।

আকবর অনেককেই প্রাসাদের চতুর্দিকে দেখতে পেল। তারা যুদ্ধের সময় সৈনিক ছিল। এখন আনন্দের সময় তাদের চিনতে কষ্ট হল। রণনিপুণ যোদ্ধার আকৃতি হয়েছে অন্যরকম। তারা পোষাক পরেছে বহুবর্ণের। কণ্ঠে দুলিয়েছে মুক্তার মালা। তাদের হাতের মুঠিতে এক একটি সুন্দরীর হাত ধরা। একহাতে সুন্দরী, অন্য হাতে সরাবের পাত্র। সুন্দরীর পোষাকের মধ্যে কেমন যেন নির্লজ্জতার চিহ্ন। স্বল্প বসনে কেমন যেন বীভৎস। তাই দেখে আকবরের শরীর রোমাঞ্চিত হল। তার সামনেই একজন পুরুষ একটি রমণীকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে বুকের সীমিতে চেপে অধরে চুম্বন আঁকলো।

আকবরকে তখন কেউ চিনতেই পারলো না। কত লোক তার মধ্যে আকবরকে চেনা অবশ্য দুষ্কর। তবে একটু ভালকরে চোখ মেললেই তাকে দেখা যেত। সে তো আর ছদ্মবেশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল না কিন্তু তখন কারও চেনার মত মনের অবস্থা ছিল না। আর যদিও চিনে থাকে, এ অবস্থায় কিছুই করবার নেই। সম্রাট সে থাকবে নিজের খাসকক্ষে আপন মেজাজে বন্দী। পথে এসে কেন এই আনন্দে তাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে

আর আকবর তখনও সম্রাটের মত শ্রদ্ধা পেত না। সে নামে

সম্রাট, ক্ষমতা সব তার অভিভাবকের। যা কিছু মান্য করার সেই অভিভাবকই পায়, সে পায় না।

তাই একান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আকবর উৎসব পুরীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কেউ তাকে বাধা দেবে না বলেই নিশ্চিন্ত হল। অন্তত খানসাহেবের কাছে গিয়ে তাকে কেউ সনাক্ত করবে না।

এগিয়ে চললো। এগিয়ে চলতে অনেক বাধা। এক একসময় এক একজন এসে মাতাল হয়ে তার ঘাড়ে পড়ছে। তাকে ঠেলে সরাতে যেতেই আর একজন। এমনি বাধা সর্বত্র। তাছাড়া নির্লজ্জ সব আচরণ ও অবস্থান। সোপানশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে রমণী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও উপস্থিতি। তরুণমনে কেমন যেন কৌতূহল, কেমন যেন বিস্ময়। আকবরের চোখকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। মনের মধ্যে কিসের যেন উন্মাদনা।

আর একটু এগিয়ে যেতে এক জায়গায় দেখলো, সেখান থেকেই গুলাববাগের শুরু। গুলাববাগে নানারঙের পুষ্পস্তবকের বিচিত্র সারি। রক্তবর্ণের পসরা যেন কেউ গুলাববাগে মেলে দিয়েছে। সেখানেই একটি মর্মরখচিত প্রস্রবণ। প্রস্রবণের জল ধ্বনি সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে।

মর্মরময় প্রস্রবণ। শ্বেতনির্মিত মর্মর। আসমানের আলো এখানে ঔজ্বল্য দান করেছে। সেই আলোতে একটি রমণীকে সেই শ্বেতমর্মর সোপানে শুয়ে থাকতে দেখা গেল।

রমণীটি একা। আসমানের আলো তার দেহবর্ণের শুভ্রতাকে আরো প্রখর করেছে। দুটি আয়ত কালো চোখে সুর্মার অঞ্জন। মেয়েটি আকবরকে দেখে উঠে বসেছিল, এবার তাকে মৃদু হেসে কাছে ডাকলো।

আকবর সভয়ে দূরে পালাচ্ছিল কিন্তু রমণীটির খিল খিল হাসিতে তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। তার পৌরুষে আঘাত লাগলো। অন্তত আওরতের কাছে ক্ষুদ্র পুরুষেরও মূল্য আছে।

কাছে যেতে রমণীটি আবার হেসে বললো—পালাচ্ছিলে কেন ?

আকবর কোন উত্তর দিল না। শুধু মাথানত করে চোরাচাহনিতে রমণীটিকে দেখতে লাগলো।

রমণীটি আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো, বললো—এ সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? রাত হয়েছে, নিদ্ যাবে না ?

আকবর তবুও কোন উত্তর দিল না।

তুমি বাচ্চা মর্দানা, বড়দের এসব আনন্দ দেখতে সরম পাও না! তোমার আম্মা কোথায় থাকে ? তার কাছে চলে যাও।

মনে মনে আকবর ক্ষিপ্ত হল। মেয়েটি তাকে একেবারে বাচ্চা মর্দানা বললো। প্রকাশ করে দেবে নাকি সে সম্রাট আকবর!

শুনলেই মেয়েটি বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আবার সন্দেহ জাগলো যদি মেয়েটি আরো প্রগলভ হয়ে ওঠে। তার সম্রাট ক্ষমতা কিছু নেই বলে যদি ব্যঙ্গ করে ? তাকে আরো ছেলেমানুষ আরো বাচ্চা বলে যদি উপহাস করে ?

সে কথা ভেবেই সে নিজেকে সংযত করলো। তাকিয়ে রইল দূরে আর একটি স্থানের দিকে। টিউলিপগাছ। সুন্দর বড় বড় ঝাকড়া গাছের মত টিউলিপের সমাবেশ। এটা সে এর আগেও একবার দেখেছে। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার হল। পিতা হুমায়ুন এরই বিপরীত পাশে পঁচিশ হাতদূরে শেরমণ্ডল গ্রন্থাগারের সোপান শিলা থেকে পড়ে মারা গেছেন। সে কখনও শেরমণ্ডল গ্রন্থাগারে যায় নি। পুস্তক দেখলেই কেমন যেন তার মাথাটি ঘুরে যায়।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে টিউলিপ গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলি। মাথার ওপর চন্দ্রের রূপালী আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। ঠাকুর্দা বাবরশাহ যখন প্রথম দিল্লী জয় করেছিলেন, কাবুল থেকে আনিয়ে এই টিউলিপ বৃক্ষ এখানে রোপণ করেছিলেন। শুধু

বৃক্ষই নয়, তার সাথে কৃত্রিম পাহাড় ও ঝর্ণা সৃষ্টি করেছিলেন। আর আছে স্থানে স্থানে পীতবর্ণের খুবান ফুলের গাছ। এও কাবুলের আমদানি।

আকবর দেখতে পেল, সেই খুবান ফুলের গাছে লাল রংয়ের ছিটে দেওয়া পীতবর্ণের ফুল ঝুমকোর মতো দুলছে। দূর থেকে তার নয়নাভিরাম দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

মনে মনে আকবর পিতামহের সৌন্দর্যজ্ঞানের প্রশংসা করলো।

পিতামহের পর এই দিল্লী প্রাসাদ কতজন অধিকার করেছে, ভেঙেছে কত সুন্দর জিনিস। গুলাববাগ নষ্ট করে অশ্বকে দিয়ে তা ভক্ষণ করিয়েছে। সুন্দর সুন্দর গোলাপ পুষ্প চিরতরে তাদের বিকশিত যৌবনতনু হারিয়েছে। তবু এই টিউলিপ বৃক্ষের সারি কেউ নষ্ট করে নি।

হঠাৎ তার কানে প্রবেশ করলো পরিচিত এক কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তা অন্তর্হিত হল এবং চমকিত হল।

বৈরাম খান। তারই কণ্ঠ সে শুনেছে।

পালাবার জন্যে সে চতুর্দিকে তাকালো কিন্তু কোথায় পালাবে? সেই রমণীটির দেহস্পর্শ করে খানসাহেব দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে আছেন তিনি আকবরের দিকেই।

আকবর মাথা নত করলো। একবার ভাবলো, তার দীপ্ত পৌরুষ সে জাগিয়ে তুলে বৈরাম খানের কথার প্রতিবাদ করবে কিন্তু কেমন যেন নিজেকে সে অসহায় মনে করলো।

বৈরাম খান কোন তীরস্কার করলেন না, শুধু শান্তকণ্ঠে বললেন—শাহজাদা, আমি তোমার ভালর জন্যেই সবকিছু করি। আমার হুকুম অমান্য করার জন্যে আমি দুঃখিত হয়েছি। ভবিষ্যতে এমন আর না করলে সুখী হব।

সেই রমণীটির কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। সে হাসলো আবার খিল খিল করে, তারপর বললো—বেকুব লেড়কা। ওর

হয়তো ইচ্ছে হয়েছে, বড়দের মত একটু আনন্দ করতে। রমণীটি আবার কলস্বরে হেসে উঠলো।

আকবর শুনতে পেল বৈরাম খান বলছেন—সলিমা, এ কে জানো? হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট বন্ধুপুত্র আকবর শাহ্।

সঙ্গে সঙ্গে সলিমা মাটিতে নেমে সেলাম পেশ করতে লাগলো।

আকবর আর দাঁড়ালো না, ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। অসহ্য। এই অবমাননা কি আল্লা তার কোনদিন ও দূর করবেন না?

পরে শুনেছিল এই সলিমাই তার একরকম আত্মীয়া হয়। পিতার বিমাতা গুলরুখ বেগমের কন্যা।

কিন্তু সলিমা বৈরাম খানের সঙ্গে কেন ওমনি আচরণ করলো? তখন অপরিণত বয়সে যে সে কত ছেলেমানুষ ছিল!

সেই উৎসব রাত্রে বৈরাম খানের ওপর তার রাগ হয় নি, হয়েছিল ঐ খুবসুরত আওরত সলিমার ওপর। জেনানামহলের আওরত। আবরু রক্ষা করা অবশ্য উচিত। তা না করে বংশে কলঙ্ক আরোপ করে উৎসবে এসে ভিড়ে পড়েছে। অবশ্য একথা মনে হয়েছিল, যখন সে জানতে পারলো, সলিলা তার আত্মীয়া।

পরে সে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিল, যখন সে উপযুক্ত ক্ষমতা অধিকার করবে, অন্তত নিজের আত্মীয় পরিবারের শালীনতা রক্ষার জন্যে অন্দরমহলের আলাদা ব্যবস্থা করবে। বাইরের পুরুষেরা কখনও যে অন্তঃপুরের কঠিন অবরোধ ভাঙতে পারবে না, তারই মত ব্যবস্থা।

সলিমার এই নির্লজ্জতা সে সময়ে ঘোরতর অপরাধ বলে বিবেচিত হত। শাদী না হওয়া আওরতের এই বেলেল্লাপণা সীমাহীন।

পরে যখন পরিণত মন জাগ্রত হয়, তখন এই বিষয় তার মনে আর কোন আলোড়ন জাগায় নি। তখন সে মনে মনে হেসেছিল।

মহব্বত বলে যে একটি অনুরাগ রমণী পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা সে জানতো না। জানার পর নিজেরই কেমন লজ্জা জেগেছিল। তবু তার সঙ্কল্প অটুট ছিল। হারেমের শালীনতা সে রক্ষা করবে। মহব্বত রাজার ঘরে শোভন নয়, ওর পথ যাযাবরদের মধ্যে। কোন অভিজাত বংশে এই ধরনের আচরণ ঠিক নয়।

তাও অনেক পরের কথা।

উৎসবের পরদিন থেকেই নতুন এক কথা মহলের মধ্যে শুনতে পেল।

বৈরাম খান শাদী করবেন।

শাদী করবেন কেন? তার শাদী করা তিনটি বেগম হারেমে আছে। তারা বেশ সুন্দরী। তাদের দেখেছে আকবর যখন তাঞ্জামে করে পালিয়ে যাচ্ছিল। আঠারোখানি তাঞ্জামের একটিতে তিনটি বেগম। অপরূপ সুন্দরী তারা। দুধে আলতা রঙের ওপর মণি-মুক্তার রোশনাই। শুনেছিল এই বেগম তিনি পেয়েছিলেন পিতা হুমায়ুনের কাছ থেকে। একটি কাবুলের মেওয়া ফলের মত। একটি কাশ্মীরের নীল হ্রদের মত। একটি আরবের মরুপ্রান্তরের ইহুদী। তিনটিরই আলাদা রঙ, আলাদা দেহসৌন্দর্য। তাছাড়া আরো আছে হারেমে অনেক সুন্দরী। বৈরাম খানের আলাদা একটি রঙমহল। সেখানে হরেক সুন্দরীর হাট।

এর পরও তিনি রমণী দেখলে ঔৎসুক্য হন—এই কথা ভেবে সেই অল্প-বয়েসের আকবর বিস্মিত হয়? পিতা বেঁচে থাকতে বৈরাম খান যে সাহস প্রকাশ করেন নি, এখন যেন পূর্ণ স্বাধীনতা! সমুদ্র সমান ক্ষমতা। খুশির পালতোলা নৌকা ছুটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে বাধা দেবার নেই।

আরো সে শুনলো, সলিমাকে শাদি করছে কেন? মুঘলদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যেই এই তাঁর বাসনা।

বৈরাম খান একজন সৎব্যক্তি। এই খ্যাতিটা সমস্ত মুঘল

পরিবেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সে নাকি মহিষী হামিদার কাছে কসম খেয়ে ওয়াদা করেছে, তাঁর প্রাণে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত সে মুঘল পরিবারের ইজ্জত রক্ষা করবে। শাহজাদা আকবরকে দেখবে। তাকে সিংহাসনে বসবার মত উপযুক্ত করে তুলবে।

সেইজন্যে সকলে তাঁকে বিশ্বাস করে। তাঁর কার্যের কেউ সমালোচনা করে না। তিনি যা কিছু করেন, মুঘল পরিবারের মঙ্গলের জন্যে। তাই সকলে তার অন্যায়ও দেখতে পায় না।

কিন্তু আকবর অপরিণত হলেও অনেক অন্যায় সে দেখতে পায়। তাই তার বার বার ইচ্ছা করে, এই অভিভাবকত্ব ঘুচিয়ে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

সলিমার সাথে শাদিতেও কেমন যেন তার বিক্ষোভ মনে জাগে। বৈরাম খান আসলে একটি ধূর্ত স্বভাবের ব্যক্তি। মুঘল বংশকে পাকে পাকে জড়িয়ে পরাধীন করবার জন্যেই এই শাদির আশা।

এই সময়ে মাকে যদি পেত? মার কাছে তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারতো। বলতে পারতো, মা, আমার যেন মনে হচ্ছে, এই শাদি সুখের হবে না? এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র নিহিত আছে।

মার কাছেই সে সব বলতে পারতো, আর কারুর কাছে নয়! অন্য কাকেই বা সে বলবে? কে তার মনের কথা বুঝবে? সে ছেলেমানুষ! তার বুদ্ধি পরিণত হতে এখন অনেক সময় লাগবে। তখন যদি উপযুক্ত হয়, না হয় তার কথার মূল্য থাকবে।

৪

বৈরাম খানকে নৃশংস প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়। তিনি কেমন করে ঐ সলিমার মত কুসুম মনের কোমলতন্ত্রে ভালবাসা রচনা করতে সক্ষম হবেন।

বৈরাম খান ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ না হলে বন্দী হিমুকে কি করে নিজহস্তে হত্যা করতে পারলেন? বন্দীকে নিজ আয়ত্বে পেয়ে মূষিকের মত হত্যা করা—এ যে ঘোরতর অন্যায়। অন্তত বীরের ধর্ম তা নয়। জাতির ধর্মেও তা কলঙ্ক।

অথচ ঐ খানখানাসাহেব সুস্থ মস্তিষ্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ হিমুর বুকে আমূল তরবারী প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

আজ নয় এর আগেও বৈরাম খানের নৃশংস পরিচয় আকবর বহু ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। পিতা যখনই তাকে কোন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন, অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছেন এই ব্যক্তিটি। অথচ এই ব্যক্তিটিকে যে সে কিছুতে দেখতে পারে না, একথা সে কি করে বোঝাবে? পিতার অগাধ শ্রদ্ধা বৈরাম খানের ওপর।

আর খানসাহেবও এমন চতুর প্রকৃতির ব্যক্তি, পিতার সামনে তার আচরণ দেখবার মত। মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আর পিতা মুগ্ধ হয়ে পরিবর্তে উপদেশ দেবেন,—তুমি বালক পুত্র, আমি যদি কোন সময়ে না থাকি তাহলে এই বৈরাম খানই পিতৃতুল্য কাজ করবে। তাকে আমি আমার সমস্ত পরমাত্মীয়ের চেয়ে বিশ্বাস করি।

সেইজন্যে বৈরাম খান আকবরের সঙ্গেই সর্বদা ছায়ার মত

থাকতেন। আকবর মনে করে তার জীবনে এই একটি শনি। দুষ্টগ্রহ।

তার যখন ন' বৎসর বয়স পিতা আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে গজনীর শাসনভার দিলেন। নামে মাত্র শাসন পরিচালনা। সিংহাসনে সে বসে থাকতো, আর পরিচালনা করতেন এই বৈরাম খান। পিতার অন্যতম ভ্রাতা হিন্দালের মৃত্যুর পর এই প্রদেশ তাদের হাতে এসেছিল। তারপর গজনী থেকে লাহোর। লাহোরেও সে একাধিকভাবে তিন বছর রাজ্য পরিচালনা করেছে।

ঘটনাটি ঘটে এই লাহোরেই।

কাহিনীটি এত স্পষ্ট ও এত ভয়ঙ্কর যে সেই চার পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা, তবু ম্লান নয়। যেন এখনও সেই সজল মুখখানি নির্যাতনের যন্ত্রণায় স্পষ্ট। সেদিনও ঐ বৈরাম খান কোন প্রতিবাদই শোনেন নি। শাস্তি দেওয়ার পূর্বে গভীর রাত্রে ছুটে গিয়েছিল আকবর তাঁর খাসকামরায়। অনুরোধ করেছিল, বেগুনা আওরতকে আপনি মুক্ত দিন। যদি ও কোন দোষ করে থাকে তবে লঘু দণ্ড দিন। রমণী হত্যা করে মুঘল বংশ কলঙ্কিত করবেন না।

বৈরাম খান যখন আকবরের কথা শোনেন নি, তখন সে পিতার কাছ থেকে আদেশ আনার জন্যে দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে কাবুলে পাঠিয়েছিল। তখন পিতা হুমায়ুন কাবুলে। একরাত্রে সেই খবর নিয়ে অশ্বারোহী আসতে পারে না। তাকে প্রচুর ইনাম দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকবর রাজী করিয়েছিল। কারণ পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেই বেগুনা রমণীর শাস্তি হয়ে যাবে।

আজ পিতা এজগতে নেই। থাকলেও কারো মনের স্বাধীন চিন্তার ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। পিতা কি চোখে যে বৈরাম খানকে দেখেছিলেন! অশ্বারোহী উত্তর নিয়ে এল পিতার স্বলিখিত হস্তাক্ষর। অবিশ্বাস করার উপায় নেই। 'আমি

যাকে ক্ষমতা দান করেছি, তাকে বিশ্বাস করেই দিয়েছি। সে যা উপযুক্ত বলে মনে করেছে, তাই হবে। তার কর্মের সমালোচনা করার অধিকার স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই।'

তারপর ভিন্নভাবে উপদেশ দিয়েছেন—তুমি এখন বালক মাত্র। পড়াশুনায় মন দিলেই খুশি হব। পড়াশুনার সাথে অস্ত্রবিদ্যা, শরীরচর্চা এসব নিয়মিত করবে। আমাদের মুঘল পরিবার শিক্ষিত পরিবার। অন্তত সে পরিবারের সুনাম রক্ষার জন্যে সচেতন থাকবে।'

চিঠিটি বৈরাম খানও দেখেছিলেন। সেদিন তিনি উল্লাসে হেসেছিলেন।

তারপর আর কি? চোখের সামনে দেখতে হয়েছিল সেই রমণীর নির্মম মৃত্যু। মানুষ অপরাধীর এমনি বিচার করতে পারে? তাছাড়া সে যখন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক দুর্বলতা নিয়েই পৃথিবীতে আসে। তার দেহে শক্তি প্রয়োগ করা এ যে দস্যুতুল্য। খোদা যাদের রূপগুণে মহিয়সী করে পৃথিবীতে পাঠায়, তারা যত দোষই করুক, অন্তত বীর পুরুষ তাদের ধর্ম নষ্ট করে না।

এর বেশী সেদিন ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে আর কিছু আকবর ভাবতে পারে নি। বয়স তখন যে সন্ধিক্ষণে ছিল, তাতে সে রমণীটিকে সহোদরা বহিন ভেবেছিল।

যখন উজ্জ্বল সূর্যরশ্মির মাঝে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে তাকে দাঁড় করানো হল, তাকে দেখেই আকবরের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বেচারী মেরে বহিন।

মুঘল সৈন্যেরা চারিদিকে বর্শা হাতে বৃত্তাকারে দাঁড়িরে অপরাধিনীকে পাহারা দিচ্ছে। এমনভাবে ঘনবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে, যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

কিন্তু ঐ রমণীর পালাবার কোন ইচ্ছা ছিল না, বরং সে মৃত্যুর জন্যে এত নির্ভীক যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। দাঁড়িয়েছিল দৃঢ়

ভঙ্গিতে সূর্যের দিকে মুখ করে, যেন কাকে সে তার নিরুপায় অবস্থার জন্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করছে। কিম্বা হয়তো মনে মনে সে আল্লাকে ডাকছিল।

দূর থেকে আকবরের ইচ্ছে করলো, চীৎকার করে ঐ মেয়েটিকে সে তার মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। অন্তত মেয়েটি মৃত্যুর জন্যে একটু কাঁদুক। একটু শোক করলে তার শাস্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

দর্শক উপস্থিত হয়েছে প্রচুর,। লাহোরবাসীও অনেক আছে। পুরীর রমণীরা একটি অবরোধে এসে জমা হয়েছে। তাদের কলস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

মেয়েটিকে প্রস্তর নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা করা হবে। কটি হাতীর সাহায্যে এসেছে ছোট, বড় অনেক প্রস্তরখণ্ড। নিক্ষেপের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশজন শক্তিশালী সৈনিক।

খানসাহেব আদেশ প্রচার করলেই শুরু হবে সেই ক্রীড়া। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আকবরের পাশেই। ওরা একটি উঁচুমঞ্চে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশে ছিল আমীর, ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। বেশ ভীড় ছিল সেই মঞ্চটিতে।

সকলেই কৌতুক অনুভব করছিল। নৃশংস কৌতুক। বিশেষ করে আওরত বধ হবে। যে আওরত অন্দরমহলে শোভা পায়। যে আওরত নাচমহলের বিশেষ মুহূর্তে ঝাড়লণ্ঠনের নীচে নৃত্যের ছন্দে দেখতে ভাল লাগে। যে আওরতকে সোহাগের ইন্তেজারে আবদ্ধ করে সুকোমল শয্যার সীমিতে প্রত্যাশা করতে ইচ্ছে জাগে—সেই আওরতকে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শাস্তির জন্যে দেখে অগণিত নারী-পুরুষেরা যেন কি এক ক্রীড়ায় মেতে উঠলো।

রক্ত ফুটছে জ্বলন্ত কড়ায়। প্রতি রমণী পুরুষের শিরায় শিরায় যেন সীমাহীন উত্তেজনা। বক্ষ উদ্বেল হচ্ছে। নিঃশ্বাস দ্রুত হচ্ছে।

আকবর একসময় খানসাহেবকে চুপি চুপি বললো—আমাকে অনুমতি দিন, আমি এস্থান পরিত্যাগ করতে চাই।

হঠাৎ খানসাহেব অট্টহাস্য করে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসিতে উপস্থিত ব্যক্তিরা কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বৈরাম খান ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে একটি বালককে অপমানের লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। সকলকে উদ্দেশ্য করেই বললেন—শুনেছেন আপনারা রাজকুমারের কথা! সে এই মৃত্যু দেখে ভয় পাবে বলে কাপুরুষের মত এইস্থান পরিত্যাগ করতে চাইছে। উপযুক্ত মুঘল বংশধরের কথাই বটে। যে পিপীলিকার মৃত্যুতে আতঙ্কিত হয় তার ভবিষ্যৎ আপনারা বিবেচনা করুন। সম্রাট হুমায়ুনের উপযুক্ত পুত্রই বটে। তৈমুরলং এইরকম বংশধরের জন্ম হবে জানলে বংশ লোপ করে যেতেন।

উপস্থিত ব্যক্তিরা বৈরাম খানের কথায় উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন।

আকবর মাথা নীচু করে সে অপমান সহ্য করলো। লজ্জায় তার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করলো। তখনই কারও কাছে পালিয়ে যেতে তার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কে আর তার আছে? আত্মীয়স্বজন যারা আছে, তারা স্বার্থপর। আর সব বেতনভোগী। নিমকের মর্যাদা রক্ষা করে। হুকুমতালিম ভিন্ন আন্তরিকতা নেই।

এই সময়ে বৈরাম খান অপরাধিনীকে হত্যার আদেশ দিলেন। সেই পঞ্চাশজন সৈনিক একটি অবলা রমণীর ওপর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে লাগলো।

ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে এই নৃশংসতা।

ওদিকে গৌরবর্ণ সুন্দর খুবসুরত অষ্টাদশী এক রমণীকে জোয়ান জোয়ান পঞ্চাশজন লোক প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়ে হত্যা করছে, এদিকে উন্মাদ দর্শকেরা উত্তেজনায় চীৎকার করতে লাগলো।

রমণীর পরিধানে ছিল একটি কালো আলাখাল্লা। সেখানি ছিন্ন হল। দেহবর্ণ রক্তাক্ত হল। কপাল, মুখ, চোখ, মাথা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। তারপর ঢলে পড়লো মাটিতে। তখনও প্রস্তরখণ্ডের বৃষ্টি অবিরামগতিতে চলেছে। শেষে দেখা গেল, মেয়েটি প্রস্তরখণ্ডের তলায় চাপা পড়েছে।

এই সময় আকবরের কানে গেল রমণীটির অপরাধের গুরুত্ব কি অপরাধ সে করেছিল আকবর জানতো না।

রমণীটি নাকি ব্যভিচারিণী হয়েছিল। ব্যভিচারিণী কাকে বলে তখন আকবর জানতো না। শুধু বুঝতে পেরেছিল একটা কিছু ঘোরতর অন্যায়। আওরতের এই অন্যায়ের ক্ষমা নেই।

আরো শুনলো, খানসাহেব এই রমণীটির প্রতি লুব্ধ ছিলেন।

মেয়েটি ছিল অন্দরমহলের পরিচারিকা। বেগমদের ফরমাইস খাটাই তার কাজ। একদিন খানসাহেব তাকে দেখে লুব্ধ হয়ে তাঁর খাসকক্ষে আহ্বান করেন কিন্তু মেয়েটি দুঃসাহসিকভাবে এই আহ্বান প্রত্যাখান করেছে। তাতে অবশ্য সে কোন শাস্তি পাই নি।

একদিন অন্দরমহলে গভীর রাত্রে তার কক্ষে একটি পুরুষকে ছল করে পাঠানো হয়। পুরুষটি প্রবেশ করতে ইমলি চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর রক্ষীর ছুটাছুটি। খবর যখন খানসাহেবের কাছে পৌছলো, তিনি বিচার তৈরী করিয়েই রেখেছিলেন।

আসলে বাঁদী নষ্টা। সে ব্যভিচার রচনা করে শেষপর্যন্ত পুরুষটিকে ধরিয়ে দেবার জন্যে এই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছে। অন্তঃপুরের শালীনতা নষ্ট করার জন্যে তার মৃত্যুদণ্ড হল। শুধু দণ্ডের নিয়মটি একটু বৈচিত্র্যধর্মী। ব্যভিচারিণীর শাস্তি অবশ্য মৃত্যুদণ্ডই মুঘল আইনে লেখা আছে।

কিন্তু ইমলি বাঁদী কেন ব্যাভিচারিণী নাম পেল? বৈরাম খানের আসক্তির নিম্নে নিজেকে বলি দেয় নি বলেই কি এই অপরাধ?

আকবর আবার পিতাকে পত্র লিখলো। সমস্ত বিত্তান্ত

সহজভাষায় লিখে পিতার কাছে প্রেরণ করলো। লিখলো, পিতা বিচার চাই। নিরপরাধিনীর এই শাস্তি সহ্যাতীত। এর বেশী সেদিন আকবর পিতাকে কিছুই বলতে পারে নি, আসলে সেদিন পিতাকে সে বেশী ভয় করতো। আজ হলেও কি সে পারতো? গুরুজনকে শ্রদ্ধা করতেই সে শিখেছে, অবমাননা করতে নয়।

পিতার সেদিন উত্তর লিখিত পত্রখানিও তার হৃদয় চূর্ণ করেছিল, বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে নি। পিতা নির্মম ভাষায় তার চিঠির প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

'তোমার জন্যে একজন উপযুক্ত শিক্ষক প্রেরণ করছি, আর বৈরাম খানকে তোমার পড়াশুনার জন্যে নজর দেবার ক্ষমতা দান করছি। তুমি এখন বালক মাত্র। রাষ্ট্রনীতি বোঝার বয়স হলে তোমার পত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করবো। কোমল মন রমণীদেরই শোভা পায়, তোমার মনের কোমলতার জন্য চিন্তিত হলাম। যে বাঁদী মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে, আমার ধারণা উপযুক্ত বিবেচনাতেই পেয়েছে। তুমি মন শক্ত করবে, যুদ্ধই আমাদের বংশের পুরুষদের ধর্ম। মানুষকে মেরে ক্ষমতা অধিকার করাই আমাদের কর্ম। আমার অবর্তমানে তোমাকে সেই বংশের সুনাম রাখতে হবে। মনে রেখো, সেখানে তোমাকে অনেক কঠিন কাজও করতে হবে। তোমার পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসছে।'

কিন্তু পিতার উপদেশ আকবরের বালক মনে রেখাপাত করেনি। পিতার পত্রের উত্তরে তার চোখে জল এসেছিল। আর কাতর হয়েছিল সেই মৃতা বাঁদীর জন্যে।

কঠিন হতে হবে। হৃদয়কে বধ করে নির্মম হতে হবে।

সবই সত্যি কথা! তাই বলে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন একি মানুষের ধর্ম? মুঘলরা যুদ্ধবাদী। যুদ্ধ করে রাজত্ব করাই তাদের ধর্ম, সেখানে করুণা নেই, মমতা নেই। এসব কোমল বস্তুর কোন অধিকার নেই বলে কি বুঝতে হবে

তারা কোন নীতিরও ধার ধারবে না। তৈমুরের নির্মমতাই বংশধররা অনুসরণ করবে। তৈমুরের হৃদয়বত্তার কোন অনুসন্ধান কেউ করবে না? তাই যদি হয়, তাহলে পিতামহ বাবর কেন বার বার শত্রুকে ক্ষমা করেছেন? তিনি কোন মন নিয়ে কবিতা রচনা করতেন? সঙ্গীতের মধুর সুর তো নির্মমতার থেকে আসে না। পিতামহের কথা কেন? পিতা হুমায়ুনই বা কি নির্মমতার পরিচয় দিয়েছেন? পিতার মৃত্যুর পর কেন ভাইদের রাজ্যবণ্টন করেছিলেন? তিনি তো ইচ্ছে করলে বেইমানী করতে পারতেন?

উপদেশ দেওয়া যায় কিন্তু উপদেশ পালন করাই শক্ত।

সেদিন সেই ইমলি বাঁদীর মৃত্যুতে বৈরাম খানও আকবরের কাছে ক্ষমা পাননি, পিতা হুমায়ুনও না। কারণ বাঁদীর মৃত্যুর সেই দৃশ্য কখনও চোখ থেকে আকবরের সরে যায়নি।

তারপর হিমুর মৃত্যু।

এক চক্ষু অন্ধ, ক্ষতবিক্ষত সেই বন্দীকে হত্যা করার জন্যে বৈরাম খান তাকে অনুরোধ করলেন। লোভ দেখালেন গাজী উপাধি লাভ করার এই সুযোগ।

পিতা আজ নেই, তাছাড়া এই বিশাল যোদ্ধাকে সে-ই এক বর্শার দ্বারা কাবু করেছে। আজ সেই বন্দীকে হাতে পেয়ে তাকে বধ করবে? পিতা থাকলে হয়তো তাঁর হুকুম পালন করতে হত। আজ যদি তার মনোভিপ্রায় না ব্যক্ত করে, সঙ্কল্পে দৃঢ় না হয়, তাহলে ভবিষ্যতের সম্রাটের ক্ষমতা কোথায় সৃষ্টি হবে? তাই সে প্রথম বৈরাম খানের অবাধ্য হল।

অবশ্য তার নীতিগত ধারণা বুঝিয়ে বললো—বন্দীকে আঘাত করা বীরের কর্ম নয়। অন্তত আমি তা পারবো না।

প্রথমে বৈরাম খান ক্ষিপ্ত হলেন, গর্জে উঠে আকবরকে শাসন

করতে চাইলেন। তারপর বোধহয় তাঁর স্মরণ হল, এখন আকবর আর বালক নয়। তাছাড়া সিংহাসনের অধিকারী এখন আকবর। একে ক্ষেপিয়ে তুললে ভবিষ্যতে তাঁরই অসুবিধে হবে। তাই হঠাৎ স্বর কোমল করে আকবরকে বোঝাতে লাগলেন।

কিন্তু আকবর অটল। তার সঙ্কল্প সে কিছুতেই ছাড়তে চাইলো না। শুধু বললো—আমি তো বলেছি চাচা, বন্দীকে আঘাত করতে পারবো না।

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ কে জয় করলো? কে এই হিমুকে বধ করলো? সব কৃতিত্ব নিজেই আত্মসাৎ করেছিল বলে আকবর বৈরাম খানের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তাই সঙ্কল্প হল আরও দৃঢ়, বজ্রের মত কঠিন হয়ে সেই কিশোর হিমুর অর্ধমৃত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো।

বৈরাম খান আবার চটলেন। আবার ভয় প্রদর্শন করে আকবরকে আদেশ পালন করাতে চাইলেন।

কিন্তু আকবর কঠিনস্বরে বললো—আমার অভিপ্রায় আমি ব্যক্ত করেছি। এরপর যদি আপনি বলপ্রয়োগ করেন, তাহলে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হলে আপনি আমাকে দায়ী করবেন না। মুঘল বংশের একটা নীতি আছে, আমি মুঘলবংশধর, তার বাইরে আমার কোন কাজ করা আশা করি উচিত নয়।

অগত্যা বৈরাম খান নিস্তেজ হলেন। তারপর ম্রিয়মান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে বন্দীকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও?

আকবর চুপ করে থেকে বললো—বন্দী এক সময়ে ছিলেন খুব বলশালী, রণনিপুণ যোদ্ধা। তুর্ক, আফগান, রাজপুত এক বিস্তৃত সৈন্যের অধিকারী। আজ তিনি সব হারিয়ে নিঃস্ব। এক চক্ষু তাঁর চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। একটি হাত ও পা তাঁর পঙ্গু—এখন তাঁকে ছেড়ে দিলেই মনে হয় উপযুক্ত আচরণ করা হবে। কারণ তাঁর আর সে শক্তি নেই, তিনি পুনরায় রাজ্যজয়ের

জন্যে প্রস্তুত হবেন। আর যদিও হন, আমরা কি তাকে পুনরায় পরাজিত করতে পারবো না?

কিন্তু বৈরাম খানের একথা মনঃপুত হল না। তিনি উত্তরে তিক্তকণ্ঠে বললেন—তোমার পিতা সাধে আমাকে সব সময় সাবধান করে গেছেন। তোমার কোমল মনের জন্যেই তুমি বন্দীকে মুক্তি দিতে চাইছো কিন্তু এ কখনই রাষ্ট্রনীতির ধর্ম নয়।

তখন আকবর বললো—পিতামহ বাবরের রণনীতির কথা কি আপনি শোনেন নি? পিতা হুমায়ুন কি শুধু বন্দীকে নির্মমভাবে হত্যাই করেছেন? কেন নিজের ভ্রাতাদের তিনি বার বার ক্ষমা করেন নি?

যখন বৈরাম খান তর্কে আকবরের সঙ্গে পারলেন না, তখন নিজেই একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারী হাতে করে হিমুর অর্ধমৃত দেহের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দ্বিরুক্তি না করে বন্দীর বুকে বসিয়ে দিলেন।

আকবর চোখে হাত চাপা দিয়ে নিজের কক্ষে পালিয়ে গেল।

কী নৃশংস প্রকৃতির মানুষ এই পরম হিতৈষী পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁন! এ নাম কি বীরত্ব? না কাপুরুষতা! দুর্বলকে হাতের নাগালে পেয়ে সবলের এই অমানুষিকতা—না, না এর নামই যদি রাজত্ব হয়—তাহলে প্রয়োজন নেই সে রাজ্যের। তার চেয়ে একক জীবন নিয়ে লোকালয়ের বাইরে গিয়ে বাস করা অনেক ভাল।

সে যদি যথার্থ কোনদিন সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসে, তবে মনুষ্য রক্তের কোনদিন অবমাননা করবে না। নিজের শিরাতেও যে মনুষ্য রক্ত প্রবাহিত! সে রক্তের সম্মান সে যথার্থ ভাবে রক্ষা করবে। বিনা কারণে যেমন সে মনুষ্যশরীরে আঘাত হানবে না, তেমনি ক্ষমা দিয়েও অপরাধীকে করবে না কোন করুণা। অপরাধী যে তার উপযুক্ত শাস্তিই সে পাবে, তবে অপরাধের গুরুত্ব

অনুযায়ী। অহেতুক প্রাণহানি যেমন অন্যায়, অহেতুক ক্ষমাও অপরাধ।

সেই বৈরাম খান মহব্বতের সোহাগ দিয়ে তার ভগ্নী সলিমার হৃদয় জয় করতে চায়। না, না যার মনে সঙ্গীত নেই, সে কখনও একবার আসমানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রঙ ফেরা দেখেনি, সে কি জানবে ভালবাসার ধর্ম? বরং সে সলিমার মনে দুর্বলতার ছায়া ফেলে তাকে প্রতারণা করতে চায়।

ঐ নৃশংস প্রকৃতির মানুষ, ঐ বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ—যার মনে এতটুকু দয়ার লেশমাত্র নেই। যে মুসলমান হয়ে কখনও আল্লাকে ভজনা করে না, যে ভাল পোষাক ছাড়া, ভাল খানা ছাড়া একদণ্ড বসবাস করে না, তার মনে জাগবে আওরতের প্রতি আকর্ষণ! আকর্ষণ জাগতে পারে, সে আকর্ষণ মহব্বতের জন্যে নয়, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্যে।

যদি মহব্বতই থাকতো, থাকতো তাহলে সঙ্গীত। তাহলে সেই বাঁদী নির্মমভাবে মৃত্যুর মাঝে লীন হত না।

সলিমা বোধ হয় বৈরাম খানের প্রকৃতি জানে না। জানে না বলেই একজন বীরপুরুষের বেগম হতে চেয়েছে। আচ্ছা যদি তাকে কেউ খানসাহেবের প্রকৃতির আসল পরিচয় জানায়, তাহলেও কি সে এই শাদীতে সমর্থন জানাবে?

কিন্তু তাকে জানাবে কে? আকবর নিজে জানাতে পারে না, কারণ সলিমা তাকে বাচ্চা মর্দানা বলে উপহাস করে। অবশ্য সলিমার বয়স তার চেয়ে বেশী নয়। তবে আওরত কম বয়েসেও পরিণত শরীর ও মন পায় বলে আকবর তার কাছে বাচ্চা।

জানাতে পারে এক বৈরাম খানের অন্যতম ইহুদী বেগম লল্লা। লল্লাকে দেখেছে আকবর, সে সব সময়ে ঈর্বান্বিতা হতে চায়। ওড়নার আড়ালে তার দুটি সুর্মা আঁকা আয়ত চোখে যেন কিসের জ্বালা। সে বৈরাম খানের কোন বেয়াদপি সহ্য করে না। খাসকক্ষ পরিত্যাগ করে রঙমহলে রাত্রিবাস করলে সে বিক্ষুব্ধ হয়। পরদিন স্বামীর ওপর নানান কটূক্তি করে তাকে অপদস্থ করে। এসব অবশ্য লোকের আলোচনাতেই আকবর শুনেছে, সঠিক কিছু জানে না। তবে রটনার কিছু যে সত্যি সে বিশ্বাস করে। কারণ তা না হলে বৈরাম খানের অন্যদুটি বেগমের কথা কেউ বলে না কেন?

আকবর আরো শুনেছে, এই ইহুদী বেগম লল্লা সুরা পান করে। মাতাল হয়ে সারারাত্রি ধরে বিবস্ত্র থেকে নৃত্য করে। কেউ কিছু বলতে গেলে বলে—বেশ করেছি। অন্তঃপুরের নামে যে বন্দীশালায় আমাদের পূরে রাখা হয়েছে তা থেকে মুক্তি না দিলে এই করবো? আরো যদি বেশী কিছু করার ক্ষমতা থাকে তাও করবো। কারো নিষেধ শুনবো না। শাস্তি পেতে হয়, তাও

গ্রহণ করবো। অন্তত মৃত্যুর মত শান্তি যেন পাই। মরলে সব শান্তি।

লল্লা কাঁদে। সরাব পান করে পাগলের মত কাঁদে। গান করে। সুন্দর গান করে। তবে সে গান কান্নার।

আকবরের এক একসময় ইচ্ছা করে সেই গান শুনতে কিন্তু অন্তঃপুরে ঢোকবার অধিকার থাকলেও বৈরাম খানের বেগম মহলে ঢোকবার অধিকার নেই। বিশেষ কটি মহলে কারুরই ঢোকবার অধিকার নেই। সেখান শুধু পরিচারিকার গতিবিধি। তবে পরিচারিকাদের কিছু উৎকোচ দিলেই কাজ হাসিল হয়।

পরিচারিকাদের হাত দিয়ে সেইজন্যে অন্তঃপুরে ঘটে গোলমাল। আগে এসব আকবর বুঝতো না। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের সমস্যা নিয়ে পিতাকেও অনেক মাথা ঘামাতে দেখেছে। মা হামিদাও অনেক সময় এই অন্তঃপুরের ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মায়ের রাগ সে কখনও দেখেনি কিন্তু অন্তঃপুরের সমস্যা নিয়ে অনেক সময় তিনি চীৎকার করেছেন।

পিতার সঙ্গে মাতারও এই নিয়ে অনেক সময় মনোমালিন্য হত।

তখন আকবর দেখেছে, পিতা মায়ের কাছে কেমন যেন ভীরু। পিতা কাকুতি মিনতি করতেন, মা মাথা নেড়ে অসমর্থন জানাতেন।

শেষে পিতা মাতার হাত ধরতেন।

কিছু কিছু কথাবার্তাও আকবরের মনে আছে।

মা হয়তো বলতেন—তোমাদের বংশে এই উচ্ছৃঙ্খলতা কেন, কেন তোমরা বহুরমণী ভোগ্য হও? এদিকে তোমাদের মুঘলবংশ শৌর্য বীর্যের জন্যে খ্যাত। যুদ্ধে মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যাও। ন্যায় নীতির সব দিক থেকে তোমাদের জাতি প্রশংসা পাবার যোগ্য। অথচ তোমরা সময় পেলেই সুরা পান করে রঙমহলে ঢুকবে। রমণীর সুঠাম তনুর ছন্দদোলার নৃত্য উপভোগ করবে।

তাদের স্বর্গীয় রূপের পায়ে নিজেদের বীরমন সঁপে দেবে। উপভোগ করবে রমণীর রমণীয় দেহ। প্রয়োজন ছাড়াই যেখানে যত খুবসুরত আওরত দেখবে, তুলে নিয়ে এসে হারেমে পুরবে। তারপর তাদের একটিবার উপভোগ করে তাদের ইজ্জত নষ্ট করবে। আওরতগুলি সারাজীবনের হাহুতাশ নিয়ে মর্মরদেয়ালে মাথা কুটবে—তোমরা আর তাদের দিকে ফিরে চাইবে না।

এখন মনে পড়ছে আকবরের। সেবারে কে যেন একটি আওরত পিতার হারেম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে ধরা পড়েছে। পিতা তাকে শাস্তি দিতে চান, মাতা দিতে দেবেন না। মাতার ইচ্ছে—আওরতটি যেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই তাকে ছেড়ে দিয়ে আসা হোক।

পিতা দেবেন না। তাঁর ইচ্ছা—আওরতটিকে ছেড়ে দিলে মুঘল বংশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। যে আওরত সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল, সে আর কারো অঙ্কশায়িনী হলে সম্রাটের মান থাকলো কোথায়? সেই জন্যে পিতা সেই অপরাধিনীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান।

মা তা দিতে দেবেন না। মা বললেন—দোষ তোমাদের। দোষ তোমাদের পূর্বপুরুষদের। একটি মুহূর্তের জন্যে যে সব মেয়েদের তোমরা সারাজীবন কেড়ে নাও, তাদের সারাজীবন কেমন করে চলবে সে কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ?

পিতা বিরক্ত হয়ে তার উত্তরে বললেন—ভাববার দরকার কি? তারা রাজভোগে রাজসুখে অন্তঃপুরে সারাজীবন থাকার অধিকার পেল, এই কি তাই যথেষ্ট নয়?

হামিদা তখন নিজের আওরতমনের অভিব্যক্তি দিয়ে বললেন—তোমরা সত্যি এ জায়গায় দারুণ মূর্খ! দেশ শাসন করার বুদ্ধি থাকলেও, যুদ্ধে শত্রু ধ্বংস করবার ক্ষমতা থাকলেও রমণী মনের কিছুই বোঝো না। তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে

যত খুশি রমণী লুণ্ঠন করে ভোগ করো। আর রমণী একটি মুহূর্তের বলি হয়ে সব হারিয়ে ফেলে। তোমরা কি জানো না, রমণীরও কোন কামনা থাকে? তাদেরও মনে আছে আশা। আছে দারুণ আকাঙ্ক্ষা।

তখন পিতা বললেন—এসব জানবার প্রয়োজনও কি আমার? রমণী পুরুষের ভোগের জন্যই আল্লার সৃষ্টি। ভোগ করবার পর তাদের পরিত্যাগ করলে কোন গুণাহ হয় না।

হামিদা গর্জে উঠলেন, বললেন—ভুল কথা! এই যদি জেনে থাক, তাহলে ভুল করেছে। জেনে রেখ, তোমরা রমণীকে খেলার পুতুল করেছ বলে তারা এমনি হয়েছে। তা নাহলে তারাও পুরুষের মত সবকিছু করতে পারে। শুধু তাদের শক্তি আল্লা পুরুষের মত দিলে এতদিনে তোমরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারতে।

আকবর সেদিন সব কথার অর্থ বুঝতে পারে নি কিন্তু আজ বুঝতে পারছে, মাতার কথার সত্যিই অনেক অর্থ আছে। আছে গুরুত্ব। রমণীকে ছাড়া পুরুষ যেমন শক্তিপায় না। রমণীও পুরুষের শক্তিতে শক্তিময়ী। হামিদা ছিলেন বলে হুমায়ুন সারাজীবন নিজের সঙ্কল্পে অটল থাকতে পেরেছেন।

সেইজন্যেই সেদিন বুঝি পিতা, মাতার কথার আর প্রতিবাদ করতে পারেন নি। সেই আওরতটির পরে কি হয়েছিল, আকবর জানে না। তবে আজ অনুমান করতে পারে, পিতা তাকে কোন দণ্ডই দিতে পারেন নি।

মাকে সেইজন্যে আকবর শ্রদ্ধা করে। মায়ের জন্যেই সে আওরতজাতিকেও অন্য চোখে দেখে।

কিন্তু লল্লা বেগম, সে কেন একদিন পালিয়েছিল?

কালানৌর দুর্গে থাকার সময়েই এই ঘটনা ঘটে। অবশ্য তার জন্যে ছজন রক্ষী ও তিনজন বাঁদী শাস্তিভোগ করেছিল। আর যে যুবকটি প্রেমের গান শুনিয়ে লল্লাকে মুগ্ধ করেছিল, সে পেয়েছিল

প্রাণদণ্ড। কিন্তু আশ্চর্য, লল্লা পায় নি কোন শাস্তি! তাকে কেন বৈরাম খান শাস্তি দিলেন না, সে এক রহস্য। তবে কি বৈরাম খান মনে মনে লল্লাকে ভয় করে? ভয়ের মধ্যেই ভাল-বাসা কিন্তু বৈরাম খান যদি ভালই বাসবে তবে লল্লা কেন রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে এক কপর্দ্দকহীন যুবকের সঙ্গে গভীর রাত্রে পালালো?

আজও আকবরের সে বয়স হয় নি, সেই রহস্য উদঘাটন করবার। জীবনের বিশেষ এই জিজ্ঞাসার উত্তর বুঝি পেতে গেলে আরো সময় দরকার। আরো সময় পেলে একদিন বুঝবে কিনা তাও সে জানে না। তবু সে মনে মনে বার বার প্রতিজ্ঞা করলো, রমণীদের সে কখনও তাচ্ছিল্য করবে না। তাদের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়তো প্রত্যাশা করবে, তবে স্নেহ দেবে, শ্রদ্ধা করবে, তাচ্ছিল্য করবে না।

তবে বর্তমানে সলিমাকে বৈরাম খানের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। যদি দরকার হয়, তাহলে সলিমাকে সে নিজের করে রাখবে। একথা ভাবতে গিয়ে তার বেশ আনন্দ হল। কেমন যেন পুষ্প সৌরভের সুগন্ধ মনের মধ্যে উপভোগ ছড়ালো। কেমন যেন সঙ্গীতের মিষ্টি সুরের মত কোন আবেশ।

এই অনুভূতি তার এই প্রথম। তাই সে চুপ করে কিছুক্ষণ আঘ্রান নিল। যতবারই ভাবনাটা মনের মধ্যে আবর্ত সৃষ্টি করে, ততবারই কেমন যেন শিহরণের সাড়া জাগে।

সলিমার মুখখানি ভেসে উঠলো। সেই রাত্রিবেলা দেখা। টিউলিপ গাছের নীচে সেই শ্বেতপ্রস্তরের প্রস্রবন, তারই ধারে বসে আছে। চন্দ্রের আলো পড়েছে তার মুখের ওপর। একখানি সুন্দর মুখ। দুটি টানা ভুরু। দুটি সুর্মালাঞ্ছিত চোখ। গোলাপী নরম ঠোঁট। দাঁতগুলি দিয়ে যখন হাসছিল, তখন যেন মুক্তোর মত উজ্জ্বলতা প্রকাশ হচ্ছিল।

জানে না, সেই দুটি কম্পিত অধরে বৈরাম খান কোন সোহাগ দান করছিলেন কি না!

কিন্তু সলিমা তাকে বাচ্চা মর্দানা বলে উপহাস করলো।

তবে কি সলিমা ঐ বয়স্ক মানুষের 'আলিঙ্গনই বেশী আশা করে?

কিন্তু তা কেমন করে হয়? সলিমার বয়স তারই মত। কচিসবুজ, কাঁচাফলের মত গন্ধসদৃশ। আপেলের মত তার দেহবর্ণ। স্বর্গের সুষমার মত তার যৌবনের লালিমা। সবে ফুটেছে গোলাপের পাপড়ী নিয়ে পৃথিবীর রাজ্যে; সে কখনও বৈরাম খানের মত প্রৌঢ়কে আশা করতে পারে? যার বেগম আছে তিনটি নয় অনেকগুলি। উপপত্নী আছে অগুনতি। এমনি ভোগের জন্যে আওরত মজুত আছে সংখ্যাতীত। তার বাহুলোরে বাঁধা পড়বার জন্যে কোন যুবতী তরুণী লালায়িত হবে?

তবু রমণীর মন বোঝা মুস্কিল। তাদের সবশে আনাও আরো শক্ত। এই দুজ্ঞেয় পরিখা আপাতত আকবর অতিক্রম করতে চায় না। সলিমা তার হোক আর না হোক, তাও এসে যায় না। শুধু বৈরাম খানের নবতম লক্ষ্যকে বানচাল করবার জন্যেই এই প্রয়াস। আর এই কাজে লল্লাকে নিযুক্ত করলে সফল হওয়ার পথ খুবই সহজ।

কিন্তু একবার তার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কাজটি করা কি তার উচিত? যে সম্রাট। গুরুত্বময় জীবন। সে সামান্য এই রমণীর বিষয় নিয়ে নিজের অমূল্য মুহূর্ত নষ্ট করবে? তারপর ভাবলো, মন্দই বা কি? রাজকার্যের এও তো একটা অঙ্গ। বৈরাম খান মুঘল পরিবারের কন্যা গ্রহণ করে আত্মীয় হতে চাইছেন। তাঁকে আত্মীয়তা থেকে বহিস্কৃত করলেই রাজ্যের মঙ্গল। সে রাজ্যের স্বার্থের জন্যে কৌশল অবলম্বন করছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় বৃহত্তর মনীষা।

আর চিন্তা না করে সে তার খাসভৃত্যকে গোপনে উৎকোচদানে

বশীভূত করে বেগমমহলের একটি সুপটু বাঁদীকে হস্তগত করলো। তারপর তার হাত দিয়ে লল্লা বেগমের কাছে পাঠিয়ে দিল একটি চিঠি। সেই চিঠিতে বৈরাম খানের নবতম কীর্ত্তি ও সলিমার কথা লিখে দিল। উত্তর আনবার জন্যেও সেই সঙ্গে আদেশ দিল।

ঝুঁকি নিতে হল না। আগে আকবর ভেবেছিল, লল্লার সঙ্গে সে গোপনে দেখা করবে কিন্তু তাতে যদি অন্য সন্দেহ সৃষ্টি হয়? কারণ লল্লার স্বভাব সর্বজনবিদিত। নবীন সম্রাটকে হাত করে অন্য সম্বন্ধ সৃষ্টি করাও বিচিত্র নয়। লল্লা ছিল সেই প্রকৃতির রমণী। না পাওয়ার বেদনায় একটি বিক্ষুব্ধ হৃদয় ক্ষুব্ধ মনের জ্বালায় আগ্নেয়গিরি।

সেই ভেবে আকবর পত্র বিনিময় করলো।

কিন্তু আশ্চর্য এই রমণীর মন। লল্লাকে অন্যস্বভাবের আওরত বলেই আকবরের মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তার ভুল ভাঙলো।

হঠাৎ অতর্কিতে বৈরাম খান এসে কক্ষে ঢুকলেন। হাতে তাঁর আকবরের সেই চিঠি। আকবর ব্যাপারটা চিন্তা করে মনে মনে শঙ্কিত হল। বুঝতে পারলো, এর পরের ঘটনা কি হবে?

বৈরাম খান চিঠিখানি সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—স্পর্দ্ধার একটা সীমা আছে রাজকুমার।

হঠাৎ আকবর নিজেই একটা কাণ্ড করলো। পালঙ্ক থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে নীচে বসে খোদার কাছে প্রার্থনার মত জোড়হাত করে বললো—অন্যায় স্বীকার করছি। ক্ষমা করুন।

বৈরাম খান অনেক কিছু বলবেন বলে ছুটে এসেছিলেন কিন্তু হঠাৎ আকবরের অদ্ভুত আচরণে থমকে গেলেন। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আকবরের নতমুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে বৈরাম খান উল্লাস অনুভব করলেন কিন্তু পরক্ষণে তাঁর মনে এল চিঠির কথাগুলি। দারুণ এক ষড়যন্ত্র। লল্লার মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করে সলিমার সাথে কলহ উপস্থিত করার চেষ্টা। সলিমা যে ভুল

করতে চলেছে সেটুকু তাকে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে প্রতারিত করার আকাঙ্ক্ষা।

বৈরাম খান চিঠির ভাষাগুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন কিন্তু বুঝতে পারেন নি, আকবর হঠাৎ এমন কাজ করলো কেন? তাই তিনি একটু সময় চুপ করে থেকে কণ্ঠে উষ্মা সৃষ্টি করে বললেন—কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করলে বলবে কি? তোমার মনোভিপ্রায় অবগত হলে আমি খুশি হব রাজকুমার?

আকবর উত্তরে মাথা নেড়ে বললো—আমি ক্ষমা চাইছি। অপরাধীকে ক্ষমা করলে কি তার অপরাধের গুরুত্ব লঘু হয় না? আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু অন্যায় করার প্রবৃত্তি দমন করতে পারি নি বলেই এই অপরাধ।

বৈরাম খান জিজ্ঞেস করলেন—তবে কি বুঝবো, এ তোমার নিছক প্রবৃত্তির তাড়না?

নিছক প্রবৃত্তির বেয়াদপি।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না। তবে [illegible]ল্লাবেগমকে কেন ক্ষিপ্ত করলে? সলিমার কাছে সরাসরি পত্র পাঠালেই তো তোমার অভিসন্ধি পূর্ণ হত।

আবার আকবর জোড়হাত করে বললো—ক্ষমা। আমার বেয়াদপির ক্ষমা। পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করে, তেমনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার যন্ত্রণা বর্ধিত করবেন না।

বৈরাম খান আর বিশেষ কিছু না বলতে পেরে কক্ষত্যাগ করে চলে গেলেন। ভবিষ্যতের যে সম্রাট, যার হাতে একদিন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি আসবে, তাকে আর বিশেষ কিছু বলা শোভা পায় না। যখন সে নিজেই মানসিক দৈন্যতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছে। তাছাড়া আরো একটি কারণ আছে, সলিমাকে যে লোভ দেখিয়ে জয় করেছেন, তা যদি প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে তার প্রকৃতি ধরা

পড়ে যাবে কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে সমূহ বিপদ। খুব নিপুণ কৌশলের দ্বারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। আকবরকে করতে হবে বুদ্ধিহীন। তাকে বাইরের আলোয় বেশীক্ষণ চলাফেরা না করতে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে রাখতে হবে। সে যাতে বেশী রাজকার্যে মাথা না ঘামায়, তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। সে সঙ্গীত ভালবাসে, সেই সঙ্গীতে করতে হবে মুগ্ধ। মনে সঙ্গীতের সুর থাকলে বৈষয়িক বুদ্ধি থাকবে না। পড়াশুনায় মন নিয়োজিত করিয়ে রাখতে হবে। জ্ঞান বাড়ুক ক্ষতি নেই, তবে সে জ্ঞান কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।...... সলিমাকে একটি গুরুত্ব বিষয়ের আলোকলাভ করে জয় করেছেন। নিজে একদিন সিংহাসনে বসবেন আর পাশে বসবে সম্রাজ্ঞী হয়ে সলিমা বিবি। না হলে সলিমার মত একটি সদ্যফোটা কুসুম কলিকাকে কি জয় করা যেত? মুঘল পরিবারের আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদেরই একদিন ধ্বংস করতে হবে। শুধু ভয় কিছুটা আকবর। তাকে সত্যিই ভয়। তাকে আর ছেলেমানুষ বলে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

এই সব কথা ভেবেই আকবর ক্ষমা চাইতে বৈরাম খান আর বিশেষ গোলমাল সৃষ্টি করলেন না। সত্যি, মানুষ যখন ক্ষমা চায়, তার মনের ইচ্ছাগুলি অধীনতা না স্বীকার করলে ক্ষমা চায় না। আকবর যখন ক্ষমা চাইলো, তাতেই বুঝতে হবে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু যদি লল্লা বিশ্বাসঘাতকতা না করতো? লল্লা যে কেন এত ভাল ব্যবহার করলো, তাও বোঝা মুস্কিল!

আকবরও একলা ঘরে চতুর্দিকে পায়চারী করতে করতে সেই কথা ভাবলো। আজ সে একটি কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে অকৃতকার্য হল। তারই ভুল হয়েছে, অন্তত ভাবা উচিত ছিল

পিছনের কথা। সে একাই ধূর্ত বলে নিজেকে চিন্তা করে ভুল করেছে। আওরত চরিত্র কি অদ্ভুত রহস্যময়? লল্লার স্বভাবের যেটুকু পরিচয় সে অবগত হয়েছে তাতে এই বিশ্বাসঘাতকতা, না আর কিছু ভাবা যায় না। এবার আর কোনদিন কোন বেসরম জেনানাকে বিশ্বাস করে নিজেকে ছোট করবে না!

এত ছোট হয়ে গেল যে বাধ্য হয়ে তাকে ক্ষমা চেয়ে উদ্ধার-লাভ করতে হল। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়ার পর মানসিক যে জ্বালা তার শরীরে দাহ সৃষ্টি করলো, তার নিবারণ কেমন করে হবে? শুধু সে অসম্মানিত হল না, তার স্বভাবের গতিবিধি নিরূপণ করে বৈরাম খান সচেতন হয়ে উঠলেন। একে সব সময় তিনি তার ওপর সতর্কদৃষ্টি রেখে চলেছেন, তার ওপর এই কারণ উপস্থিত করে আরো সতর্ক করা হল।

কিন্তু কেনই বা সে হঠাৎ ক্ষমা চাইতে গেল? সে সম্রাট, তার নামে আছে পাঞ্জা। তার নামে রাজ্যশাসিত হয়। প্রত্যহ প্রত্যুষে মোল্লাদের উদাত্তস্বরে তার নামে ঈশ্বরের প্রার্থনা শোনা যায়। দরবার কক্ষে আমীর, ওমরাহরা আসন গ্রহণ করবার পূর্বে শতবার সম্রাটকে কুর্ণিশ প্রদান করেন, সম্রাটের নাম উচ্চারণ করে দীর্ঘায়ু কামনা করেন। দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসতে শুরু করেছে, নবীন সম্রাট আকবরকে দর্শন করতে, নজরানা দিতে। সেই আকবর হঠাৎ দুর্বল মনের পরিচয় প্রদান করে ক্ষমা চেয়ে বসলো? সামান্য সৈনিকের মত এক আচরণ! যার নেই কোন সম্বল, ফকিরীবেশ, স্কন্ধে একটি মলিন ঝোলা। যে দরজায় দরজায় ভ্রমণ করে উদরপূর্ণ করে—ঠিক সেরূপ ব্যবহার করলো আকবর।

কেন সে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে বৈরাম খানের মুখোস খুলে দিতে পারলো না? বলতে পারলো না, বেইমান, বেতমিজ, দেশের লোককে নিজের কর্তৃত্বে বশীভূত করে অধীন করতে চাইছো! আমীর, ওমরাহদের হাত করেছ, মুঘল পরিবারের হিতকাঙ্খী সেজে সাধুতার

পরিচয় দিচ্ছ কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ—আমাকে বালক সাজিয়ে কতদিন আর নিজের স্বেচ্ছাচারীতা বলবৎ রাখবে ?

কিন্তু একথা এখনও বলা যায় না। এখনও মুঘল রাজত্ব বিপদ-মুক্ত নয়। এখনও তার মাথার ওপরে খড়্গ ঝুলছে। চতুর্দিকে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবারই ভয় বেশী। এই সময় বৈরাম খানের মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অভিভাবকত্ব দরকার। তাঁর সাহায্য যখন প্রয়োজন, সুতরাং তাঁর কিছু বেয়াদপিও সহ্য করতে হবে। সময় হলেই এই বেয়াদপির উপযুক্ত সাজা দিলেই হবে।

এই ভেবেই হঠাৎ আকবর ক্ষমা চেয়ে বসেছে। অবশ্য অন্যায় যখন করেছে, তখন ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোন অপরাধ নেই। নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে গেলে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পৃথিবীতে এই কার্যসিদ্ধির জন্যে অনেক মহানব্যক্তি অনেক ছোট কাজও করেছেন। তাদের পূর্ব-পুরুষ চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লং, বাবর শাহ্ এরা কি কোন ছোট কাজ করেন নি ?

আকবর নিজেকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলো কিন্তু মনকে বোঝালেও কোথায় যেন বিবেকের দংশন তাকে স্থির হতে দিল না।

এই সময় তার কানে গেল, মা হামিদা গত দু-দিন হল রাজপুরীতে ফিরেছেন। কিন্তু তিনি ফিরে স্বামী যে শেরমণ্ডল নামক গ্রন্থাগারের সোপান থেকে পড়ে মারা গেছেন, তারই সংলগ্ন একটি মহলে অবস্থান করছেন। তিনি এখন স্বামীর শোকে মুহ্যমান। তার সাথে কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। তিনি কারো সঙ্গে কোন কথাই বলছেন না। সম্পূর্ণ চক্ষু দুটি নিমীলিত করে স্বামীর কথাই এক মনে ভাবছেন, স্বামীর মুখখানি স্মরণ করে দু' চোখে শ্রাবণের ধারা বইছে। কিছুই আহার করছেন না, কোন রাজসিক পোষাক তার শরীরে নেই। কালো একটি কাপড়ে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করে বসে আছেন একাসনে স্থির হয়ে।

আকবর কথাগুলি শুনে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল। মা ফিরেছেন? মা ফিরে স্বামীর জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, পুত্রের জন্যে নয়। তাহলে এখনও পত্নী স্বামীর জন্যেই ব্যাকুল। মাতা পুত্রের জন্যে নয়।

দারুণ এক অভিমানে আকবরের হৃদয় দ্রবীভূত হল। সে একা। পৃথিবীতে তার কেউ আপন নেই?

এই সময়ে কক্ষের মধ্যে খাসভৃত্য কয়েকটি লোকের সাহায্যে রূপোর ট্রেতে করে বিবিধ রাজসিক খাদ্য সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করলো, সেই দেখে আকবরের যত ক্রোধ তার ওপর গিয়ে পড়লো। অভিমান থেকে ক্রোধের উৎপত্তি। হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উষ্ণ খাদ্য সামগ্রীর ট্রেগুলি লোকগুলির হাত থেকে নিয়ে ফরাসের ওপর আছাড় মারলো। ছড়িয়ে গেল মোগলাই খানা বহুমূল্য ফরাসের ওপর! কিছু বা লোকগুলির দেহের ওপর পড়ে দগ্ধ করলো গাত্রচর্ম। যন্ত্রণা ছুটলো কিন্তু প্রভুর ক্রোধ মূর্তির সামনে ভৃত্যের যন্ত্রণা প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই। তাই নীল হল তাদের মুখ। আর লাল হল আকবরের বাদশাহী অবয়ব!

কিন্তু আপসোস হল না। বরং খাসভৃত্য ইমাদ আলিকে তীব্রভাবে ধমক দিয়ে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

না, আহার নয়। বিশ্রাম নয়। আরামের জন্যে কোন কামই নয়। কেন সে আরাম উপভোগ করবে? কার জন্যে করবে? কিসের জন্যে করবে? কে তার আপন বলতে আছে? সব বেতন ভোগী ভৃত্য। হুকুমের দাস। ফরমাইসের জন্যে তৈরী হয়ে থাকে। ফরমাইস পেলে তামিল করে, নতুবা ত্রিসীমানায় থাকে না। সব জিনিসের কি ফরমাইস দেওয়া যায়? দিলের চাহিদার কি কোন আকার আছে? তার কি সবসময়ে তাড়না থাকে? অথচ এক একসময় এমন বস্তু কাছে পেলে মন আপন থেকেই তার অভাব উপলব্ধি করতে পারে। সেই অভাব সবসময়।

তার কোন ফরমাইস নেই বটে কিন্তু পেলে যেন তার অভাব অনুভব করা যায়।

কিন্তু সে অভাব ভৃত্য মেটাবে কেমন করে? ভৃত্যাকে ফরমাইস দিতে হয়, আর জীবনধারণের কতকগুলি প্রাত্যহিক তালিকা থাকে, তারা নিয়মিত সেই তালিকা মেনে চলে। তার বাইরে তারা কিছু জানেও না, করতেও পারে না।

এই জায়গায় প্রয়োজন আপন লোক। অতি আপনার জন কেউ। যার সাথে নিকট রক্তের সম্পর্ক। যে বুঝতে পারবে নিজের মন দিয়ে অন্যের মনের অভিব্যক্তি। নিজের স্বভাব দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে অন্যের মনের চাহিদা।

আকবর তবে কি খাদ্যবস্তু নষ্ট করে দিল ঐজন্যে? ভৃত্যের ওপর রাগ করে আপন লোকের আক্রোশ মেটাল! তাই যদি হয়, তাহলে সে ভুল করেছে! সামান্য বেতনভোগী ভৃত্যের অপরাধ কোথায়? অপরাধ যদি কিছু থাকে, তাহলে সে অপরাধ আকবরের পরমাত্মীয়ার। মা যদি তাকে ভুল বুঝে থাকে, অন্যে তার ফলভোগ করবে কেন?

কিন্তু রাগ মানুষকে চণ্ডালে পরিণত করে? তাছাড়া আকবর রাজবংশধর। তার ক্রোধের পরিমাণ একটু মাত্রাধিক্য হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বোধ হয় তার হঠাৎ অভিমান ক্রোধে পরিণত হয়ে একটা বিপ্লব অঙ্কিত করলো।

৬

একটি স্বল্পদীর্ঘ শ্বেতমর্মরখচিত কক্ষের হর্মতলে বসে যুবতী এক রমণী। এখনও সূর্য অস্তমিত হয় নি। আছে দীপ্তি। সে দীপ্তিতে আছে সেই আগের মতই রোশনাই। তবে সূর্য মধ্যগগনে ঢলে পড়েছে বলে কিছু তাপ ম্লান হয়েছে। উত্তপ্তভাব মন্দগামী হলেও পূর্বগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নি। যে বৃহৎ পুরুষ একদিন তাকে একবার দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেই যুবতীর রূপই তার আছে, শুধু মাঝের যা একটু ক্ষয়, সে এমন কিছু নয়। কালের ছোঁয়া লেগে সমুদ্রের পারে ঢেউ লেগেছে বটে। বয়স হয়তো তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে কিছু চিহ্নের জন্য কিন্তু সে চিহ্ন এমন কিছু নয়। এখনও বহু পুরুষের হৃদয়াকাশে ঝড় তুলতে পারে এই রমণী।

কিন্তু সেই রমণী তার যৌবনের দোসর, ইহজীবনের দেবতা, পরলোকের শান্তির জন্যে হর্মতলে বসে প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনায় রোদন করছে। ভাবছে ষোলটি বছরের স্মৃতি। ষোলটি মুক্তার মালার গ্রন্থি একটি একটি করে মোচন করছে, আর ছুটে আসছে কত সজীব স্মৃতি। স্বামীকে কাছ ছাড়া কখনও সে করে নি। যখনই সে কাছ ছাড়া করেছে, তখনই যেন মনে হয়েছে দারুণ এক বিচ্ছেদ; আজ সেই বিচ্ছেদ চিরকালের। আর সেই স্বামী তার কাছে আসবে না। তাকে আদর করে নাম ধরে ডাকবে না। সোহাগ পরিয়ে দেবে না আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে। সুখে দুঃখে আপন সঙ্গী করে বিপদে আশ্রয় চাইবে না তার কাছে। সমস্ত পরিসমাপ্তি একদিন এরই সংলগ্ন বাইরের সোপানে সংঘটিত হয়ে গেছে। তিনদিন বেঁচেছিলেন তিনি। তিনদিন ছিলেন এই কক্ষের

এই জায়গায়, যেখানে আজ সে বসে তাঁকে একমনে ডাকছে। এখানে একদিন তাঁর প্রাণবায়ু এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে। আর ঐ ঘাসের জমিনের নীচে তাঁর নশ্বরদেহ চিরনিদ্রার মাঝে লীন হয়ে শুয়ে আছে। আর ডাকলে কথা বলবেন না। স্পর্শ দিলে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেবেন না।

কিন্তু তাঁর চিরস্থকুমার দেহটি দেখারও সাধ মিটলো কই? সংবাদ যখন পৌঁচেছিল, সে অনেক পরে। বিলম্ব সে এতটুকু করে নি। স্বামীর শেখানো অশ্বেই সওয়ার হয়ে দ্রুত চলে এসেছিল কিন্তু পথ তো কম নয়? তবু বিলম্ব হয়েছিল। আর শুনলো, গোপনে বাদশাহকে মাটিচাপা দেওয়া হয়ে গেছে। কারণ শত্রুপক্ষ জানবার আগেই এ কাজ করা হল এইজন্যে, বাদশাহ মারা গেছেন কাউকে জানতে দেওয়া হবে না। নকল বাদশাহ সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করছেন।

নকল বাদশাহ। নকল হুমায়ুন শাহ! তার স্বামী, সেই স্থপুরুষ জোয়ানব্যক্তির নকল অবয়ব! এ কেমন করে হয়? শোকে মুহ্যমান হয়ে হামিদা চীৎকার করে বলেছিলেন—বন্ধ কর এই বেসরম ফিকির! বাদশাহ হুমায়ুন একজন হতে পারে, আর সেই তিনি। জগতে তাঁর দ্বিতীয় নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তখনই হামিদার মনে হয়ে ছিল, এমন মানুষের বুঝি দোসর আর হয় না। যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অনুতপ্ত হয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত শুধু নয় যে সাহস, যে শ্রম, যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, পৃথিবীতে বুঝি তার কোন তুলনা নেই।

চাক্ষুস দেখা। লোকমুখে শোনা নয়। মানুষটির সেই প্রতিদিনের রোজনামচা দেখলে বিস্ময়ই জাগে। পত্নী না হয়ে যদি নিত্যের সহচরও হত, তাহলেও বুঝি সহানুভূতি জাগতো। আর সে নিজে পত্নী। শয়নে, স্বপনে, তন্দ্রায়, জাগরণে যার অঙ্গের সাথে

অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ছিল। আজ চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরে, যখন সেই মানুষটি বিপদের মুখে পথ খুঁজে পেতেন না!

তারই এই দুই বাহুর মাঝে নিজেকে সঁপে দিয়ে ক্রোড়ে মুখ লুকিয়ে রণনিপুণ সেই যোদ্ধা বালকের মত দিশেহারা হয়ে পথের সন্ধান চাইতেন—বিবি, পথ বলে দাও। চিরাগ জ্বালা দেও। কোন পথে গেলে পারবো আমি পিতার স্বপ্নের রাজ্য হিন্দুস্থান উদ্ধার করতে? ছন্নছাড়া সেই মানুষ নিজের জীবনরক্ষার জন্যে পথ চাইতেন না, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে। 'পিতার রাজ্য আমি অক্ষম সন্তান রক্ষা করতে পারি নি। আমি কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। পিতা আমার জীবন রক্ষার জন্যে নিজের জীবন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন। আর আমি অকৃতজ্ঞ। উপযুক্ত পিতার অনুপযুক্ত সন্তান।'

শুধু তাঁর এই সওয়াল। শুধু তাঁর এই আপসোস।

সেই মানুষের জন্যে আজ মন হাহাকার করবে না! কেউ না জানুক, সে তো তাঁর অন্তরের সবকিছু জানতো। জানতো বলেই আজ সবকিছু মনে হচ্ছে নিরর্থক। এমন বিচ্ছেদ বুঝি আর কারো হয় না। এমন বেদনা বুঝি আর কারো জীবনে আসে না।

একটিবার যদি তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হত! ঘাসের আস্তরণ সরিয়ে, মাটির রুদ্ধদ্বার খুলে ফেলে একটিবার তাকে দেখতে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল কিন্তু কেউ তার কথা শোনে নি। কেউ তার মনের ভিতরটা দেখে নি। অবশ্য কবর সরিয়ে দেখারও নিয়ম নেই। তাতে মৃতদেহের প্রতি অবিচার করা হয়। না হয়, একবার অবিচার করা হল। পৃথিবীতে তো নিত্যনতুন কত অবিচার সংঘটিত হচ্ছে।

একদিন এই মানুষটিকে সে শাদী করতে চায় নি। যোলবছর

পূর্বের সেই ঘটনা। এখনও উজ্জ্বল। এখনও স্পষ্ট। যাঁরা রাজা, বাদশাহ তারা অনেক উপরের মানুষ। ঐ আসমানের ওপরে তারা বাস করে। তাদের কাছে সামান্যরা পৌঁছতে পারে না বলেই তার ধারণা ছিল। অন্তত রাজপরিবারের সেই বিরাটত্বের চেয়ে একজন সামান্য লোকের আন্তরিকতা অনেক মূল্যবান। বাদশাহের সঙ্গে শাদী হলে অন্তঃপুর বাদশাহের খাসকক্ষ থেকে অনেকদূর। 'বিনা আদেশে কখনও কেউ কারও কাছে যেতে পারবে না। তাও নিয়ম মাফিক।

নিয়মের বাইরে ছাড়া দয়িতের সঙ্গে মিলতে পারবে না বলেই বাদশাহকে প্রথমে প্রত্যাখান করেছিল।

তার মনে ছিল স্বপ্ন। সুন্দর একটি স্বর্গীয় স্বপ্ন মনের মধ্যে খেলা করে বেড়াতো। একটি সুপুরুষ নওজোয়ানের আকৃতি যথেষ্ট পুলক সৃষ্টি করতো। হামিদার মনেও পুলকের সঞ্চার হয়েছিল, সেও ভাল বেসেছিল কিন্তু তার প্রত্যাখান অন্যকারণে।

প্রথমত হুমায়ুন সেই বয়সে বহু রমণী ভোগ্য। দ্বিতীয়ত বাদশাহের বিরাটত্ব। তৃতীয় কারণও অবশ্য ছিল তবে সে কারণ এখানে আর লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। যা অতীত, তা অস্তমিত। তার কোন স্মৃতি নেই। হিন্দাল অবশ্য মনে মনে আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতো। সাক্ষাত কোন আবেদন প্রকাশ করে নি। তবে সময়ান্তরে হয়তো পাণিগ্রহণ করতো। তখন শুধু মৌনমনের মিলন। পূর্বরাগের আবেগ মূর্ছনা। তার জন্যেও হামিদার মনে কিছু সঙ্কোচ উপস্থিত হয়েছিল।

তবে হিন্দালের মাতা দিলদার সৎপুত্র মাহামের সোহাগ নাসীরউদ্দীনের জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নাসীরউদ্দীন হুমায়ুনের আদরের নাম ছিল। আপন মাতা মাহাম বেগম যে নামে হুমায়ুনকে ডাকতেন সেই নামে দিলদারও ডাকতেন। মাহাম ছিলেন বাবর শাহের পাটরাণী। তিনি ছিলেন পরিবারের কর্ত্রী। বাবর শাহের

অনেক পত্নী ও উপপত্নী ছিল কিন্তু মাহামের মত কেউ নয়। সেই মাহামের পুত্র হুমায়ুন। সবার জ্যেষ্ঠ। মাহামের কোন কন্যা-সন্তান ছিল না বলে তিনি দিলদারের কন্যা গুলবদনকে পোষ্য নিয়েছিলেন। এই দিলদার মনে মনে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা ছিলেন, তবু কখনও প্রকাশ করেন নি। শুধু কন্যা গুলবদনই নয়, হিন্দালও মাহামের দত্তক পুত্র ছিল।

আজ সেই মাহাম নেই, কোন ঈর্ষাও নেই। অথচ একদিন এই মাহামই স্বামীর অবর্তমানে পরিবার প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন কিন্তু সেও বা কদিন? অনাথ পুত্রকন্যাদের ভার এই দিলদারকেই নিতে হয়েছিল। অতীতকে ভুলতে হয়েছিল। স্মৃতিকে মুছতে হয়েছিল।

হুমায়ুন পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তার প্রতি অনেকেরই মোহ থাকা স্বাভাবিক। দিলদারেরও ছিল।

হুমায়ুন তখন রাজ্যহারা হয়ে একদিকে ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্র অন্যদিকে দুর্দ্দান্ত শত্রু শূরবংশীয় নৃপতি শেরশাহের ভয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সিন্ধুপতির আশ্রয় প্রার্থনা চেয়ে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত। সেই সময় হিন্দাল মাতাকে নিয়ে মূলতানের কাছে পাট নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেছে। এখানেই ছিল হামিদা বানু। দিলদারের স্নেহের শান্তছায়ায়। হিন্দালের সুফী গুরু মীর্জা আকবর জামীরের সুন্দরী কন্যা। উদ্দেশ্য অবশ্য অন্য ছিল। হয়তো শেষপর্যন্ত সেই সঙ্কল্প কাজে পরিণত হত যদি না হুমায়ুন এসে বাধা সৃষ্টি করতেন।

হুমায়ুন সেই কিশোরীর রূপমাধুর্য ও প্রস্ফুটিত যৌবনতনু দেখে কেমন যেন হতচকিত হলেন। হৃদয়ে তখন তাঁর রাজ্যহীনের বিক্ষোভ। নিরাপদ আশ্রয়ের চিন্তা। সর্বোপরি তাঁর জীবনে তখন শান্তি ছিল না। সেইসময় এই রমণীসৌন্দর্য তাকে বিমুগ্ধ করলো। যার আশ্রয় নেই, সে চায় শাদী করতে।

হামিদার রূপলাবণ্যই এর জন্যে দায়ী। হামিদা এমন এক কুসুম কোমল গোলাপ ফুলের মত বর্ণশোভা বিকিরণ করেছিলো, যার মধ্যে ছিল চির অশান্তির শান্তি। বিক্ষুব্ধ মনের ছায়াঘন সবুজ বর্ণ দীপ্তি।

ছিল হয়তো তার মধ্যে যৌবনের অশান্ত জোয়ার। সীমাহীন উত্তপ্ত মনের তপ্ত কামনার দাহিকা শক্তি। পুরুষ যা দেখলে স্বভাবত পাগল হয়, ছুটে যায় সোহাগরঞ্জন পরিয়ে সেই রমণীকে সম্ভোগের মাঝে আকর্ষণ করতে—হামিদার সে সবই উপকরণ ছিল, তবু যেন তার চেয়ে স্থিতির কল্পনাই প্রধান। হুমায়ুন সে সময়ে ভাবলেন, এই রমণীকে জীবনের সঙ্গিনী করলে তার তিক্ত জীবনের প্রাণপ্রাচুর্য্যই সঞ্চিত হবে। একটি নিরাপদ আশ্রয় মিলবে।

তাই প্রথম সাক্ষাতে হামিদার তিনি করাকর্ষণ করেছিলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে জানিয়েছিলেন তাঁর মহব্বতের সঙ্গীতময়বাণী। অন্তর থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এক প্রার্থনার আকুতি নয়, তার জীবন রক্ষার জন্যে একটি পরম নির্ভরতা।

অন্তরের ভাষা বুঝি সব অন্তরের স্পর্শ পায়। বালিকা হামিদা সেই কথা শুনে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তে পালিয়েছিল অন্যকথা চিন্তা করে। তাছাড়া ছিল সরম। লাজরক্তিম সরম তার সমস্ত গণ্ডে সিঁদুর আভা ছড়িয়ে তাকে পলায়নে সাহায্য করেছিল।

আজ সে সব কথা ভাবলেও কেমন যেন ভাল লাগে। কেমন যেন সেই সেদিনকার মোহ এসে আবার হৃদয় চঞ্চল করে তোলে।

হামিদা সেদিন আনন্দিত হয়েছিল কিন্তু আনন্দের চেয়ে ভয়ই তাকে কেমন ভীরু করে তুলেছিল। দিলদারের কাছে শোনা আছে, এই বাদশাহের অনেক কথা। দিলদার প্রশংসাই করেছিলেন।

বীরের সম্মানই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্নেহদান করে আরো স্নেহ অপরের মনে সৃষ্টি করে অপরিচিত ব্যক্তিকে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি আজ এসেছেন। অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া কি স্বাভাবিক নয়?

কিন্তু হামিদা জানালো প্রতিবাদ। হয়তো মহব্বতের যে বাধা, সেই বাধা সৃষ্টি করে দয়িতের মন পরীক্ষার জন্যে সে জানালো তার অভিমত।

আজ হামিদা সেইজন্যে বলেন, সেদিন পরীক্ষার জন্যেই তিনি ঐ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। নিখাদ প্রেমের আকর্ষণই আলাদা, যিনি তাকে ভালবেসেছেন, তার মোহ সাময়িক কিনা দেখবার জন্যে এই কৌশল। সেদিন যদি তিনি বিমুখ হয়ে চলে যেতেন, হয়তো তার অন্তর দগ্ধ হয়ে লীন হয়ে যেত।

খোদা তাকে সেদিন বিমুখ করেন নি, তার জন্যে আজও সহস্র কোটি ধন্যবাদ।

হামিদা চেয়েছিলেন বাদশাহকে নয়। চেয়েছিলেন একটি বিশুদ্ধ অন্তর, উদার হৃদয় আর নিবীড় ভালবাসা। পেয়েছিলেন তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। যৌবনের অঙ্গার যখন তাকে বার বার দগ্ধ করতো, তখন স্বামীর সোহাগের আলিঙ্গন তাকে মুগ্ধ করতো। তিনি স্বামী সুখে সোহাগিনী ছিলেন।

'তিনি যে স্পর্দ্ধাভারে বলেছিলেন, তাঁর বাহু যাঁর কণ্ঠলগ্ন হতে সমর্থ হবে, তাঁকেই তিনি পরিণয়পাশে আবদ্ধ করবেন। এমন কাকেও তিনি স্বামীত্বে বরণ করবেন না, যার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করতে তাঁর হস্ত পৌছবে না।'

এই ভয় তার ভবিষ্যতে আর ছিল না। হুমায়ুন বহু রমণীতে আসক্ত হলেও পত্নী প্রেমে কখনও অবহেলা প্রকাশ করেন নি। বরং সেখানে তিনি বাদশাহ ছিলেন না। সেখানে ছিলেন একজন পত্নীপ্রাণ সাচ্চা মরদ।

কত কথাই আজ বিরহকাতর মনে স্মৃতির মত জেগে ওঠে। ধূপ পুড়ে গেছে কিন্তু তার সৌরভ মিলায় নি। সেই সৌরভ বুঝি হৃদয়ের সমস্ত বিড়ম্বনাকে নতুনভাবে শোককাতর করে যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে। গিয়েছিলেন তিনি কাবুলে মির্জা হাকিমের মায়ের কাছে হৃদয়ের জ্বালা নির্বাপিত করতে কিন্তু থাকতে পারেন নি। হারিয়েছে তারই যে বেশী। তার শোক কার অন্তর স্পর্শ করবে? কে বুঝবে তার বেদনা? কে দেবে তেমনিভাবে সান্ত্বনা?

নেই, নেই, কেউ নেই। পৃথিবী আজ অসার শূন্য। সেই জন্যেই তিনি রাজসিক প্রাসাদ থেকে নির্বাসন নিয়ে এই স্মৃতিবিজড়িত স্বামীর শেষ আশ্রয়ের স্থানটিতে নিজেকে এনে স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাতেও যেন আরো হাহাকার। আরো হাহুতাশ। আরো শোকের নিদারুণ নীলবর্ণ বেদনা।

রাজপুরীতে ফিরে তিনি অন্তঃপুরে একবারও যান নি। কেমন যেন আজ তাঁর লজ্জা। শত লজ্জা তাঁকে ঘিরে সম্পূর্ণ এককজীবন গ্রহণে সাহায্য করেছে। তাঁর মনে হয়, পৃথিবীতে যে ঐশ্বর্য আছে, যে দৌলত রোশনাইতে ভরিয়েছে ভুবন, যে সৌভাগ্য এখনও থরে থরে চতুর্দিকে সজ্জিত তার ভাগিণী হওয়ার অধিকার আর তাঁর নেই! তাই তিনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত অন্তঃপুরে আর প্রবেশ করেন নি।

এ মুখ আর কাউকে দেখাতে চান না! এ আকৃতি কারুর কৃপা পেয়ে সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত হবে, এ প্রত্যাশাও তিনি করেন না! একদিন তাঁর যে সৌভাগ্য ছিল, জগতে আর কারুর ছিল না। আজ তার সে সোহাগ অস্তমিত। অন্যের উপহাস তাঁর অন্তর দগ্ধ করবে। সেইজন্যে তিনি সবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চান। ঈর্ষা নয়, ঈর্ষা তাঁর নেই। জগতের নিয়মের বৃত্তেই তিনি নিজের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন। বুদ্ধিহীনা তিনি নন। বুদ্ধি আছে বলেই স্বামী হারার বেদনা তাকে ভুলতে দিচ্ছে না।

প্রিয় মিলনের সেই নিরবিচ্ছিন্ন সুখ অন্তর্হিত হচ্ছে না বলেই অন্তর হাহাকারে ভরে যাচ্ছে !

তিনদিন গত হল এই একাত্মকক্ষে। এখানে কেউ নেই। বৈরাম খান সংবাদ পেয়ে নিজে এসেছিলেন। কিন্তু হামিদা তার সামনে উপস্থিত হন নি! পরিচারিকার দ্বারা বলে পাঠিয়েছেন, আমার কোন অভাব নেই। আপনি বৃথা দুশ্চিন্তা মনে পোষণ করবেন না, আমি ভাল আছি।

তবু বৈরাম খান মৃত সম্রাটের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তার প্রিয়তমা পত্নীর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। পাঠিয়েছেন মূল্যবান পোষাক, আরামদায়ক কেদারা, মূল্যবান শয্যা! ব্যবহারের জন্যে নানান সামগ্রী। কিন্তু সে সব দেখে মনে মনে হামিদা বিরক্ত হয়েছেন। কে এসব রাজবৈভব চেয়েছিল আরামের জন্যে? ফেরৎ পাঠিয়ে তিনি ভৃত্যদের কড়া হুকুম দিয়েছেন। এখানে কারুর আসার দরকার নেই। আমার প্রয়োজন কিছু নেই। আমি শুধু একলা থাকতে চাই।

তবু একজন পরিচারিকা থেকে গেল। প্রাসাদপুরী থেকে এই মহলটি অনেক দূরে। যদি হঠাৎ কিছু প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে মহিষী অসুবিধায় পড়তে পারেন। এই ভেবেই পরিচারিকাটি হামিদার নিষেধ প্রত্যাখান করেও থেকে গেল। শেষপর্যন্ত হামিদা সেই পরিচারিকার সঙ্গ স্বীকার করলেন কিন্তু তার বেশী নয়।

হামিদা সমাহিত হলেন আপন ধ্যানের মাঝে। রাজপুরী থেকে রাণীর উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী পাচিকা বয়ে নিয়ে এল কিন্তু হামিদার সেই ধ্যানস্থমূর্তি দেখে কেউ তাঁকে সজাগ করতে সাহস করলো না। পড়ে থাকলো রাজসিক খাদ্যবস্তু।

হামিদা এই তিনদিন ধরে অল্প আহার ও সামান্য নিদ্রা গ্রহণ করলেন!' বেঁচে থাকতে হবে বলেই এই গ্রহণ। বেঁচে না থাকলে

বুঝি ভালই হত। স্বামীর পাশে চিরশয্যায় শয়ন করে চিরসুখের মধ্যে চক্ষু বুজতে পারলেই বুঝি মিলতো শান্তি।

এই তিনদিনে তার শরীর অনেক শুষ্ক হল। অনেক ম্লান হল দেহলাবণ্য! কথায় চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হয়ে কেমন যেন স্ফীতকায় হয়ে গেল। সুন্দর মুখখানির ওপর কেমন যেন নেমে এল যোগিণীর রূপ। যোগিণীই বটে। যার বসন ছিল রাজসিক। যিনি সর্বদা বাহারে রঙীন পোষাক ছাড়া পরতেন না। সাজতেন সুন্দর করে। মণিমুক্তার অলঙ্কারে দেহ অলঙ্কৃত করে রাখতেন। চোখে সুর্মা, অধরে গোলাপীরং, গণ্ডে সিঁদুর আঙা, হাতের তালুতে মেহেদী শোভা। একমাথা রেশমের চুলে হাজার রকম বিন্যাসের কেরামতি।

সেই বিলাসিনী রমণী আজ নিরাভরণে একটি কালো কাপড়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে সব মোহ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

আজ যেন নতুন করে আবার বাদশাহ হুমায়ুন শাহ মারা গেলেন। হামিদার শোকের প্রাবল্যে রাজপুরী যেন নতুন করে মৃত বাদশাহের শোক অনুভব করলো। তাই রাজপুরী হল স্তব্ধ।

এরই মধ্যে একদিন প্রত্যুষে আকবর এসে মায়ের দরজার সামনে দাঁড়ালো।

অভিমান আর ধরে রাখতে পারে নি রাজকুমার। মাতার শোকের কথা শুনে সব অভিমান তার অপসারিত হয়েছে। বরং মনে হয়েছে, পিতার মৃত্যু সত্যিই আকস্মিক। এই আকস্মিকতার জন্যেই সবার শোক ঘনীভূত হওয়া স্বাভাবিক। এতদিন হয় নি, তার কারণ বাদশাহের মৃত্যুতে রাজপরিবারের মাঝে সর্বনাশের রূপ ফুটে উঠেছিল। ভীষণ দর্শনা কালো দূত এসে সব অন্ধকার করে দিতে চেয়েছিল। তাই বাদশাহের বিচ্ছেদে শোক প্রকাশ করার অবসর মেলে নি। তখন হামিদার দিকে দেখারও অবসর ছিল না।

আজ প্রিয়তমা পত্নীর শোকোচ্ছ্বাসে নতুন করে শোকের ঢেউ লাগলো রাজপরিবারে। আকবর রাজপুরীর চতুর্দিকে সেই ছায়া দেখে আর অভিমান নিয়ে থাকতে পারে নি, ছুটে এসেছে মায়ের কাছে। মাকে সান্ত্বনা দেওয়া কি তার কর্তব্য? কি জন্যে সে এসেছে, তা জানে না, তবে আসবার জন্যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাকে উৎসাহী করে তুললো, তাই সে এলো।

পিতার জন্যে তার কি কোন বেদনা নেই? সেকথা এখানে অবান্তর, কারণ তার শোকের কাল বহুপূর্বে গত হয়েছে। কান্না তার সহজে আসে না। একদিন সে পিতৃশোকে ক্রন্দন করেছিল, যখন ফকির নূরউল্লা কান্নার গীত পরিবেশন করে তার মন দ্রবীভূত করেছিল।

আজ কাঁদতে গেলে, শোক করতে গেলে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। নূরউল্লা আবার না গান গাইলে তার দু'চোখে জল আসবে না। চোখে জল অনেকের অল্পায়াসে আসে, আবার চোখের সামনে অতি প্রিয়জনের মৃত্যু দেখলে আসে না। আকবর দ্বিতীয় পরিপন্থির মানুষ।

কিন্তু কাতরতা জাগলো মাতার জন্যে। রাজপুরীর সকলের মুখে শুধু মহিষী হামিদার কথা। বেগম আজ স্বামীর শোকের জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। আরাম পরিত্যাগ করে ভিখারিণী হয়েছেন। কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে এমন এক ভূমিকার পরিচয় দিচ্ছেন, যা রাজপরিবারের আতঙ্ক।

শুনে মায়ের জন্যে আকবরের মন উতলা হয়ে উঠলো। আর অভিমানী হয়ে চুপ করে নিজের পরিধির মধ্যে কাটাতে পারলো না।

একদিন হামিদা কোন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। এমন কি পরিচারিকার মুখ পর্যন্ত দেখেন নি। তিনি শুধু আঁখি মুদে স্বামীর প্রিয় মুখখানি দেখবার চেষ্টা করেছেন। অনুভূতির মধ্যে স্বামীর স্পর্শ সুখ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে আরো নিঃশব্দ হয়েছেন।

রাজ্য নয়, রাজত্ব নয়, দৌলত, ঐশ্বর্য, বিলাসিতা, জাঁকজমকতা কিছু নয়—শুধু সেই মৃতমানুষের পুনরুজ্জীবন। যেন মরেও তিনি সজীব হয়ে প্রিয়তমার কাছে আসেন।

হঠাৎ আকবরকে চোখের সামনে দেখে তিনি চমকিত হলেন, তখন তাঁর মনে পড়লো—তিনি তো শুধু স্বামী সোহাগিণী পত্নী নন, তিনি যে মা, জননী, গর্ভধারিণী। পুত্র নিজে এসে তার অবস্থান প্রকাশ করে নি, স্বামী অন্তরালে থেকে পুত্রকে পাঠিয়ে তাকে সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি নেই, আছে তাঁরই ঔরসজাত সন্তান, তাঁর রক্তের সম্বন্ধ, তাঁর আকৃতির হুবহু প্রতিবিম্ব। এখন এই পুত্রের মাঝে নিজেকে অন্তরীণ করলে তাঁর প্রতি ভালবাসাই প্রকাশ করা হবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ হামিদার ভাবান্তর ঘটলো, তিনি দু'হাত বাড়িয়ে পুত্রকে ব্যাকুল হয়ে কাছে ডাকলেন—বেটা, মেরে বেটা!

আকবর মনে প্রাণে তখনও শিশু, তখনও তার হৃদয় মাতৃস্নেহের জন্যে ব্যাকুল। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। কেমন যেন শিশুর মত ছুটে গিয়ে মাতার প্রসারিত হাতের মধ্যে নিজেকে ধরা দিল।

মাতা-পুত্রের মিলন হল। কোথায় বুঝি কোন অন্তলীনে নীহরিকার ওপারে তূর্যধ্বনি হয়ে উঠলো। শঙ্খধ্বনি হল নিঃশব্দে কোন্ নিস্তব্ধপুরীর প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলে। কিছুক্ষণ ধরে কেউ কোন কথাই বললো না। হামিদা বললেন না, নিঃশব্দ অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়েছিল বলে। আকবর বললো না, তার অন্তরে কিসের যেন ঢেউ ছাপাছাপি হয়ে তাকে পূর্ণ করে দিয়েছিল বলে। এই মাতৃস্নেহের জন্যেই বোধ হয় একদিন আকবর মুঘল বংশের সবচেয়ে বড় আসনটি অলঙ্কৃত করেছিল। তৈমুর কি তাঁর মাকেও এমনিভাবে ভালবাসতেন? তৈমুরের নামও তো মুঘল বংশের সবার মুখে মুখে। তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে মুঘলদের মধ্যে একটা

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তারপর বাবর শাহ। ভারত জয়ী বাবর শাহ জীবনের অর্ধশতাব্দী শুধু রণাঙ্গনেই অতিবাহিত করেছেন। তিনি সে শক্তি পেলেন কোথায়? তাঁর মা নিগার খানুমকে কি তিনি ভালবাসতেন না?

আকবর শুধু মাকেই ভালবাসতো। মায়ের জন্যে তার মনের তলে কিসের যেন আলোড়ন! জীবনের অধিক সময় তার ধাত্রী-মাদের হেফাজতে কেটেছে, মাকে সে খুব অল্প সময় কাছে পেয়েছে বলে হয়তো এই ব্যগ্রতা!

আর সেইমুহূর্তে সন্তানের জন্যে হামিদার মনে পড়লো বিগত-দিনের একটি স্মৃতি। তখন এই সন্তানকেই একমাস বয়েসের সময়ে ফেলে তাদের পালাতে হয়েছিল। স্বামী ও তাঁর এই পুত্রের জন্যে একই দুরবস্থা।

স্বামীকে সেদিন তাঁর কঠিনই মনে হয়েছিল। নিজেদের জীবন রক্ষার জন্যে ভাইয়ের হাতে বাঁচতে গিয়ে একমাসের শিশুকে ফেলে পলায়ন। ভ্রাতা আসকারী হত্যা করেনি তাই, যদি করতো যদি সেদিন এই সন্তান হারাতো, তাহলে আজকে কি নিয়ে জীবন থাকতো?

স্বামীর ওপর সত্যিই তাঁর সেদিন রাগ হয়েছিল। অশ্বে সওয়ার হয়ে যখন তাঁরা পারস্যাভিমুখে এগিয়ে চলেছেন, বার বার তিনি অশ্ব থেকে নেমে যেতে চেয়েছেন।

আমার পুত্র, আমার বেটা। তুমি আমাকে সেই শিবিরেই ফিরিয়ে দিয়ে এস। আমার পুত্রের সাথে আমায় যদি হত্যা ক'রে কোন ক্ষতি নেই। তুমি কেন আমাকে জোর জবরদস্তি করে আনলে?

স্বামী পূর্বে কোন কথাই বলেননি। কোন সান্ত্বনা, কোন প্রতিবাদ।

হঠাৎ চন্দ্রালোকের আলো মেঘের অন্তরাল থেকে প্রকাশ

হল। ওঁরা এবড় উন্মুক্ত ক্ষেত্র দিয়ে ছুটে চলছিলেন। একই অশ্বের ওপর ছুজনে সওয়ার হয়েছিলেন। হামিদা সামনে, হুমায়ুন পিছনে। চন্দ্রের আলো ওঁদের ওপর পড়তে হামিদা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্যস্ফুরণ বন্ধ হয়ে গেল।

বাদশাহ হুমায়ুনের ছুচোখ গড়িয়ে জল নেমে এসে পুরুগণ্ডের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে হামিদা বুঝতে পারলেন, কাকে তিনি আঘাত দিয়ে চলেছেন ? যার ক্ষত অনেক বেশী, তার কাছ থেকে সান্ত্বনা পাওয়া মুস্কিল, তেমনি তাকে আঘাত করাও অন্যায়। তিনিও যে সন্তজাত পুত্রের জন্যে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছেন!

হুমায়ুন একসময় বললেন—জুলুবিবি, তুমি আমার অপরাধ নিও না। এছাড়া পথ ছিল না বলেই এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। তোমাকে ওখানে রেখে এলে আসকারী তোমার সম্মান রক্ষা করতো না। শুধু শিশুকে ফেলে এলাম এইজন্যে যে, যদি শিশুর মুখ চেয়ে ছুশমন ভ্রাতা তার তরবারী রুদ্ধ করে। অন্তত শিশুর কুসুম কোমল মুখ দেখে শয়তানেরও রক্ত শীতল হয়।

শুধু অনুমানের ওপর জীবন রক্ষা। হতেও পারে, নাও হতে পারে। সোহাগ ছিন্ন হতেও পারে, আবার রক্ষা পেতেও পারে। অনুগ্রহের সেতু।

সেদিনের সেই সে আতঙ্ক—আজ মনে এলে এখনও যেন কেমন হৃদ্‌কম্প হয়। যদি সেদিন আকবর নিহত হত ?

হামিদা পুত্রের দিকে তাকিয়ে আবার তার দেহে নিজের হস্তস্পর্শ দিলেন। আজ আবার তার মনে সেই কম্পন এল।

এ কম্পন পারস্য সাম্রাজ্যে অবস্থান করেও দমিত হয় নি। পারস্য সম্রাট শাহ তহমাস্পের নিরাপদ আশ্রয়ে যতই তাঁরা আদর যত্ন পেয়েছেন, এই শিশু আকবরের জন্যে ততই তাদের চিত্ত বিকল হয়েছে। উদ্বিগ্ন হয়েছেন। একটি সংবাদের জন্যে সমস্ত

মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। সে কি বেঁচে আছে? শয়তান চাচা আসকারী ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্ষমা করে বাঁচতে সাহায্য করেছে?

হুমায়ুনও সেদিন কম ছটফট করেন নি। বার বার পারস্য সম্রাটকে উদব্যস্ত করেছেন, আপনি কোন লোক পাঠিয়ে একটু সংবাদ নিন। আমার শয়তান ভ্রাতা আমার পুত্রকে হত্যা করে আমার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে কিনা!

কিন্তু পারস্য সম্রাটের তখন কোন উপায়ই ছিল না খবর এনে দেওয়ার। উত্তর ভারতের চতুর্দিকে তখন আফঘানরা তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ব্যক্তি শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন। এদিকে মুঘল বংশধররা ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত, মীর্জা বেগেরা খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ড অধিকার করবার জন্যে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে।

এই সময়ে কোন পারস্য সৈন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে প্রাণ নিয়ে ফেরবার উপায় থাকবে না। সুতরাং সংবাদ আনা দুষ্কর বলেই পারস্যসম্রাট ভিন্নভাবে দুই স্বামী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

পারস্য সম্রাটের সেই আতিথ্য আজও ভোলবার নয়। আজও বার বার মনে পড়ে হামিদার—সম্রাট শাহ তহমাস্পের কথা, তার ভগিনী সুলতানামের কথা। কি সুন্দর সেই রমণী ছিল সুলতানাম। সম্রাটের ভগিনী বলে এতটুকু অহঙ্কার ছিল না। যেমন রূপ ছিল তেমনি ছিল গুণ। চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ রূপ, এতটুকু উগ্র নয়। উগ্র নয় বিলাসিতার প্রাচুর্য। অথচ উগ্র আভিজাত্যে পূর্ণ ছিল রাজপুরীর মহলগুলি। অন্তঃপুরের রমণীরা ছিল অলঙ্কারের রাণী। জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে থাকতেই তাঁরা ভালবাসতেন কিন্তু বর্তমান সম্রাট ও তার ভগ্নী যেন অন্য মানুষ। অন্য ধাতুতে গড়া।

ভগ্নী সুলতানাম অমায়িক ব্যবহার নিয়ে হামিদাকে ও সম্রাট শাহ তহমাস্পের দৃষ্টি সর্বদা মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনকে ঘিরে। এই অতিথি দম্পতি কিসে পুত্রবিচ্ছেদ বিস্মৃত হয়ে আনন্দ উপভোগ

করতে পারেন সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি। মহানুভব শাহ তহমাস্প সন্তপ্ত সম্রাটকে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে নিত্য নব আমোদের ব্যবস্থা করতেন। শিকারের আয়োজন করে সম্রাটকে ভুলিয়ে রাখতেন।

শিকারে যখন হুমায়ুন যেতেন হামিদাও তার সঙ্গ ত্যাগ করতেন না। অশ্ব, উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা দোলারোহণে মৃগয়ার উল্লাস উপভোগ করতে যেতেন। সঙ্গে শাহজাদী সুলতানামও অশ্বারোহণে তাদের অনুসরণ করতেন।

এই করেই সেদিন পুত্রবিচ্ছেদ ভোলবার চেষ্টা করতে হয়েছে। পারস্যের সেই দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী যদি এমনভাবে সান্ত্বনা দান না করতো, তাহলে আকবরের সংবাদের জন্যে ও তার মুক্তির জন্যে হয়তো আসকারীর কাছে গিয়েই উপস্থিত হতে হত। আসকারী বোধ হয় সেই আশা করেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে হয়নি বলে আজ সবচেয়ে ধন্যবাদ সেই ভ্রাতা ও ভগ্নীকে দেওয়া উচিত।

সেই সন্তান আজ আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে। সেই সন্তান আজ মুঘল সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল সিংহাসন অলঙ্কৃত করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। পিতার মতই রণনিপুণ, পিতামহের মত শক্তিশালী, তৈমুরের মত দুর্ধর্ষ হবে বলেই যেন শরীরে তার আভাস ফুটে উঠছে। হামিদা আকবরের পুষ্টদেহে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে নিম্নস্বরে বললেন—বেটা আকবর। মেরে বেটা আকবর। অনেক কথা মনে এল কিন্তু কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না। কণ্ঠের কাছে কি যেন ঢেলার মত এসে তার সব কথা রুদ্ধ করে দিল।

তারপর অনেক পরে আবেগদমিত করে নিম্নস্বরে বললেন—বেটা পারবি? পারবি তুই মুঘল বংশের মুখোজ্জ্বল করতে। তুই

আমার গর্ভজাত সন্তান, তোর পিতার হৃদয় মনের উচ্ছ্বাস। তোর ওপর মুঘলবংশের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমার সম্মান রক্ষা করে তুই পারবি শক্তির পরিচয় দিতে? পিতা, পিতামহ সমস্ত পূর্বপুরুষদের শক্তিকে ম্লান করে নতুন এক কীর্তি, নতুন এক খ্যাতি!.........তুই যদি পারিস, তাহলে আজকের এই শোক আবার শান্ত হবে। আমি আবার তোরই জন্যে নতুন করে উৎসাহ আহরণ করবো।

আকবর মাথা নত করে বললো—কসম খাচ্ছি আম্মা। যদি না পারি নিঃশব্দে সরে যাবো। মুঘল বংশকে কলঙ্কিত করতে জীবিত থাকবো না।

আবেগের উচ্ছ্বাসে হামিদা বানুর চোখে জল এসে পড়লো, সস্নেহে বিচলিত হয়ে বার বার পুত্রের হাত ধরলেন, তার গণ্ডে স্নেহচুম্বন দিলেন।

আকবর তাকিয়ে থাকলো মায়ের দিকে একদৃষ্টে। কি যেন সে দেখতে লাগলো? কোন্ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সে তুলে নিয়ে এল পৃথিবীর নতুন এক শক্তির আধার। বুঝতে পারলো শক্তি-রূপিনী শক্তিময়ী তার পাশে থাকলে সে মুঘল বংশের নতুন এক কীর্তি ঘোষণা করতে পারবে। সে কীর্তি বুঝি এ পর্যন্ত কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। মসজিদে মসজিদে, দরজায় দরজায় ঘরে ঘরে তাকে নতুনরূপে বন্দনা করবার জন্যে বসে যাবে খোদার মত প্রার্থনা করতে। অন্ধকার থেকে আলোর উজ্জ্বল তারা যেমনি রহস্যময় রাত্রিকে অলঙ্কার পরায়, তেমনি তার কীর্তিতে অলঙ্কারের মত উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হবে।

সেই অদৃশ্য লোকের স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতের চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিশোর আকবর কেমন যেন তৃপ্তি পেল। জানে না সে তার সেদিন আসবে কেমন করে? সে দুর্গম পরিখা সে পার হয়ে কেমন করে সমুদ্র সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, মানুষের মনে

আনবে শান্তি। শত্রু তার ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে শক্তি দমিত করবে, মাথা নত করে নিবেদন করবে নিজেদের কর্মক্ষমতা।

এক বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা। বিরাট এক পর্বত সমান প্রত্যাশা।

এই সূত্রে তার মনে পড়লো পিতামহ বাবর শাহকে। পিতামহের আত্মজীবনীতে লেখা আছে একটি বিরাট আশাবাদী মনের ছবি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের কল্যাণ। যুদ্ধ করে, শত্রু ধ্বংস করে রাজ্যজয় করা অবশ্য বীরের ধর্ম কিন্তু অন্যায়ভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি সুযোগ পেলেই কবিতা রচনা করতেন কিন্তু কবিতার কোথাও তার এতটুকু রক্তের তাণ্ডব ছিল না, বরং থাকতো স্নিগ্ধ সবুজ মনের একটি ছায়া ঘন পত্রপল্লবিত প্রতিচ্ছবি।

এমনি মনই আকাঙ্ক্ষিত করতে হবে। এমনি একটি আদর্শকেই বুকে পোষণ করে তরবারী ধারণ করতে হবে। গীতের সুধায় মন ভরিয়ে অসির ঝনঝনানিতে আনতে হবে রণতাণ্ডব। মানুষকে হত্যা করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসার স্বর্গরচনার করে মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রত্যাশা করতে হবে। তবে মিলবে আকাঙ্ক্ষিত যশ কীর্তির উজ্জ্বল শিখা সূর্যের উজ্জ্বলতার সাথে মিশে নতুন এক ইতিহাস রচনা করবে।

হঠাৎ আকবর উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে নামাজের ভঙ্গিতে বললো—তুনিয়ায় আপন বলতে আমার তুমি। তুমি পাশে থাকলে আমি অসাধ্য সাধন করতে পারবো। পিতা আমাকে শিখিয়ে গেছেন অসি চালনার কৌশল। তুমি দেবে আমার সেই অসিতে অপরাজেয় শক্তি। আমি কসম খাচ্ছি, পিতার সম্মান, তোমার সম্মান ও মুঘল বংশের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তিনিয়োগ করবো।

হামিদা বানু চোখের জল মুছলেন। স্বামীর উদ্দেশ্যে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁকে মনে মনে প্রার্থনা করলেন।

মনে মনে বললেন—আমাকে নতুন বসন পরতে সাহায্য কর। নতুন শরীর দান কর। নতুন মনে পুত্রের কল্যাণের জন্যে কর্তব্য করতে দাও। এছাড়া উপস্থিত আর কোন প্রার্থনা নেই। আর তুমি সর্বদা মৃত্যুর পরপারে থেকে ছায়ার মত পাশে থেকো। যদি বেহেস্ত বলে কিছু থাকে, তাহলে তুমি সেই বেহস্তে আত্মমগ্নে বিভোর না থেকে তোমারই প্রিয়তমার সুখের জন্যে যত্নবান হোয়ো।

হামিদা বানু আবার রাজপুরীতে ফিরে চললেন। সেখানে প্রতীক্ষিত আত্মীয়স্বজন তার আগমনের জন্যে ব্যগ্র। মহিষীর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনে মহলে মহলে নতুন এক সাড়া পড়ে গেল। মন্ত্রী, সেনাপতি, উজীর, নাজির, সরকার, বাবুর্চি, প্রভৃতি কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। হঠাৎ নহবতখানায় ইমনকল্যাণ সুরে সানাই বেজে উঠলো। মঙ্গল পারাবত মুঘল সাম্রাজ্যের বার্তা নিয়ে নীল আকাশের নীলিমার সুদূরে বিলীন হল।

মঙ্গল ধ্বনি উচ্চারিত হল। মঙ্গল বাদ্যে চতুর্দিক ভরে উঠলো। এ কদিন মহিষীর শোকে রাজপুরী কেমন যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহিষীর প্রত্যাবর্তনে সেই শোক অপসারিত হয়ে আবার নতুন রাগিনীতে চতুর্দিক ভরে উঠলো।

আবার নতুন এক শিক্ষক এসে আকবরের কক্ষে প্রবেশ করলো। রক্ষী জানালে. ; জনাব, মন্ত্রী, খানসাহেব, ও মহিষীর ইচ্ছায় এই মৌলভী সাহেব আপনার শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন।

মীর আবদুল লতিফ সেই শিক্ষক। পারস্যদেশীয় লোক। বৈরাম খানের বিশেষ অনুরোধে নাবালক সম্রাটকে শিক্ষা দিতে এসেছেন।

আকবর ভুরুদ্বয় কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকলো সেই শিক্ষক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কিন্তু দেখতে দেখতে কেমন যেন তার মোহসঞ্চার হল।

পারস্যদেশীয় লোকটির আকৃতিতে কেমন যেন এক কমনীয়তা। মুখখানি কেমন যেন সুন্দর। চোখ দুটিতে কি যেন এক বুদ্ধির দীপ্তি। একমুখ দীর্ঘ দাড়ির জঙ্গল, তবু যেন সেই জঙ্গল ভেদ করে বের হচ্ছে নতুন এক জ্যোতির সূর্য। এমন বুদ্ধিদীপ্ত লোক সে জীবনে কখনও দেখে নি। এমন আকৃতির মানুষ এই রাজপুরীতে একটিও নেই। তবে কি শিক্ষার ধর্মই এই? অনেক জ্ঞানের রশ্মি মনের মধ্যে চাপা না থেকে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে? সে যদি প্রচুর অধ্যয়ন করতে পারতো? কিন্তু রসহীন এই অধ্যয়নের মাঝে কোন আনন্দ নেই বলে বচমন থেকেই সে অধ্যয়ন করতে পারলো না! পুস্তক দেখলেই তার কেমন যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়।

অথচ পিতা তার মুঘল নিয়ম অনুযায়ী শিশুকালেই শিক্ষারম্ভের ব্যবস্থা করেছিলেন! চার বৎসর, চার মাস, চারদিন বয়সে তার মকতব আরম্ভ হয়। শিক্ষক একটি নয় বিভিন্ন পাঠের জন্যে তেরোটি। পীর মহম্মদ নামে এক বিশিষ্ট বিদ্বানব্যক্তি তার প্রধান শিক্ষক। এই পীর মহম্মদকে পিতা বিশেষ ক্ষেত্র থেকে জোগাড়

করেছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী ভাষা বিশেষভাবে জানতেন এবং বহু জ্ঞানগর্ভ কিতাব মুখস্ত করে আবৃত্তি করতে পারতেন। কোরাণেও বিশেষ দখল ছিল।

এই পীর মহম্মদ পরিবারের অনেকেরই শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি মুঘল শাহজাদীরা চিকের আড়াল থেকে পীরমহম্মদের কাছে পাঠ নিত। পিতা হুমায়ুনের ভগ্নী গুলবদনও এই পীরমহম্মদের কাছ থেকে কোরাণের শ্রুতিমধুর ব্যাখা শুনতেন। পরে এই পীরমহম্মদ আর শিক্ষকতা করেন নি, রাজকার্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

কিন্তু আকবর এই পীরমহম্মদকে সহ্য করতে পারতো না। মিঞাসাহেবের প্রধান দোষ, তিনি প্রতিদিন হস্তলিপি অভ্যাস করাতেন। আর আকবরের মনে হত, পৃথিবীতে এইটি সবচেয়ে দুরূহ কাজ। হস্তলিপি অভ্যাসের মত একঘেয়ে কাজ আর দুনিয়াতে নেই। অথচ পীরমহম্মদ বলতেন, শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এইটি। এই যদি শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হয়, তাহলে আকবরের শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্তির পথে। কারণ ধৈর্য ধরে আরবী ও ফার্সী হরফগুলি সুন্দর করে বসাতে গিয়ে মনে হত, এর চেয়ে অসি চালনা অনেক সহজ কাজ। অথচ আকবরের অসাধারণ স্মরণশক্তি। কোন কিছু শুনে মুখস্ত বলায় তার কোন কষ্ট ছিল না।

পীরমহম্মদ যখন বিখ্যাত ফার্সী কবি সাদির গুলিস্তাঁ ও বুলিস্তাঁ মুখস্ত বলতেন, আকবরের কণ্ঠস্থ। ঐ শিশুর মুখে পরিবারের লোকেরা সাদির কবিতা মুখস্ত শুনে চমকিত হত কিন্তু লেখাপড়ায় উৎসাহ কম দেখে নিরুৎসাহ হত।

আজও আকবরের মনে আছে, পিতা তার এই শিক্ষার অবহেলা দেখে পূর্বপুরুষদের কথা ব্যাখা করে তাকে ভৎর্সনা করতেন কিন্তু করলে কি হবে? কিতাবের হরফগুলি পঠনের চেয়ে যে অন্যকিছু করতে সবচেয়ে উৎসাহ জাগে, এ কে বুঝবে?

পায়রা পোষা, শিকার করা, ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া, অসি চালনায় আজও উৎসাহ। যত বয়স এগিয়ে চলেছে, আকবর বিদ্যাচর্চার চেয়ে এইসব ক্রীড়াতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এ অবশ্য তার জীবনের একটি প্রধান দুর্বলতা। মুঘল পরিবারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যাচর্চা। সেই বৈশিষ্ট্য সে বজায় রাখতে পারলো না।

কিতাব দেখলে কেমন যেন তাদের শত্রু মনে হয়! অথচ মুঘল পরিবারের ভিন্ন একটি গ্রন্থাগার সর্বদা তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অবসর সময়ে অধিকাংশ রমণী-পুরুষের পুস্তক অধ্যয়ন একটি অঙ্গ। পরিবারের রমণীরা পর্যন্ত সেই অভ্যাস আয়ত্ত করে চলেছে। বেগমরাও পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম নয়। যত বয়স বাড়ছে, আকবরের জ্ঞানোন্মেষ হচ্ছে, সে তার অভাব বুঝতে পারছে। মানুষ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করতে গেলে সর্ববিষয়ে পারদর্শী হওয়ার দরকার। সে যদি কোনদিন মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর যদি শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে নাম রাখতে চায়, তাহলে তাকে বিদ্যাচর্চা অভ্যাস করতে হবে। মুঘল পূর্বপুরুষরা যাঁরাই ইতিহাসে নাম অঙ্কিত করেছেন, তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন।

আজ সবই বোঝে নবীন সম্রাট আকবর শাহ্। বয়স তার নিম্নগামী হচ্ছে না, ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। বয়স যখন বাড়ছে, তখন বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ হচ্ছে। বুঝতে পারছে অভাবটা। কিন্তু উপায় কি? যা তার মনের মধ্যে উৎসাহ বর্দ্ধন করে না, স্পৃহা জাগায় না বরং রক্তের কোথায় যেন শীতলতার স্পর্শ অনুভূত হয়, সেই কাজ যত উন্নতির পরিপন্থী হোক্—কি করে তা করা সম্ভব?

তাই আবার শিক্ষক সামনে দেখে তার ভুরুদ্বয় কুঞ্চিত হয়েছিল।

কিন্তু আবদুল লতিফকে দেখে হঠাৎ তার সে ভাব অন্তর্হিত হল। সে সুমিষ্টহাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করে বললো—বন্দেগী আলি জাঁ।

মীর আবদুল লতিফও তাঁর ছাত্রকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন। মুঘল রাজ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই যুবক একদিন নিজ বাহুবলে সমগ্র দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে, অথবা শত্রুর এক আঘাতে যমুনার অতল জলের তলায় ডুবে যাবে আজকের জেগে ওঠা এক টুকরো হীরক—শিক্ষিত মানুষ শিক্ষার চোখ দিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখছিলেন। হঠাৎ আকবর গুরুকে অভিবাদন করতে গুরুও ছাত্রকে হাত তুলে কুর্নিশ করে বললেন—বন্দেগী জাঁহাপনা।

আকবর মৃদুহাস্যে এবার বললো—আপনার মত একজন পণ্ডিত-ব্যক্তির সঙ্গ পেয়ে যথেষ্ট আনন্দ বোধ করছি কিন্তু আপনি কি শোনেন নি—মুঘল পরিবারের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতে আমি অক্ষম? অর্থাৎ আমি মূর্খ হয়ে সমস্ত মুঘল পূর্বপুরুষদের অপমান করেছি। কিতাবের নীরস অক্ষরগুলি যখন চোখের সামনে ভাসে মনে হয় যেন সেগুলি মৃত ঘৃণ্যকীট, মরেও তাদের দংশন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় নি। সেই কঠিন কীটবিশিষ্ট নীরস অক্ষরগুলির মর্মোদ্ধার করে কিছু উপলব্ধি করা আমার সাধ্যাতীত। তাই তাদের দেখে ও আপনাদের দেখে আমি নিরুৎসাহ বোধকরি। আমার এই দুর্বলতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন।

মীর আবদুল লতিফ যখন কথা বলেন, তখন বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলেন। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি পারস্যদেশীয় একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্নব্যক্তি, জীবনে আমি বহুলোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু নবীন জাঁহাপনার মত এমনি আর কাকেও দেখি নি। এমন স্বীকারোক্তি কে করে? যার হৃদয় এমনি উদার তারই তো মহত্ব প্রকাশ হয়! মূর্খ কি কখনও তার পরিচয় উন্মোচন করে? বরং বিদ্বান ব্যক্তির মত অভিমানই মনের ওজন বাড়ায়।

তারপর থেমে আবদুল লতিফ বললেন—আমি জাঁহাপনাকে কোন নীরস কিতাবের ব্যাখান মুখস্ত করতে উৎপীড়িত করবো না।

আমার পঠনপদ্ধতি অন্নধরণের। মনের প্রসার বাড়ে, চোখের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, অথচ জ্ঞানোন্মেষের পথ সুগম করে—এমনি পাঠই দেব। আমাকে যদি শিক্ষক না মনে করে দোস্ত মনে কর, তাহলে খুশি হব।

আকবরের প্রথমেই এই নবনিযুক্ত শিক্ষককে পছন্দ হয়েছিল। এখন তাঁর কথা শুনে আরো উল্লসিত হল। মনে মনে এমনি একটি ব্যক্তিকেই সে প্রত্যাশা করছিল। মনের মধ্যে অনেক কথা এক একসময় আসে, অনেক ছবি এক একসময় ফুটে ওঠে কিন্তু তার প্রকাশ হয় না। এমনি একজন আপনব্যক্তি, অথচ যিনি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, ব্যক্তিত্বে মহান বয়সে বড়—কাছে থাকলে মনের কথা খুলে বলা যায়! সরম এসে কণ্ঠরোধ করে না। তার দেখা পেয়ে শিক্ষার চেয়ে সঙ্গ প্রার্থনায় খুশি হয়ে আকবর বরণ করে নিল।

ত্বজন যুক্ত হল তার জীবনের একটি সন্ধিক্ষণে। একজন ফকির নূরউল্লা ও অপরজন এই শিক্ষিত ব্যক্তি মীর আবত্বল লতিফ।

আবত্বল লতিফ এরপর ছাত্রকে সুলেহ্ কুল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। পুস্তকের কোন গুরুগম্ভীর ব্যাখান নয়, বিশ্বশান্তির মন্ত্র। মানুষের কল্যাণ। শুভবুদ্ধির আদর্শ। জীব ও জগতের নির্বাণ কল্পনায় নতুন ভাবের উন্মেষ।

মন পবিত্র হল নবীন সম্রাটের। দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন এক স্বচ্ছ নীলিমার রঙ লাগলো। রাজপুরীর কোলাহলের মাঝে, মানুষের স্বার্থ যেখানে স্পষ্ট সেখানে কোন্ সুদূর তুষারমৌলি শিখর থেকে নেমে এল এক জ্যোতির্ময় রূপ। সম্রাট আকবর কখনও প্রত্যহ নামাজ পড়তো না, হঠাৎ সে নামাজের ফঙ্গিতে বসে সেই জ্যোতির্ময় রূপের প্রার্থনা করতে লাগলো।

আবত্বল লতিফ ছাত্রের কানে কানে বললেন—এই জ্যোতির্ময় রূপ চোখের তৃপ্তিই শুধু নয়, মনের বিকাশের জন্যে এর প্রকাশ কিন্তু তুমি পৃথিবীর মানুষ, তোমাকে দুর্গন্ধময় পঙ্কের ভেতর থেকে

পঙ্কজকে তুলে আনতে হবে, তারপর এই রশ্মির প্রভাবে জড়িয়ে নিয়ে তাকে যোগ্য করে তুলতে হবে। কিন্তু ক্ষেত্র বড় দুরূহ। অনাচার, মিথ্যাকথা, ভেদাভেদ, রাহাজানি, প্রবঞ্চনা ; ব্যভিচার সমস্ত কিছু নিয়ে এই পৃথিবী। তাদের ঘৃণাও করতে পারবে না, উপেক্ষা করতে পারবে না। এদের বন্ধু করেই এদের ভেতর থেকে ঈশ্বরের সেই মহানকীর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এখনও আকবরের সেই বুদ্ধি হয় নি, সব কথা তার বোধগম্য হয় না। তবু ভাল লাগে। আবদুল লতিফকে শিক্ষক বলেই মনে হয় না। কেমন যেন উৎসাহ এনে দেন। এই যদি শিক্ষার মন্ত্র হয়, তাহলে সে শিক্ষা মুঘল রাজকুমার গ্রহণ করবে।

ভোরের আলো তখনও ফোটে নি, সবে কিশোরীর যৌবন ফোটার মুহূর্তের মত। রক্তিমাভা। আকবর প্রত্যহের মত প্রাসাদ ছেড়ে চলেছে অনেকদূর। দ্রুত তার গতি। এই অভ্যাস অনেকদিনের।

রাত্রির শেষ প্রহর থাকতে যখন আসমানে শুকতারাটি ললাটে টিপের মত জ্বলে, আকবর নিদ্রা পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় অশ্ব তার তৈরী হয়ে সহিস জলমান খাঁর সামনে প্রভুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আকবর সাধারণ সৈনিকের পোষাকে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে কোন দেহরক্ষী থাকে না, সম্পূর্ণ একা ও নির্ভীক।

একবার সে শুধু আসমানের দিকে তাকিয়ে শুকতারাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। রাত্রির শেষক্ষণ কিনা দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেই শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি প্রাসাদ প্রকম্পিত করে প্রতিধ্বনি তোলে। প্রত্যহ এমনি হয়। আকবর নিঃসন্দেহ হয়ে অশ্বের ওপর লম্ফ দিয়ে উঠে বসে। জলমান খাঁ সেলাম পেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে আকবরের অশ্বক্ষুরের শব্দ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত প্রাসাদের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে আকবরের অশ্ব দুর্দাম হয়ে ওঠে।

প্রত্যহ রাত্রির শেষযামে এমনি ধ্বনি হয়। রাজপুরীর সকলেই জানে, কে এমনি সময় বাইরে চলে যায়? তাই বিশেষ আর কেউ সচকিত হয় না। সারা রাত্রি ডিউটি দেবার পর যে সব রক্ষীরা ঘুমে ঢোলে তারা মাঝে একটু সচকিত হয়—নবীন সম্রাট ভ্রমণে বেরিয়ে গেলে আবার নিদ্রা, এই ভেবে তারা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর অন্ধকারে শূন্যের উদ্দেশ্যে সেলাম পেশ করে আবার নিদ্রার কোলে হারিয়ে যায়। ওরা বাদশাহকে দেখতে পায় না, শুধু শব্দকে অনুসরণ করে সেলাম জানায়।

কিশোর আকবর তখন তেজীয়ান অশ্বের ওপর শক্তিমান সওয়ার। লাগামের চর্মরশি দুটি হাতে চেপে ধরে পায়ের রেকাব দিয়ে অশ্বের উদরে আঘাত হানছে। শিক্ষিত অশ্ব, সে জানে এই আঘাতের উদ্দেশ্য কি? সে'ও উল্কার বেগে ক্ষুরের ধ্বনি জাগিয়ে ছুটছে।

সিংহদরজার সীমানা ছাড়িয়ে সামনেই সড়ক পথ। সেই পথ লাহোর পর্যন্ত চলে গেছে। পথের দু'ধারে সারি সারি বৃহৎ বৃক্ষের ঘন আড়াল। দেবদারু, সাইপ্রাস, বটবৃক্ষ নানান বৃক্ষের সমান সজ্জা। পথের এই সজ্জা শূরবংশীয় নৃপতি শেরশাহের কীর্তি।

তখনও অন্ধকার ঘন। চাপ চাপ অন্ধকারের কুহেলী চতুর্দিকে দৃশ্যমান। এখনও প্রত্যুষের আলো বরণডালা নিয়ে উদয় হয় নি। তবে উদয়ের পূর্বাভাস। প্রত্যহ কিশোর আকবর চলতে চলতে এই আলো ফোটার ক্ষণটি দেখতে থাকে। যেন জননী-জঠর থেকে শিশু ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে নেমে আসে। গতি অশ্বের দুর্বার। পথে কোথাও সে থামে না। দুর্বার গতিতে চলতে চলতেই সে দেখতে থাকে পূর্বাকাশে উষার উদয।

ধীরে ধীরে অন্ধকার পশ্চিমে লগনে সরে যায়। দূরে বহুদূরে নীলিমার নভপ্রদেশ থেকে ফুটে ওঠে মেঘের বুকচিরে একটুকরো আলোর প্রকাশ। তারপর সেই আলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে

চতুর্দিক। স্নিগ্ধ যে আলোর বিন্দুগুলি যেন সমুদ্রের জলে স্নান করে উষার প্রতিলিপি নিয়ে উদয় হয়। এই ঐশ্বরিক প্রকাশ দেখতেই বুঝি আকবর আসে। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবর্ণনীয় রূপ-মাধুর্য উপভোগ করার শিক্ষা আকবর পেয়েছিল পিতা হুমায়ুনের কাছ থেকে। তিনি একদিন এই মুহূর্তে নিদ্রাভঙ্গ করে বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রত্যহ এই সময় বাইরে যেতেন। আকবর রহস্যের সন্ধান পেয়ে আর নিদ্রার কোলে থাকেনি, প্রত্যহ কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত না করলেও তার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে আপন একটি উঁচু অশ্বে সওয়ার হয়ে চলে আসে এই মুক্তপ্রদেশে। সেখানে নেই কোন দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, বিপ্লব। আছে মুক্তির এক অনাবিল আস্বাদ।

আকবর এই মুহূর্তটিতে যেন নতুন এক জীবনের আস্বাদ পায়। যেন হীরা, চুনি, পান্নার মত দ্যুতি নয়, তার চেয়েও উজ্জ্বল, তার চেয়েও অবর্ণনীয়।

সেদিনও আকবর শিক্ষাগুরু মীর আব্দুল লতিফের বাণী মনে ধারণ করে চোখের ওপর উষার প্রথম লগ্ন প্রত্যক্ষ করছিল। আর ভাবছিল, কী সুন্দর এই দুনিয়া! মানুষ কেন এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু শয়তানের রূপ পরিগ্রহ করে? দুনিয়া সবার। এখানে নেই কোন শ্রেষ্ঠত্বের হুমকি। শ্রেষ্ঠ সকলে। অধিকার সকলের। তবে কেন অধিকারের জন্যে এই হানাহানি?

হঠাৎ আজানের বিলম্বিত স্বর কানে গিয়ে প্রবেশ করলো। আকবরের চিন্তাধারা ছিন্ন হল। সে দেখলো, সে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার কিনারে। যমুনার নীলজলের ওপর পড়েছে উষার প্রথম রক্তিম চুম্বন। আসমানে ছুরির ফলার মত ধারালো বিদ্যুৎ। সোনালী ছবির কাজ করা বসন কে যেন পরে দাঁড়িয়ে আছে নীল জলের কিনারে।

এই যমুনার ধারে অনেক মসজিদ। বিরাট বিরাট গম্বুজ-

ওয়ালা মসজিদে পাঠান সম্রাটের কীর্তিই ঘোষণা করছে। ফিরুজ শাহ তুঘলকের সেই পুরোণো কীর্তি। তুঘলকাবাদের ঐতিহ্য এখনও ম্লান নয়। লোকে এখনও দিল্লীকে তুঘলকাবাদ বলে।

আকবর যেখানে অশ্বপৃষ্ঠে বসে অপেক্ষা করছিল, ঠিক তারই সামনে একটি মসজিদ। মসজিদটির নির্মাণ কৌশল বড় অদ্ভুত। হিন্দুর ভাস্কর্যের নক্সা মসজিদগাত্রের সর্বত্র, এমন কি উপরের গম্বুজের নির্মাণও অনেকটা হিন্দুর মন্দিরের ধরণের।

মসজিদটি যে মন্দিরকে ভেঙে নির্মিত হয়েছে, এইতে প্রমাণিত হয়।

কিশোর আকবর তখনও পরিণত মনের অধিকারী হয় নি বলে ধর্ম পরিবর্তনের এই নজিরে মনে কষ্ট পেল। কেন এই ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত? হিন্দুর ধর্ম কি মুসলমানের ধর্ম নয়? মুসলমানের ধর্ম কি হিন্দুর ধর্ম নয়? তবে কেন এই পরিবর্তন? কেন এই ঈশ্বরকে নিয়ে মতবিরোধ?

উষার উদয়কালে নামাজের সেই গম্ভীর প্রাণদায়িণী স্বরে আকবরের মনে কত কথাই জাগলো। প্রত্যহ এমনি সে মসজিদের ভেতর থেকে শোনে ঈশ্বরের অমৃতময় বাণী। মন পবিত্র হয়ে যায়। আজও তার তেমনি মনটি শুচিশুভ্র এক মহান অনুভূতিতে ভরে গেল।

ফকির নূরউল্লার সঙ্গীত মনে পড়লো। কয়েকদিন ধরে নূরউল্লা আর গীত পরিবেশন করে না। দারুণ জ্বরে তার কণ্ঠের সুমিষ্ট ক্রন্দন গীত শুষ্ক হয়ে গেছে। এখন ভগ্ন মসজিদের প্রাঙ্গণে শুয়ে সে জ্বরের ঘোরে আল্লাকে ডাকছে। রাজবৈদ্য গিয়েছিল দাওয়াই দিতে কিন্তু সে দাওয়াই গ্রহণ করে নি! বলেছে, আমি সামান্য ব্যক্তি, রাজসিক দাওয়াই আমার দেহের উত্তাপ শান্ত করবে না। যিনি উত্তাপ দিয়েছেন, তিনিই গ্রহণ করবেন।

শুনে আকবর নিজে গিয়ে নূরউল্লার সামনে দাঁড়িয়েছে—ফকির-সাহেব, তুমি দাওয়াই গ্রহণ করবে না কেন?

উত্তাপে মুখখানি কালিমাবর্ণ হয়ে গেছে। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। একটি স্তম্ভের পিঠে হেলান দিয়ে আড়ভাবে শুয়েছিল। বাদশাহকে দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করলো কিন্তু শরীর দিল না সে কাজ করতে।

সেই দেখে আকবর তাড়াতাড়ি বললো—আরাম কর ফকির-সাহেব, উঠ না। আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তুমি দাওয়াই নিলে না কেন? তোমার গান আর কতদিন শুনতে পাব না। তোমার গান না শুনতে পেলে আমার যে দিল বিগড়ে যায়।

থোড়া দিন জনাব। ঔর থোড়া দিন গেলেই বিলকুল সব আচ্ছা হো য্যায়গা।

তবে দাওয়াই নাও।

ওবাত কভি নেহি। খোদা যো দিয়া হ্যায়, খোদাই লে লেগা।

কিছুতে নূরউল্লাকে আকবর দাওয়াই নিতে রাজী করাতে পারলো না।

সেই নূরউল্লাকে আবার মনে পড়লো। নূরউল্লাকে মনে পড়লেই তার সঙ্গীত মনে আসে। সেই কণ্ঠ যেন সেই কটি গানের জন্যেই সৃষ্টি। এমন সৃষ্টি বুঝি আর কখনও হয় নি।

একদিন মা হামিদাবানু তার কথা বললেন। বেটা, এই সঙ্গীত শিল্পীর বুঝি তুলনা হয় না। ওকে দীন-দরিদ্রের জীবন ত্যাগ করে রাজকার্যে বহাল করে দাও। কিম্বা গায়ক দলে নোকরী দিয়ে গীত-মহলে নিযুক্ত কর।

কেন জানি মাতার কথা শুনেই আকবর শিউরে উঠেছিল। ফকির নূরউল্লা খাঁ গীতমহলে নোকরী নিয়ে গান গাইবে? এ যে কত বড় অসম্ভব, সে একমাত্র সেই জানে! মনে হয়, পরম আশ্চর্য কথা বুঝি এর চেয়ে আর কিছু নেই। মাতা যদি পুত্রকে ঘাতকের কাছে প্রেরণ করে হত্যার আদেশ দিতেন, তাহলেও বোধ হয় আকবর এত বিস্মিত হত না।

তাই মাতার কথার উত্তরে অসহিষ্ণুকণ্ঠে বলেছিল—তাহলে ফকিরের মৃত্যু হবে। আর ঐ গান ওর কণ্ঠে কখনও আসবে না। ঐ গান দৈন্যের গান, নিঃস্বের গান—ওখানে রাজসিকতার স্পর্শ লাগলে খোদাই সেই শক্তি কেড়ে নেবে।

কিশোর আকবর বুঝি এমন করে আর কাউকে বোঝে নি, যতটা বুঝেছিল ফকির নূরউল্লাকে।

উষার আলো পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পক্ষীরা কলস্বরে ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। আকবর প্রাসাদে ফেরার জন্যে অশ্বের মুখ ঘোরালো। আবার ছুটলো অশ্ব ঝড়ের বেগে।

ঝড় উঠলো পথের বুকে। দু-পাশে সুরম্য বৃক্ষের সারি। পত্রগুচ্ছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে পথের ওপর খেলা করছে। আকবরের কণ্ঠে আসছে গান। সে নূরউল্লারই একটি গানের কলি গুন গুন সুরে গাইতে লাগলো। সবই ঈশ্বরকে নিবেদনের গান, সবই খোদার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি। কিন্তু তবু যেন প্রিয়তমের গান। খোদাই সেই প্রিয়তম না হয়ে যদি অন্য কেউ মানবী হয়, তাহলেও এই গান তাকে নিবেদন করা যায়।

যে ছিল একদিন অতীতে। দিয়েছিল সে অনেক সোহাগ, দিয়েছিল অনেক স্মৃতি। তার রূপ যৌবন, দেহের উত্তাপ দিয়ে বেহেস্তের সুখ প্রদান করেছিল, প্রতিটি বিনিদ্র রজনী সেদিন স্পর্শ-সুখের সহানুভূতিতে সে ভরিয়ে দিয়েছিল। সহস্র কোমল ওষ্ঠের চুম্বন ওষ্ঠে দিয়ে রচনা করেছিল নতুন এক স্বর্গ।

আজ সে নেই। কোন একদিন রজনীর নিশিভোরে নিদ্রিত দয়িতের পাশ থেকে উঠে চলে গেছে। প্রেম গোলাপ হয়েছে কিন্তু দেহের শোনিত মেখেছে সেই গোলাপ। গোলাপের সুরভি এখনও আছে। এখনও তার গন্ধসুবাস বিলিয়ে প্রাণমন আকৃষ্ট করে। এখনও রাত্রি স্বপ্নলোকের বসন পরিধান করে সুর্মাকাজল

পরে হাতছানি দিয়ে ডাকে কিন্তু সে যে নেই, সেই প্রিয়তমা যে চলে গেছে রাত্রি জানে না।

নূরউল্লা গানের ভেতর দিয়ে সেই বিরহসঙ্গীত প্রকাশ করে। সে বার বার ক্ষমা চায় সেই পলায়িতা প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে। বলে, আমি যদি অজ্ঞানে তোমায় কোন আঘাত দিয়ে থাকি, একবার মার্জনা কর। আর একবার আমাকে তোমার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ দাও। যে মহান, সে যে নিজের গুণে অপরের দোষ ম্লান করে দেয়! অপরাধী যদি ক্ষমা চায়, তাহলেও কি তাকে ক্ষমা করা যায় না?

আসমানে কত আলো, সেই আলোতে প্রকৃতি অভিসারিকা হয়। রাত্রের তমিস্রার মাঝে প্রিয়তমা কাছে না থাকলে নিদ্রাও দুচোখে নামে না। আজ কতদিন আমি নিদ্রাহীন জীবন যাপন করছি। আমার বসন মলিন হয়েছে, ছিন্ন হয়েছে। দেহ কৃশ আকার ধারণ করেছে। আহারে রুচি নেই। একদিন তো তুমি আমাকে ভাল বাসতে! আমার এতটুকু কষ্টে তোমার বুকে ব্যথা বাজতো। আজ আমি এত যন্ত্রণা ভোগ করছি, তবু তুমি নীরব কেন?

আকবর এই গীতের অর্থ বুঝে অনেকবার নূরউল্লা খাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি এখন রাজশক্তির সাহায্য পেয়েছ, তোমার সেই প্রিয়তমা কোথায় পালিয়ে গেছে বল না! একদল সৈন্য পাঠিয়ে তোমার কাছে তাকে আনিয়ে দিই।

নূরউল্লা খাঁ তার উত্তরে হেসেছিল। তারপর বলেছিল—বহুৎ মেহেরবানি শাহনসা! কিন্তু কোথায় পাঠাবেন বাদশাহী সৈন্যদের? সে কোথায় আছে তাই কি আমি জানি? পরে মাথা নীচু করে সলজ্জভঙ্গিতে বলেছিল—আর সে আমাকে গ্রহণ করবেই বা কেন? সে যে এখন দৌলতের রাণী। দৌলতের সিংহাসনে বসে মসলিনের বসন পরে নতুন মাশুখের জন্যে দিন গণনা করছে।

আকবর নূরউল্লার হেঁয়ালীপূর্ণ কথার অর্থ বুঝতে পারে নি। হঠাৎ বাদশাহী ভঙ্গিতে গর্জে উঠে বলেছিল—আলবৎ গ্রহণ করবে। আমি তোমায় তার মত উপযুক্ত করে দেব। আমাদের দৌলতখানা থেকে তোমার জন্যে যাবতীয় দৌলত আনিয়ে দেব। আমার অনেক ভাল পোষাক আছে, দেব তা থেকে অনেকগুলি। বল সে কোন্ রাজ্যে আছে, কার হারেমে আছে ?

নূরউল্লা সেলাম জানিয়ে হেসে বলেছিল—বাদশাহ আপনি শান্ত হোন্। আমি আর তাকে চাই না। জোর করে কি কারও মহব্বত পাওয়া যায় ? মন যখন ভেঙেছে, সে আর জোড়া লাগবে না। তারপর হেসে বলেছে—এসব ঝুট্ বাদশাহ। আমার কোথাও কেউ নেই। প্রকৃতির বিরহে আমি আত্মহারা। খোদার প্রেমে আমি অভিভূত। খোদার কাছেই আমার প্রার্থনা, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।

নূরউল্লা একটি চরিত্র। এ চরিত্রের মধ্যে যে কি আছে, সমুদ্রের মাঝে ডুব দিয়েও বুঝি তল পাওয়া যায় না। কিশোর আকবর তখন জটিল জীবনের কিছু বোঝে না, তাই নূরউল্লার চরিত্র বুঝতে পারলো না। শুধু সে বুঝলো, একটি সজীব আদর্শ। এ আদর্শকে অনুসরণ করলে ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হবে।

তাই বার বার অন্তরের মাঝে শূন্যতার সৃষ্টি হলে সে নূরউল্লাকেই ভাবে। নূরউল্লার সঙ্গীত তার হৃদয় মনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

হঠাৎ তার কানে গেল একটি অশ্বক্ষুরের ধ্বনি।

আকবর সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি লাগাম ধরে অশ্বের গতি মন্থর করলো।

একটি পথের বাঁকে অন্য একটি পথের মিলন হয়েছে। সেই মিলনস্থানের চতুর্দিকে ঝাউবৃক্ষের বিস্তার। আরো আছে অনেক হরেক রকমের বৃক্ষরাজি।

সেই পথ দিয়ে একটি অশ্ব ছুটে আসছিল। আকবর দাঁড়িয়ে-
সেই [illegible]র সঙ্গমস্থানে। দূর থে[illegible] সেই [illegible]রাহী
দেখে অশ্বের গতি মন্থর করে কোষবদ্ধ থেকে তরবারী বের করলো। সূর্যের আলোয় সেই তরবারী ঝলকে উঠলো।

আকবর মৃদুহেসে কোমরবদ্ধ থেকে তরবারী বের করে দাঁড়ালো।

সামনে এসে উপস্থিত হল একটি অশ্বারোহী। কিন্তু ওকি? অশ্বারোহী তো একা নয়, তার পিছনে একটি আওরত! ওড়নার দোপাট্টা বাতাসে উড়ছে। মুখখানি দেখা যাচ্ছে না, তবে বোধ হচ্ছে সে ভয়ে অশ্বারোহীর পিঠে মুখ লুকিয়েছে।

তবে কি অশ্বারোহী একে নিয়ে পালাচ্ছে?

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আকবর গর্জে উঠলো, দুঃসাহসী সৈনিক, বশ্যতা স্বীকার কর, নতুবা এইমুহূর্তে তোমার শোনিতে পথের বুক রঞ্জিত হবে।

যুবক হঠাৎ হাঃ হাঃ করে অটহাস্য করে বললো—আমি রাজপুত, কাপুরুষ নই। তুমি আমার পথ ছাড়ো, নইলে আমিই তোমার শোনিতে এই হস্ত রঞ্জিত করবো।

হঠাৎ দুইবীরের অসিতে ঝঙ্কার উঠলো। দুজনেই অশ্বের ওপর বসে পরস্পরের অসি দিয়ে আঘাত হানলো। সূর্যের রশ্মির চন্দ্রাতপে ঝাউবীথিকার পথে যেন নতুন এক যুদ্ধের সূচনা হল।

রাজপুত যুবক জানে না সে কার সঙ্গে অসিযুদ্ধ করছে? দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের বীভৎসতা তখনও অস্তমিত হয় নি। মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত যে ঐ দিল্লীর দুর্গের গম্বুজের মাথায় নিশান উড়িয়েছে, এ কে না জানে? পাঠানের প্রতাপ আজ শেষ হয়ে এসেছে, নতুন শক্তির উদ্ভব যেটুকু হচ্ছে, তাতে সমগ্র এশিয়া জয়ের পরিকল্পনা নিয়ে কেউ আর ভারতে শক্তিবৃদ্ধি করছে না। মুঘল

শক্তি অনেকদিন ধরে মার খেয়ে খেয়ে নতুন এক সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে।

বাদশাহ হুমায়ুন যাবার পর হিন্দুস্তানের অন্যান্যরা ভেবেছিল, বুঝি মুঘল রাজ্যের অবসান হল। সেইজন্যে হিমুর উৎপত্তি। কিন্তু হিমু সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়ে প্রমাণ করলো, মুঘল রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে মসীলিপ্ত নয়, বরং সমুজ্জ্বল। তাদের উন্নতি কেউ রোধ করতে পারবে না। বৈরাম খান উপযুক্ত অভিভাবক, তাছাড়া যুবরাজ আকবর কোন অংশে মুঘল সিংহাসনের অনুপযুক্ত নয়।

সেই আকবর দেহরক্ষীহীন অবস্থায় এক সামান্য রাজপুতসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে! যদি হঠাৎ অতর্কিতে কোন আঘাত সম্রাটের প্রাণহানির কারণ হয়? কিম্বা যদি জানতে পারে রাজপুত সৈনিক, যে যার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, সে আর অন্য কেউ নয়—স্বয়ং কিশোর সম্রাট আকবর। তাহলে কি সে একবারও চেষ্টা করবে না সম্রাটের প্রাণ সংহার করতে? অন্তত জাতির কাছে, দেশের কাছে এই বাহবা নেওয়ার চেষ্টা থেকে কি বিচ্যুত থাকবে?

কিন্তু হঠাৎ দুজনেই অসিযুদ্ধ থামিয়ে দিল। কেমন যেন কলের পুতুল হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি।

কিন্তু যোদ্ধা দুজনেই হঠাৎ থমকে গিয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো, তারা কেন থেমেছে?

রাজপুত যুবকটির পিছনে যে আওরতটি সভয়ে আত্মরক্ষার জন্যে অশ্বের ওপর বসেছিল, তার চিল চীৎকারে, তারা থেমেছে।

মেয়েটি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল বলে সে সভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল।

এবার পরিশ্রান্ত আকবর উন্মুক্ত তরবারী হাতে সেই মেয়েটির দিকে তাকালো।

বারো-তেরো বছরের ; কিশোরী। এখনও বয়সের পুরু-ছাপটি তার দেহকে ঘিরে ক্রীড়া করে নি। অর্থাৎ যৌবন এখনও দ্বারদেশে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। তবে কিশোরী পেয়েছে বেহেস্তের রূপ। এমন রূপসী মুঘল হারেমে বুঝি একটিও নেই। এই রূপ যখন যৌবনের পূর্ণ ছোঁয়াচ পাবে বুঝি চাঁদ আকাশে আর তার গর্ব প্রকাশ করবে না।

কিশোর আকবর সেই কিশোরীকে দেখে বিমুগ্ধ হল।

এবার সেই কিশোরীটি ভয়চকিত কণ্ঠে অথচ সাহস করে বললো—আমার ভাইজানকে তুমি বধ করছো কেন? ভাইজান বধ হলে আমাকে যে কেউ দেখবার থাকবে না, একি বুঝতে পারছো না?

শত্রুকে এই ধরণের কথা বলা শোভা পায় না বলেই হঠাৎ কিশোরীটি লজ্জিত হয়ে স্তব্ধ হল।

আর আকবরের মনে কৌতুকের সঞ্চার হল।

সে তাড়াতাড়ি তরবারী কোষবদ্ধ করে মুখে হাসি এনে বললো—এ যে তোমার ভাইজান, আমি তো তা জানতুম না। কিন্তু তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কি উদ্দেশ্যেই বা ভ্রাতাভগ্নী এই প্রত্যুষে বিদেশী রাজ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছ?

তখন সেই রাজপুত যুবক বললো—আমরা ভাগ্যান্বেষী, চলেছি কোন কর্মের সন্ধানে। যেখানে কর্ম পাব সেখানেই আমাদের হবে অবস্থান, সে স্বদেশ বা বিদেশ হোক্। পররাজ্য হোক বা বিধর্মীর শাসিত হোক। নিজের দেশ যখন আমাদের জীবন ধারণের ক্ষমতা দিল না তখন আমাদের কোন স্বদেশ প্রীতি নেই। আমরা তাদেরই বন্ধু ভাববো, যারা আমাদের দুই ভাই-বোনের প্রতি কৃপা করবে। আমি রণনীতি জানি। যুদ্ধ আমাদের স্বধর্ম। তার প্রমাণ নিশ্চয় কিছুক্ষণের মধ্যে পেলেন। এবার আপনি বলুন আপনি কি আমাদের কোন সাহায্য করতে পারেন?

আকবর মনে মনে শিক্ষাগুরু মীর আবদুল লতিফকে স্মরণ

করছিল। তাঁর আদর্শের সেই বিশেষ সংজ্ঞাগুলি মনে আনছিল। পিতাকে স্মরণ করলো আকবর। মা হামিদাকে মনে করলো। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া যে মানবের কল্যাণ। জাতির বৈশিষ্ট্য। জাতিকে তুনিয়ার চোখে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ঘৃণা ত্যাগ করতে হবে। আশ্রয়প্রার্থীর কোন ধর্ম নেই, সে সবার ধর্মের এক চিহ্নিত যোগসূত্র। সে বিধর্মী হলেও ধর্মচ্যুত নয়। অন্তত ইসলামের ঘরে তার নতুন প্রতিষ্ঠা হবে।

আকবর অশ্ব থেকে নেমে বিপরীত অশ্বের কাছে গেল। তারপর সস্নেহে বললো—তুমি শুনলে হয়তো অবাক হবে যুবক, আমি মুঘল সম্রাট আকবর শাহ। তোমাদের এদেশের পরম শত্রু। তাছাড়া তুমি হিন্দু ও আমি মুসলমান। তবু তুমি আশ্রয়-প্রার্থী, মুসলমানের ধর্মে কি আছে জানি না, তবে আমার ধর্মে তোমাকে আশ্রয় দেওয়া একান্ত কর্তব্য। আমি তোমায় আশ্রয় দিলাম।

তার আগে বলো—তুমি কেন নিজের ভূমি ত্যাগ করলে? তোমাদের কি মাতাপিতা নেই, আত্মীয়স্বজন নেই?

যুবক ম্লানকণ্ঠে বললো—সে ইতিহাস বড় মর্মন্তদ। এই পথের ওপর দাঁড়িয়ে তা বলা যায় না। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমরা তুই ভাইবোন বড় ভাগ্যহীন। মাতার সুকোমল ক্রোড় চিরতরে হারিয়েছি। তিনি এ জগতে নেই। পিতা নতুন বিবাহ করে আমাদের মৃত্যু কামনা করেছেন। বিমাতার অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আর গৃহে থাকতে পারি নি। স্বদেশেই থাকবার জন্যে রাণা উদয় সিংহের সেনাদলে ভর্তি হতে গিয়েছি কিন্তু পিতার কারসাজিতে তা আর সম্ভব হয় নি। অন্যকর্মও চেষ্টা করেছি কিন্তু মেলে নি। শেষে একদিন চরম অবস্থা সৃষ্টি হল। ভগ্নী শিবালীকে বিমাতা বাড়ীর বাইরে তাড়িয়ে দিলেন। তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। পিতাকে এর বিহিত করতে

বললাম। তিনি নিরুত্তর রইলেন দেখে অগত্যা গভীররাত্রে ভগ্নীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েছি।

আকবর আবার কিশোরী শিবালীর দিকে তাকালো। সবে বৃক্ষশাখায় সবুজ পত্রলয়ের আবির্ভাব হয়েছে। ভাই যখন পিতামাতার বিরুদ্ধ আচরণের প্রতিবাদ করছিল, শিবালীর দুটি ডাগর চোখের প্রান্তভাগে জল টলমল করছিল। মুখখানি আনত করে সে পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে রেখা টানছিল।

আকবর আরো খুঁটিয়ে শিবালীকে দেখতে লাগলো। না, তখন তার মধ্যে কোন মোহের সঞ্চার হচ্ছিল না। শুধু দেখছিল রূপের প্রকাশ। এইমাত্র দেখে সে ফিরেছে প্রকৃতির সৌন্দর্য। এখন দেখছে মানুষের রূপ। আর ভাবছিল, এইজন্যে বাদশাহরা এত আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে হারেম শোভা করে। তার মধ্যেও পুরুষের প্রবৃত্তিগুলি জাগতে শুরু করেছে। সেও মাঝে মাঝে শরীরে যেন কিসের উন্মাদনা অনুভব করে। ইন্দ্রিয়ের কোথায় যেন আলোড়ন। এক একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ শরীরটি ছটফট করে ওঠে।

তবু সে এখন অপরিণত। সলিমাকে দেখে তার মধ্যে রমণী স্পর্শের মাদকতা সৃষ্টি হোক্। তবু সে জানে, সে এখন ঐদিকে মন সমর্পণ করতে পারে না।

কিন্তু শিবালীকে দেখে হঠাৎ তার ভগ্নীপ্রীতির মত এক প্রীতি অনুভব করলো।

একবার অবশ্য রাজপুরীর মধ্যের কথা ভাবলো। সেখানে বিধর্মীর পদসঞ্চার বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে রাজপুতরা মুঘলদের প্রধানশত্রু। সংগ্রাম সিংহের সাথে মুঘল বাদশাহ বাবর শাহের খানুয়ার যুদ্ধ এখনও বিভীষিকা সৃষ্টি করে। হিন্দুরা ভাবে, মুসলমানরা এদেশে এসে তাদের দেশ অধিকার করেছে।

স্বদেশকে বাঁচানোর জন্যে স্বদেশবাসী মরীয়া। হিমুর সাথে পাণিপথের যুদ্ধতেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। একই পতাকা তলে, তুর্ক, আফঘান, রাজপুতরা মুঘলদের বিতাড়নের সঙ্কল্প নিয়েছিল। তুর্ক, আফঘানরা স্বদেশবাসী ও মুঘলরা বিদেশী।

এই জাতিবিরোধ নিয়েই যত আক্রোশ। এখন যদি সে এই রাজপুত ভ্রাতা-ভগ্নীকে প্রাসাদে নিয়ে যায়, আলোড়ন জাগা স্বাভাবিকই বেশী! হয়তো আমীর, ওমরাহরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করবে। অভিভাবক বৈরাম খান তার ব্যবহারে বিরক্ত হবেন, মাতা হামিদা বানু কৈফিয়ত তলব করে হয়তো তিরস্কার করবেন। হারেমের অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যেই আক্রোশে ফুলবেন। তবু নিয়ে যেতে হবে। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া সকল ধর্মেই ন্যায়। মুঘল বংশের রীতিই আছে, দস্যু হলেও আশ্রয়প্রার্থীকে কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মনে পড়লো, মাতার কাছে শোনা পিতা হুমায়ুনের কথা। সংগ্রাম সিংহের প্রিয়তমা পত্নী রাণী কর্ণাবতীর সাথে তিনি রাখীবন্ধন ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। তাহলে হিন্দুর সাথে মুসলমানের এই প্রীতি নতুন নয়! কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর তার মাথায় কিছুতে আসে না, মানুষ তো সবাই এক! তবে তার মধ্যে এই ভেদাভেদ কেন? কেন ধর্মের এই বৈষম্য? খোদা সকলকেই একইভাবে মানুষ নামে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেখানে কাউকে কি অভিনব কোন ক্ষমতা প্রদান করেছেন? যার জন্যে একজন হবে শ্রেষ্ঠ, অপরজন তার গোলাম হবে! তবে কেন এই বিভেদ? কেন এই ধর্মের শ্রেণী নির্বাচন? যদি কখনও সম্ভব হয়, তাহলে সে এই বিভেদের প্রতিবাদ করবে। আজ যদি প্রয়োজন হয়, এই দুটি ভ্রাতাভগ্নীকে নিয়ে গিয়ে সে সংস্কারচ্ছন্ন পরিবারের মুখোস খুলে ফেলবে। ভাল কাজ করতে গেলে আন্দোলন জাগে, জাগুক।

আকবর যুবকের হাত ধরলো, ধরে বললো আজ থেকে

তোমরা আমার বন্ধু হলে। তোমাদের নিয়েই আমার ভবিষ্যতের পথে সংগ্রাম শুরু হল।

ওরা তারপর অশ্বের ওপর উঠে চলতে লাগলো। শিবাজী বসলো সেই ভাইয়ের পিছনে, ভ্রাতার কোমর বেষ্টন করে।

৮

তুর্ক, আফঘান, মুঘলরা যারাই রাজ্য পরিচালনা করেছে, তারা তাদের অন্তঃপুরিকাদের জন্যে ভিন্ন একটি নতুন ব্যবস্থা করেছে। অন্তঃপুরিকারা বাইরের লোকের দৃষ্টিতে কখনও দৃশ্যমান হবে না। এমন একটি অন্তঃপুর রাজ্যের রহস্য নিয়ে প্রাসাদের বিশেষ একটি অংশে রক্ষিত হবে, যার গোপনতা সম্রাট নিজের ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবে। সেখানে সূর্যালোক পর্যন্ত প্রবেশ না করে, তার মত ব্যবস্থা। সূর্যেরও নির্লজ্জ প্রকাশ আছে, সে তার জ্যোতির বলয়ে যদি খুবসুরত আওরতের নগ্নদেহ দেখে লোলুপ হয়? এই দিল্লীর বুকে কত রাজা রাজত্ব করে গেছে। আছে তাদের ভগ্নাবশেষ প্রাসাদের শেষচিহ্ন। সংযুক্তা, পৃথ্বীরাজের রাজপুরীর ওপর কুতুবউদ্দীন, আলতামাসের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, সেই রাজপুরীতে ছিল আলাদা একটি অন্দরমহল, বাইরের সঙ্গে তার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। আজ আকাশচুম্বী কুতুবমিনার আছে, আর আছে তাদের রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ।

আরো পিছনে চলে গেলে হস্তিনাপুরের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়। মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের রাজধানী এখানেই ছিল। কুরুক্ষেত্র এই দিল্লীরই কোন একস্থানে। আজ হস্তিনাপুর রাজধানীর কোন চিহ্ন নেই, তবে স্মৃতি আছে।

তারপর দিল্লীর বুকেই এক এক করে বিভিন্ন রাজগণ রাজত্ব

করে গেছে। দাসরাজরা, খলজীবংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দবংশ, লোদীবংশ তারপর মুঘলবংশ। মুঘলদের পরাজিত করে শূরবংশ শূরদের পরে আবার মুঘলবংশ।

যমুনা যেমন বার বাব পথ পরিবর্তন করে অন্যমুখী হয়েছে, তেমনি এদের রাজপ্রাসাদও বিভিন্ন অংশে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানের যে প্রাসাদ তার অনেক রূপান্তর ঘটেছে। ইব্রাহিম লোদী যখন রাজত্ব করতেন, তখন প্রাসাদের অন্যরূপ ছিল। ইব্রাহিম লোদী রাজকার্যের চেয়ে বিলাসজীবনই বেশী পছন্দ করতেন। তাই তিনি দরবারের সজ্জার চেয়ে অন্দরমহলের শোভার দিকে মন দিয়েছিলেন। নতুন নতুন যেমনি আঁওরত নিয়ে এসে রঙমহল পূর্ণ করতেন, তেমনি নির্মাণ করাতেন, নতুন নতুন বেহুঁসের মহল, যেখানে প্রবেশ করলে বেহেস্ত মনে হবে। ইব্রাহিম লোদী যখন পরাজিত হলেন, তখন অন্তঃপুরের অধিকার পেয়ে মুঘল বাদশাহ বাবর শাহ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও বহু পত্নী, উপপত্নী গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর মত নয়। শুধু ইব্রাহিম লোদীর বেগমই যথেষ্ট ছিল না, ছিল বাঁদী, নর্তকী ও উপভোগের জন্যে হাজারো হাজারো কুসুমসদৃপ খুবসুরত মরশুখী আওরত। এত সুন্দর রমণী একসঙ্গে ভারতবিজয়ী মুঘল সম্রাট বাবর কখনও দেখেন নি!

সেই ইব্রাহিম লোদীর জেনানামহল দেখেই বাবরশাহের এমনি মহল করবার পরিকল্পনা এসেছিল। তিনি ভারতে যতদিন বেঁচেছিলেন, পরাজিত ইব্রাহিম লোদীর কিছু বাছা বাছা সুন্দরী নিয়ে আলাদা একটি রঙমহল করেছিলেন। সেখানে পরে এসেছিলেন আরো অন্যদেশের যুবতী রমণী। যারা শুধু উপভোগের জন্যে এসেছিল। সম্রাট তৈমুর সমরখন্দে কেমনভাবে অন্তঃপুর রক্ষা করতেন, তার কোন ইতিহাস নেই। তবে বাবর শাহ দেখেছিলেন, তাঁর পিতা ওমর শেখ মির্জাকে বহু শাদী করতে। তাঁর পত্নী

ও উপপত্নীদের একটা হিসাব বাবর শাহ তাঁর অ বনীতে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৈশোর জীবনে এই উপপত্নী, রক্ষিতা রাখার প্রতি বাবরের যে ঘৃণা ছিল, পরে আর তা থাকে নি। বিশেষ করে পরিণত বয়সে যখন তিনি ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন, তখন যেমন মদ্যপানের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হয়েছিলেন রমণীসংসর্গের জন্যে লালায়িত।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়তো এইজন্যেই বাবর শাহ জয়লাভ করতে পারতেন না। ঘটনাটি ঐতিহাসিকরা বিশেষ আমোল দেন নি কিন্তু কত তুচ্ছ কারণে যে সেদিন এক একটি যুদ্ধ পরাজয় লাভ করতো, সে ইতিহাস কে রাখে? পানিপথের যুদ্ধের আগের দিন বাবর শাহের শিবিরে গোপনে একটি হুরীর মত ছদ্মবেশী সুন্দরী প্রবেশ করে তাঁকে একেবারে বেহুঁশ করে দিয়েছিল।

বাবর শাহ তখন যুদ্ধের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন! আকণ্ঠ রমণী সুধা পান করে সুরার মাঝে বেহুঁশ হয়ে সারারাত্রি কাটিয়ে দিয়েছিলেন, এমন কি সেনাপতি শিবিরে ঢুকতে চাইলেও হুকুম পায় নি।

তারপর চৈতন্যোদয় হয় প্রভাতের আলো আসমানে ফুটলে। চোখের আমেজ কাটলে রণবিশারদ বীরপুরুষ বাবর শাহ বুঝতে পারেন। তিনি কি মোহে বশ হয়ে নিজের কর্তব্য ভুলেছেন? সেদিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে মদ না, মেয়েছেলে না।......অনেকদিন তিনি মদ সত্যিই স্পর্শ করেন নি কিন্তু রমণী ভোগের তৃষ্ণা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণের দ্বারা নিবৃত্তি হয়নি। বাবর শাহ মারা গেলে তাই হুমায়ুন পিতার রমণীদের নিয়ে বড় অসুবিধায় পড়েছিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র হুমায়ুন পিতার স্পর্শ করা রমণীদের তো নিজের অঙ্কে স্থাপন করতে পারেন না! ছিল অনেক কাশ্মিরী আপেলের মত, কাবুলের মেওয়ার মত খুবসুরত জোয়ানী আওরত। হয়তো তাদের তখনও স্পর্শ করা হয় নি,

তারা অন্তঃপুরের সৌন্দর্য বর্দ্ধিত করবার জন্যে সবে কোথা থেকে লুণ্ঠিত হয়ে এসে মুঘল অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছে।

ইচ্ছে করলে হুমায়ুন শাহ তাদের নিয়ে মজলিস বসাতে পারতেন। হুমায়ুন নিজেও ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী। তাঁরও হারেমে ছিল অনেক জোয়ানী আওরত। তিনিও যুবক বয়েসে যথেষ্ট বিলাসীজীবনের পরিচয় দিয়েছিলেন, তবু অকৃতজ্ঞ সন্তানের মত পিতার গচ্ছিত আওরতদের ভোগ করেন নি। এমন কি কতক আওরত সৈনিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে [illegible] অন্তঃপুর [illegible] [illegible]ছিল, আর কিছু পালিয়ে গিয়েছিল। তাতে হুমায়ুন শাহ খুশি হয়েছিলেন, নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এমনি করেই সৃষ্টি মুঘল পরিবারের অন্তঃপুর। মুঘল সম্রাটরা যুদ্ধে গেলে তাদের অন্তঃপুর সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এ রীতি বাবর শাহও পালন করেছেন, হুমায়ুন শাহও পালন করেছেন। তৃতীয় সম্রাট এখন আকবর শাহ।

তবে তার বয়স অল্প। অন্তঃপুরের শালীনতা, সম্ভ্রম, অবরোধ এসব রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব তার এখন হয়নি। তাছাড়া তার নিজস্ব আওরত যখন অন্তঃপুর আলো করে বাস করবে, তখন তার দায়িত্ব শুরু হবে। এখন অন্তঃপুরে আছে পিতার পোষিত হাজার রমণী। মাতার হেপাজতে যাদের ভরণ পোষণ নির্বাহ হয়। পিতার অবর্ত্তমানে মাতার কর্তব্য এখন তাদের প্রতিপালন করা। আর আছে মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির নাজির প্রভৃতি উচ্চরাজকর্মচারীর পরিবাররা। তাদের মহল অবশ্য আলাদা, তবে মুঘল হারেমের সঙ্গে তাদের অবরোধ রক্ষিত হয়, সেখানেও বাইরের লোকের কোন প্রবেশাধিকার নেই।

শুধু বৈরাম খানের পরিবারের জন্যে আলাদা একটি বিশেষ মহল তৈরী হয়েছিল। শেরশাহ যখন দিল্লী অধিকার করেছিলেন, তখন তিনি রাজপুরীর সবকটি অট্টালিকা ভেঙে চুরমার করে

নতুন ভাবে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সেইজন্যে পূর্বে মুঘলরা হুমায়ুনের প্রথম রাজত্বে যেমনভাবে বাস করেছিলেন, পরে আর তা সম্ভব হয় নি।

তারপর বর্তমানে দিল্লী অধিকার করে বৈরাম খানের কর্তৃত্বাধীনে নতুন নতুন মহল নির্মিত হচ্ছিল। বৈরাম খান রাজপরিবারের সংলগ্ন নিজের অন্তঃপুরিকাদের জন্য অভিনব একটি মহল তৈরী করিয়েছিলেন। আর সেখানে দিনের পরদিন চলতো আমোদ প্রমোদের এক নতুন হল্লা।

আকবর শাহ অপরিণত বয়স্ক যুবক বলে তার খাসমহল নির্বাচিত হয়েছিল, অন্তঃপুর ও বারমহলের মধ্যবর্তীস্থানে। হামিদা বানু থাকতেন আকবরের পাশের মহলে, তবে অন্তঃপুরের সংলগ্ন। হামিদা বানুর পাশে থাকতেন যত ধাত্রীমায়েরা। তাদের প্রত্যেকের এক একটি মহল সুনির্দিষ্ট ছিল। ' আর আত্মীয়স্বজনেরা থাকতো ভেতর মহলে তবে যারা দম্পতি তাদের জন্যে আলাদা মহল ছিল।

পুরুষেরা মেয়েমহলে রাত্রিবাস করতে গেলে তার ভিন্ন ব্যবস্থা। যাদের বহুপত্নী, তাদের কোন্ পত্নী কবে স্বামীর কক্ষে রাত্রিবাস করবে তার ব্যবস্থা থাকলে বাঁদী জেনানা দারোগা তাদের পৌঁছে দিয়ে আসতো। হারেমের এই বিরাট সমস্যা একটি রাজ্যের সমস্যার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই হারেমের যিনি কর্ত্রী হতেন, তাঁর অনেক বিষয় চিন্তা করতে হত। এক জায়গায় অনেকগুলি রমণী থাকলে যে অবস্থা হয় আর কি ?

ইদানীং হামিদা বানু এই অন্তঃপুরের সর্বকর্ত্রী হয়েছিলেন।

আকবর আশ্রয়প্রার্থী দুই ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এনে ভগ্নী শিবালীকে মাতার কাছে পাঠিয়ে দিল। জানিয়ে দিল, ভাগ্যহীনা এই রাজপুত কিশোরীকে যেন নিজের হেফাজতে যত্নে লালন করা হয়। মেয়েটিকে

নিয়ে প্রথমে কোন গোলমাল লাগলো না। কারণ এমনি বিধর্মী বহু আওরতই হারেমের শোভাবর্দ্ধন করতো। আওরতের ধর্ম কি? তারা যার ঔরসে যার গর্ভে জন্ম নিক্, পরিণত বয়েসে যার ঘরে গিয়ে যার হৃদয়ে কুসুম ফোটাবে, সেই ভাগ্যবান পুরুষের ধর্মই তার। সেইজন্যে মুঘল রাজ্যের নীতি ধর্মের দিক থেকে আওরতদের কোন দণ্ডাজ্ঞা দিত না। বরং হিন্দুরমণী যত হারেমে আসে, তত জেনানমহলের ইজ্জত বাড়ে। শিবালী হারেমে প্রবেশ করতে কোন আন্দোলন উত্থিত হল না। আলোড়ন জাগল নন্দন সিংকে নিয়ে।

বিধর্মী নিশ্চয় গুপ্তচর তাকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হোক্।

সম্রাট আকবর রুখে দাঁড়ালো—খবরদার! যে এই আশ্রয় প্রার্থীর মৃত্যুদণ্ড দেবে, আমি তার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করবো। আমার পিতৃতুল্য রাজপুরুষরা কি ভুলে গেছেন যে, মুঘল রাজ পরিবারের নীতিই আছে আশ্রয়প্রার্থী শত্রু হলেও তাকে রক্ষা করা উচিত। আমি মুঘলবংশের উপযুক্ত পুত্র, আমি সেই নীতি পালন করেছি।

দরবারের রাজতখতে বসে অগণিত আমীর ও ওমরাহের সামনে নবীন সম্রাট আকবর এই ঘোষণা করছিল। একপাশে সেই যুবক নন্দন সিং দাঁড়িয়েছিল অপরাধীর মত।

আকবরের ঘোষণা শুনে আমীর ওমরাহদের মধ্যে সোরগোল উঠলো। বৈরাম খান মন্ত্রীর আসনে আসীন হয়ে চুপ করে বসেছিলেন।

এই সময়ে একজন ওমরাহ বললেন—এই যুবককে আশ্রয় দিয়ে আমরা কি করবো?

উত্তর দিল কিশোর আকবর—তাকে উপযুক্ত যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করবো, রাজকর্মে নিয়োগ করবো।

অন্য এক ওমরাহ বললেন—এরকমভাবে বিধর্মীদের উৎসাহিত করলে নিজেদের ধর্মের লোকেরা নিযুক্ত হবে না।

তার উত্তরে আকবর বললো ভারতবর্ষ শুধু ইসলাম ধর্মীদেরই একচেটিয়া নয়। আমরা যদি কখনও সমস্ত ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা পাই, তাহলে অন্যধর্মের মানুষেরও করুণা আমাদের দরকার। বরং আপন ধর্মের লোকেরা ক্ষমা করবে কিন্তু ভিন্নধর্মের লোকেদের মঙ্গল না চাইলে তারা ষড়যন্ত্রের দ্বারা রাজত্বের অবসান চাইবে।

এই কথাগুলি কি সামান্য এক অপরিণত যুবক বলতে পারে? অনেক বড় রাজপুরুষ, পর্যাপ্ত শক্তি নিয়ে যে পৃথিবীতে এসেছে। বুদ্ধিও আছে অনেক। তারও মনে এমনি দূরদর্শিতা জেগে উঠবে না। সেও এমনি ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সোনার কল্পনা করতে পারবে না।

আমীর, ওমরাহরা সেইমুহূর্তে মনে মনে তৈমুরের উত্তরসাধককে সেলাম পেশ করলেন। যার মনে সমগ্র এসিয়া জয়ে' পরিকল্পনা, তার বাহুতে যে একদিন বিরাট শক্তি এসে পড়বে, তারই জন্যে নতি স্বীকার। এমন করে কজন কথাই বা বলতে পারে! এমনি করে আশ্বাস কোন্ বাদশাহের দ্বারা প্রকাশিত হয়!

বয়েসে নবীন কিন্তু বুদ্ধিতে অনেক বড়। এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি বাদশাহের না থাকলে কি হয়? শক্তিও কম নেই। নিজের তরবারীর শক্তি দিয়ে পরবর্তীকালে আগ্রা জয় করেছে। সেকেন্দার শূরকে এই যুবকই একদিন হঠাৎ অতর্কিতে প্রাসাদ থেকে অশ্ব ছুটিয়ে গিয়ে ধৃত করেছিল। সঙ্গে মাত্র ছিল পঞ্চাশজন সিপাহী।

তারপর সেই সেকেন্দার শূরকে ক্ষমা করে তাঁকে একটি জায়গীর উপহার দেয় এই আকবর। বন্দীকে এই ক্ষমা করার ঘোর বিরোধী আমীর ওমরাহরা, সেদিনও এমনি এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে দরবারের উপস্থিত ব্যক্তিদের চমকিত করেছিল আকবর। কিন্তু সেই সেকেন্দার শূর বিহারে জায়গীর ভোগ না করে

বিদ্রোহী হতে আকবর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেদিনও তার মূর্তি দেখবার মত। রক্তবর্ণ মূর্তিতে এই দরবারে দাঁড়িয়েই বালক আকবর চীৎকার করে বলেছিল—বেইমান, তাকে জীবিত ধৃত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

ছুটেছিল এক সহস্র সৈন্য আকবরেরই বিশ্বস্ত অনুচর কেলী খাঁর পরিচালনাধীনে। তার আগেই সেকেন্দার শূর জায়গীরের লোভ ছেড়ে দিয়ে বাঙলা দেশে পলায়ন করেছিলেন।

আমীর ওমরাহদের সে কথা মনে পড়লো। উপস্থিত নবীন বাদশাহের কতকগুলি কার্য বিরুদ্ধমনের বিদ্রোহ জাগায়, আর কতকগুলি কার্য বিস্ময় জাগায়। বন্দীকে ক্ষমা করা যেমন বৈরাম খানের নীতি নয়, আমীর ওমরাহদেরও সেই নীতি ছিল না। অবশ্য পূর্বসম্রাট হুমায়ুনও বন্দীকে ক্ষমা করতেন। কিন্তু সে কথা তখন অনেকেই বিস্মৃত হয়েছিলেন।

আমীর ওমরাহরা নবীন বাদশাহকে তাদের নীতি অনুসরণের জন্যে বার বার চেষ্টা করতেন কিন্তু আকবর বয়েসে নবীন হলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে কঠোর ছিল। বুদ্ধির চাতুরীতে তাকে কাবু করা সত্যিই দুষ্কর।

নন্দন সিংকে আকবর শেষপর্যন্ত সমস্ত বাতবিতণ্ডার বিরুদ্ধে আশ্রয়দান করলো। শেষপর্যন্ত রাজন্যবর্গের কাছে জামীনস্বরূপ নিজেকে গচ্ছিত রাখলো, 'যদি এই রাজপুত যুবক কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার জন্যে সেই দায়ী থাকলো। রাজ্যের কোন ক্ষতি হলে স্বয়ং সম্রাট তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করবে।'

সকলে সেই মুহূর্তে কিছু বললো না কিন্তু মনে মনে তারা সম্রাটের কার্যের ঘোর বিরোধিতা করলো। নবীন সম্রাট বয়েসে ছোট হলেও নিজের স্থির সঙ্কল্পে কেউ কখনও তাকে সরাতে পারবে না। সুতরাং তাদের স্বাধীনতা যখন ঠিকমত প্রকাশলাভ করবে না, তখন এই রাজ্য ও রাজত্বে প্রয়োজন কি? অপরিণত এই যুবককে

সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিলেই মনে হয়, নিজেদের ক্ষমতা বজায় থাকবে।

কিন্তু বৈরাম খান এই বিদ্রোহের চক্রান্তে কোন উৎসাহ বোধ করলেন না। তিনি আমীর ওমরাহের রক্তচক্ষুর দ্বারা বশ করে জানিয়ে দিলেন—আপনারা সে চেষ্টা কখনও করবেন না। আমি আমার বন্ধুর কাছে কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, সেই প্রতিজ্ঞা আমি কিছুতেই ভঙ্গ করবো না। তার পুত্রকে সিংহাসনের ওপর বসিয়ে, রাজ্য সুরক্ষিত করে তবে আমার ছুটি। কেউ যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা পূরণের বিরোধিতা করে তাহলে তার জীবন কিছুতে রক্ষা পাবে না। আমার তরবারীই সেই বিদ্রোহের অবসান চিরতরে ঘটাবে। আর উষ্ণশোণিতের স্রোতে মর্মরসোপন ধৌত করে এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করবে যে কর্তব্যের কঠিনতা যত নির্মম, বেইমানের দুর্বল তরবারী তত ক্ষুরধার নয়।

৯

এরই মধ্যে একদিন রাত্রে হঠাৎ আকবরের ঘুম ভেঙে গেল। আজকাল তার নির্ভয়ে ঘুম হয় না। কেমন যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে হঠাৎ আচমকা উঠে বসে। কেন উঠে বসে সে জানে না, অথচ তার ঘুম ভেঙে যায়। স্বল্পালোকিত কক্ষের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে বোবা হয়ে যায়। প্রাসাদ চত্বর থেকে প্রহর গণনার ঘোষণা ভেসে আসে। কক্ষের বাইরে অলিন্দের মাঝে প্রহরীর চলাফেরার পদধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করে।

শয্যার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আকবর ভাবতে বসে, এমন কেন তার হচ্ছে? কেন এই শান্তমনে বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার পলিমাটি? প্রায় প্রত্যহই তার ঘুম ভেঙে যায়, কখনও ভাঙে প্রভাত

হওয়ার দুদণ্ড পূর্বে, কখনও রাত্রির মাঝামাঝি সময়। অথচ তারপর আর ঘুম আসে না। এমনি অবস্থায় পালঙ্কের ওপর ছটফট করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে আসে, আর তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় প্রাতঃভ্রমণে। কিন্তু ঘুমের সে জড়তা তার যায় না। কেমন যেন চোখদুটি জ্বালা করে, দেহ দুর্বল লাগে। অশ্বের বল্গা চেপে ধরলেও হাত ঠিক মজবুত হয়ে বসে না। অশ্বও তার দুরবস্থা বুঝতে পারে। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এমন কেন হচ্ছে ?

এই প্রশ্ন উদয় হতে আকবর আর নিজেকে শয্যার মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। উঠে সে কক্ষের হর্ম্যতলে দাঁড়ায় তারপর কি ভেবে তারই কক্ষের ভেতর দিয়ে ছাতে ওঠবার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। এই কক্ষের ওপর এই ছাতটিও সেই ব্যাঘ্রহত্যাকারী শেরশাহের পরিকল্পনায় সৃষ্টি। কেন যে তিনি এই ছাতটি নির্মাণ করেছিলেন, বোঝা যায় নি ? অন্তঃপুরের সংলগ্ন এই কক্ষটি হয়তো নিজের ব্যবহারের জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন। আর এই ছাতটি গোপনে সকলের গতিবিধি দেখবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া কেন হবে এই গম্বুজযুক্ত ছাত ?

আকবর এর আগে একবার এই ছাতে উঠেছিল। নিজের কক্ষের মধ্যে বিশেষভাবে নির্মিত এই উন্মুক্তস্থানের প্রতি তার কোন কৌতূহল ছিল না।

হঠাৎ সেদিন কি যেন ভেবে সন্ধ্যেবেলা এই ছাতে উঠে এসেছিল। অবশ্য তার গোপন মনে একজনকে দেখার প্রত্যাশা ছিল।

শিবালীকে।

মা হামিদার কাছে বাঁদীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু হামিদার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে, তিনি একবারও শিবালীর সম্বন্ধে কিছু বললেন না। অথচ তার জিজ্ঞেস করতে লজ্জা জেগে উঠলো। এই লজ্জা যে কেন তার এল, সে জানে না! অথচ বার বার

মুখে এসেও জিবের তালুতে কেমন যেন জড়িয়ে গেল। মাকে আর জিজ্ঞেস করা হল না সেই ভাগ্যহীনা কিশোরীর কি ব্যবস্থা করলে?

এই অবস্থার জন্যেই সে হঠাৎ নিজের কক্ষের ঘুলঘুলি দিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। অনেকে বলত, এর ছাতে দাঁড়ালে জেনানামহলের সবকিছু দেখা যায়। আকবরকে অবশ্য কেউ নিষেধ করে নি কিন্তু কথাটা শুনে তার কেমন যেন লজ্জা করতো। ওখানে আছে কত মাতৃস্থানীয়া রমণী। যারা পিতার বিলাসজীবনের সঙ্গিনী ছিল। তাছাড়া আছে অজস্র আত্মীয়া। সেই আত্মীয়াদের কন্যারা আছে, যারা সম্পর্কে তারই ভগ্নীস্থানীয়া। না, না—তবু জেনানামহলের দিকে দেখবার তার বয়স হয় নি, সমস্ত রাজপুরীর লোকেরা তাকে এখনও বালক বলে। হৃদয়ের এই গূঢ়রহস্যে প্রবেশ করবার তারও কোন বাসনা নেই। জেনানামহল হাজার রহস্যে ঘেরা থাক্ তবু সে রহস্য উদ্‌ঘাটনে তার অমূল্য জীবন ব্যাপৃত করবে না।

সলিমা তাকে 'বাচ্চামর্দানা' বলে রসিকতা করেছে। সে অপমানিত হয়েছে। একটি স্ত্রীলোক তার পৌরুষে আঘাত হেনেছে। হোক্ সে ভগ্নীর মত, তবু তাকে ক্ষমা না।

মা হামিদা এই শাদীতে বৈরাম খানকে আত্মীয় করে নিলেন, মা আগ্রহান্বিতা না হলে সে এই মিলনের বিরুদ্ধতা করতো। সলিমার সেই 'বাচ্চা মর্দানা' বলা চিরকালের জন্যে রুদ্ধ করে দিত। তবে কি সে সলিমাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দান করতো? না, সে রমণী পুরুষের মাঝে এই মিলন ঘটতে দিত না। অন্তত বৈরাম খানের মহব্বত আন্তরিকতাশূন্য, এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে সলিমাকে বিচ্ছেদের বহ্নিতে দগ্ধ করতো। লল্লা যদি বেইমানী না করতো, তাহলে হয়তো এই মিলন বিচ্ছেদের মাঝেই শেষ হয়ে যেত।

কিন্তু তাঁর জন্যেই কি প্রত্যেকদিন তার ঘুম ভেঙে যায় ?

না, সলিমাকে সে ভুলেছে। সলিমা এখন বৈরাম খানের বাহুলগ্ন হয়ে কত রঙীন স্বপ্ন দেখে। তাদের মিলনদৃশ্য দেখবার জন্যে তার কোন প্রত্যাশা নেই।

সে দিন সে ছাতে উঠেছিল সন্ধ্যাবেলা, শুধু শিবালীকে দেখবার জন্যে। যদি কোনরকমে তার চোখে পড়ে, সে জীবিত আছে, ভাল আছে সুখে আছে জানতে পারলেই আর কোন দুর্ভাবনা থাকে না। যাকে জীবন দান করে, বাঁচবার অধিকার দিয়ে এখানে এনেছে, তার নিরাপত্তা জানার দায়িত্বও তো তার !

নন্দন সিংয়ের সঙ্গে প্রত্যহ দেখা হয়। রাজপুরীর পিছনদিকে অসি চালনার ভূমিতে তার দেখা পাওয়া যায়। সেও অসি কসরৎ করে নিজেকে যুদ্ধের জন্যে তৈরী করছে। যুবকটি বিনয়ী, দেখা হলেই মুসলমানী কায়দায় সেলাম পেশ করে।

নন্দন সিংকে সে কতকথা জিজ্ঞেস করে কিন্তু ভগ্নীর কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না। হয়তো সে কিছুই জানে না, আবার হয়তো জানে। ভগ্নী ভাল আছে কিনা এ খবর কি সে যোগাড় করে নি? কিন্তু সেখানেও লজ্জা।

আর সেইজন্যেই এই চোরের মত ছাতে এসে দাঁড়ান কিন্তু ছাতে না এলেই বুঝি ভাল হত। এক দেখতে গিয়ে যে আর একদৃশ্য দেখে ফেললো, তার মূল্যায়ন কিসের দ্বারা হবে !

জীবনের এমনি সংঘাত যদি গোপনে ঘটে যেত !

অনেক ঘটনা হয়তো ঘটে কিন্তু তার প্রকাশ না থাকলে আর আলোড়ন জাগে না। সেদিন আকবর হঠাৎ মসজিদে আজানের সময় ছাতে এসে না দাঁড়ালে আর তাকে ঐ দৃশ্য দেখতে হত না। না দেখলে তার চিন্তার মধ্যেও এই সন্দেহ ফুটে উঠতো না।

দেখতে এল জেনানামহলের কোন অলিন্দ দিয়ে শিবালীকে দেখা যায় কিনা কিন্তু দেখলো এক সাংঘাতিক দৃশ্য।

পৃথিবী কি সেইমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারতো না! দিন ও রাত্রির প্রতিদিনের ঘূর্ণায়মান আসা যাওয়া। বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেলেই তো মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হত। কিম্বা সমুদ্র হঠাৎ ছুটতে শুরু করলেই সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হয়ে যেত।

কিন্তু কিছুই হল না। স্তব্ধ সন্ধ্যার মাঙ্গলিক মুহূর্তে মসজিদে মসজিদে মোল্লাদের আল্লাকে ডাকার প্রার্থনা যেন আরো সোচ্চার হল। আসমানের নীলিমার সুদূরে বল্লমে বিদ্ধ তারার উপস্থিতি পৃথিবীর আয়ু বৃদ্ধি করলো। কত মানুষ সেইমুহূর্তে জন্ম নিল, কত আত্মার সেইমুহূর্তে নির্বাণ হল। কত দুর্বহ জীবন পরিসমাপ্তি হয়ে শান্তির কোলে লোকান্তরিত হল। হায়, সবই সেইমুহূর্তে মঙ্গল আরতির মত সমাধা হল, শুধু হল না আকবরের চোখের সেই দৃষ্টির কোন পরিবর্তন!

সে যেমন সেই অলৌকিক দৃশ্য অবাক দুই চোখদিয়ে দেখেছিল, তেমনি দেখতে লাগলো। সেইমুহূর্তে সে চেয়েছিল, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাক্ কিন্তু গেল না। চোখ দুটি তেমনি সজাগ, দৃষ্টি তেমনি স্বচ্ছ থাকলো। স্বচ্ছ সেই দৃষ্টি দিয়ে সে তাকিয়ে থাকলো সামনের দিকে জেনানামহলের অন্দরে। মার কক্ষের অভ্যন্তরে। এই ছাতের অলিন্দ থেকে মা হামিদার কক্ষের সব দৃশ্য প্রকট। কক্ষের একটি গবাক্ষ দিয়ে সব দেখা যায়।

পুত্র হয়ে আকবরকে খোদা মাতার কক্ষের এমন এক দৃশ্য দেখালেন, যা স্বপ্নেরও অগোচর। অন্তত আকবর স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতো না, কেউ যদি এমনি এক রসালো গল্প তাকে শোনাতো, অবিলম্বে তার শিরচ্ছেদের আদেশ দিত।

কিন্তু এইবা কেমন ক'রে সম্ভব? মাতা হামিদা বানু এই সেদিন মৃত সম্রাটের শোকে মূহ্যমান হয়ে বৈরাগ্য জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর সেদিনের সেই বিচ্ছেদ বেদনার ইতিহাস কেউ না জানুক, সে তো জানে! মাতাকে যদি সেদিন সে উদ্ধার না

করতো, তাহলে হয়তো তিনি স্বামীর বিয়োগ বেদনায় মূহ্যমান হয়ে সেই কক্ষেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দেহ রাখতেন।

সমস্ত রাজপুরী সেদিন এই রাজরাণীর বেদনায় আবার নতুন করে মৃত সম্রাটের অভাব অনুভব করেছিল।

না, না এ কখনও সম্ভব নয়! তারই মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে। তারই চোখের দৃষ্টিতে জাদুকরের ভেলকিবাজী চলেছে। কোন এক দক্ষ জাদুকর এমনি এক মায়ার সৃষ্টি করে তার মাতার প্রণয়লীলা প্রত্যক্ষ করাচ্ছে!

কিন্তু তাই যদি হবে তবে তার চেতনা কেন সজাগ? কেন সে সজাগ চেতনা নিয়ে এই কক্ষের ছাতের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ঐ জেনানামহলের অভ্যন্তরে তাকিয়ে আছে? সে যে কেন ছাতে উঠেছিল, সে তা জানতো। এখনও জানে, সে এই বিসদৃশ্য চিত্র দেখবার জন্যে এই ছাতের অলিন্দে ওঠে নি। শিবালীকে দেখবার জন্যে তার আগ্রহ ছিল। শিবালী জেনানামহলের মধ্যে আরামে আছে কিনা দেখবার জন্যেই এই অলিন্দে উঠেছিল। সবই যখন চেতনার ভেতর আছে। এখন যা দেখলো, তা চেতনার বহির্ভূত জাদুকরীর ভোজবাজী হবে কেমন করে?

আবার সে অসহায় বোধ করলো। হয়তো সত্যিই সে এখনও বালক। বালকের চোখ নিয়ে সে যে দৃশ্য খারাপ মনে করছে, সে দৃশ্য বড়দের মনের অন্য এক আচরণের দৃশ্য।

কিন্তু তাই বলে রাজরাণী, সম্রাট হুমায়ুনের প্রিয়তমা মহিষী বর্তমান সম্রাট আকবর শাহের জননী; যাকে পিতা বলতেন জুলি বেগম, যাকে সে বলে পিয়ারী আম্মি—সেই রমণী এক ভিন্নপুরুষের পায়ের তলায় বসে কি প্রার্থনা করছে? আর সেই ভিন্ন একপুরুষ অন্য কেউ নয়, এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় হিতৈষী বৈরাম খান।

বৈরাম খানকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় তিনি অত্যধিক

সুরা পান করেছিলেন। তার দেহ টলছিল, চোখ তুটি আমেজে ঢুলু ঢুলু ছিল। কথা শোনা যাচ্ছিল না কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল। তিনি বোধ হয় জড়িতস্বরে কি পেশ করছিলেন?

আর মাতা পায়ের কাছে বসে কাতরতার দ্বারা তা প্রত্যাখান করছেন।

তবে কি পিতা বন্ধুকে রাজত্বের অভিভাবকত্ব দিয়ে তার মহিষীর দায়িত্বও অর্পণ করে গেছেন? তাহলে এই ছলনা পূর্বে প্রকাশ করার কি দরকার ছিল? না, না মা, আমার মা। তার কোন অন্যায় পুত্রের দেখা অবশ্যই অপরাধ? মায়ের সমালোচনা করা পুত্রের শোভা পায় না। যে পুত্রকে এই মা একদিন গর্ভে ধারণ করে জগতের মাঝে নিয়ে এসেছেন?

আকবর তারপর আর সেই ছাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকে নি। একরকম মাতালের মত নীচে নেমে এসেছে। নিজের কক্ষে এসে বোবা পাথরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে।

একি দেখলাম আমি? খোদা, তুমি আমাকে একি দৃশ্য দেখালে? এই যদি জগতের আসল কলিজা হয়, তাহলে তুমি আমাকে এ জগত থেকে সরে যেতে সাহায্য কর।

আকবরের তু'চোখে জল নেমে এল। যেন যমুনা প্রাসাদের পাশ দিয়ে না বয়ে আকবরের তু'চোখের প্রান্ত দিয়ে নেমে প্রশস্ত কক্ষের পথ নিল।

সমস্ত কক্ষময় সে পাগলের মত ছটফট করে বেড়াতে লাগলো।

কক্ষের অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণবর্তিকার সামনে দাঁড়ালো। জোরালো আলোর সামনে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু মেলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে দেয়ালে টাঙ্গানো তরবারীখানা টেনে নিল। বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণ বাতিদানে আঘাত করতে গিয়ে থমকে নিজেই বললো—এই কক্ষের কটি আলোকে আঘাত করলে কি পৃথিবীকে অন্ধকার করা যাবে?

কিন্তু আমি কি করবো? আমার মা অবিশ্বাসিনী, দ্বিচারিনী, ব্যভিচারিনী। আর আমি সেই সংবাদ জেনে নিঃশব্দে সম্রাটের ভূমিকা নিয়ে রাজ্য বিস্তারে মন দেব? প্রজার মঙ্গল সাধনে নব নব অভিযান রচনা করে ঐশ্বর্যের এক বিরাট বৈভবে দাঁড়িয়ে নিজের কৃতিত্বের সাফল্যে উল্লসিত হব। আর অলক্ষ্যে কেউ দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বলবে—জানিস্, বেচারী এই সম্রাটের মা নফরৎ জেনানা।

কে যেন অন্তরালে দাঁড়িয়ে পিশাচিনীর মত খিল খিল করে হেসে উঠলো।

জ্বালা, জ্বালা প্রচণ্ড জ্বালা। প্রশস্ত বক্ষের অভ্যন্তরে যেন কিসের এক সুতীব্র অগ্নিদাহ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সমস্ত শিরা উপশিরায় সেই জ্বালার তাপ লেগে কেমন যেন শোণিতে রণতাণ্ডব শুরু হয়েছে। পুষ্ঠ বাহুর কঠিন বলিষ্ঠতা যেন দুর্বল হয়ে শিথিল হয়ে গেছে।

আকবরের শরীরে আর কোন শক্তি থাকলো না। সে যেন কেমন দুর্বল হয়ে সারা কক্ষময় ছটফট করে বেড়াতে লাগলো।

মুঘল রাজত্বের হৃতঐশ্বর্য আবার ফিরে এসেছে। দিল্লীর প্রাসাদ শীর্ষে মুঘল পতাকা বাতাসে উড়ছে। সে শুধু উড়ছে না একটি যোদ্ধা জাতির শৌর্যবীর্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করছে। আকবর বিবশ চোখে দেখতে লাগলো তারই কক্ষে ঐশ্বর্যের কত বিচিত্র সম্ভার। মণিমুক্তার কত ছড়াছড়ি যত্রতত্র। হীরা, চুনি, পান্নার রোশনাই তারই দেহের ওপর বিচিত্র, দ্যুতি ছড়িয়ে আছে। তার পোষাকে আছে অলঙ্কার, কক্ষের সর্বত্র বিত্তে ছড়াছড়ি। খানা আসে যত রাজসিক, হুকুম করলে এখুনি আসবে, যা তার প্রয়োজন। কোন অভাব নেই। কোন মালিন্য নেই।

তবে তার চোখে জল কেন? তবে তার বক্ষে জ্বালা কেন? তবে সে কিসের বেদনায় দুঃসহ হয়ে জীবন শেষ করতে চাইছে?

রাত্রি এগিয়ে চললো। সে থমকে দাঁড়ালো না। মুহূর্ত তার কাজ করে ধীরে ধীরে প্রহরের দিকে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ আচমকা কক্ষে প্রবেশ করলো খাসভৃত্য।

সে হয়তো কোন প্রয়োজনে কক্ষে প্রবেশ করেছিল, কিম্বা প্রভুর কোন ফরমাইস আছে কিনা জানতে এসেছিল।

কিন্তু তাকে দেখেই আকবর হঠাৎ বিকৃতকণ্ঠে বললো—সরাব লে আও!

খাসভৃত্য রহিম খাঁ প্রভুর ফরমাইসিতে চমকে উঠলো।

বুঝতে পারে নি এমনি ভান ক'রে আবার তাকাতে আকবর হঠাৎ অস্বাভাবিক চীৎকার করে বললো—সরাব, সরাব। আমি সরাব পান করবো। যা উল্লুক জলদি নিয়ে আয়। আস্‌লি সরাব। যে সরাব পান করলে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা নিবৃত্তি হবে। মানসিক দুশ্চিন্তা থাকবে না। সুস্থ চিন্তাধারা রুদ্ধ হয়ে সমস্ত বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যাবে। আমি চাই সরাব পান করে সেই দুর্লভ অন্ধকার লোকে চলে যেতে।

রহিম খাঁ ততক্ষণে কক্ষত্যাগ করে চলে গেছে।

আকবর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে একটি মূল্যবান ডিভানের ওপর বসলো। দুহাত দিয়ে কপালের রগদুটি চেপে ধরলো। জীবনে এই সুরা স্পর্শের প্রথম শুভক্ষণটি মনে এলেই মনে পড়বে এই ভয়ঙ্কর দুষ্ট উপলক্ষ্যটি। এর চেয়ে জীবনে খারাপ সময় তো আর নেই! এমনি কোন এক অসহ মুহূর্ত এলেই জীবনের সব সঙ্কল্প বানচাল হয়ে যায়।

না, আর কোন কথা সে ভাবতে পারছে না। এখন বুদ্ধিকে, বিবেককে, চিন্তাকে লয় করে নিঃঝুম হয়ে মাতাল হতে হবে। সুরার আস্বাদন সে জানে না। তবে যারা সুরা পান করে, তাদের জিজ্ঞেস করে দেখেছে, জলীয় পদার্থটা যখন গলা দিয়ে বুকের নীচে নেমে যায়, সে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করতে করতে যায়। অস্তিত্বের সেই

জোরালো শক্তি দগ্ধ করতে করতে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু তারপর হঠাৎ সেই যন্ত্রণা বিলুপ্ত হয়, নেমে আসে চোখের দুই দৃষ্টির মাঝে কেমন যেন এক নতুন জগতের সৌন্দর্য। সেখানে বর্তমানের কোন বেদনা নেই। স্পন্দনহীন জীবনের মাঝে এক নতুন স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে শোক, তাপ, দুঃখ, বিরহ, আঘাত সব ভুলিয়ে দেয়। সবগুলি ইন্দ্রিয় এক জায়গায় হয়ে আদিম এক আকাঙ্ক্ষা মনে ধরে, যা আনন্দের জন্যে, সুখের জন্যেই সৃষ্টি। সেখানে বিবেক দংশন করে না। চেতনা জাগ্রত হয়ে ন্যায়ের পথ ধরায় না। অন্য এক অনুভূতি। বিস্মৃত এক উপলব্ধি। স্বপ্নের এক নতুন জগত।

মুঘল রাজপুরুষরা সকলেই মদ্যপান করতেন। এমন কি জেনানামহলের বহু আওরত আজও মদ্যপান করে। তার মা পিতা বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে করতেন, এখন করেন কিনা সে জানে না।

সেও মদ্যপান করবে, তবে বয়সের একটা পরিমাপ আছে বলেই তার দ্বিধা ছিল। এ বয়সে মদ্যপান করলে আনুসঙ্গিক উপগ্রহগুলি এসে জুটবে। আর তাদের প্রশয় দিতে গেলে শারীরিক যে বৃদ্ধি তা তার নষ্ট হয়ে যাবে। শরীরকে গঠন করতে গেলে, শক্তিশালী হতে গেলে অকালে শরীরকে ধ্বংস করা অন্তত বলশালী যোদ্ধার উচিত নয়।

বুদ্ধি তার আছে বলেই লোভের হাত থেকে সে নিস্কৃতি পেয়েছে। না হলে অন্য কেউ হলে এতদিনে কবে সুরাপানে আসক্ত হয়ে অপরিণত মনে রঙমহলে গিয়ে হুল্লোড় করতো। আর যখন অসি ধরে যুদ্ধ করতো, দুর্বল হাতে কম্পিত বক্ষে পরাজিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রাণভিক্ষা করতো।

এসব জানে বলেই আকবর নিজেকে অনেক সংযমের ভেতর দিয়ে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু লাভ কি হল ?

নিজেকে সম্রাটের মত তৈরী করে লাভ কি হল ?

জগতের চতুর্দিকে নির্মলতার চেয়ে ধূসর পাণ্ডুরতাই বেশী। অন্ধকারের গোপনতাও কম নয়। পাপের এমনি বিচিত্র রূপ চতুর্দিকে হাত-পা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা নিবু´দ্ধির লক্ষণ বলেই মনে হয়।

আজ সে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে, তার এতদিনকার মানসিক সোপান নিবু´দ্ধিতাকেই প্রশয় দিয়েছে। সকলে তাকে যে বালক বলে তার কারণই হচ্ছে, সে বালকোচিত আচরণে অভ্যস্ত বলে। অজ্ঞানকে কখনও জ্ঞান দান করা উচিত নয়। জগতের যত অঘটন তাকে গোপন করে ঘটে যাক্ সে ঈশ্বরের সহজ পথই গ্রহণ করবে ? কারণ তার জগত সীমাবদ্ধ। সে জানে জগতের সহজ পন্থাটুকু। জটিল জীবনের রূপ সে জানে না।

আকবর নিজেকে আঘাত করতে চাইলো। সত্যিই সে বুদ্ধিহীন। সে মানুষের আকৃতি দেখেই বিচার করে। মানুষের কোমলস্বরের কথা শুনে বিগলিত হয়। কিন্তু জানে না, মানুষের আকৃতির পিছনে তার অনেক ছদ্মবেশ আছে। মানুষ যখন হত্যা করে তখন তার মুখের ওপর যে দৃশ্য ফুটে ওঠে, সে কি আর পরে থাকে ? মানুষ যখন জঘন্য কাজ করতে উৎসাহিত হয়, তখন তার মুখের আকৃতি কি একেবারে পরিবর্তিত হয় ? তেমনি মানুষের কোমলস্বরের কথার মধ্যেও থাকে প্রবঞ্চনা। সে কার্যোদ্ধারের জন্যে ছলের আশ্রয় নেয়।

এসব কথা কিন্তু তখন আকবর ভাবতে পারে।

তখন সে সমস্ত ভাবনায় উর্দ্ধে উঠে ভাবনাহীনের আবর্তে ঢুকে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিরাট উত্তেজনায় তার দেহের কামিজ ঘামে ভিজে চুবুচুবু। প্রশস্ত কপাল দিয়েও দরদিগলিত ধারায় ঘাম ঝরছে। দু'চোখে জলের ধারা ছিল, এখন শুধু রেখা স্পষ্ট হয়ে আছে। এখন দু'চোখ দিয়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। বাঁদিকে

গালের নীচে যে বড় আঁচিলটি ছিল, সেটি ক্রোধের জন্যে স্ফীত হয়ে রক্তবর্ণ আকার ধারণ করেছে।

বান্দা রহিম খাঁ সুরা আনতে গেছে অনেকক্ষণ। আনতে তার অনেক বিলম্ব হচ্ছে! তবে কি সে গেছে অভিভাবককে জিজ্ঞেস করতে—বালককে সুরাপাত্র দেবে কিনা!

এইকথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকবর আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, এত বড় স্পর্দ্ধা ঐ নফরের! তার হুকুমকে এরা খোদার হুকুম মনে করে না! তার হুকুমকে অবমাননা করে অভিভাবকের নির্দেশ নিতে যায় যে সব বেতমিজরা তাদের চাবুক মেরে শায়েস্তা করতে হবে।

এই কে আছিস্? আকবর হঠাৎ আবার অস্বাভাবিকস্বরে চীৎকার করে উঠলো।

এই সময় কক্ষে এসে প্রবেশ করলো অনেক লোক। অনেক রমণী ও পুরুষ। তার মধ্যে শুধু আকবর চিনলো মাকে, তার কয়েকজন ধাত্রীমাকে আর যাকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে সেই বৈরাম খানকে।

আকবর তাদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল!

হঠাৎ তার চোখে পড়লো ভৃত্য রহিম খাঁকে। তাকে দেখেই আবার ক্রোধ সপ্তমে উঠলো—এই বেতমিজ, উল্লুক কাঁহাকা! সরাব কাঁহা।

হামিদা কাছে এগিয়ে এলেন। সস্নেহে আকবরের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—গোসা কেন কর বেটা? আমিই ওকে সরাব নিয়ে আসতে নিষেধ করেছি।

কেন করেছ? আমি কি এখনও বাচ্চা আছি? হাত ছেড়ে দাও। এই বলে আকবর ঝাঁকি দিয়ে মাতার বন্ধন থেকে নিজের হাতখানি ছিনিয়ে নিল!

যা কোনদিন আকবর করে নি, শেষপর্যন্ত তাই সে করলো।

মাকে সবার সামনে এমনিভাবে অপমান করার আকাঙ্ক্ষা কখনও তার হয় নি। মাকে সে ভালই বাসতো। এমন ভাল বোধ হয় কোন পুত্র তার মাকে বাসে না। এবং এ কাহিনী সবাই জানতো, তাই আকবরের ওমনি আচরণে উপস্থিত নারী-পুরুষেরা আশ্চর্য হল।

পুত্রের অস্বাভাবিক আচরণে হামিদা বানু মাথা নত করলেন। তার দু'চোখের কোণে মুক্তাবিন্দু দেখা দিল।

আকবরের চোখে পড়লো তা কিন্তু মাতার পূর্বের সেই আচরণ স্মরণ পড়তে সে আবার ক্ষিপ্ত হল। না, কোন ক্ষমা না! বরং এমন আচরণ প্রকাশ করতে হবে, যার মধ্যে মাতা-পুত্রের কোন সম্পর্ক নেই। শত্রু, শত্রুতাই পুত্রের সাথে মাতার সম্পর্ক।

এই সময় হামিদা বানু ক্রন্দন মুখরিত কণ্ঠে বললেন বেটা, তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো? হঠাৎ এমনি আচরণই বা প্রকাশ করছো কেন? তুমি তো এমনি কখনও ছিলে না!

ব্যস্, ব্যস্, আমি এসব মিঠি মিঠি বাত শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, আমার বান্দাকে আমি যা ফরমাইস করেছি, তা পালিত হবে কি না!

হঠাৎ এই সময়ে বৈরাম খান অভিভাবকের মেজাজে গম্ভীরস্বরে বললেন—রাজকুমার, মা বলে যদি সম্মান না দাও, আওরত বলেও নিশ্চয় সম্মান দেবে। তোমার এই ঔদ্ধত্যে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে হঠাৎ কেন এমনি আচরণকে প্রশয় দিচ্ছ?

আকবর হঠাৎ বৈরামখানের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গস্বরে মাথা নত করে বললো—সেলাম আলেকুম খানসাহেব। তারপর হঠাৎ সরোষে গর্জন করে বললো—আপনি পিতৃতুল্য না হলে আপনার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি তৈমুরের বংশধর আকবর শাহ নিজে হাতে দিত। যাই হোক্ উপস্থিত আমাকে আর ক্ষিপ্ত না করে আপনারা অনুগ্রহ করে আমার কক্ষ ত্যাগ করলে সুখী হব।

এই সময় বিবি রূপা বলে তার এক অন্যতম ধাত্রীমা এসে আকবরের হাত ধরলো।

আকবর হঠাৎ দারুণ কাতর হয়ে দু'হাত জোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো—আপনারা আমার পূজনীয়া। কেন আপনারা আমার ক্ষুব্ধ মনের বাষ্পাচ্ছাদিত রূঢ় কথাগুলি শুনে মনে বেদনা পাবেন? আমি কেন এমন আচরণ করছি, যদি বলতে পারতাম তাহলে হয়তো এই জটিলতা অপসারিত হত কিন্তু এমন এক মানসিক দ্বন্দ্ব যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ধীরে ধীরে সকলেই কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আর আকবর কেমন যেন একা বসে বসে দারুণ এক বেদনায় নীল হয়ে গেল। মাকে কত সে কটু কথা বললো! মায়ের চোখে জল দেখে অন্য সময় হলে সে কত কাতর হত! আর আজ সম্পূর্ণ বিপরীত। কাতর তো সে হলই না, বরং আরো জ্বালা আরো প্রদাহ।

এই সময় রহিম নয় অন্য একজন বান্দা একটি পানপাত্র ও একটি স্বর্ণভৃঙ্গারপূর্ণ মদ্য নিয়ে এসে কক্ষে ঢুকলো।

তার হুকুম তামিল করা হয়েছে দেখে আকবর মনে মনে প্রীত হল।

আর চিন্তা না। এবার নতুন সাথী। নতুন জগত। বিড়ম্বনা নেই! আছে অনাবিল অফুরন্ত আনন্দ। দেখা যাক্ জগতের সবকিছু ভুলে রঙের জগতে গিয়ে রঙীন হওয়া যায় কি না!

আকবর কাছে টেনে নিল পাত্র, পূর্ণ করলো গুলাবী আতরের খসবু দেওয়া সরাব, তারপর গলায় ঢেলে দিল এক নিমেষে।

চলে গেল জ্বালা নিয়ে দগ্ধ করতে করতে কোমল তন্ত্রে সজাগ সাড়া তুলে। প্রথম সুরার আস্বাদের এই অভিজ্ঞতা মর্মে মর্মে হৃদয়ে সাড়া জাগালো। হঠাৎ বুকটা অসহ্য যন্ত্রণায় চেপে ধরে আকবর নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কী অসহনীয়

যে অনুভূতি! কী দুর্বহ যে উপলব্ধি! চোখ ফেটে তার জল বেরিয়ে পড়লো।

এই সময় সেই বান্দা বললো—হুজুর, আপ মাত পিজিয়ে, সরাব আপকো লিয়ে নেহি।

রক্তাভ চোখে আকবর বান্দার দিকে তাকালো। বান্দার স্পর্দ্ধা দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলো বেল্লিক—বেতমিজ। জুতি মারকে মু তৌড় দেউঙ্গা। অউর সরাব, জাদা সরাব। আজ রাত ভোর সরাব পান করেই যাব।

এই বলে আকবর আরো কয়েকপাত্র মদির সুরা গলায় ঢেলে মাতাল হয়ে উঠলো। বীভৎস হয়ে উঠলো। বিকৃতমুখে, ভয়াল চোখে, রক্তাভ দৃষ্টিতে বান্দার দিকে তাকাতেই সে সভয়ে সেলাম পেশ করতে করতে কক্ষ থেকে অদৃশ্য হল।

আকবর সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করে, রাত্রের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে বোবা মর্মর দেয়ালের গায়ে কম্পন তুলে চতুর্দিকে ভরিয়ে তুললো—হাঃ হাঃ হাঃ।

না, দুনিয়ার সঙ্গে কদিনই মুঘল বংশধরের কোন সম্পর্ক থাকলো না। সোনার বর্ণের সূর্যের উদয়কালে যে যুবক তাকে চুম্বন করবার জন্যে রাত্রির এক প্রহর থাকতে বাইরে বেরিয়ে পড়তো, কোনদিনও কোন অজুহাতে এই নিয়মের তার কেউ শৈথিল্য দেখে নি, শেষ-পর্যন্ত তাও হল। সূর্য বুঝি যমুনার অতল থেকে ম্লান দ্যুতি নিয়ে অবনত মস্তকে উদয় হল। বাতাস বুঝি আর সহজগতিতে বইলো না, কোথা থেকে যেন জ্বলীয় তাপ বহন করে এসে দাহ সৃষ্টি করলো। মালঞ্চ বনে কুসুম বৃন্তে নতুন কলির আবির্ভাব হল না। যদিও বা আবির্ভাব হল; অলিদল এসে গুঞ্জরণ করলো না।

না, ভুল। পৃথিবী ঠিকই চললো। প্রকৃতি তার আপন নিয়মের বৃত্তে আবর্তিত হয়ে সব কিছুই সমাধা করলো। বিহঙ্গদল গান গাইতে গাইতে নদীর পার দিয়ে, বৃক্ষের অভ্যন্তর দিয়ে, মেঘের সীমানা ডিঙিয়ে বাসায় ফিরলো। মসজিদে আজানের করুণ সুর আসমানের বুকে প্রতিধ্বনিত হল। প্রাসাদ সিংহদরজার মাথায় নহবতখানায় মোহিনী রাগে সানাই বাজলো। রাজপুরীর অভ্যন্তরে খুব বিশেষ একটা চাঞ্চল্য জাগলো না। শুধু অন্তঃপুরে একজন অবিরাম কেঁদে চললো। সেইজন্যে অন্তঃপুরের রমণীদের মন বিস্বাদ।

তাও খুব বেশী নয়। যে কাঁদছে, সে কাঁদুক। কেউ না জানুক সে তো জানে, তার পাপের এই পরিণতি! তার অন্তর তো মিথ্যে নয়! সে নিজের বুকে হাত দিয়ে কখনও মিথ্যেকে ঢাকা দিতে পারবে না। যমুনার জলের ওপর হয়তো অনেক কল্লোল। অনেক সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে সে দর্শককে বিমোহিত করে কিন্তু যমুনা নিজে

জানে, তার অতল জলের তলায় আছে কত পাপের হিমস্রোত, কত গোপন জঞ্জালের বিশ্রীস্তর।

সেইজন্যে অন্তঃপুরে যে নীরবে কাঁদছে, কাঁদুক। তার দিকে দৃষ্টি দেবার কারুরই দরকার নেই। রাজা-বাদশাহের রাজপুরীতে যেমন বহুলোক, তার বহু কলরব! উৎসব বাড়ীতে যেমন হয়, কেউ কারও খবর রাখে না। তেমনি উৎসব মুখরিত সর্বদা এই রাজপুরী। অনেক গণ্ডগোলের মধ্যে কে কাঁদলো, তার অনুসন্ধান বড় একটা হয় না।

তবে নবীন সম্রাট আকবরের পরিণতিতে সকলেরই বিস্ময় উপস্থিত হল। আমীর, ওমরাহরা পর্যন্ত সচকিত হল।

দরবার গৃহ বন্ধ। সম্রাট যখন সিংহাসন অলঙ্কিত করবে না, তখন দরবারগৃহ খুলে কি হবে? সম্রাট না হয় রাজকার্য করে না, কিন্তু তাকে সামনে রেখেই তো মন্ত্রী, সেনাপতি এঁরা দরবার করেন? নিয়ম যেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সেখানে নিয়মের বহির্ভূত কোন কাজ করা যায় না। সেইজন্যে বাদশাহের অনুপস্থিতিতে সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

বাদশাহ এখন আকণ্ঠ সুরার সমুদ্রে অবগাহন করে কর্তব্য ভুলেছে।

কেউ কেউ অন্তরালে মুচকি হেসে বললো—বাদশাহ নতুন সরাব পান করতে শিখেছে তো তাই এই অবস্থা! তা বেশ, মুঘল বংশের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। রক্তের সম্বন্ধ যাবে কোথায়?

আবার কেউ বললো—এবার দু'চারটি খুবসুরত সায়েদ মাসুম চিড়িয়া খাসকক্ষে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু বয়স যে বড় কম! জেনানার উত্তাপ সহ্য করতে পারবে কেন?

ঠিক পারবে! মুঘল পুরুষদের শক্তি আলাদা ছাঁচে ঢালা। পূর্ব-পুরুষদের কথা শোন নি, তাদের মানই এই বাদশাহ রাখবে।

এই বয়সে অন্যকেউ হলে হয়তো সরাবের পাত্র ধরতেই হাত দশবার কাঁপতো কিন্তু শুনছো না, সরাবখানা উজার করে শুধু মদ চলেছে। এবার হয়তো শোনা যাবে মজুত সরাব সব নিঃশেষ।

রুদ্ধদ্বার। বান্দার প্রবেশ ছাড়া কারো প্রবেশের হুকুম নেই। হুকুম নেই কোন রিস্তেদার আওরতের, রাজমাতা হামিদা বানুর। নফরসর্দার গোলাম মহম্মদের। শিক্ষক মীর আব্দুল লতিফের।

তবে একবার আব্দুল লতিফের প্রবেশাধিকার মিলেছিল। কাতর অনুনয় করে বান্দার হাতে দিয়েছিলেন এক খত।

'খোদার কসম জাঁহাপনা, আমি আপনার বিশ্রামে এতটুকু ব্যাঘাত সৃষ্টি করবো না। শুধু আমার অভিপ্রায় প্রিয়তম ছাত্রের মুখদর্শন। এখন কোন জ্ঞানদান করা নয়। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ নয়। দোস্তের সাথে দোস্তের মিতালী। মহব্বতের এক সুতীব্র আকর্ষণ অনুভূত হতে, তাই চাই প্রিয়মুখ দর্শন।'

কি সুন্দর কথার যোজনা! কি মুগ্ধ বিস্ময় এই কথার মধ্যে? আকবর উপেক্ষা করতে পারে নি। নেশায় সমস্ত শরীর তার টলে আছে। জ্ঞান নেই অথচ অজ্ঞানও হয় নি। চেতনার বহুদূরে অবস্থান করেও অচেতন সে হয় নি। সুখাদ্য উদরে এতটুকু নেই, অথচ অখাদ্যের শেষ নেই।

সে নেমে গেছে একেবারে নিঃসীম অন্ধকারের অতলান্তে। কে যেন তাকে মাটির তলায় কোন অন্ধকার বন্দীকক্ষে চিরকালের জন্যে আবদ্ধ করেছে কিন্তু তার জন্যে তার নেই কোন দুশ্চিন্তা। বরং সে আরো অন্ধকার প্রদেশে মিলিয়ে যেতে চায়।

এই সময় আব্দুল লতিফের এই খত। প্রথমে বান্দাকে তাড়া করলো, তারপর হঠাৎ লতিফসাহেবকে মনে আসতে সে হঠাৎ বান্দাকে ডেকে খতটি হাতে নিল। এই লোকটিকে যে সে খুব পছন্দ করে, এ কথা তার মনে পড়লো। পৃথিবীতে যদি কেউ

তার এতটুকু আপন থাকে, মনে হয় এই লতিফসাহেব। এতবড় জ্ঞানী পুরুষ কিন্তু কোন অহমিকা নেই, বরং এমন সুন্দর কথা বলেন যা কেউ কখনও বলে নি। তাছাড়া আকৃতিতে আছে অদ্ভুত এক কমনীয় আকর্ষণ যা সচরাচর মেলে না।

নেশায় জড়ানো দেহ, ভাল করে লাল চোখ হুটো মেলে দেখা যায় না। এ কদিন কেমন চেহারা হয়েছে তাও সে জানে না। বিরাট দর্পণ কক্ষের দেয়ালে চতুর্দিকে খোদিত আছে কিন্তু সভয়ে দর্পণের সামনে সে যায় নি।

সে তো ধ্বংস হতে চাইছে। ভুলে যেতে চাইছে সব, তবু ভুলতে পারছে না কেন? লোকে বলে, সরাব পান করলে সব বিস্মৃতি হয় কিন্তু কোথায় সেই বিস্মৃতি? আর কত পরীক্ষা হবে! সরাব হেরে গেছে তার কাছে। সরাব পারে নি নতুক মাশুককে জয় করতে। আকবর জয় করেছে সরাবকে। তবু সে পান করে চলেছে। যদি একবার সব বিস্মৃতি ঘটে। দর্দ কমে।

এমন সময়ে আব্দুল লতিফের একটুকরো খত।

খতটি হাতে নিয়ে সে পড়বার চেষ্টা করলো, শুদ্ধ ফার্সীতে সুন্দর হস্তাক্ষরের বয়ান।

আব্দুল লতিফের সুন্দর হস্তাক্ষর সে চিনতো কিন্তু এই পরিবেশে আরো একবার তাকে মুগ্ধ করলো। আরো একবার সে জড়িতস্বরে বাহবা দিল। কিন্তু একি? পত্রটি তো সে পড়তে পারছে না! চোখে কেমন যেন ঝাপসা দেখছে। মাথাটার মধ্যে দারুণ যন্ত্রনা। লিপির অক্ষরগুলি কেমন যেন দৈত্য-দানবের মত চোখের সামনে কালো আলখাল্লা পড়ে এসে নৃত্য করছে!

কয়েকবার চোখ টেনে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে সামনে দণ্ডায়মান বান্দাকে হুকুম করলো—পড়তে পারিস্?

জী, আজ্ঞে!

পড়্ তাহলে। শয়তান চোখদুটো কেড়ে নিয়েছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

বান্দা ভয়ে ভয়ে বাদশাহের হাত থেকে খতটি নিয়ে পাঠ করে শোনালো।

একটুখানি ঝিম মেরে মাথাটা নীচু করে আকবর বোধ হয় নিজেকে নেশা থেকে সরানোর চেষ্টা করলো, তারপর নিজেই ফিস-ফিস করে বললো—কেন যে এঁরা এখন দেখা করতে চান? এঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। সেলাম জানাই। পেয়ার করি। এখন আমি দোজাখের অন্ধকার পথে নেমে পড়েছি। আলো আর চাই না। জীবন আর চাই না। কেউ সান্ত্বনা জানাক্ তাও যে চাই না। তবে কেন এই আহ্বান? আমার বুকের মধ্যে যে বেদনা, সে বেদনা জানাবার তো কোন উপায় নেই। তাই নিজের জ্বালায় নিজেই দগ্ধ হয়ে নিঃশেষে জীবনকে উৎসর্গ করেছি।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বান্দার দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল—মিঞাসাহেব কো লে আও!

আব্দুল লতিক কক্ষে এসে দাঁড়ালেন। সেলাম পেশ করে আকবরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে লাগলেন তাঁর ছাত্রের অবনতি। আকবরকে তিনিও যে ভালবেসে ফেলে-ছেন। কোথায় যেন তাঁর স্বভাবের সঙ্গে এই রাজকুমারের স্বভাবের মিল। তিনি বহু পড়াশুনা করে আজকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। আজ পেয়েছেন সমস্ত চিন্তার একটা শেষ পরিণতি। আর এই রাজকুমার কোন কিছু অধ্যয়ন না করেই পেয়েছে তারই মত লক্ষ্য-বস্তুর সন্ধান। তাঁর সেই গোপন প্রত্যাশা বুঝি এই তরুণ যুবকের ভেতর দিয়েই একদিন লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে।

তাই তিনি বড় ভালবাসেন এই কুমারকে। রাজা বলে নয়, বাদশাহ বলে নয় শক্তিধরের শক্তির সন্ধান পেয়ে। একজন

উল্লেখযোগ্য পুরুষের ভেতরে তার চিন্তার সন্ধান পেয়ে মমতার আধার দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন।

কিন্তু হঠাৎ একি? কেন এমন পরিণতি হল? বাইরের লোকের কথায় বিশ্বাস করেননি। নিজে চাক্ষুস না দেখে বিশ্বাস করবেন না বলেই ছুটে এসেছেন। জানেন এ সময় ঐ পরিবেশে গেলে নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তবু নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেন নি!

একটা অপূর্ব জীবন অকালে ধ্বংস হয়ে যাবে? একটা ঔজ্জ্বল্যমান হীরকখণ্ড জ্যোতি বিকীরন করবার পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যাবে? তবু যদি নিজের এতটুকু সাহায্য দিলে ফিরে আসে সেই মন, চেষ্টা করবেন না? সেইজন্যে এসেছেন। বড় প্রত্যাশা নিয়ে ধীর পায়ে ভীরুমনে বাদশাহের কক্ষে এসে ঢুকেছেন।

আকবর এই সময় আবার পাত্র পূর্ণ করে গলায় ঢালছিল।

আব্দুল লতিফ ব্যথিতস্বরে বললেন—আমার গোস্তাখি মাফি হয় কুমার! কেন তুমি নিজেকে এমনিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছ?

আকবর হঠাৎ পাত্র নিঃশেষ না করে মধ্যপথে থেমে গিয়ে অবাক হয়ে আব্দুল লতিফের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এ প্রশ্ন কেন করছেন মীরসাহেব! আমি আজ সব প্রশ্নের বাইরে চলে গেছি।

ক্যয়া তক্‌লিফ?

তাও বলবার নয়। শুধু সরাব পান করে দেখছি, অনেকে যে সরাব পান করে আনন্দ পায়, আমি পাই কিনা! কিন্তু কত ভাণ্ড শেষ করে দিলাম, বিনিময়ে কিছুই মিললো না। যার জন্যে সুরায় আসক্ত হলাম তাও ভুললাম না।

তারপর হঠাৎ কাতর হয়ে বললো—আপনি তো বহু জ্ঞান আহরণ করেছেন, আপনাকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি।

বলতে পারেন জীবনের কোন আঘাত ভুলতে কি উপায় অবলম্বন করা যায়?

আব্দুল লতিফ বুঝতে পারলেন, সম্রাটের দুঃখ কোথায়? নবীন সম্রাটের সুস্থ সবল নরম মনে হঠাৎ কোন এক চরম আঘাত তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তাই তার এই পরিণতি। কিন্তু হঠাৎ তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে সোনা দগ্ধ হয়ে সাচ্চারূপ নিচ্ছে। আঘাত পাওয়া দরকার। আঘাত না পেলে জীবন মজবুত হবে না। জীবনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে চাই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় উপদেশের দ্বারা বোঝানো যায় না। রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে যোদ্ধার অভিনয় করে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হবে। সম্রাট হয়তো দরবারে বসে অপরাধীর বিচার করতে পারে। দণ্ড সকলেই দিতে পারে কিন্তু মানুষের অন্তরের স্নেহ সবার ভাগ্যে মেলে না, যে না বোঝে অন্যের অন্তরের বেদনা।

হঠাৎ আব্দুল লতিফ সেলাম পেশ করে বললেন—হুজুর আমি যাই।

কিন্তু আমার জবাব!

জবাব তুমিই একদিন নিজের কাছে পাবে।

এ কথার অর্থ?

এর বেশী আজ আর আমার জানা নেই।

কথাগুলি কি রূঢ় শোনালো না?

হয়তো শোনালো কিন্তু আঘাত প্রতিমানুষের জীবনে দরকার। আজ তোমার হয়তো কষ্ট হচ্ছে কিন্তু একদিন উপকার হবে। আমি যাই কুমার। আমি যা জানতে এসেছিলাম জেনে গেলাম।

আব্দুল লতিফ ছাত্রকে সম্রাটের সম্মান দান করে কক্ষ থেকে অদৃশ্য হলেন।

আকবর নিজের দেহে হঠাৎ চপেটাঘাত করে জানতে চাইলো, সে চেতনার মধ্যে আছে কিনা!

তারপর হঠাৎ নিজেই হো হো করে আপন মনে হেসে বললো—আসলে লতিফসাহেবেরও মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে। আঘাত বোধ হয় তার জীবনে আছে বলে সবাই আঘাত পাক তাই তিনি চান। এসব তত্ত্বকথা শোনার মত মর্জি আর নেই। এই বলে আকবর আবার মদ্যপান করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ ভৃঙ্গার নিঃশেষিত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে ডাকলো—বান্দা, এই উল্লুক ক্যা বাচ্চা! সরাব লে আও। আউর জাদা সরাব। গুলাবী সরাব। আতরের খসবু মাখা সরাব।

হঠাৎ মনের মধ্যে গান এল। সুরের সুকুমার রাগিনী কোন্ অদৃশ্যলোক থেকে এসে কণ্ঠে সুর পরালো। নেশায় জড়ানো মনে আকবর গান গেয়ে উঠলো।

সেও গান গাইতে পারে, তারও কণ্ঠে গান আছে। তারও মনে সুর আছে। সঙ্গীতকে সে শুধু পছন্দ করে না, অন্তর দিয়ে ভালবাসে।

কিন্তু তার গান কেউ শুনতে পায় না। শ্রোতাকে শোনায় না সে। যখন মনে সুর আসে, সে আপন মনে গান গায়।

আজ কিন্তু আপন মনে গাইলো না, উদাত্তস্বরে নূরউল্লারই এক সঙ্গীত গেয়ে উঠলো। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল হুহু করে গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

তারপর আবার কি ভেবে বিরক্ত হয়ে চোখের জলকেই শাসন করলো।

আমি সম্রাট আকবর শাহ। আমি দিল্লীর সিংহাসনে বর্তমানের বাদশাহ। মুঘল বংশের উজ্জ্বল প্রদীপশিখা। আমার মত সৌভাগ্য ক'জনের আছে, তবু আমার চোখে এত জল কেন? কি দুঃখ

আমাকে পোড়াচ্ছে, যার জন্য কিছুতে নিজেকে প্রকৃতস্থ করতে পাচ্ছি না!

কিন্তু ভুললে কেমন করে চলবে? ভোলা যে যায় না। যা চোখে দেখে মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে, সে যে অদৃশ্য হয় না!

হঠাৎ আকবর চীৎকার করে ডাকলো, এই কে আছিস্?

একটি লোক সেইসময় আবার সরাবপূর্ণ ভৃঙ্গার নিয়ে প্রবেশ করলো। তাকে আকবর হুকুম করলো—একজন খুবস্থরত যুবতী স্থগায়িকা আমার কক্ষে নিয়ে আয়।

নফর দ্বিরুক্তি না করে সেলাম পেশ করে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ আকবর আনন্দে খুশি হয়ে উঠলো। সে বড় হয়ে গেছে। সে স্বাধীন হয়ে গেছে। তার ওপর আর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এখন সে নিজের খুশিতে যা কিছু ইচ্ছে করবে সমস্ত গোলামরা তা তামিল করবে।

সত্যিই এক খুবস্থরত জোয়ানী আওরত সেলাম পেশ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করলো।

আকবরের মনে হঠাৎ সরম জেগে উঠলো। নেশা তখনও তার ছুই চোখে। পালঙ্কের শয্যার ওপর ঢলে পড়ে সে সামনে মেহগনি টেবিল থেকে পাত্র পূর্ণ করে পান করছে।

ছুই চোখে ঢুলুঢুলু আমেজ। হঠাৎ সেই আমেজের মধ্যে আওরতের স্থরতের বহ্নি তার চোখে দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

আওরত অপরূপ সাজে সজ্জিতা। রক্তবর্ণের পোষাকের সঙ্গে পরেছে মূল্যবান জড়োয়ার অলঙ্কার। কানে হীরার কুণ্ডল থেকে আলো বেরিয়ে জ্যোতি ছড়িয়েছে। বক্ষের শুভ্র পেলবতার ওপর মুক্তোর. ঝিকিমিকি। চোখ ছুটি থেকে কি এক মোহিনী মায়া ঠিকরে পড়ছে।

সেই মুহূর্তে আকবরের মনে রাজপুত কন্যা শিবালীর কথা

মনে এল। ঠিক এমনি ছুটি চোখ। যেন সেই চোখের ছায়া এই ছুটি চোখের দৃষ্টির মধ্যে।

শিবালীর জন্যে হঠাৎ তার মনটা কেমন করে উঠলো। কে জানে, সে ভাল আছে কিনা! অন্তঃপুরে মা হামিদা তাকে আরামের মধ্যে রেখেছেন কিনা!

এখন যদি সে শিবালীকে দেখতে চায়, কেমন হয়? এখন নিশ্চয় তার অভিভাবক আর রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে শাসন করবে না। তার শাসনের ভিত যে আলগা হয়ে গেছে। সে যে এখন নিজের আচরণেই নিজে লজ্জিত।

তার ইচ্ছেকেই এখন সকলে মেনে নেবে। সে যে এখন দারুণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। মানুষ খুন করতেও তার দ্বিধা হবে না!

মনে মনে নিজের স্বাধীন ক্ষমতায় প্রীত হয়ে আবার বান্দাকে ডেকে হুকুম করলো—এক নয়া রাজপুত আওরত রাজমাতার কাছে জিম্বা আছে, উসকো জলদি লে আও। উসকো নাম, শিবালী।

বান্দা চলে গেল সেলাম করে।

এবার আকবর বয়স্কমানুষের মত গম্ভীরস্বরে নতমস্তকে দণ্ডায়মানা আওরতকে আদেশ করলো—আচ্ছা গানা পেশ কর।

সুললিতকণ্ঠে মাধুর্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে, সুর্মালাঞ্ছিত চোখের তারায় বিদ্যুতের বহ্নি জ্বালিয়ে একটি প্রেমের গান গাইতে লাগলো মেয়েটি।

গানের ভাষাতে ছিল আগুনের উত্তাপ, তাছাড়া কমনীয় রমণীর দেহের ঐশ্বর্যে আকবরের নেশা জড়িত চোখের দৃষ্টি পড়ে কেমন যেন তাকে রোমাঞ্চিত করে তুলছিল। স্ফীতকায় বক্ষের দিকে তাকিয়ে আকবরের দেহ কেমন যেন শিহরিত হচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে রক্তিম চোখ ছুটি গায়িকার গানের সাথে ছন্দ রেখে পা

থেকে মাথা পর্যন্ত বুলিয়ে নিচ্ছিল। এমন করে খুঁটিয়ে একটি যৌবনবতী নারীকে দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম।

সে অনুভব করতে লাগলো যেন সে সব ভুলে যাচ্ছে! সুরা তাকে যা ভোলাতে পারে নি, নারীর সৌন্দর্য তাকে তা মুহূর্তে ভুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এমন হল, গায়িকার গান আর তার মন আবোরিত করলো না, গায়িকার যৌবনমণ্ডিত দেহের রমণীয় সৌন্দর্য তাকে সব ভুলিয়ে দিল।

সুরার পাত্র রেখে তাই সে রমণী সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলো। এমন করে অভাববোধ তো কখনও সে অনুভব করে নি, তাছাড়া এমনি চাহিদাও তার কখনও মনে আসে নি! সে বালক, অপরিণত! এখনও সময় হয় নি পৃথিবীর অন্যদিকের পরিচয় লাভ করবার—এই শাসনের জন্যেই কৌতূহল ছাড়া তার কোন প্রত্যাশা ছিল না। আজও হয়তো হত না, যদি না আজ অবাধ্যতার পরিচয় দিত। অথচ এই অবাধ্যতার জন্যে অন্যপক্ষ এমন এক বিড়ম্বনায় পড়েছে, নিষেধের সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

সেই জন্যে তার কক্ষে রমণীর প্রবেশের অধিকার মিলেছে।

কিন্তু আকবর মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিল, দুনিয়ার এই আওরতের ক্ষমতা দর্শনে। সুরা যে কদিন ধরে তাকে বশ করতে পারলো না, আওরত পারলো এক মুহূর্তে। তবে কি এজন্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ পুরুষ আওরতের কাছে বশীভূত? তাদের বংশের সব পুরুষেরাই আওরত কবলিত। তৈমুর, বাবর, হুমায়ুন, শেখ মীর্জারা সকলেই আওরতের গোলাম।

হঠাৎ আকবরের স্মরণ পড়লো মাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মোহমুক্তি ঘটলো। বেইমান, অবিশ্বাসিনী, চরিত্রহীনা এই আওরত জাতি।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত নেশার আমেজ অপসারিত

হল। গায়িকার দেহের সৌন্দর্যে মনে হল বিষের প্রলেপ জড়ানো আছে। বিষধর সর্পের মত ফণা তুলে প্রথমে ছোবল না দিয়ে গোপন করে রাখে ফণাটি। তারপর ধীরে ধীরে মনের মধ্যে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে আবেশের রক্তিম মুহূর্তে ফণা উত্তোলিত করে।

এ না হলে তার মা হামিদা বানু এমন হলেন কেন?

মাকে আর চিন্তা করতে কেমন যেন ঘৃণা জাগে? অথচ এই মায়ের গর্ভে সে জন্মেছে। আজ তার মনে হচ্ছে, এই মায়ের গর্ভে না জন্মালেই বুঝি মঙ্গল ছিল। কিন্তু তাহলে জন্মাতো কেমন করে? অন্য গর্ভধারিণী হলেও তো সেই অবিশ্বাসের কাজ করতো?

চিন্তা থেকে হঠাৎ সে সরে এসে গায়িকার দিকে চেয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বিরক্ত হয়ে বললো—গানা বন্ধ করে চলে যাও।

গায়িকা তখনও গান পেশ করছিল, হুকুম না হলে থামতে পারবে না বলেই করছিল। শ্রোতার হুকুম পেয়ে সে আর দ্বিরুক্তি না করে অদৃশ্য হল।

আকবরের তখন শিবালীকে মনে পড়েছে। শিবালীও তো আওরত, সেও কি একদিন এমনি অবিশ্বাসিনী হতে পারে?

এই সময় যে বান্দা শিবালীর খোঁজে গিয়েছিল, সে এসে জানালো, বেগমসাহেবা কোন উত্তরই দেন নি রাজপুত লেড়কির সম্বন্ধে। তবে খাসবাঁদী জানালো, ঐ নামের কোন রাজপুত লেড়কি মহলমে নেই।

নেই?

হঠাৎ আকবর উঠে দাঁড়ালো—আম্মি উত্তর পেশ করা মনে করলেন না? এতদূর অবজ্ঞা? তবে তাই হোক্। নেমে আসুক বিচ্ছেদ। চলে যাক্ মায়া। ঐশ্বর্যের পাদপীঠ থেকে দৈন্যের পথে পৌঁছোক। ফকিরী জীবনে যদি কিছু পাওয়া যায় তাই মূল্যের। আর যদি মৃত্যু আসে তবে পরম শান্তি মিলবে অন্যলোকের সংসর্গে।

আকবর কাউকে কিছু না বলে সাধারণ পোষাকে সজ্জিত হয়ে নিজের অশ্বটি নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লো।

শাস্ত্রী পাহারাদার সম্রাটকে না চিনতে পেরে চীৎকার করে বললো —তফাৎ যাও হুশিয়ার, ঘোড়সওয়ার!

১১

তুনিয়ার বাইরে কোন আশ্চর্য বস্তু নেই, তার ভেতরেই আছে যত রহস্য, গোপনতা।

আর মানুষই সেই রহস্য সৃষ্টি করেছে। মানুষের মধ্যেই আছে সেই রহস্যের বৃহৎ ভাণ্ড। ভাণ্ড বুঝি কখনও শেষ হবে না। সৃষ্টির কাল থেকে এই ভাণ্ড উপুড় হয়ে আছে, তরল পদার্থের মত গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। শেষ নেই। লয়ও নেই।

শেষ হয়ে গেলে মানুষের সৃষ্টিরও শেষ হয়ে যেত। তাই বুঝি চিরকাল নব নব রহস্য স্তরে স্তরে শিলার মত বুকের জমিনে জমা হয়ে আছে। যত মানুষ তত পথ, তত অভিনব রহস্য। আর সেই রহস্য বুঝি এই নারী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে।

হামিদা বানু পতিপ্রেমে গর্বিতা ছিলেন। কুমারী জীবনের যে কামনা ছিল, বিবাহের পর আর তা স্থায়ি হয় নি। হুমায়ূনের বৈমাত্র ভাই হিন্দাল তাঁকে দেখে মহব্বত দান করেছিলেন। হিন্দালকে তিনিও যে চান নি এমন নয়। সম্রাট পুত্র হিন্দালের রূপও ছিল, গুণও ছিল, তাছাড়া ছিল একটি রমণীকে ভালবাসার মত ক্ষমতা। হুমায়ুন যদি সেদিন আশ্রয়ের জন্যে বিমাতা দিলদারের কাছে না আসতেন, না দেখতেন হামিদাকে তাহলে হয়তো হিন্দালই লাভ করতো হামিদার মত রমণীরত্নকে।

কিন্তু সবই ভবিতব্য। কোথায় ছিলেন হুমায়ুন, কোথা থেকে

কোথায় এসে হামিদার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলেন। অবশ্য তার জন্যে পরে হামিদার মনে কোন অনুশোচনা জাগেনি। এমন একধরণের নিবিড় সোহাগ ভালবাসার রঙে রাঙিয়ে বাদশাহ হুমায়ুন পত্নীকে দান করেছিলেন, যা কেউ কখনও দান করতে পারে না। তাই হামিদা অতীতের সব ভুলে প্রিয় সান্নিধ্যে নিজের রমণীমনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

অন্তত স্বামী বেঁচে থাকা পর্যন্ত অন্যপুরুষের কথা বেগম মহিষী কখনও ভাবতেন না। সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে, হিন্দালের মৃতদেহ যখন শিবিরের সম্মুখে আনা হল।

অথচ এই হিন্দালই একদিন ভ্রাতার ওপর যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু সেই ভ্রাতার সপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েই মৃত্যুকে বরণ করলেন। হিন্দাল যথেষ্ট ভালবেসে ছিলেন হামিদাকে। ভালবেসেছিলেন বলেই ত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। ত্যাগের মধ্যে দিয়েই মহৎ জীবনের দিশারা। হিন্দাল সত্যিই মহৎ ছিলেন। ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হলেও পরে শ্রদ্ধার মাঝে ভ্রাতাকে আপন করেছিলেন। মাতা দিলদারের কথায় প্রিয়তমাকে উৎসর্গ করে ভ্রাতার গুরুত্বকে মেনে নিয়েছিলেন এবং ভ্রাতারই জন্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সমরে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন।

এ মহৎ প্রাণের বুঝি কোথাও তুলনা মেলে না। বাদশাহ পুত্ররা শুধু স্বার্থের জন্যে হানাহানি, রক্তারক্তি করেছে এই ইতিহাসে লেখা আছে কিন্তু হিন্দালের মত বাদশাহ পুত্রদের নিঃস্বার্থ মনের মহৎ মনীষার কোন ইতিহাস লেখা হবে না।

হুমায়ুনের সকল ভ্রাতাই তাঁর শত্রুতা করেছেন, হিন্দালও কম করেন নি। তবে সে শত্রুতা প্ররোচনার দায়ে পড়ে করেছেন। আসলে তিনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুমায়ুনকে পরিবারের অন্যান্যের মত শ্রদ্ধা করতেন।

ভ্রাতৃবৎসল এই হিন্দালকে পরে হুমায়ুন বুঝতে পেরেছিলেন, যখন তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ শিবিরে আনীত হয়েছিল।

প্রথমে নৈশ সেই অভিযানে হিন্দালের মৃত্যু গোপন করে রাখা হয়েছিল। গোপন করার কারণ সৈন্যরা নিরুৎসাহ হয়ে ছত্রভঙ্গ হতে পারে, তাতে আরো বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু বাদশাহ ভগ্নী গুলবদনের স্বামী খাজা খিজর খাঁ এসে চুপি চুপি বললেন—হুজুর, জনাব হিন্দাল সাংঘাতিক আহত নয় শুধু তিনি নিহত হয়েছেন।

সেই সময় হুমায়ুনের কাছে ছিলেন মহিষী হামিদা ওরফে জুলিবেগম। হঠাৎ জুলিবেগম এই দুঃসংবাদ শুনে কেমন এক অস্বাভাবিক শব্দ করে উঠলেন। পতির বাহুবন্ধনে হামিদা আবদ্ধ ছিলেন, হঠাৎ কেমন যেন তার বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। তিনি অল্প ব্যবধান রচনা করে চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর সেই কুমারী প্রেমের দাবদাহে দগ্ধ হয়ে, শোকার্তা হয়ে উঠলেন।

হুমায়ূন পত্নীর অদ্ভুত আচরণে অভিভূত হলেন।

খিজর খাঁ তখনও আদেশ পালনের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

হঠাৎ হামিদা ক্রন্দনমুখরিত খিজর খাঁর সামনে গিয়ে বললেন—কোথায় রেখেছ সেই নিহত রাজকুমারের মৃতদেহ, আমাকে একবার দেখাতে পারো?

খিজর খাঁ একান্ত অনুগতের মত নিম্নস্বরে বললেন—কিন্তু বেগম সাহেবা, আপনাকে দেখানো তো সম্ভব নয়? শাহাজাদার মৃতদেহ আছে গোপনে আমারই শিবিরের একান্তে। সেখানে বিশেষ পাহারা দিয়ে তার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়েছে।

কিন্তু আমি যে একবার দেখবো? একটিবার কি আমাকে দেখাতে পারো না সাহেব?

কেমন যেন হামিদা বিবি পাগলের মত খিজর খাঁর হাতদুটি গিয়ে ধরলো।

খিজর খাঁ ইতস্তত করে বাদশাহের দিকে তাকালেন। বাদশাহ তখন অভিভূত, বিস্মিত হয়ে কি যেন ভাবছেন।

উত্তর খিজর খাঁই দিলেন—মাপ করতে হবে বেগম আলী শাহী, এ সময় নিহত রাজকুমারকে দেখাতে গেলে সৈন্যদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে।

কোন উপায় নেই ?

না, উপায় থাকলেও সুযোগ নেওয়া হবে না। তোমার কোমল হৃদয়ের মাঝে দৃঢ়তার আচরণ পরাও। হুমায়ুন কেমন যেন পত্নীর দিকে তাকিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন।

গোপন কিছুই ছিল না। বেগম নিজেকে আর রোধ করতে পারেন নি। বেরিয়ে পড়েছিল তাঁর মনের আসল কঙ্কাল। তাঁর কুমারী জীবনের সেই প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস, যা পরবর্তী স্রোতে সমুদ্রের জলে ধৌত হয়ে গিয়েছিল। ধৌত যে হয়ে যায় নি, তা দেখেই হুমায়ুন সেই মুহূর্তে ভ্রাতার বিহনের শোকে মুহ্যমান না হয়ে পত্নীর আচরণের জন্যে আঘাতের বেদনায় জর্জ্জড়িত হলেন। আর সেইজন্যেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অমনি কঠিন দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাষা।

তারপর হুমায়ুন খিজর খাঁকে হুকুম করলেন—গোপনে ভ্রাতার মৃতদেহ তারই জায়গীর জুই-শাহীতে যেন সমাধিস্থ করা হয়।

খিজর খাঁ হুকুম নিয়ে চলে গেলে হুমায়ুন শাহ আর একবার স্তব্ধ হয়ে প্রিয়তমা পত্নীর দিকে তাকালেন।

হামিদা তখন মাথাটা নীচু করে পাগলের মত হাহুতাশ করে কেঁদে চলেছেন। তাঁর দুটি চোখ দিয়ে অশ্রু দরবিগলিত ধারায় নির্গত হচ্ছিল, তার শেষ কোনদিন হবেনা বলেই মনে হল। এ অশ্রু যে একদিনের নয়, অনেকদিন ধরে জমে জমে তবে এমনি অপর্যাপ্ত হয়েছে, তাই প্রমাণ করলো।

সে কথা বুঝে একবার হুমায়ুন মনে মনে ক্ষিপ্ত হতে গেলেন।

পত্নীকে বেইমান বলে পরিত্যাগ করতে বাসনা জাগলো। অভিমান হল। এতদিনের এত সোহাগ, এত সান্নিধ্য, বিলাসমনকে সংযত করে, এই একজনের মাঝে নিজের হৃদয় সঁপে দেওয়া, সবই তাহলে মিথ্যে! আসলে বেগমের মনে ছিল পূর্বজীবনের সেই স্মৃতি! মহব্বত! দিলের মধ্যে ছিল হিন্দাল!

অনেকক্ষণ ধরে এক বিরাট জ্বালার মাঝে আত্মাহুতি দিয়ে নিজেকে হুমায়ুন প্রকৃতস্থ করার জন্যে যুদ্ধ করলেন।

এদিকে সময়ও অল্প, এখুনি শিবির পরিত্যাগ করে যুদ্ধে গিয়ে যোগদান করতে হবে। ভেসে আসছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে সৈনিকদের মরণ আর্তনাদ।

বেগম কাঁদছে। সে কেন কাঁদছে তার অর্থ পরিষ্কার। আর সেইজন্যে অন্তরে জ্বালার প্রদাহ। তার চেয়ে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে এখুনি সাংঘাতিক আহত হতে পারতেন, মনে হয় ভাল হত। সে জ্বালা বুঝি সহ্য হত।

হুমায়ুন শাহ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই দিনটির কথা কোনদিন ভোলেন নি। সেদিন যে অসুবিধায় পড়েছিলেন, এমন অসুবিধায় বুঝি আর কখনও পড়েন নি বিশেষ করে একটি আওরতের কাছে তাঁর এই অবমাননা!

অন্য কেউ হলে এখুনি এই বেইমানের শাস্তি তিনি দিয়ে দিতেন। কোমরের বন্ধনী থেকে ইস্পাহানী ছোরাখানা বের করে আমূল ঐ কুসুম বক্ষে ঢুকিয়ে দিতেন কিন্তু তা যে হবার নয়, ঐ জুলিবেগমই তার প্রমাণ। দুনিয়ার সবাইকে হয়তো নির্মম শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে পারেন, পারেন না এই রমণীকে কোন আঘাত করতে। আঘাত করলে সে ব্যথা নিজের বুকে বাজবে। হৃদয়ের সবটুকু মমতা যার জন্যে ব্যয় করেছেন, তার আচরণ এ যে ক্ষমারও অযোগ্য। তবু নিরুপায় তিনি। হৃদয়কে অস্বীকার করতেও পারবেন না, বেগমকে বলতেও কিছু পারবেন না।

বেগমের কান্না উপশমের জন্যে কাপুরুষের মত সান্ত্বনার বাণী আওড়াতে পারবেন। হ্যাঁ, সান্ত্বনাই দিতে পারবেন।

বেগম কাঁদছে দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তার কান্না যাতে রুদ্ধ হয়, তার জন্যে ভালো ভালো সোহাগের কথা বলতে হবে। হুমায়ুন তাই বললেন।

মরিয়ম রোনা মৎ। দুনিয়ায় খোদার ইচ্ছাকে মেনে নিতেই হবে। তোমার আমার বেদনা দরিয়ার পানির সাথে মিশে যাবে। জিন্দেগী বরবাদ করতে এই দর্দ ভুলে যাও। আসমানের নীল রঙের দিকে তাকিয়ে দেখো, তাহলেই বুঝবে, কোথাও নেই কারো সান্ত্বনা।

কিন্তু হুমায়ুন আর ভাল কথা বলতে পারলেন না। কেমন যেন নিজেকে বড় ছোট মনে হল। নিজেকে মনে হল বড় অসহায়। তাঁর পত্নী কাঁদছে তার দিলের মাশুকের বিহনে, আর তিনি তাকে সান্ত্বনা দান করছেন? তিনি কি মানুষ নামের বাইরে এসে পশুর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন? যে কাঁদছে কাঁদুক। তার শোক নিবারণ হলে কান্না এমনিই শুকিয়ে যাবে।

এই কথা ভেবে হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্যে বেগে সেস্থান পরিত্যাগ করলেন।

এসব কথা আজ বিস্মৃতি। এ চিত্র অতীত। আজ হুমায়ুন বাদশাহ চলে গেছেন কিন্তু একজন এখনও আছে। তার কি মনে এসব স্মৃতি গুজরায় না!

দোষ হামিদা হয়তো কিছুই করেন নি কিন্তু দোষ না করলেও অপরাধের আবর্তে অনেক দোষ আপন থেকেই হয়ে যায়। হামিদার জীবনের এইসব ঘটনা তাকে উপলক্ষ্য করেই ঘটে গেছে। অথচ তার জন্যে তিনি কতখানি দায়ী, এ অর্থ বিচার্য।

আর একজন পুরুষ বৈরাম খান।

বৈরাম খানকে দুঃসাহসী করেছিলেন হুমায়ুন শাহ। হুমায়ুন

শাহের একটি দোষ ছিল, যাকে ভালবাসতেন তাকে দারুণভাবে বিশ্বাস করতেন। অন্ধ সেই বিশ্বাস। উদারতাই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বল অংশ। উদার হৃদয় দিয়ে যেখানেই প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে গেছেন, সেখান থেকেই রক্তাক্ত ছুরিকার হুমকি এসে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে।

তাঁর রাজ্য হারানোর প্রধান কারণই হচ্ছে এই।

বৈরাম খানের বেলাতেও তাই হয়েছিল। আর খানসাহেবও যথেষ্ট ধূর্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাদশাহের বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্যে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিকটি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তাই বাদশাহ্ অন্ধভাবে বৈরাম খানকে নিজের অন্তরের তুল্য আপন ব্যক্তিহিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বৈরাম খান বয়েসে তরুণ হলেও ছোটবেলা থেকে চতুরতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন।

মাদ্রাসায় একসঙ্গে শাহাজাদা হুমায়ূনের সঙ্গে পড়াশুনা থেকে। চাঘতাই মুঘলবংশের কেউ নয়। ধর্মে শিয়া। তবু তার সাথে হুমায়ুনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। আর গরীব বংশের ছেলে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সম্রাট পুত্রের স্বভাবের সাথে বশ্যতা স্বীকার করে নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছিল।

অদ্ভুত এই ব্যক্তি বৈরাম খান। অদ্ভুত চতুর ও বুদ্ধিবিশিষ্ট। নিজের কোন উদ্দেশ্যই মনে রাখেন নি। সম্রাটের লক্ষ্য তার জীবনের শপথ। মুঘল বংশের রাজত্ব কায়েম করবার জন্যে তার সর্ব্বোমুখী চেষ্টা। বন্ধুত্বের শপথ চিরস্থায়ী করবার জন্যে তার জীবন উৎসর্গীত।

যে কোন বুদ্ধিমান লোকই বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে এমনি এক আদর্শ বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়ে। অন্তর্নিহিত ভাব যাই থাক। সন্দেহজনক কোনকিছু না চোখে পড়লেই বিশ্বাস দৃঢ় হবে। হুমায়ুনের সেই জন্যে বিশ্বাস হয়েছিল।

তাছাড়া হুমায়ুন ছিলেন এমনিই উদার ও হৃদয়বান। চরিত্রের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি গুণের ইন্ধন অধিক পরিমাণে ছিল। তাই বিশেষ বেগ পেতে হয় নি বৈরাম খানকে হুমায়ুনের প্রীতি লাভ করতে।

সেইজন্যে হুমায়ুন দিয়েছিলেন সর্বোপরি অভিভাবকত্ব তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আকবরের।

আকবরের সমস্ত কৈশোরটি বৈরাম খানের ছায়াতেই আতঙ্কিত হয়েছিল। আকবর অত্যাচারিত হত। বিদ্রোহী হত। পিতার কাছে অভিযোগ পেশ করতো কিন্তু কোন সুরাহা হত না।

হুমায়ুন বলতেন—তুমি আমার বন্ধুকে পিতার মতই জ্ঞান করবে। পিতার নামে যেমন কোন অভিযোগ করা যায় না, তেমনি কোন বিক্ষোভ মনে পোষণ কোরো না। আমি যাকে বিশ্বাস করেছি, তাকে নিজের চেয়ে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করি।

এমনিই অন্ধ বিশ্বাস হুমায়ুনের। পুত্রকেও অস্বীকার করে বন্ধুকে বিশ্বাস করেছেন।

কিন্তু একজন শুধু এই ধূর্তলোকের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি হামিদা। জুলিবেগম। মরিয়ম মকানী। অন্তঃপুরের লক্ষ্মী। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। হারেমের জৌলুস। সম্রাটের প্রেয়সী।

তিনি এই বৈরাম খানকে চিনতে পারেন। কিন্তু নিরুপায় স্বামীকে তার পরিচয় দিতে গেলে পরিবর্তে স্বামীর কাছ থেকে অশ্রদ্ধা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অথচ শয়তান তার জাল বিছিয়েছে। পরিণামে কি হবে কে জানে?

শুধু তার ভয় করতে লাগলো একটিমাত্র সন্তানের জন্যে। আকবরের ওপর ঐ শয়তানের দৃষ্টি বেশি। যদি কোন চক্রান্ত মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে আকবর হারিয়ে যাবে।

এই কথা ভেবেই একদিন তিনি গোপনে বৈরাম খানের সঙ্গে মিলিত হলেন।

কাজটা অবশ্য খুব গর্হিত। হারেমের জেনানা পরপুরুষের কাছে দর্শন দেওয়া, মুঘল রাজবংশের আইনে নিষিদ্ধ। সম্রাট হুমায়ুন যদি জানতে পারতেন তাহলে প্রিয়তমা বেগমের কি বিচার করতেন, চিন্তার বিষয়। অবশ্য সেই জেনেই হামিদা বিশেষ নিরাপত্তার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে একজনমাত্র এই ঘটনাটি জানতো। হামিদার বাঁদী ছিল অনেকগুলি, তারা মধ্যে খাঁসবাদীও কয়েকটি। এরই মধ্যে থেকে সঈদাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন।

সঈদা বিশ্বাসী ছিল, অন্তত বেগমকে সে যথেষ্ট পেয়ার করতো। এরই তত্ত্বাবধানে একদিন গভীর নিশিতে হামিদা বৈরাম খানকে ডেকে পাঠালেন।

কাজটি সত্যিই দুঃসাহসের মত। তবু উপায় কি? একমাত্র সন্তানের নিরাপত্তা দরকার। তার জীবন রক্ষা না হলে মাতৃত্ব নিশ্চিহ্ন হবে। আর কোন সন্তান গর্ভে এল না। কেন এল না সে জানে না? মনে হয়, স্বামীরই অপরাধ। অতিরিক্ত বিলাস-জীবন যাপনের জন্যে জননশক্তি লোপ পেয়েছে। অথচ তিনি স্বীকার করেন না। বললে, হাসেন।

প্রথম বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখের প্রথম প্রবল উন্মাদনায় আকস্মিক একটি ফল লাভ হয়েছিল। সেই সম্পদ। দুর্লভ সে সম্পদ। এই একটি ফল লাভ না হলে যে কি হত? রমণী পুরুষের সব সম্বন্ধই শিথিল হয়ে যেত। থাকতো না কোন সোহাগ, কোন নিবিড় সুখের উচ্ছ্বাস ভরা স্বপ্ন কল্পনার সীমাহীন আবেগ। তখন সম্রাটকে মনে হত শয়তান। অক্ষম এক অযোগ্য পুরুষ

রমণীর চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাকে মাতৃত্ব দেবার মত শক্তি নেই, সুতরাং সে পুরুষের অধীনতা কোন্ রমণী চায়?

আজ দ্বিতীয় সন্তান থাকলে আর এই গোপন পরামর্শের দরকার হত না। মনে হচ্ছে, তার এই একটি মাত্র গর্ভের সন্তানকে নিয়ে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে।

আকবরের বিপদ আসার আরো একটি কারণ মনে জাগছে, বৈরাম খান বয়েসে তরুণ হলেও তার প্রতি সে আকাঙ্ক্ষিত। যা দু-একবার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, তাতে তার চোখের ভাষা সে পড়েছে। রমণী চিরকালই পুরুষের দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করতে পারে।

বৈরাম খান যে সৎ নয়, এই দৃষ্টিই তার প্রমাণ। সেদিনই সে ইচ্ছে করলে সম্রাটকে বলে একটা বিশ্রীকাণ্ডের উদ্ভব করতে পারতো। কিন্তু লাভ তাতে কিছু হত না। বৈরাম খান ধূর্ত। বন্ধুকে ঠিক বুঝিয়ে দিতেন।

আর সে নিজে বোকা হয়ে যেত! কারণ প্রমাণ কই? দৃষ্টির অর্থ দিয়ে তো কাউকে অপরাধী করা যায় না! তাছাড়া সম্রাট তখন বন্ধুপ্রেমে এমন আত্মহারা যে স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন, তবু বন্ধুকে করতেন না।

এমনিই তখনকার পরিস্থিতি।

আজও সেই অবস্থা। হয়তো ধরা পড়লে তার দুর্নাম হবে, বৈরাম খান বেঁচে যাবে। এরই মধ্যে বাদশাহের হারেম থেকে তিনটি যুবতী হস্তান্তরিত হয়েছে। নয়া খুবসুরত আওরত যখন বাদশাহের ইন্তেজারের জন্যে রঙমহলে এসে প্রবেশ করেছিল, তখন তাদের কেমন করে যেন বৈরাম খান দেখেছিলেন।

তারপরই প্রার্থনা ও দরবার।

বাদশাহ সম্রাট খুশিমনে বন্ধুকে উপঢৌকন দিয়ে দিলেন।

বাদশাহ বোধ হয় বন্ধুর প্রার্থনায় তাঁর প্রিয়তমা বেগমকেও

দিতে পারতেন, যদি বৈরাম খান চাইতেন। তবে বৈরাম খান নির্বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

কিন্তু হামিদা কেমন যেন সম্রাটের এই বন্ধুপ্রীতি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর নিজেরই মনে হল, একটা কিছু অঘটন ঘটুক। একটা বিশ্রী এমন কিছু ঘটুক, যাতে সম্রাটের চৈতন্যোদয় হয়। তার বিশ্বাস মর্মর সোপানের মত ভেঙে পড়ে।

হামিদা অবশ্য সেইজন্যে বৈরাম খানের সঙ্গে গোপনে মিলতে চাইলেন না। এই শয়তান প্রকৃতি ধূর্ত ব্যক্তির অভিপ্রায় কি? কেন তিনি আকবরের ওপর অত্যাচার করে তাকে আঘাত করছেন? এই জানার জন্যেই এই অভিসার রচনা করলেন।

তার অতলান্ত দৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? চোখের কালো তারার মাঝে কি অভিজ্ঞা পোষণ করে সঙ্গোপনে এক অভিনব সুখ লালন করছেন? দৃষ্টি কি তবে বন্ধুর প্রিয়তমার প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ? তার দুধসাদা বর্ণ, সুষমামণ্ডিত দেহ, বেহেস্তের অপরূপ ছটার মত দেহ লালিমা দেখে নিজের যৌবন লাঞ্ছিত সুকুমার বলিষ্ঠ পুরুষ অঙ্গ চঞ্চল হচ্ছে!

তবে কি স্মরণ করিয়ে দেয় সরহিন্দ যাত্রার পথে সেই স্মরণীয় জীবন রক্ষা!

সম্রাটের সঙ্গে সেদিন ছিল আরো অনেক রমণী। বিস্তৃত সৈন্যসামন্ত নিয়ে একটি বাহিনী পরিবৃত হয়ে সম্রাট চলেছিলেন সরহিন্দ জয় করতে।

চলতে চলতে রাত্রি আসতে একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশিত হয়েছিল। স্থানটি খুব মনোরম ছিল না। বরং দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জঙ্গলে হিংস্র জন্তু থাকাও বিচিত্র নয়। তবু উপায় ছিল না বলে রাত্রিটুকু অতিবাহিত করবার জন্যে তাঁবু খাটানো হল।

সারি সারি তাঁবুর বেষ্টনীর মধ্যে সম্রাটের বিস্তৃত বাহিনী। ভিন্ন কটি তাঁবু আলাদা ভাবে স্থাপন করে হারেমের ব্যবস্থা হল। শুধু হামিদা থাকলেন সম্রাটের পাশে। তাঁর আলাদা অবস্থান সম্রাট নাকচ করে দিলেন। সেদিনের রাত্রিটি ছিল বড় ভয়ঙ্কর। আকাশে ছিল না কোন আলো। শুধু ভূসো কালি লেপা মসীলিপ্ত অন্ধকার। কেমন যেন থমথমে।

প্রকৃতির জন্যেও হতে পারে, তবে সাধারণত সম্রাট যুদ্ধের আগে কেমন যেন বিমনা হয়ে যেতেন। হয়তো তার মনে হত, তিনি এই যুদ্ধেই নিহত হবেন। আর সেইজন্যে তিনি সুখের মাঝে থাকতে চাইতেন। পৃথিবীতে যত সুখ আছে, এই যুদ্ধের আগে তিনি তা উপভোগ করে নিতেন।

বাদশাহের স্বভাবের এই ধারা প্রায় অনেকেই জানতো। জানতেন হামিদাও। তাই সে রাত্রে তিনি স্বামীর পাশেই থাকলেন।

অনেক রাত্রে যখন স্বামী নিদ্রিত হয়ে পড়লেন, হামিদার ঘুম না আসার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সারি সারি দু-পাশে তাঁবু পড়েছে। অন্ধকারে তাঁবুর সারিই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, আর কোন শব্দ নেই। মনে হয় বিস্তৃত বাহিনীর লোকেরা ঘুমিয়ে গেছে।

আকাশে তখনও কোন আলোর রেখা ফোটেনি। তবে একটু তরল হয়েছে অন্ধকার। সেই আবছার মাঝে দেখা যাচ্ছে সামনে চাপ বাঁধা গভীর জঙ্গল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের উঁচু মাথা সেই জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে আকাশ চুম্বী হয়ে আছে।

হামিদা ভাবছিলেন আগামী যুদ্ধের কথা। স্বামী যদি এই যুদ্ধে নিহত হন? তাহলে তাঁর বাঁচবার পথ কোথায়? কে দেখবে তাকে? কে আশ্রয় দেবে এই ভাগ্যহীনা রমণীকে? তাছাড়া বিজয়ী ব্যক্তিও তাকে ছাড়বে কেন? নিয়ে যাবে ধরে। কেড়ে নেবে তাঁর রমণী কৌস্তভ রত্নটি।

এই সব কথা তিনি প্রতিটি যুদ্ধের আগেই ভাবেন। পরিণতিটা ভেবে কেমন যেন শিহরিত হল! কি নিরুপায় অবস্থা? কি ক্ষণস্থায়ী জীবন?

সম্রাটের কর্তৃত্বাধীনে তাদের সযত্নে লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখার কত চিন্তা, তাদের সুখে রাখার জন্যে কত পরিকল্পনা।

যেই সম্রাট নিহত হলেন কোথায় গেল তাঁর রাজসিকতা। তখন এক একটি রমণীর মূল্য কানাকড়িরও সমান নয়। বরং অন্যান্য আসবাবের যা মূল্য আছে লুণ্ঠিতা বেগমদের সে মূল্য নেই। হয়তো সাধারণ সব সৈন্যদের উন্মত্ত পাশবিকতার মাঝে পড়ে রক্তাক্ত হয়ে কোথায় যন্ত্রণার মাঝে লীন হয়ে যাবে।

এই সব কথাই হামিদা ভাবেন, যখন স্বামী যুদ্ধে যান।

আজ এই উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আবছায়া অন্ধকারের মাঝে তাকিয়ে সেই কথা ভাবছিলেন, হঠাৎ তিনি আঁতকে উঠলেন। পায়ের অগ্রভাগে কি যেন দংশন করলো? প্রচণ্ড জ্বালা ও যন্ত্রণা। পায়ের শিরা থেকে কি যেন উত্তপ্ত হয়ে ওপর দিকে উঠে আসছে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে তীব্র এক সীমাহীন অগ্নিপ্রদাহ।

হঠাৎ অন্ধকারে হামিদা দেখতে পেলেন বিষধর সর্প। অন্ধকারে ফণা তুলে তখনও তার সামনে জ্বলছে। ক্ষুধিত তার দুই চোখে কি যেন এক বিজাতীয় আক্রোশ। একটি কামড়ে তার সবটুকু আক্রোশ ঢেলে দিতে পারে নি, দ্বিতীয় দংশন সৃষ্টি করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আর চিন্তা করতে পারলেন না হামিদা। পরিত্রাহি চীৎকারে সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করে অসংখ্য তাঁবুর মানুষগুলিকে জাগিয়ে দিলেন।

মুহূর্তে অনুচররা এসে সেই বিষধর সর্পটি তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী করে দিল।

সর্পটির তখন আর নড়বার সামর্থ্য ছিল না। মানুষের বিষ

শরীরে প্রবেশ করে তাকে বিষভাবে অবনত করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় দংশন করবার তার শক্তি ছিল কিনা কেউ জানে না। হয়তো ছিল না কারণ যখন অনুচররা আঘাত হানলো, তখন তার ফণাটি নিঃশব্দে দোদুল্যমান। এমন কি হামিদার পরিত্রাহি চীৎকারেও সে মনে হয় আর অবনত হতে পারে নি। শক্তি নিঃশেষিত হয়ে বিষের ক্রিয়ায় অবসন্ন। সে যদি দ্বিতীয় কামড় রচনার জন্যে প্রস্তুতি না করে পলায়ন্যোদ্যত হত, তাহলে বোধ হয় এই মৃত্যু তার ঘটতো না।

যাই হোক, এদিকে হামিদার সমস্ত দেহ নীল বর্ণ হয়ে আসছে। তাঁবুতে তাঁবুতে সাড়া পড়ে গেছে। নিদ্রিত আর কেউ নেই। সকলেই সজাগ হয়ে প্রধানা বেগমের জন্যে চিন্তিত। কিন্তু কারুরই কাছে এগোবার হুকুম নেই। সকলেই অন্তরাল থেকে সংবাদ শ্রবণ করছে।

সম্রাট হুমায়ুন তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। প্রিয়তমা মহিষীর এই মৃত্যুনীল যন্ত্রণাক্লিষ্ট বদন দেখে অস্থির হয়ে পায়চারী করছেন।

বাঁদীরা বেগমের পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করছে। এসব ঘটনা এক মুহূর্তেই ঘটে গেছে, তার জন্যে কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হয় নি।

প্রজ্বলিত মশাল সামনে রাখা হয়েছে। হামিদাকে তুলে তাঁবুতে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু তিনি তাঁবুতে যাবেন না। তাঁর গোলাপ ফুলের বর্ণদেহ নীল হয়ে হয়ে কেমন যেন নীলাভ হয়ে আসছে। চোখ মুখ দিয়ে উত্তেজনায় ঘর্ম নির্গত হচ্ছে। দেহের পোষাকেরও তখন আর কোন ঠিক নেই। যে মৃত্যু পথযাত্রী তার আর আবরু রক্ষার দরকার কি ?

এই সময় সম্রাট হুমায়ুন শাহ বালকের মত কেঁদে উঠলেন। অতো বড় একজন বিরাট ব্যক্তি, যাঁর অধীনে শত শত সৈন্য,

যাঁর বাহুতে মত্তহস্তীর বল, তিনি কাঁদছেন তাঁর প্রিয়তমার জন্যে। সম্রাট নাসিরউদ্দীন হুমায়ুন শাহ জঙ্গ বাহাদুর। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট মুঘল যোদ্ধা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবান পুরুষ। তিনি কাঁদছেন বালকের মত একটা রমণীর জন্যে, যে রমণী তাঁর হেফাজতে আছে তখনও সংখ্যাতীত। ইচ্ছে করলে তিনি তখনও হাজার হাজার মোহর দিয়ে পৃথিবীর সেরা সেরা সুন্দরীকে ক্রয় করতে পারেন। হামিদার রূপ তাদের কাছে নিষ্প্রাণ দ্যুতির মতই ম্লান মনে হবে। তবু বাদশাহ তাঁর বিহনেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এই শোক বিহ্বল মুহূর্তে বৈরাম খানের কাছ থেকে এক অনুচর এসে সম্রাটকে কিছু নিবেদন করলো।

সম্রাট শুনেই অস্থির হয়ে বললেন—কিন্তু কোথায় আমার দোস্ত? এতক্ষণ কেন সে আমাকে নিবেদন করেনি। বিলম্বে যে আমি আমার কলিজা হারাতে বসেছি, একি বোঝেনি সে?

বৈরাম খান একটু দূরেই অবস্থান করছিলেন। সম্রাটের অসহায় উক্তি তার কানে প্রবেশ করেছিল। কাছে এসে আদাব করে বললেন—আপনার হারেমের ইজ্জত জনাব, মৃত্যুর চেয়ে ইজ্জতই আপনারা রক্ষা করে থাকেন। তাই এই অধম সাহস করেনি ইজ্জতকে ক্ষুণ্ণ করে এগিয়ে আসতে।

সম্রাট হুমায়ুন তখন তাকিয়ে আছেন ভূলুণ্ঠিতা বেগমের যন্ত্রণা-কাতর দেহের দিকে। বেগমের সংজ্ঞা তখন বোধহয় বিলুপ্ত হয়ে আসছে। অন্ধকার নেমে আসছে সুন্দর দুটি সুর্মালাঞ্ছিত চোখের দৃষ্টির মাঝে।

সম্রাট হুমায়ুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—দোস্ত, দুনিয়ার সব সম্পদের বিনিময়ে আমার এই প্রিয়তমা বেগম। যে রাজ্য ও রাজত্বের জন্যে দিনের পর দিন শ্রম প্রকাশ করছি, তাও যদি বেগমের বিনিময়ে ত্যাগ করতে হয়, আমি রাজী আছি। তুমি

যদি পারো, আমার বেগমের জীবন দান কর। আমি চিরকাল ধরে তোমার গোলাম হয়ে থাকবো।

আর কোন কথা নয়, এবার কাজ। বৈরাম খান মুহূর্তে পরিচারিকাদের দ্বারা হামিদার সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। তারপর সেখানে নিয়ে গিয়ে একান্তে চললো তাঁর শুশ্রূষা।

বৈরাম খান জানতেন সর্পের বিষ তুলে দেহ নির্বাণ করতে। যথাকৃত্য তাই সম্পন্ন করতে লাগলেন।

রাত্রি এগিয়ে চললো নিঃশব্দে। মেঘের আড়ালে চন্দ্রিকা হারিয়ে থাকলো কি? না, তার প্রকাশ রহস্যময়তার ছায়ালোকে আরো ঘন হল! সে যাকগে।

তবে সে রাত্রিটি একান্ত বৈরাম খানের জীবনে নতুন রূপ নিয়ে এসে ধরা দিল।

আজ হামিদা গোপনে সেই জন্যে হাসেন। সংজ্ঞা যে একেবারে তার বিলুপ্ত হয়নি, সে খানসাহেব জানতেন না। বরং যন্ত্রণা আস্তে আস্তে লুপ্ত হতে তার জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় এসে দেহের চেতনা জাগিয়ে রেখেছিল। তখন যন্ত্রণার চেয়ে ভিন্ন পুরুষের শিহরণই তাকে সচেতন করেছিল।

বৈরাম খান সৎবুদ্ধি প্রণোদিত হলে কেন দ্বিতীয় কাউকে তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেননি? এমন কি সম্রাটের হুকুম নিয়ে একটি পরিচারিকা বাইরে প্রহরায় নিযুক্ত থাকা ছাড়া আর কারুর তাঁবুতে অবস্থানের হুকুম ছিল না। সম্রাট চেয়েছিলেন পত্নীর পাশে অপেক্ষা করতে।

তাঁকেও বুঝিয়েছেন বৈরাম খান। আপনি সম্মুখে থাকলে ক্ষতি বৈ লাভ কিছু হবে না। যদি বেগমের জীবন রক্ষা করতে চান

তাহলে নিজেকে বশ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম যান, আপনার পত্নীকে যথা সময়ে আপনার কাছে সুস্থ শরীরে পৌঁছে দেব।

সম্রাট তখন পত্নীকে হারাবার আশঙ্কায় ব্যাকুল। আর তাঁর মনে কিছুই ছিল না, কোন সন্দেহ। তাছাড়া তিনি দোস্তকে দারুণ বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসেই তিনি সবকিছুই ভুলেছেন। এমন কি পত্নীর ইজ্জতের কথাও তাঁর বিস্মৃতির অতলে। বেগমকে পরপুরুষের সামনে বের করা মুঘল রাজবংশের নীতিবিরোধী, সে কথা তাঁর মনে ছিল না। শুধু তখন তিনি পত্নীর প্রাণের আয়ু চাইছিলেন। জীবন ফিরে চাইছিলেন।

হামিদার সংজ্ঞা প্রায় ছিল না। নীল বিষের ক্রিয়া রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল।

জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগলো বৈরামখানের অদ্ভুত বিষ উত্তোলনে।

হামিদার সালোয়ারের অনেকখানি তিনি নিঃসঙ্কোচে তুলে দিয়েছিলেন। বেরিয়ে পড়েছিল দুধে আলতা বর্ণের মসৃণ পুষ্ট পায়ের নিম্নভাগ। বৈরাম খান কি সম্রাট মহিষীর সেই পা-দুখানি দেখে শিহরিত হন নি? যেখানটায় সর্প দংশন করেছিল, সে স্থানটি অবশ ছিল। কি যে সেই মিঞা সাহেব করলেন?

আস্তে আস্তে চেতনা পূর্ণতার মধ্যে এল। পায়ে আর সেই অবশ ভাব নেই। দেহের যন্ত্রণাও অনেক আরামের মধ্যে।

তবু হামিদা সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে থাকলেন। তাঁর তখন মৃত্যু ভয় ছিল না, বরং মজা লাগছিল। এক পুরুষের বাহুবন্ধনে একটানা অভ্যস্ত জীবনের স্রোত থেকে নতুন এক অভিনব জীবনের মধ্যে সাময়িক প্রবেশ করতে কার না মজা লাগে? যদি সেই জীবনের মধ্যে কোন ঝুঁকি না থাকে!

সেদিন যে কোন ঝুঁকি ছিল না, হামিদা বুঝতে পেরেছিলেন।

সম্রাট বেগমের প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্যে সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই রাজী ছিলেন।

আর খোদা বৈরাম খানকে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন।

একটি একান্ত নিরালা তাঁবু। সেখানে আর কেউ নেই। একটি শয্যার ওপর সম্রাট মহিষী শুয়ে আছেন। আর একটি ধূর্ত আদমী দুর্লভ এক রমণীরত্নের সম্পূর্ণ অবয়ব ক্ষুধিত শ্বাপদের দৃষ্টিতে লেহন করছে। দুটি মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে তাঁবুর অভ্যন্তর ভাগ কেমন যেন রোমাঞ্চকর।

হামিদা অজ্ঞানের ভান করে পড়ে থেকে চোখের ফাঁক দিয়ে বৈরাম খানকে দেখছিলেন।

বৈরাম খান একদৃষ্টে লোভাতুর রমণী দেহের আবর্তে অনেকক্ষণ দৃষ্টির তালিকা বুলিয়ে পরে মুখের কাছে এগিয়ে গেলেন। নিজের মুখখানি মহিষীর মুখ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে কি ভেবে আবার সরিয়ে নিলেন। কামিজের ওপর দিয়ে মহিষীর বক্ষের সুউন্নত প্রবাল স্তম্ভ স্বর্ণচূড়ার সৃষ্টি করেছিল। ছিল না যৌবন মহিমার ওপর কোন পুরু আবরণ। অবরোধ রচনা করে নি হারেম ইজ্জতের অহমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে আওরতের কোন আলাদা ভূমিকা। তাই লোলুপ হয়ে সেই রাত্রে বৈরাম খান একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। চোখের ফাঁক দিয়ে হামিদা তাই দেখে কেমন যেন শিহরিত হয়েছিলেন। মৃণাল বাহু দুটি বক্ষের কোমল চূড়ার ওপর ঢাকা দেবার বাসনা জেগেছিল। অন্ততঃ কোন আবরণ পরিয়ে ঐ বিশ্বাসঘাতক সম্রাটের দোস্তের চোখ দুটি অন্ধ করবার ইচ্ছা হয়েছিল।

হামিদা যখন এই ভাবছেন সেই সময় তিনি দেখলেন, বৈরাম খানই একটি সূক্ষ্ম বসনের ওড়না নিয়ে এসে বুকে চাপা দিয়ে দিলেন।

হামিদা মনে মনে বৈরাম খানের সৎসাহসের প্রশংসা করে অজ্ঞানের ভান করে পড়ে থাকলেন। মন্দ কি? কোন দুঃসাহস

যখন নেই তখন চারিত্রিক কলুষতা সৃষ্টি হওয়ারও ঝুঁকি নেই। তখন এ ক্রীড়া অনেকক্ষণ চললে ক্ষতি কি? কিন্তু ভয় আছে। বৈরাম খান কেন সম্রাটকে ডেকে তাঁর মহিষীকে জিম্মা করে দিচ্ছেন না? এই বিলম্বের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি নেই?

হঠাৎ হামিদা বানু অনুভব করলেন তাঁর মুখের ওপর তপ্ত এক নিঃশ্বাসের স্পর্শ। আঁতকে উঠলেন আতঙ্কে।

বৈরাম খান তাঁর মুখের ওপর আবার ঝুঁকে পড়েছিল। মনে হচ্ছে এখুনি তাঁর তৃষিত অধরের স্পর্শ আঁকবেন হামিদার নরম দুই আবেগসিঞ্চিত গোলাপ ফুলের পাপড়ি সদৃশ ওষ্ঠে।

আতঙ্কে, ভয়ে, বিস্ময়ে হামিদা নড়ে উঠলেন। জ্ঞান ফিরে এসেছে এমনি অভিনয় করে তিনি চোখ মেললেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে বৈরাম খান ছিটকে সরে গিয়ে বিরাট দূরের এক ব্যবধান রচনা করলেন।

মনে মনে হামিদা বৈরাম খানের ভীরুতায় হাস্য সংবরণ করলেন।

আজ সে সব কথা মনে পড়ে।

সজ্ঞানে কখনও বৈরাম খান তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেননি। কিন্তু দৃষ্টি তার তেমনিই ছিল। সে দৃষ্টির অর্থ সব রমণীরাই পড়তে পারে।

আজ তাই ভাবেন হামিদা। বৈরাম খান নিশ্চয় কিছু চায়। না হলে তার সন্তানের প্রতি ওঁর এই আক্রোশ কেন?

সেইজন্যে তিনি সঙ্গীদার মারফতে তাকে ডাকতে পাঠালেন।

সেদিন যদি না ডাকতে পাঠাতেন, তাহলে বোধ হয় ভালো হত, তাহলে পরবর্তী ঘটনা এমনি জটিলতার পরিণতিতে এসে পৌঁছতো না। আর পুরুষ এই দুর্বলতার সুযোগ নিত না।

কিন্তু মা চায় পুত্রের নিরাপত্তা। পুত্রের জন্যে মাতা অনেক নীচে নামতে পারে। তার জন্যে কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব নয়। সর্বকালের সর্বদেশে মাতাপুত্রের এই সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়ে আসছে।

তাই হামিদা কোন কোন দোষ করেছিলেন কিনা! কাজির বিচার নয়—স্বয়ং ঈশ্বর সেই বিচারের আসনে বসবেন।

একটি আলাদা মহল পড়েছিল। কাবুল রাজপুরীরই এই ঘটনা। সমস্ত দুনিয়া নিদ্রার কোলে সমাচ্ছন্ন হলে হামিদা একটি বোরখায় নিজেকে গোপন করে খাসকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। যাবার সময় সঙ্গীদাকে চুপি চুপি বৈরাম খানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এই গোপনতা সৃষ্টির কারণ হারেমের কোন রমণীর সাথে বাইরের লোকের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার জন্যে। আর বিশেষ করে রাজমহিষী। তাঁর আবরু তো সবার আগে!

এইজন্যে এই গোপনতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল, নাহলে কোন মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে হামিদা ঐ পরিবেশে বৈরাম খানকে ডাকতে পাঠান নি।

তবু সেই পরিত্যক্ত মহলের জনমানবহীন প্রকোষ্ঠে চলতে গিয়ে হামিদার সর্বশরীর ছমছম করে উঠেছিল। এখানে কোন প্রহরী নেই, কোন আলোরও ব্যবস্থা নেই। বরং অন্ধকারের সরীসৃপরা মানুষের পদশব্দে হুটপাট করে পালাতে লাগলো।

থমথমে আবহাওয়া। ভগ্নপ্রায় মহল। উন্মুক্ত আসমানের রূপালী চন্দ্রালোকের মিষ্টি আলো ভগ্ন গবাক্ষ দিয়ে এসে কক্ষের মধ্যে পড়েছিল।

এই পরিত্যক্ত মহলটি বর্তমান রাজপুরী থেকে একটু দূরত্বে। এখানে কারো আসার সম্ভাবনা কম বলে এই স্থানটি হামিদা নির্বাচন করেছিলেন। এখন এই রাত্রে একা এই মহলে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর গা কেমন যেন ছমছম করতে লাগলো।

মহলের চতুর্দিকে চাপ চাপ গাঢ় অন্ধকার। স্থূলকায় থামগুলি দাঁড়িয়ে আছে যেন যমদূতের মত। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাবার গলিপথগুলি কেমন যেন ভয়াবহ। মনে হয় কে যেন গলির মধ্যে

লুকিয়ে আছে ওৎ পেতে। গেলেই ঝাপটে ধরে কণ্ঠনালি চেপে ধরবে। যে ঘুলঘুলিগুলিতে পুষ্পপাত্র ও আলোকদান রাখা হত এখন সেগুলি খালি! সেখানে এক বুক করে অন্ধকার।

হঠাৎ নড়ে উঠলো ছাতের খিলান থেকে ঝোলানো ঝাড়-লণ্ঠনের ভগ্ন কাচগুলি। মনে হল, যেন কে নাচছে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে। সচকিত হয়ে হামিদা বানু নিজের কোমরে রাখা ছুরিকাটি চেপে ধরলেন।

এই মহলটি কেন পরিত্যক্ত হয়েছিল হামিদার মনে পড়লো।

বাবর শাহের এক জেনানা বদমেজাজী ছিল বলে এরই এক প্রকোষ্ঠে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। জেনানাটিকে হামিদা দেখেননি, তবে শুনেছিলেন তার রূপ নাকি ছিল আসমানের মত জৌলুসে ভরা। হীরা জহরতের মত দ্যুতিময়। কিন্তু আওরত বড় মেজাজী ছিল, দিমাগে বাবরকে সে তার ইজ্জত দেয়নি। যেদিন বাবর শাহ তাকে সুন্দর সাজে ভূষিত হয়ে তাঁর কক্ষে আসতে বলেছিলেন, জেনানা হুকুমের নফরৎ করেছিল।

সম্রাটের হুকুমের বিরুদ্ধতা, সামান্য এক দুর্বল আওরত! নেমে এসেছিল সম্রাটের নির্মম শাস্তি সেই রমণীর ওপর। বন্দী হয়ে সেই বেয়াদপ রমণী এই মহলেরই এক রুদ্ধকক্ষে আবদ্ধ ছিল।

কিন্তু সেই বিদ্রোহিনী ছিল আরো দুঃসাহসী, সে সম্রাটের শাস্তির তোয়াক্কা করেনি। গবাক্ষের জাফরীর ছিদ্রে নিজের কাপড় বেঁধে গলায় ফাঁস টেনে দিয়েছিল। জেনানাটি নাকি বঙ্গদেশেরই কোন এক অঞ্চলের সোহাগ ছিল।

সে যাই হোক্, তারপরেও এই মহল পরিত্যক্ত হয় নি। কিছুদিন ধরে এই মহলের আশেপাশে একটি ছায়া রমণীর উপস্থিতি রাত্রিবেলা অনেকে দেখতে পায়। সে কেমন যেন ভয় দেখিয়ে কণ্ঠনালি চেপে ধরতে আসে। ছুটে কাউকে তাড়া করে ভয়

প্রদর্শন করে। এমনিভাবে একদিন সম্রাট হুমায়ুন শাহ এই মহল পরিত্যাগ করেন।

যখন এই সব কথা হামিদা আতঙ্কে ভাবছেন, হঠাৎ সঈদা কাছে এসে চাপা স্বরে বললে—বেগমসাহেবা, জনাব খানসাহেব এসেছেন!

সামনে বিস্মিত চোখে বৈরাম খান দাঁড়িয়েছিলেন।

হামিদা চোখ ফেরাতেই বৈরাম খান সেলাম পেশ করে সম্মান জানালেন, তারপর মৃদুহেসে বললেন—কি আর্জি বেগমসাহেবা? হুকুম ফরমাইয়ে! অধীনকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন?

সঈদা সেখান থেকে সরে গিয়েছিল। সইদার মুখের দিকে যদি কেউ তাকিয়ে দেখতো, তাহলে দেখতে পেত তার ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক। বাঁদী স্থূলবুদ্ধি নিয়ে আর বেশী কি বুঝবে?

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে প্রকৃতির আলো—অন্ধকার অপহরণ করেছিল। দুজনেই দুজনকে বেশ দেখতে পাচ্ছিল।

হামিদা সেজেছিলেন অপরূপ সাজে। দৌলতের রাণী দৌলত দিয়ে সাজিয়েছিল নিজের দেহবর্ণ। হীরার কুণ্ডল, হীরার বালা। সাচ্চা মুক্তোর সাতনরী হার কণ্ঠ থেকে বুকের সবটুকু অধিকার করেছিল। তাছাড়া রক্তবর্ণের সাটিনের সালোয়ার, কামিজ, বেগুনী-রঙের ওড়নাখানা অবহেলাভরে মাটিতে লুটোচ্ছে। আতরের খসবু দিয়ে বাতাস আমোদিত করেছে।

কেন যে এত অপরূপ করে সেজেছিলেন, হামিদা নিজেই জানেন না। কি উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে এই সাজ তা তাঁর অজ্ঞাত। তবে তিনি সব সময়েই সেজে থাকতেন, বর্তমানে তার ওপর একটু রঙ চড়িয়েছেন মাত্র।

কিন্তু বৈরাম খানের সেই পূর্বদৃষ্টির পুনঃ প্রতিফলন দেহের ওপর পড়তে তিনি সঙ্কুচিত হলেন। তাঁর তখনই মনে হল, এমনিভাবে সেজে আসা তার উচিত হয়নি।

হঠাৎ বড় লজ্জা এসে গণ্ড রক্তিম করলো। তিনি অনুতপ্ত হলেন। না এলেই বুঝি ভাল হত। কিন্তু আকবরের নিরাপত্তা! সন্তানের জীবন!

মনে পড়তেই হামিদা মাথা তুললেন, কাতরস্বরে বললেন—আমার সন্তানের জীবনরক্ষার জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

বৈরাম খান অবাক হলেন আকস্মিক এই কণ্ঠস্বরে। কিছুক্ষণ বিস্ময়ে-হতবাক হয়ে তারপর বললেন—কেন কোন কারণ ঘটেছে?

হামিদা চুপ করে থাকলেন। তাঁর সেইমুহূর্তে মনে হতে লাগলো, তিনি কি শুধু পুত্রের নিরাপত্তার জন্যেই এতদূর এগিয়ে এসেছেন? না, অন্য কারণও আছে। অবচেতন মনের মধ্যে কোন ভিন্ন উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত! এই নিশুতি রাত্রি। নিভৃতে এখানে দেখাশোনা। তাছাড়া নিজে তিনি সেজেছেন অপরূপ সাজে।

কেন? কেন? কি জন্যে তাঁর এই নিভৃত অভিসার? অভিসারই বলবে কেননা এক খুবসুরত রমণী তুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য পেয়ে তবু এসেছে এক তুষ্টমতলবী ধূর্ত লোকের সাথে দেখা করতে। হয়তো যদি সন্তানের জন্যে তার এই ব্যগ্রতা থাকতো, তাহলে কিছু বলার ছিল না কিন্তু কোথায় যেন একটু অন্য সম্বন্ধ সৃষ্টি করবার ইঙ্গিত। স্বামীর দোস্ত, তারও যদি দোস্ত হয় ক্ষতি কি? কিন্তু একটি রমণীর দোস্ত যে একজন পুরুষ হলে তুজনের সম্বন্ধ দোস্তের বন্ধনে থাকে না, একথা তখন সম্রাজ্ঞী বুঝতে চাইলেন না।

আজ বলতে দ্বিধা নেই। হামিদা নিজেই নিজের অন্যায় স্বীকার করেন। স্বামীর সোহাগ যত আবেগ মথিতই হোক, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, তার রক্ত তরল হয়ে এসেছে, তিনি হামিদাকে সুখী করতে পারেন না, এই কথাই সেদিন সম্রাজ্ঞীর মনে উদয় হয়েছিল।

আর বৈরাম খান ছিলেন হামিদার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের

বড়। দুজনের রক্তেই তখন উদ্দাম তারুণ্য। বৃক্ষশাখে যেমন নতুন পত্রলয় সবুজরঙের প্রাণস্পন্দন নিয়ে বাতাসে আন্দোলিত হয়, তেমনি তারুণ্যের এই যৌবনপুষ্ট দুটি নরনারী সেই নিশুতি রাত্রে উভয় উভয়ের দিকে অন্তদৃষ্টিতে তাকালো।

হামিদার মনে পড়লো সেই সর্পদংশনের রাত্রিটি। সেই দৃষ্টি, আজও সেই সাতৃষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ হামিদা চাপাস্বরে ফিস ফিস করে বললেন—সম্রাট যদি তাঁর এই দোস্তের দৃষ্টির অর্থ অবগত হন?

বৈরাম খানও সেইস্বরে উত্তর দিলেন—দৃষ্টির স্বাধীনতা সবারই আছে।

কিন্তু সেই দৃষ্টিতে যদি সুস্থচিন্তা প্রকাশ না হয়?

অন্যায় কিছু নয়। রূপের দর্শন সবারই চোখে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

আর কামনা?

রূপ মনের মধ্যে অভিভূত করলে কামনা স্বাভাবিক পথ প্রার্থনা করে।

কিন্তু আমি যদি সম্রাটকে দোস্তের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলি!

লাভ কিছু হবে না। সম্রাট আমাকে নিজের চেয়েও বিশ্বাস করেন।

হঠাৎ হামিদা ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—আর সেইজন্যেই বুঝি আপনি সুযোগের আশ্রয় নিয়েছেন?

আবার বৈরাম খানের বিস্ময়। বিস্ময়ে বললেন—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাইছেন?

ঠিকই বুঝতে পারছেন। শুধু না বোঝার ভান করছেন। সম্রাট আপনার চালাকি ধরতে না পারুন, আমার কাছে আপনার সব কৌশলই ধরা পড়ে গেছে। আপনি আমাকে জব্দ করবার

জন্যেই আকবরের ওপর অত্যাচার করছেন। অথচ আপনি বেশ ভালভাবেই জানেন, আকবর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তাকে মানুষ করবার ভার সম্রাট বিশ্বাস করে আপনার ওপর দিয়েছেন। আর আপনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার ওপর অত্যাচার করে চলেছেন। তার মতের বাইরে তাকে শাসন করে তার দৃঢ়তা ভেঙে দিচ্ছেন।

বৈরাম খান নিজের মনের অভিসন্ধি অন্যের মুখে শুনে অপরাধীর মত কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—বেশ আমি স্বীকার করছি, তাই করেছি। এবার বেগমসাহেবের আজ্ঞা কি বলুন?

হামিদা মাথা তুলে বললেন—আমি আপোষ চাই। অন্তত সন্তানের ক্ষতি যাতে না হয়, তার মত কোন স্বার্থত্যাগ।

বৈরাম খান হঠাৎ মৃদু হেসে বললেন—আমি রাজী! কি আপোষ প্রত্যাশা করেন?

হামিদা চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

মাথার ওপর আসমানের নীলিমায় হঠাৎ একটি তারা দৃষ্টি-গোচর হল। তারাটির উজ্জ্বলতা দেখে হামিদা নিজের মনের অন্ধকারে সেই উজ্জ্বলতার একটু আলো প্রবেশ করাতে চাইলেন।

এই সময় হঠাৎ বৈরাম খান এগিয়ে গিয়ে হামিদার অতি নিকটে দাঁড়ালেন। একেবারে বুকের সান্নিধ্যে।

আবেগ জড়িতকণ্ঠে বৈরাম খান বললেন—খোদা তোমাকে যে সুরত দিয়েছেন, সে কি ঐ প্রৌঢ় সম্রাটের ভোগের জন্যে ব্যয়িত হয়? আমি এই চেয়েছিলাম, আমি তোমার রূপে মুগ্ধ বেগমসাহেবা!

যেন সেই বিষধর সর্প আবার দংশন করলো হামিদাকে। হামিদা ককিয়ে উঠলেন। একজন অধীনস্থের মুখে অপমানজনক উক্তি শুনে তাঁর সম্রাজ্ঞীর পদগৌরব ক্ষুণ্ণ হল, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে

বললেন—স্তব্ধ হও দুঃসাহসী আদমী। স্পর্দ্ধার সীমা যে ছাড়িয়ে গেছ, তা ভুলে যেও না।

বৈরাম খানও সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আমার স্পর্দ্ধার একটা সম্পূর্ণ অভিপ্রায় আছে কিন্তু আপনি এই নিভৃত ভগ্নমহলে নিশুতি রাত্রে শুধু কি এমনি এসেছেন, এই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

আর না। সত্যকথাটা বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়বে। আসল আকৃতির বীভৎস রক্তাক্ত ক্ষতটি বেরিয়ে পড়লে নিজেরই ভয় করবে।

তাই হামিদা ছুটলেন। বোরখাটা আবার দেহকে আচ্ছাদিত করে ফেলে দিয়ে পাগলীর মত ছুটলেন। কানদুটি রুদ্ধ করে ছুটলেন। রক্ত যেন দমকে দমকে প্রাবল্য সৃষ্টি করে মুখ দিয়ে উঠে আসতে লাগলো। দেহের প্রতিটি রক্ত নিঃসরণের মুখ যেন হঠাৎ বড় হয়ে স্রোতস্বিনী হল।

হামিদার নেশা কেটে গেল। অনুতপ্ত হয়ে সেই গভীর নিশিথে শূন্যে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বললেন—এই পাপের জন্যে আমি যেন ক্ষমা পাই।

কিন্তু আমার আকবর, আমার মাতৃত্ব!

এই বুভুক্ষার সংশয় আবার দেখা দিয়েছিল, যখন সম্রাট হুমায়ুন শাহের আকস্মিক মৃত্যু কানে আসতে।

তার আগে সেই রাত্রি নিভৃতদর্শনের পরিনামটুকু লিপিবদ্ধ করতে হয়।

সঙ্গীদাকে বিশ্বাস করে হামিদা বেগম বৈরাম খানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এবং এ সংবাদ গোপন রেখে দিতে বলেছিলেন। সঙ্গীদা বিশ্বাস ঠিকই রেখেছিল, তবে সে বেগমসাহেবের সেই নিভৃত মিলনের অর্থ অন্য করেছিল। রমণী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলে যা স্বাভাবিক অর্থ হয়, সেই অর্থই সে মনে ধারণ করেছিল।

আর তারই পরিণাম সঙ্গীদার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেও মহিষীর মত ব্যভিচারিনী হয়েছিল। যৌবন তার ছিল, বয়সও তার খুব একটা বেশী নয়। মরদ চতুর্দিকে ঘুরছে। তাদের একটু সুযোগ দিলেই জীবন মধুময় হয়। অন্তত কটি রাত্রির সুখস্বপ্ন বিচ্ছিন্ন হয় না। আর তাছাড়া সম্রাজ্ঞী নিজেই যখন দ্বিচারিনী, কলঙ্কিনী—তখন তারা তো সামান্য বাঁদী ছাড়া কিছু নয়! তাদের চরিত্রের সততা কে অনুসন্ধান করে?

তাছাড়া সম্রাট নিজে যদি কখনও কোন বাঁদীর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চান, তাহলে বাঁদীর গররাজির কোন ক্ষমতা আছে, না নোফর সাহস করে প্রভুকে চটাতে পারে!

যাই হোক, সঙ্গীদা ছিল খাঁসবাদীর অন্যতম। সম্রাজ্ঞীর মহলেই তার বাস। সম্রাজ্ঞীর মহলেই গোপনে বাইরের লোক আনতে লাগলো।

চললো কিছুদিন ব্যভিচারের স্রোত মহলের গুপ্ত প্রকোষ্ঠের হর্ম্যতলে। দুঃসাহসী সঙ্গীদা কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠলো।

শেষে একদিন সংবাদ গেল সম্রাজ্ঞীর কাছে।

চমকে উঠলেন হামিদা বানু। ছুটে গিয়ে চেপে ধরলেন ব্যভিচারিনীর কণ্ঠনালি।

সঙ্গীদা তখনই সরোষে বললো—আমার বেলা অপরাধ, আর সম্রাজ্ঞীর কোন অপরাধ নেই। তিনি নিভৃতে খানখানান সাহেবের—।

কথার শেষ আর হল না। ঠাস্ ঠাস্ করে চড় পড়তে লাগলো সঙ্গীদার গণ্ড লক্ষ্য করে। হামিদা কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নিজের সম্মান থেকে নীচে নেমে পড়ে পাগলিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সেই অবস্থায় রাগের বশে চাবুক দিয়ে সঙ্গীদার কোমল অঙ্গ রক্তাক্ত করলেন।

তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে নিজের কক্ষে ঢুকে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোলেন। চোখের কোণে অশ্রুর স্রোত এসে গণ্ডপ্লাবিত করলো।

হামিদা সেইমুহূর্তে বুঝলেন, অন্যায় তারই। সঈদা বেতনভোগী নোকর বলে নীরবে প্রহার সহ্য করলো। কিন্তু তিনি নিজেই তো তাকে এ সুযোগ প্রদান করেছেন।

কেন সেদিন রাত্রে তিনি বৈরাম খানের সঙ্গে মিলিত হলেন? তিনি কোন অন্যায় করেন নি বটে কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে? তার উপরওয়ালা কেউ থাকলে সেও তো তার বিচার এমনি করতো। ঠিক সঈদার মত।

১২

তারপর থেকেই হামিদা সংযমী হয়েছিলেন। মনের কোন দুর্বল প্রবৃত্তিকেই প্রশয় দেন নি। সন্তানের জন্যে কোন কাতরতা। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও নিজের নিঃস্বতা দিয়ে তাকে বাঁচানোর ভান করবেন না।

একটি সন্তান। আজ সে তার কেউ নয়। মুঘল রাজবংশের প্রদীপশিখা। তৈমুরের উত্তরসাধক। কেউ যদি হঠাৎ তাকে গুপ্তহত্যার দ্বারা নিঃশেষে সরিয়ে দেয়, কারও ক্ষমতা নেই তার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে রাখে।

তাই হামিদা অন্তঃপুরের কঠিন অবরোধের মধ্যে শয্যায় নিভৃত সুখগহনে শুয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগলেন। আর স্বামীর বিক্ষুব্ধ মনে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা জানাতে লাগলেন। স্বামীকে সান্ত্বনা না জানালে তাঁর বিরাট মনে অসহায়তা বড় বেশী তাঁকে পঙ্গু করে দিত। পত্নীর কর্তব্য বলে হোক বা শুভানুধ্যায়ী বলে হোক্ তাঁকে এইটুকু ত্যাগস্বীকার করতে হত।

আর একজনের চোরাদৃষ্টির অর্থ মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আলোড়ন জাগালে নিজেকে তার বড় খারাপ লাগতো। আর

তখনই তিনি নিজেকে আরো অন্তঃপুরের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিতেন। কিন্তু সব সাবধানতাই একসময় নিঃশেষে মুছে গেল, যখন সংবাদ প্রচারিত হল সম্রাট হুমায়ুন শাহ আকস্মিক কবরশায়িত হয়েছেন।

আকাশ যেন ভেঙে অন্ধকার নেমে এল। নীল আকাশের প্রান্তর জুড়ে আর কোথাও আলোর নিশানা থাকলো না। কে যেন অপর্যাপ্ত কালি দিয়ে লেপে দিল সম্মুখের দৃষ্টি। প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বইলো আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। সুখের সেই স্বপ্নশয্যা, আহারের মোগলাই খানা, বিলাসের রঙীন পেয়ালা চূরমার হয়ে গেল।

সেদিন বুঝি কখনও ভোলা যায় না।

অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হল।

সুখের সংসার ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল।

হামিদারই মনে আঘাতটা সবচেয়ে বেশী বাজলো। সবে শান্তির যমুনা কল্লোলে ভাসতে ভাসতে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। স্বামীর বিক্ষুব্ধ জীবনে শুধু যুদ্ধ, হানাহানি, এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত শুধু দৌড় করেই পরিশ্রান্ত। স্বামীর সাথে তাঁকেও ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সব শ্রমের শেষ স্বস্তি দিল্লী অধিকার।

দিল্লীর প্রাসাদ শীর্ষে মুঘল পতাকা উড্ডীন করে, স্বামীকে সিংহাসনের ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত করে হামিদা তখন অন্য কিছু চিন্তার সমুদ্রে অবগাহনে ব্যস্ত। সাফল্যের একটা নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দে তখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল পুলকিত।

তিনি তখনই পুত্রকে দেখার জন্যে চঞ্চল হয়ে স্বামীর অনুমতি নিয়ে সেই কালানৌর দুর্গে গেছেন। সেখানে শুধু পুত্রই ছিল না। ছিল পুত্রের অভিভাবকও। নিঃসন্দেহে সেই অভিভাবকের অভিপ্রায় অবগত হয়ে একটু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়েছেন।

নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে মানুষের যেমন স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, সেই আকর্ষণই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

না, সেখানে তিনি কোন দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেন নি। দুর্গের অন্তঃপুরে সম্রাজ্ঞীর পদগৌরবে বাঁদী ও বান্দার সেলাম পেয়ে আয়াসের মাঝেই কালাতিপাত করেছেন।

রমণী জীবনের কোন গোপন সম্বন্ধ, অন্তরের কোন অভিলাষ, নতুন অভিসার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের কোন প্রবল ইচ্ছা তাঁর ছিল না, শুধু প্রয়োজনের জন্যে প্রয়োজন মেটাবার প্রত্যাশায় তিনি পুত্রকে দেখতে কালানৌর দুর্গে গিয়েছিলেন।

আর একবার দেখতে এসেছিলেন বৈরাম খানের গতিবিধি।

অনেকদিন থেকে স্বামীকে এই মানুষটির ওপর থেকে আস্থা তুলে নেবার জন্যে চেষ্টা করে এসেছেন কিন্তু সম্ভব হয় নি। কেমন যেন নিজেকে অন্তঃসার শূন্য মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, স্বামী বুঝি তাঁর মনের কথা ধরে ফেললেন! ঈর্ষার বাষ্পে যে তার কণ্ঠ পরিবর্তিত হয়ে আছে, তা বুঝি আর গোপন থাকবে না।

বৈরাম খান যেন তাঁর সপত্নীর মতন। সবটুকু প্রীতি স্বামীর অপহরণ করার জন্যে তাঁর এই ঈর্ষা। কিন্তু স্বামীর কাছে কিছুতেই তাকে অপমানিত করে পরিত্যক্ত করতে পারলেন না।

বিষের সেই ঈর্ষার জ্বালা নিয়েই কালানৌর দুর্গে সেই ধূর্তকে দেখতে গিয়েছিলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন গভীর নিশিথে সংবাদ এল, সব শেষ।

হামিদা তখন অন্তঃপুরের বিশেষ একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত কক্ষে স্বর্ণপালঙ্কে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সংবাদটা তাঁর কানে আচমকা প্রবেশ করতে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেন নি, মনে হয়েছে চক্রান্ত। রাজনৈতিক চক্রান্ত অনেক সময় দানা বেঁধে উঠলে তার প্রকাশ অনুমান করা যায় না। তারপর যখন সেই চক্রান্তের আসল স্বরূপ

প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন চতুর্দিকে তার আকস্মিকতা উপলব্ধি করা যায়।

মনে হয়, সম্রাট সেই চক্রান্তের মাঝে পড়েছেন কিন্তু তাই বলে এত তাডাতাড়ি তাঁর মৃত্যু হয় নি।

এ বিশ্বাসযোগ্য নয়। পৃথিবী যদি এই মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেত, তবু বিশ্বাস করা যায় কিন্তু সম্রাটের মৃত্যু!

এত তাড়াতাড়ি তাঁর সৌভাগ্য অস্তমিত হবে, এ যেন কল্পনার বাইরে। হামিদা তাই প্রথমে শুনে এক যুগ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। চিরকাল শিবিরে শিবিরেই স্বামীর সাথে কাটলো। একদিনের জন্যে বিপদ মুক্ত, একদিনের জন্যে নীরব প্রশান্তি জীবনে এল না। যদিও বা বর্তমানে মিললো, তাও শেষ।

তারপর ধীরে ধীরে ব্যাপারটা অনুধাবন করে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বসলেন।

ছুটে এলেন বৈরাম খান। বাধা দেওয়ার জন্যে প্রতিবাদ করে বললেন—এ সময়ে আপনার সেখানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। যদি সম্রাটের মৃত্যুতে বিদ্রোহ জেগে থাকে তাহলে আপনার প্রাণসংশয় হবে।

চোখে অশ্রুর প্রাবল্য রোধ হয় নি। দু' চোখে তপ্ত অশ্রুনিয়ে হামিদা বললেন—সম্রাট যখন চলে গেছেন, তখন আমার এই জীবনের প্রয়োজন কি? আমার জীবন সেই মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে গেলেই তো মঙ্গল বেশী!

কিন্তু আপনার পুত্র, আকবর এখনও আছে, তার জন্যে আপনার দায়িত্ব কম নয়। অন্তত তার জন্যে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।

হামিদার কথাটা সেইমুহূর্তে স্মরণ হল। মাতৃত্ব আবার হাহাকার করে উঠলো। এবার পত্নীত্ব গিয়ে মাতৃত্বের ভূমিকাতে সম্পূর্ণ তাঁকে প্রবেশ করতে হবে।

কিন্তু তবু একটিবার শেষ দেখা, পনেরো বছরের একাধিকক্রমে যাঁর সান্নিধ্যে যৌবনের অনেকগুলি তপ্তমুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে। যাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত পরিচিত। অতো বড় একজন পুরুষ কিন্তু তিনি শিশুর মত যখন অসহায় বোধে ছুটে আসতেন। এসব কথাই সেই মুহূর্তে মনে আসতে হামিদা আর স্থির থাকতে পারলেন না। মাত্র কটি অনুচর সঙ্গে নিয়ে অশ্বের ওপর উঠে বসলেন।

কবরশায়িত হবার পূর্বে শেষ একটিবার দর্শন। সেই শ্বশ্রুময় সুন্দর বদন। চিন্তার কুহেলিকায় কত রেখার ছাপ পড়েছে। সেই কম্পিত তুখানি পুরু অধর, বলিষ্ঠতার ছাপ এঁকে তেজস্বী করে রেখেছিল। তারপর তিনি যখন সেদিনও বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিলেন—কে বলবে তিনি দিন দিন প্রৌঢ়ত্বের ধাপে এসে পৌঁছচেন?

একদিনের কথা সবচেয়ে মনে পড়ে। এই সেদিন দিল্লী বিজয় করে ফিরে তাকে কাছে টেনে নিলেন। এমন নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন, যা কোনদিন করেন নি। সোহাগ রঞ্জন পরিয়ে দিয়ে আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন—বেগম, আজ আমি সম্পূর্ণ। পিতার রাজ্য হারিয়ে মনে বড় কষ্ট অনুভব করেছিলাম, নিজেকে বড় অক্ষম মনে হয়েছিল। আজ পিতার রাজ্য আবার পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পিতার আশীর্ব্বাদ বুঝি আর তুর্লভ নয়।

এই সেই পুরুষ।

আজ তিনি নেই! আর তারই বেগম হয়ে স্বভাবের সবকিছু জেনে শেষ সময়ে একবার কাছে যাবো না!

সেইজন্যে তিনি বিপদ জেনেও দিল্লী গিয়েছিলেন।

কিন্তু এসব অতীত আরো অতীতে চলে গেছে।

বর্তমানে যখন তিনি পূর্ণ মাতৃত্বে এসে পৌঁছলেন, যখন তাঁর চিন্তা তাঁরই পথ—তখনকার কথাই লিপিবদ্ধ যোগ্য।

সম্রাটের মৃত্যুর পর শোকসাগরে হামিদা নিমজ্জিত হয়েছিলেন কিন্তু বার বার তাঁর মনের মধ্যে নাবালক পুত্র আকবরের ছবি ভেসে উঠেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শোক অপসারিত হয়ে মাতৃত্বের পূর্ণরূপ বলিষ্ঠতার সহযোগে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছিল।

যে গেছে তাঁর স্মৃতিই বড় নয়। তাঁর কষ্টায়াসে প্রাপ্ত নবলব্ধ সাম্রাজ্য রক্ষা করাই তাঁর প্রতি কর্তব্য জ্ঞাপন করা। তাছাড়া তাঁরই ঔরসজাত পুত্র, মুঘল বংশের প্রদীপশিখা, সে শিখা প্রজ্বলিত করে বংশকে রক্ষা করাও কর্তব্য।

অনেক বড় দায়িত্ব যেন স্কন্ধে স্থাপন করে স্বামী সরে পড়েছেন। এবার পরীক্ষা সম্মুখীন। তিনি অন্তরালে থেকে পত্নীর যোগ্যতা পরিমাপ করেছেন। একদিন যেমন সোহাগরঞ্জন পরিয়ে বাহু আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রমণীর সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তেমনি আজ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মাতৃত্ব সমুজ্জ্বল করে নাবালক পুত্রকে সাবালক করে মুঘল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁরই অবহেলায় যদি মুঘল রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মৃত মুঘল পূর্ব-পুরুষরা কখনই তাকে ক্ষমা করবেন না। তাঁদের অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতে পাওয়া রাজ্য পরহস্তগত হলে তাঁরা অন্তরাল থেকে অভিশাপ দেবেন।

হামিদা নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিলেন।

একদিন বৈরাম খানের অন্তরালে থেকে নিজের সাহসকে অন্তমুখী করতেন, সেদিন বৈরাম খানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন—আপনিই আমার শেষ অবলম্বন, আপনাকে যেমন সম্রাট দোস্ত বানিয়েছিলেন, আজ বেগমের দোস্ত হয়ে মুঘল ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করবো।

কিন্তু সেদিন বড় দুঃসময়। বৈরাম খানের মত কূটবুদ্ধি মানুষও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

গোয়ালিয়র গেছে, আগ্রা গেছে দিল্লীও হস্তান্তরিত।

মুঘল রাজত্বকে ধ্বংস করবার জন্যে তুর্ক, আফঘান, রাজপুত প্রভৃতি যোদ্ধারা হিমুর পতাকাতলে উপস্থিত হয়েছে।

একা বৈরাম খান কি করবেন?

নিজের জীবন রক্ষার জন্যে স্বার্থে অন্ধ হয়ে মুঘল সম্বন্ধ ত্যাগ করে সরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এখন স্বাধীনতার জন্যে, মুঘল অধীনতা অস্বীকার করবার জন্যে হিন্দুস্থানের প্রতিটি লোক আগ্রহী। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধাচরণের কোন মূল্য নেই, যখন মুঘল সৈন্যরাই ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছে।

হামিদা বৈরাম খানের মনোভিপ্রায় অবগত হলেন। নেমক-হারামের বেইমানীতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে গিয়ে স্বামীর কথা স্মরণ করলেন। রাজনৈতিক প্রবঞ্চনায় ছলনার আশ্রয় নিলে কোন অপরাধ হয় না। শত্রুকে কর্তব্যের খাতিরে বন্ধু করে নিয়ে, শয়তানকে উত্তম কথায় প্রলোভিত করে কার্যোদ্ধার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে কোন পাপ নেই। তাতে খোদার আশীর্ব্বাদই পাওয়া যায়। যে এই কৌশল অবলম্বন করতে পারে না, তাকে খোদাও ক্ষমা করে না। তার জন্যে জগতের অন্ধকার পথই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অশ্রু স্রোতস্বিনী হয়। দুর্ভাগ্যই প্রাণের সম্বল হয়।

স্বামীর এই কথা স্মরণ করে হঠাৎ হামিদা ছলনার আশ্রয় নিলেন। বৈরাম খানকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বললেন—আপনাকে আমি সম্রাট স্বামীর পরই শক্তিমান বলে মনে করি। এই দুর্দ্দিনে যদি আপনি সরে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত মুঘল পরিবারটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আপনি কি তাদের রক্ষার জন্যে কোন শক্তিই প্রয়োগ করতে পারেন না?

রমণীর এই পৌরুষের ওপর আঘাত হানতে শক্তিমান খান-সাহেবের হৃদপিণ্ডে কেমন যেন অপমানের জ্বালা সৃষ্টি হল। হিমুর

মত এক অসমসাহসিক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা বড়ই অসাধ্য, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

কিন্তু বিনিময়ে কি মিলবে ? যদি কোনরকমে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন, তাহলে আকবর হবে তাঁর অধিকারী। আর তিনি সেই নাবালক সম্রাটের অভিভাবক হয়ে রাজ্য পরিচালনা করবেন। একদিন এই সম্রাটের নাবালকত্ব অপসারিত হলে তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে। তখন তিনি কি করবেন ? রাজসরকারের কৃপার পাত্র হয়ে বাকী দিনগুলি আয়াসের মাঝে কাটিয়ে কবরশায়িত হবেন। কেমন যেন এই চিন্তার মধ্যে কাপুরুষতার ছোঁয়াচই বেশী।

তবু খানসাহেব সেই জীবনই মেনে নিতে পারেন, যদি তার বিনিময়ে অন্য কিছু দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হন। সাধারণত ভাগ্যান্বেষীরা অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসে এমনি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। বিবেকের পরিচয় দিলে আর অপরের বুকে ছুরি বসানো যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শেরশাহ। তাঁরও পূর্ব-পুরুষ কেউ একটা সম্রাট পদগৌরব পান নি। অথচ সেই ফরিদ একদিন ব্যাঘ্রহন্তাকারী বীর শূরবংশের প্রতিষ্ঠা করে দিল্লীর সিংহাসনের একছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন।

এমনি দৃষ্টান্ত আরো কত আছে ! ভাগ্যান্বেষীদের ভাগ্য এমনি-ভাবে নিজের ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তাদের নিয়ে ইতিহাস রচনা হয়েছে।

সেইমুহূর্তে বৈরাম খান সে কথা ভেবেছিলেন ! এদের ত্যাগ-করে হিমুর সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের পথ করে নেন। ধ্বংস হোক্ মুঘল ঐতিহ্য। লুপ্ত হোক্ তাদের জৌলুস। তাঁর এতে কি যায় আসে ?

এমনি সময়ে হামিদা স্বামীবিহনের শোকের বিষাদ মুখমণ্ডল থেকে মুছে, চোখের জলের স্রোতে বাঁধ সৃষ্টি করে হঠাৎ সেই তারুণ্যের উজ্জ্বলতা মুখের ওপর ফুটিয়ে চোখে মোহিনী মায়া সৃষ্টি

করলেন। দয়িতের প্রাণে চেয়ে রমণী যেমন কাতর বিহ্বল চোখে মেঘের প্রান্তবুকে আলপনার আঁকিবুঁকি কাটে, তেমনি হামিদা বানু উনত্রিশতম যৌবন পার করেও আবার সেই অষ্টাদশের উত্তপ্তময় দিনে ফিরে এলেন।

হামিদা বানু লজ্জারুণ আরক্ত বদনে পদ্মকলিসম আঁখি নত করে চাপাস্বরে বললেন—আপনার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

এরপরই সেরাত্রে আকবরকে রমনীর পোষাক পরিয়ে কয়েকখানি পাল্কী অন্তঃপুরিকা পরিবৃতা হয়ে পলায়ন করলো।

আর বৈরাম খান ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একত্র করবার জন্যে আলী কুলী সাইবনীর সাহায্য নিয়ে তরদী বেগকে খুঁজতে লাগলেন।

তারপরের ঘটনা অবশ্য সকলের জানা।

দিল্লী আবার পুনঃ অধিকৃত হয়েছে। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে মুঘল গৌরব অস্তমিত হয়নি, তা আবার পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে। সূর্য উঠেছে রশ্মি প্রবাহ নিয়ে প্রাসাদের গম্বুজ শীর্ষে। উৎসব মুখরিত হয়েছে প্রাসাদপুরী। ওলটপালট রাজদফতর আবার নতুনভাবে সজ্জিত করে কর্ম আরম্ভ হয়েছে। ফুল বাগিচায় বিভিন্ন রকমের পুষ্পতনু ফুটে উঠে প্রাঙ্গণ মুখরিত করতো, তা আবার মুখর করেছে। ফোয়ারায় জল নিঃসরণের ধারা ছিল না, বিভিন্ন সৌরভের ধারা আবার বয়ে চলেছে। পাখী ডাকলো, বকুল ফুটলো, আসমানের বুকে প্রকৃতির রঙফেরা বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করলো।

ধ্বংসের পর নতুন রূপ দিতে যে মেহনতের দরকার হয়, সেই মেহনতের ব্যবস্থা করে নতুন রূপ দেওয়া হল।

মীর্জা হাকিমের মায়ের পাশে বসে হামিদা সবই শুনলেন। পানিপথ যুদ্ধ জয় হয়েছে, পুত্র তাঁর আবার সিংহাসন অলঙ্কিত

করেছে। স্বামীর কষ্টে প্রাপ্ত রাজ্য হারায় নি ভেবে তিনি আনন্দিত হলেন কিন্তু শিহরিত হলেন এই ভেবে যে এখন তিনি কি করে প্রাসাদে ফিরবেন ?

সেইজন্যে সেই দুশ্চিন্তা মনে নিয়ে মীর্জা হাকিমের মায়ের কাছে অনেকদিন থাকলেন। স্বামীবিহনের শোক মনের মধ্যে ধারণ করে শোক বিহ্বল হয়ে রইলেন। বেদনা যদিও আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসছিল, তবু তিনি সেই বেদনাকে মনের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত করে স্বামীর প্রেমের সম্মান দান করলেন। স্বামীর জন্যে তাঁর হাহুতাশ ছিল সত্যিকথা কিন্তু বর্তমানে বিরাট সমস্যার আওতায় পড়ে তা তরল হয়ে এসেছিল। সময় ছিল না উদ্বেগহীনভাবে শোকে মূহ্যমান হতে। তাছাড়া গুরুদায়িত্ব ছিল নাবালক পুত্রকে মানুষ করার। আর ছিল স্বামীর বংশকে দুনিয়াতে রক্ষা করার। সেইজন্যে স্বামী বিহনের শোক তাঁকে ভুলতে হয়েছিল।

এখন স্বামীর শোকে পতিপ্রাণা পত্নীর ভূমিকা নিতে হল বেদনার। তাতে সকলে তাঁর বেদনায় সান্ত্বনা দান করবে, আর তাঁর কাছে অন্য কোন বিষয়ে কেউ উত্থাপন করতে আসবে না।

তাঁর কৌশলই শেষপর্যন্ত কার্যে পরিণত হল। তিনি রমণী জীবনের ব্যর্থ হাহাকার দিয়ে মৃতসম্রাট বিহনের মালা গাঁথলেন।

মীর্জা হাকিমের মা সপত্নীর হাহাকারে সান্ত্বনা জানাতে লাগলেন।

এইসময় দিল্লী থেকে এল সংবাদ, পুত্র আকবর অসুস্থ।

হামিদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মাতৃত্ব আবার সচেতন হয়ে উঠলো কিন্তু তিনি ভীতা হলেন বৈরাম খানের জন্যে। তবু পুত্রের আকর্ষণই তাঁর সব বাঁধা অতিক্রম করলো। পুত্রকে দেখবার জন্যে হৃদয় হল দ্রবীভূত। শেষপর্যন্ত একদিন দিল্লী রওনা হলেন।

দিল্লীতে গিয়ে শুনলেন, আকবর সুস্থ হয়েছে। এই শোনার পর তিনি স্বামীহারার বেদনায় আবার শোকবিহ্বল হলেন।

প্রাসাদে প্রবেশ না করে শেরমণ্ডল পাঠাগারের সংলগ্ন কক্ষে শোকের এক নতুন চিত্র মেলে ধরলেন।

তিনি যে প্রিয়তম সম্রাটের কত আপন ছিলেন, মানুষটির সঙ্গে দীর্ঘ পনেরো বছর সান্নিধ্যে কাটিয়ে তাঁকে কত পেয়ার করতেন, তাঁরই প্রকাশ ফুটে উঠলো। রাজপুরীর সকলে দেখলো সাধ্বী বেগমের স্বামীশোকের দৃষ্টান্ত।

অবশ্য হামিদা অভিনয় করেন নি, সত্যিই তাঁর মনের মধ্যে স্বামীর জন্যে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, তবে কৌশলের মধ্যে ছিল বৈরাম খান যাতে তাঁর কাছে না আসতে সাহস করেন। আর তিনি যেন ভাবেন, সম্রাজ্ঞী সম্রাট ছাড়া অন্য পুরুষের আসক্তির বাইরের এক ভিন্ন জগতের মানুষ।

শেষপর্যন্ত হামিদার কৌশলই সার্থক হয়েছিল। বৈরাম খান সান্ত্বনা দিতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

তারপর এসে উপস্থিত হল কিশোর আকবর। আপন গর্ভজাত পুত্র, মুঘল সিংহাসনের জৌলুস, তাকে কেন্দ্র করে মায়ের অনেক আশা, সে এসে দাঁড়াতে আর মা নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি।

অবশ্য এরই মধ্যে হামিদা শুনেছিলেন, সলিমার প্রতি খানসাহেব আসক্ত। ভগ্নী, বাবর মহিষী গুলরুখ বেগমের কন্যা এই সলিমাকে দেখতে বাগিচার কুসুমের মত কমণীয়, যুবতীর যৌবন প্রস্ফুটিত লাবণ্যে চতুর্দিক আলোকিত। একে দেখে যদি খানসাহেব মুগ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ হতে পারে। একদিন তিনি বলেছিলেন, খানসাহেবকে আত্মীয় করে নেবেন।

এই সলিমাকে সঁপে দিয়েই যদি নিজেকে উদ্ধার করতে পারা যায়, মন্দ কি?

হামিদা সেই অনুমানেই পুত্রের হাত ধরে প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু মনের মধ্যে সেই স্বামীর চিন্তা ছাড়া

কিছু থাকলো না। তিনি যে এক পুরুষের চিন্তায় নিজের রমণী-জীবন উৎসর্গীত করেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিলাসব্যসন লুপ্ত হয়েছে—এই উপলব্ধি বোধই সবার মধ্যে জাগ্রত করলেন।

তারপর সলিমার সাথে একদিন শাবান মাসের পূর্ণতিথিতে বৈরাম খানের শাদী দিলেন। কে জানতো, নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এই শাদী দিতে আগ্রহী হয়েছিলেন? ভেবেছিলেন বৈরাম খানের আসক্তি হয়তো সলিমার মত এক খুবসুরত যুবতীকে পেলে নিঃশেষিত হবে। তাছাড়া আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত হতেও খানসাহেবের আগ্রহ ছিল। এই শাদীই দুই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করলো বলে হামিদা বানু খুশি হলেন।

কিন্তু তা যে শেষপর্যন্ত হয় নি, বৈরাম খানের তৃপ্তি যে কিছুতে নিবারিত হয় নি, পরবর্তী ঘটনাই তার প্রমাণ।

স্বামীর অধিকৃত ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদের অন্তঃপুরে দৌলতের মাঝে বাস করে হুমায়ুন-প্রিয়া জুলিবেগমের সেদিনের রোজনামচা কেউ যদি লিপিবদ্ধ করে থাকে, তাহলে সে জানবে সেই বিড়ম্বিত রমণী নিজের খাসকক্ষে বসে কিসের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত হয়েছেন?

ব্যভিচার বাদশাহ অন্তঃপুরের অঙ্গ ছিল কিন্তু ব্যভিচারিণী হতে চায় না—এমন রমণীও যে ছিল, তার কথা কে জানবে?

নাবালক বাদশাহের অভিভাবক।

ক্ষমতা সবই করায়ত্ত, শুধু সিংহাসনে উপবেশনই যা বাকী, আর নাবালক বাদশাহের নামে রাজ্য পরিচালনা করতে হয়। রক্ষী, সিপাহী, আমীর, ওমরাহ, রাজকর্মচারীরা মুঘল বংশধর আকবরের নামে জয়ঘোষণা করে। সকাল ও সন্ধ্যায় গম্বুজের অলিন্দে দাঁড়িয়ে মোল্লারা উদাত্তস্বরে সম্রাটের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করে। এসব মুঘল রীতি। বাবর শাহের সময় থেকে পালিত হয়ে আসছে। বাবর বাদশাহ উপাধি নিয়েছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে বসে। পূর্বে তার উপাধি ছিল মীর্জা।

কিন্তু এসব রীতিনীতি বাহ্যিক দর্শন। বাদশাহী ঠাট্। এতে বৈরাম খানের ক্ষমতা কিছু ম্লান হয় না। রাজদণ্ড তাঁর হাতে। বাদশাহী পাঞ্জা তাঁর অধীনে, সমস্ত ক্ষমতাই তিনি একা অধিকার করে নিজের ইচ্ছাকে মেলে দিয়েছেন।

তার ওপর নতুন করে মিললো মুঘলের আত্মীয়তা। এখন কেউ আর তাঁকে বিদেশী বলে অপমান করবে না। তিনি শিয়া মুসলিম প্রাধান্য বিস্তারে মন দিলেন। মুঘল সম্রাটরা অধিকাংশই সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাবর ছিলেন সুন্নী, হুমায়ুনও ছিলেন তাই। তবে তিনি যখন ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়ে পারস্য সুলতান শাহ তহমাস্পের কাছে ছিলেন, তারই অনুরোধে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। এবং তখন থেকেই তিনি শিয়াদের পরিচ্ছদ ও তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। অবশ্য হামিদা নিজে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলেই এই পরিবর্তন অতো শীঘ্র সম্ভব হয়েছিল।

বৈরাম খান রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাই এই মতবাদের প্রতি জোর দিলেন, তাতে এই হল যে বহু সুন্নী সম্প্রদায় আত্মীয় ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্বেষ পোষণ করলো। আর বৈরাম খান তাদের দমনে কৃতসঙ্কল্প হয়ে অত্যাচার শুরু করলেন। বেত্রাঘাত করে, হস্তিপদতলে পিষ্ট করে রাজ্যময় ত্রাসের সঞ্চার করলেন। মুঘল মীর্জা গোষ্ঠির ঔদ্ধত্য খর্ব করে এমন এক অত্যাচারের পরিচয় দিলেন, যা দেখলে শিহরিত হতে হয়। সম্রাটের কাছে আবেদনের জন্যে প্রার্থনা জানালে বালক বলে তাঁকে উপেক্ষার খাদে ফেলে দেওয়া হল।

অবশ্য মীর্জাদের ওপর এই অত্যাচারের সময় আকবর সরাব পানে অভ্যস্ত হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছে।

আর হামিদা বানু তার আগে প্রাসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে খানসাহেবের অত্যাচারে সহস্র দৃষ্টান্ত দেখে চমকিত হয়েছেন তাঁর কবল থেকে ভাগ্যহীনা রমণীরাও নিষ্কৃতি পায় নি। আকবর এসব সংবাদ জানতো না কিন্তু হামিদা বানু অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বহু জঘন্য দৃশ্য দেখে শিহরিত হয়েছিলেন। স্বামীও বিজেতার প্রতি অত্যাচার করতেন, তাদের রমণীদের ধরে নিয়ে এসে নিজের অঙ্কশায়িনী করতেন কিন্তু এমনভাবে কোমল অঙ্গ রক্তাক্ত করে তাদের আঘাত করতেন না। খানসাহেব সেই আচরণ করতে সাহসী হয়েছিলেন।

দেখা গেল হিমুর একটি পত্নী বিবস্ত্রভাবে উন্মুক্তক্ষেত্রে একটি লৌহময় স্তম্ভের গাত্রে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা।

এই পত্নীটি একসময় স্বামীর পরাজয় সংবাদ শুনে প্রচুর ধন-দৌলত রাজকোষ থেকে নিয়ে পলায়ন করেছিল। সঙ্গে ছিল হিমুর পিতা। হিমুর বৃদ্ধ পিতা।

এদিকে তখন মুঘল বিজয়বাহিনী দিল্লীতে প্রবেশ করেছে।

বিজয়োল্লাসে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে দিল্লীবাসী গোলাপজলের সৌরভ ছড়িয়ে মুঘল রাজপুরুষদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, এইসময় খবর এল হিমুর অন্যান্য লোকেদের কাণ্ড। যদিও হিমু তখন আহত রক্তাক্ত হয়ে একটি হস্তীপৃষ্ঠে জীবন্মৃত অবস্থায় বিজয়বাহিনীর সাথে প্রহরার মধ্যে। দেখছে অগণিত জনসমুদ্র লাখো লাখো চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে। তারা নিজেদের শারীরিক বলপ্রয়োগের অভিনয় করে সেই পরাজিত বিশাল পুরুষ বন্দীকে নিহত করবার প্রয়াস জানাচ্ছে। কেউ কেউ চীৎকার করে বলছে—কেন এখনও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ঐ বিজেতাকে ? ওর খণ্ডবিখণ্ড দেহ শকুনের আহারের জন্যে পথের বুকে ছড়িয়ে দেওয়া হোক্। অবশ্য মুঘলরা পরাজিত হলেও এমনি উক্তি জনতার দ্বারা ঘোষিত হত। যাই হোক এমনি ধরণের অনেক উত্তেজিত ঘোষণা জনতার ভেতর থেকে বিজয় বাহিনীর দিকে ছুটে আসছিল।

ঠিক এমনি সময়ে জানা গেল। দুর্গের ধনাগার, রত্নাগার, উজাড় করে সমস্ত ধনদৌলত পরাজিত হিমুর অনুচর, আত্মীয়স্বজন লুটপাট করে পালিয়েছে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবার একদল সশস্ত্র সৈন্য আনন্দ কোলাহল থেকে বেরিয়ে খানসাহেবের নির্দেশ পেয়ে ছুটলো।

কতদূর আর দুর্বৃত্তরা পালাবে ?

তার চেয়ে দ্রুতগামী অশ্বারোহী মুঘল সৈন্য। ধরা পড়লো এক এক করে অনেক নারীপুরুষ। কারো কাছে ধনদৌলত পাওয়া গেল, কারো কাছে মূল্যবান পোষাক, কেউ নিয়েছে কিছু সোনার তৈজসপত্তর—আর কারো বা কাছে কিছু নেই, শুধু সে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে।

সব ধরা পড়লো।

বিরাট এক দুর্ভাগ্যের মিছিল প্রহার গ্রহণ করতে করতে আবার

দিল্লীর রাজপথ দিয়ে দুর্গের দিকে ফিরে চললো। তাদের প্রহরায় উন্মোচিত তরবারী ও বর্শা হাতে অশ্বারোহী সৈনিকের দল।

জনতা আবার উল্লসিত হয়ে উঠলো।

তারাই যেন বন্দীদের শাস্তি দেবার জন্যে ছুটে এল।

দুর্গের মাঝে তারপর সেই ধৃত নারীপুরুষ ও শিশুদের হত্যার নৃশংস প্রহসন চলতে লাগলো।

হামিদা সেদিন দুর্গে ছিলেন না, আর আকবর থাকলেও তখন অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

নৃশংস সেই হত্যার ইতিহাস প্রহরীদের চাপা আর্তনাদে গাঁথা আছে। তারা ভয়ে জোরে পর্যন্ত কথা বলে না, শুধু বধ্যভূমিটি দেখিয়ে ফিসফিস করে বলে—কাকেও ক্ষমা করা হয় নি, কেউ ক্ষমা পায় নি। যুবতী রমণীগুলিকে প্রকাশ্যে সৈনিকদের দ্বারা ধর্ষণ করিয়ে তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। শুধু তীক্ষ্ণ তরবারীর এক এক কোপ।

হিমুর পিতা ও এক পত্নী কিছু অনুচর পরিবৃত হয়ে অনেকদূর চলে গিয়েছিলেন। রত্নগিরি, পাঠানগৌরি, মেওয়াটের কাছাকাছি। মেওয়াটে গিয়ে ধরা পড়লেন হিমুর পিতা।

বীরপুত্রের পিতাও বীর। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সৈনিকের সামনে বুক ফুলিয়ে বললেন—হত্যা কর, আমি প্রস্তুত।

কিন্তু সৈনিকরা তাঁকে হত্যা করলো না। তাঁকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে বলপ্রয়োগ করতে লাগলো।

হিমুর পিতা কিছুতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলেন না। অনেক অত্যাচার তার জন্যে নীরবে সহ্য করলেন।

শেষে তার মুখে জোর করে গোস পুরে দেওয়া হল। তিনি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বিরাট ওজনের লাথি ছুঁড়ে দুজন সৈনিকের উদর ছিন্ন করে তাদের মৃত্যু সংঘটিত করলেন।

তাঁকে এই অপরাধের জন্যে অবিলম্বে হত্যা করা হল।

মৃতদেহ অবশ্য দিল্লীদুর্গে প্রেরিত হয়েছিল।

পুত্র হিমুর মুণ্ড যেমন কাবুলের প্রাসাদ দ্বারে স্থাপিত হয়েছিল, তেমনি পিতার মুণ্ড পুত্রের মুণ্ডের পাশে স্থান অধিকার করতে গেল। আর ধড়টি দিল্লীদুর্গের দ্বারে স্থাপিত হল, সেখানেও ছিল হিমুর বিশাল বক্ষ সম্বলিত ধড়টি।

হিমুর এক পত্নী ছিল না, তাঁরও বহু পত্নী ছিল। তবে তাদের আলাদাভাবে কোন গণনা হয় নি। যখন সকলে ধরা পড়েছিল, তার মধ্যে অনেক রমণী ছিল, হয়তো তাদের মধ্যে কটি। সে যাই হোক, যে পত্নী ধনদৌলত নিয়ে পালিয়েছিল, তাকে নিয়েই বিশেষ চিন্তা হল। শোনা গেল, সে নাকি ধনাগারের প্রায় অর্ধেক দৌলত নিয়ে পালিয়েছে।

হিমুর পিতা মেওয়াটে ধরা পড়লেও তাকে ধরা গেল না।

একে সে রমণী, তারপর ধূর্তস্বভাবের। পাহাড়ের কোন্ খাদের পাশে গিয়ে লুকিয়েছে কে জানে? আবার পাহাড়ের স্থানে স্থানে সব বাসগৃহ। সেখানে অনেক নারীপুরুষ। তাদের কোন ঘরে লুকিয়েছে কে জানে? তাছাড়া হিমুর পত্নীকে কেউ দেখে নি, সনাক্ত করবে কে? এই অবস্থায় শেষে কি কারও অন্তঃপুরিকাকে টেনে আমার কোন নতুন ঝামেলা সৃষ্টি হবে?

কিন্তু এদিকে খানসাহেবের ঢালাও হুকুম, সেই কাফের রমণীর জিন্দা শির নিয়ে আসবে। নইলে তোমাদের গর্দ্দান যাবে।

চললো অন্বেষণ।

শেষে একটি অনুচর ধরা পড়লো। জানা গিয়েছিল, দুজন অনুচর সেই রমণীর সঙ্গে আছে। এত ধনদৌলত যার সঙ্গে আছে, তার গোপনতার মাঝে থাকা মুস্কিল। সাধারণ লোকই তার খোঁজ দেয়।

হলও তাই। ধৃত অনুচরটির কাছে ছিল কতকগুলি আস্‌লি হীরা। সে সেই হীরা বেচবার ফিকিরে ঘুরছিল।

সাধারণ লোক তার খোঁজ দিল।

সৈনিকরা তাকে হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে ধরে নিয়ে এল। চললো প্রহার। খুললো মুখ। বলে ফেললো মারের চোটে গোপন কথা।

এক বণিকের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেই আছে মহারাজার মহিষী।

সেই অনুচরটি সঙ্গে করে সৈনিকরা গিয়ে বণিকের আবাসস্থল ঘেরাও করলো। সমতলভূমিতেই সেই বণিকের বিরাট চৌমহল্লার আবাসস্থল। অনেক পাইক বরকন্দাজও সেখানে ছিল। তাদের সঙ্গে সাময়িক খণ্ডযুদ্ধ হল কিন্তু মুঘল সৈন্যের রণনীতির সাথে তারা পারবে কেন?

শেষে বণিকের আরো ক্ষয় হবার সম্ভবনায় হিমুর পত্নী এসে ধরা দিল। অবশ্য সঙ্গে ধনদৌলতও নিয়ে এল।

বন্দিনীকে হস্তপদশৃঙ্খলিত করে সৈনিকরা বিজয়ের উল্লাসে দিল্লীর দিকে রওনা হল।

দিল্লীর দুর্গের সিংহদরজার মাথায় তখনও দুটি কঙ্কাল ধড় ঝুলছিল।

পত্নীকে দেখিয়ে বলা হল, এদের চিনতে পারো?

বুঝতে পেরেছিল রমণীটি কিন্তু উত্তর না দিয়ে মুখটি ঘুরিয়ে নিল।

তারপর সম্মুখে নীত হল অত্যাচারিত ভয়ঙ্কর শার্দুল শয়তান বৈরাম খানের।

অনেকক্ষণ বন্দিনীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর রক্ষীদের আদেশ করলেন খানসাহেব—কাফেরের জেনানা, শুনেছি তার আস্বাদন নাকি দ্রাক্ষারসের আস্বাদনকেও হার মানায়। একে আমার খাসকক্ষে উপযুক্ত পাহারার মধ্যে রক্ষা কর।

তারপর বৈরাম খান সেরাত্রির সমস্ত ক্ষণ সরাব পান করেছেন।

আর তাঁর খাসকক্ষের অভ্যন্তরে সেই বন্দিনীকে নিয়ে কি করলেন কেউ জানে না॥ কোন্ মায়ামন্ত্র দিয়ে তিনি সেই হিন্দু-রমণীকে বশ করলেন, বলতে পারা যায় না। তবে কেউ সেরাত্রে খান-সাহেবের কক্ষ থেকে কোন অস্বাভাবিক চীৎকার শুনতে পায় নি।

প্রস্তরের পুরু দেয়ালে অনেকেই কান রেখেছিল।

শুধু বৈরাম খানের পরবর্তী কর্মধারা সকলে দেখলো, হিমুর পত্নীর বিবস্ত্র দেহ অন্তঃপুরের একটি লৌহ থামের সাথে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকলো।

হামিদা এসে এই দৃশ্যই দেখেছিলেন কিন্তু দেখে বড় অসহায় বোধ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ঐ বন্দিনী নগ্ন হয়ে নেই, সমস্ত রমণীরাই আজ নগ্ন হয়ে পুরুষের লালসার খোরাক হয়েছে। না হয় ওকে হত্যা করা হোক, নতুবা এই জঘন্য পদ্ধতি বন্ধ করা হোক। আর যাকে নগ্ন করে লজ্জা দেওয়া হয়েছে, তাকে তো দেখা যাচ্ছে, সমস্ত অনুভূতির বাইরে এক নির্জীব প্রাণী। পড়ে আছে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে।

বরং তাকে দেখে লজ্জা করছে, জেনানামহলের অন্যান্য রমণীদের। রমণীরা নিজেদের নগ্নসৌন্দর্যের এই অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখে নিজেরা আহত হচ্ছে।

হামিদা অন্তঃপুরের অনেকের কাছ থেকে এই অভিযোগ শুনলেন, এবং এও তাঁরা বললেন—বরং ঐ আওরতটিকে বারমহলে পুরুষের কামনায় তলায় রাখলেই সবচেয়ে মঙ্গল। সেখানে যখন অন্যরমণী নেই, তাদের মনে আঘাত লাগবে না।

হামিদা সবই বুঝলেন কিন্তু প্রতিবাদের ক্ষমতা তাঁর সহজে সৃষ্টি হল না। তাঁর মনে তখন বৈরাম খানের জন্যে ভীতিভাব।

একবারও খানসাহেব প্রাসাদে প্রবেশ করা কালীন তাঁর সম্মুখে আসেন নি।

দুজনের মধ্যে তখন লুকোচুরির খেলা চলেছে।

অথচ অন্তঃপুরের বীভৎস দৃশ্য দেখে হামিদার নিঃশ্বাস রুদ্ধ। এ কোন্ শ্মশানে এলাম? এ কোন্ কবরশায়িত মৃতকান্নার নিশ্চুপ প্রান্তরে বাস করছি?

ইসলাম শাহের সেই সেরা খুবসুরত কাশ্মিরী বেগমের ওপর বৈরামের অনেকদিন থেকে লোভ ছিল। একথা স্বামী বেঁচে থাকতেই শুনেছিলেন হামিদা। তাকে দেখলেন ধরে নিয়ে এসেছে বৈরাম খান। শুধু তাকে আনেননি সঙ্গে তার বাচ্চা কন্যাটিকেও ধরে এনেছেন? যুবতী আওরতের ওপর নয় পুরুষের লোভ আছে কিন্তু বাচ্চা লেড়কিকে দিয়ে কি হবে? শোনা গেল, তাকে অন্তঃপুরে বড় হতে দেওয়া হবে—তারপর অন্য ব্যবস্থা।

এই কাশ্মিরী বেগম এখন খানসাহেবের অত্যাচারে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে বিকৃত আচরণ করে চলেছে। তার অস্বাভাবিক চীৎকারে মহলে থাকাই দুষ্কর কিন্তু পাগলকে কি বলা যাবে?

হামিদা মহা চিন্তায় পড়লেন। বৈরাম খান যে এমনি অত্যাচারী হয়ে উঠবেন, এ আগেই জানা ছিল। কিন্তু একটা উপায় তো দরকার! অথচ এই খানসাহেবকে চটালেও চলবে না, নাবালক পুত্রের সাবালকত্বের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু সে কতদিন? ততদিন এই রাজ্য, রাজত্ব, রাজপ্রাসাদ থাকবে তো!

সবচেয়ে মন তার পুড়লো পীর মহম্মদকে চরিত্রহীনতার দোষ দিতে।

চরিত্র কার আছে? তামাম ভারতবর্ষের কারুর আছে? আছে কোন মুঘল রাজবংশের নারীপুরুষের? এমন কি পরিবারের কারুরই তখন চরিত্র ছিল না। দিনরাত চলছে হারেমের মধ্যেই বেলেল্লাপণা। স্বামীর ভ্রাতাদের কন্যারা বিরাট স্বাধীনতা পেয়েছে! বাপ নেই, মা নেই। কোন উপযুক্ত অভিভাবক নেই সুতরাং চরিত্রের প্রয়োজন কি? জীবনের সুখের জন্যে ছড়িয়ে দাও মন, সুরার পাত্র কণ্ঠে ঢেলে রঙিন চোখে বেহোঁসী দরিয়ায় গা ভাসিয়ে

দাও। আসকারীর চারকন্যা, সুলতানাম, জেহারা, খানজাদা, গুল-সিহারা। কামরানের দুইকন্যা, হাজী ও গুল-ইজার। স্বামীর বৈমাত্রেয় ভগ্নী গুলবদনের পৌত্রী উমই কুলসুম।

আত্মীয় কম নেই। ফরঘণা সমরখন্দ, কাবুলে যত চাঘতাই আত্মীয় ছিল, সব আজ এই দিল্লীতে। আগ্রাতেও কিছু গেছে, তবে সে প্রাসাদ সংস্কার হচ্ছে বলে এখানেই সব এসে জুটেছে।

তাই উচ্ছৃঙ্খল হবার সুযোগ হয়েছে সবার।

উৎসবের মাঝে অনেক আলো ও কোলাহল যেমন সব জমজমাট করে রাখে, অন্তঃপুরের মাঝে সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সেইসময় পীরমহম্মদই চরিত্রহীনতার উপাধি পেলেন।

অথচ এই শিক্ষিত মানুষটি একদিন বৈরাম খান ও আকবরের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অবশ্য এর পিছনে একটা বিরাট অন্তর্নিহিত ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে।

তাও হামিদা পরে জেনে ছিলেন।

তখন ধর্ম আন্দোলন চতুর্দিকে। শিয়া সুন্নী প্রতিযোগিতা।

সেই সময় অবশ্য খানসাহেব শাদী করা নব পরিনীতা বধূ সলিমার দেহবৃন্তের কুসুমসর্গে স্বর্গরচনা করছেন। ভিন্ন একটি নূতন ফ্যাসানের বেহোঁসী খাস তৈরী হয়েছে। সেখানে দিন ও রাত্রে সর্বদা জ্যোৎস্নার মায়াবিনী আলো। মধুযামিনী সেই বেহোঁসী মহালেই খানসাহেব সলিমার সাথে উদযাপন করলেন।

বৈরাম খানখানান উপাধি সেইদিনই তাঁর শিরে স্থাপিত হল।

একদিকে মুঘল আত্মীয়তা, অন্যদিকে উপাধির সবচেয়ে বড় রাজসিকতা। পদগৌরবে গৌরবান্বিত খানসাহেব শিয়া মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অত্যাচারের ভূমিকা নিলেন।

তিনি জানতেন, রাজমাতা বেগম মহিষী শিয়া ধর্মী, তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন।

সুন্নীরা দলে দলে প্রাসাদের বাইরে চলে যেতে লাগলো। কেউ প্রতিবাদ করতে যেতে ঘাতকের কাছে প্রেরিত হল।

জেনানা মহলেও সেই ঢেউ লাগলো। যারা সুন্নী তারা নয় শিয়া হবে, নতুবা প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে। বহু তাঞ্জাম এইজন্যে প্রাসাদের বাইরে যাওয়া আসা করতে লাগলো।

লজ্জালী ছিল বিবি মুবারিকার দুরসম্পর্কের আত্মীয়া। বাবর শাহের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী এই বিবি মুবারিকা। ইউ সুফজাই-প্রধানের কন্যা। এই বিবি মুবারিকাকে বাবর শাহের লাভ করবার একটি চমৎপ্রদ ইতিহাস আছে। অতবড়ো একজন পার্বত্য প্রধান কি করে যে বাবর শাহের আনুগত্য স্বীকার করলেন, সে একটা বোঝবার মত। শুধু আনুগত্য নয়, নিজের একমাত্র কন্যাকে উপহার দিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

বিবি মুবারিকা আজ পরপারে। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি হয় নি।

লজ্জালীকে শিশুবয়সে মহিষী এই হারেমে নিয়ে এসেছিলেন।

সেই লজ্জালী আজ যুবতী কিন্তু এই যুবতীর প্রকৃতি ছিল বড় ভয়ঙ্কর। বন্য হরিনীর মত সে অন্তঃপুরের চতুর্দিকে কিসের সন্ধানে ফিরতো। বাতাসের তপ্তনিশ্বাসের মত, কুসুমের নীরব সৌরভের মত, আতরের রঙিন খসবুর মত—সে নিজের সৌন্দর্য মেলে চতুর্দিক মুখর করে রাখতো।

তখন জেনানামহলে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বইতে শুরু করেছে। লজ্জালীর বাসনা নয়কে হয় করা। অর্থাৎ নিষিদ্ধ পথের আকর্ষণই বেশী।

শুনলো সে, মোল্লা পীর মহম্মদকে কলঙ্কিত করবার জন্যে ষড়যন্ত্র চলছে। লোকটি বড় ধর্মভীরু। চরিত্র, চরিত্র বলে সর্বদা হুঙ্কার দিচ্ছেন। এবং চরিত্রহীনতার জন্যে শাস্তি ফরমাইস করেছেন।

পবিত্র জীবন আল্লার অভিপ্রেত, শুদ্ধজীবনের মধ্যে আছে রাজসিক জৌলুস, সে জৌলুষ দৌলতের রোশনাইকেও ম্লান করে।

কয়েকজন খুবসুরত যুবতী রমণী বক্ষের মাসুম স্তম্ভে জোয়ার তুলে মোল্লা আলির বাসস্থানের আনাচে কানাচে গভীর নিশিথে ঘোরাফেরা করেছে।

কিন্তু কঠিন সেই মানুষ, নির্দয় সেই পুরুষ আওরতকে জগতের ঘৃণ্য প্রাণী জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছেন। কেউ পীড়াপীড়ি করলে তাকে স্নেহবিজড়িতকণ্ঠে বলেছেন—মা কি কখনও সন্তানের সঙ্গে লালসার সম্বন্ধ স্থাপন করেন ?

যখন সকলে অকৃতকার্য হয়ে সেই অকৃতদার মানুষটির সান্নিধ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে চলে এসেছে, সেইসময় লজ্জালীর প্রতিজ্ঞা হল, এই বেহেস্তের পবিত্র পুরুষটিকে মাটির স্বর্গের দোস্তাকে নামিয়ে আনতে হবে। না হলে তার আওরত জীবন কি ?

পরে অবশ্য লজ্জালীকে হামিদা ক্ষমা করেন নি, নির্মমভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন।

তবে সে কথা পরে প্রকাশ্য। পরের পরিণতি চিন্তা করে লজ্জালী এগিয়ে যায় নি। পরিণতি তখন ভাবার মতই কিছু ছিল না।

লজ্জালী শুধু নিজেকে মনোমত সাজালো।

রাত মোহিনী বসন পরিধান করলো। নিম্নাগ্রে একটি গাঢ় নীলবর্ণের ঘাঘরা পরে, বক্ষের মাসুম প্রবালে রক্তের চাপরঙের কাঁচুলী বাঁধলো। দর্পণের সামনে নিজেকে ধরে লজ্জালী সেই মোল্লাসাহেবের কথা ভাবলো।

পবিত্র জীবন যদি আল্লারই অভিপ্রেত হয়, তাহলে ভোগের জন্যে এই ইস্তাম্বুলের চিত্তোন্মাদকর আওরত পয়দা হল কেন ? কেন এল মোহিনী রাত্রির অনিন্দনীয় সেই মাধুকরী মুহূর্তগুলি ? চন্দ্রালোক মেঘের আড়ালে লুকায়িত থেকে অন্ধকারের বিস্তার

মেলে ধরতে পারতো! তাহলে শুধু বিশ্রামের জন্যে, নিদ্রার জন্যে রাত্রি পৃথিবীতে আসতো। রাত্রিকে নিয়ে তাহলে এতো কাব্য রচনা হত না।

লজ্জালীর প্রকটিত যৌবনে সঙ্কীর্ণ বসনের ঘেরাটোপ আরো চিত্তদাহের ইন্ধন সংযোজিত করলো। পান করলো সে জোরালো খসবু সরাব, সুর্মা দিয়ে এমনভাবে চোখের প্রান্তঃভাগ টানলো, যে দৃষ্টি সহজে কারোর উপর প্রতিফলিত হলে সে অবহেলা করতে পারবে না। বরং কিসের যেন আকর্ষণে তাকে লজ্জালীর কাছে টানবে।

তাছাড়া চাপাকলির মত হাতের আঙ্গুলের ডগায় মেহেদী রঙ ও পদ্মকলির মত কম্পিত রক্তাক্ত ঠোঁটে তাম্বুলের রঙ চড়ালো।

যেন মনে হল, ঊর্ধ্বলোকের সেই মহাদেবেরও বুঝি তপস্যা ভঙ্গ হবে।

দুধে আলতা রঙের গাত্রবর্ণ অধিকাংশই উন্মুক্ত। শুধু বক্ষে একখণ্ড কাঁচুলীর বন্ধন, সে ইচ্ছে করলে লজ্জালী মুহূর্তে খুলে ফেলতে পারে। আর কোমরে বুটিদার ঘাঘরা। তাও সূক্ষ্ম মসলিনের। একটু স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টিস্থাপন করলে সবই দৃশ্যমান। দুখানি পুষ্টপায়ের বর্ণ সুষমা কি দৃষ্টিগোচর হয় না? আর নাভিদেশের মসৃণ পেলবতা! নিতম্বের সেই বীণার ঊর্ধ্বভাগও ঐ ঘাঘরার আবরণে ঢাকা নয়।

সমস্ত দেহে লজ্জালী নানারকমের জোরালো আতর মাখলো, যে আতরের জোরালো খসবুতে মাথা ঘোরে। কুসুমের বর্ণ ও সৌরভ দিয়ে কেশবিন্যাস করলো, দর্পণের সামনে নিজেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তারপর একখানি ওড়নার আচ্ছাদন দেহে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

রাত্রির প্রহরের দিকে তাকিয়ে আরো সময় নিল লজ্জালী।

যখন নেমে এল নীরব গভীরতা। চাপ বাঁধা নিস্তব্ধতার অতন্দ্রান্ত নিঝুমতা।

রাতজাগা পাখী বিদঘুটে শব্দে ডাকতে ডাকতে নিদ্রিত প্রাসাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

প্রহরীর ভারী পায়ের শব্দ শুধু গম্বুজের ছোট্ট ঘুলঘুলি থেকে ভেসে আসছে। ভেসে আসছে সারেঙ্গীর সুর মাতানো তান ও দ্রুতলয়, কে যেন দুর্দ্দামবেগে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নৃত্য করে চলেছে। জেনানামহলের কোন্ প্রকোষ্ঠ থেকে ইসলামের সেই বন্দিনী কাশ্মিরী বেগমের পাগলের মত চীৎকার নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করছে। হিমুর পত্নী দেহত্যাগ করেছে, না হলে তারও গোঙানি শোনা যেত।

আরো কত শব্দ, একটা বিরাট প্রাসাদের শব্দের কি শেষ আছে? অশ্বশালায় অশ্ব, হাতিশালায় হাতির ডাক। দিনের বেলাও তারা ডাকে, তবে অতোটা প্রতিধ্বনি হয় না, কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রিতে চীৎকার করলে যেন ঘাতকের কৃপাণটা নিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

বন্দীদের অধিকাংশই এই রাত্রিবেলা বেয়াদপির জন্য শাস্তি পেত।

অবশ্য বন্দীশালাটা অনেকদূরে। প্রাসাদের একেবারে শেষ-মাথায় একটি কৃত্রিম পাহাড়ের পাশে। কিন্তু দূর হলে কি হবে—তাদের পরিত্রাহি চীৎকার অনেক সোচ্চারেই এদিকে ছুটে আসতো।

তাই নিস্তব্ধতা কোথাও নেই।

সেই নিস্তব্ধহীন অথচ স্তব্ধ, নিদ্রিত রাত্রিকে খণ্ড খণ্ড করে যখন প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে উঠলো, তখন লজ্জালী লজ্জার ভূষণ ত্যাগ করে আলোছায়া ঘেরা অলিন্দের কিনার দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো।

কোন কোন প্রহরী তাকে বাধাদানের জন্য এগিয়ে এল।

প্রাসাদের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চাইলো। হারেমের ইজ্জত বাঁচাতে চাইলো কিন্তু তখন কে আর হারেমের ইজ্জত রক্ষা করতো ?

হারেমের কঠিন অবরোধ রচনা হয়েছিল আরো পরে।

তখন একটু কৌশল অবলম্বন করলেই প্রাচীরের সীমানা লঙ্ঘন করা যেত।

লজ্জালী তাই বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হল না। সে দ্রুত গতিতে অভিসারিকা হবার জন্যে অচেনা পথ ধরে এগিয়ে চললো।

পথে এক লুব্ধ রক্ষী তার পিছু নিল।

লজ্জালী পীরসাহেবের বাসস্থান জানতো না, সে সেই লুব্ধ রক্ষীকে দিয়ে পথ চিনিয়ে নিল।

লজ্জালী তখন ভাবছে, পারবে তো! চরিত্রবান সেই ধর্মীয় উপদেষ্টা পণ্ডিত-প্রবর মোল্লা পীর মহম্মদ সাহেব। কখনও তাকে দেখেনি, শুনেছে এক হাত ঘন দাড়ি লম্বিতভাবে থুতনি থেকে ঝুলছে। বীর্যবান সেই মরদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আকৃতি নাকি মর্মরের কঠিন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা!

যত এগিয়ে যেতে লাগলো, উৎসাহ লজ্জালীর স্তিমিত হল। ওড়নাখানা নিজের উর্ধ্বাঙ্গকে আরো আড়াল করে শ্লথ গতি দ্রুত করলো।

সেই রক্ষী পাশে চলতে চলতে তার হাত ধরলো।

চাপাস্বরে বললো—আমার ঘরে চল, কেন এ খোয়াবী রাত বৃথা যেতে দিচ্ছ? মোল্লা পীরসাহেব খোজা আদমি আছে! তোমার এই জোয়ানী কলিজার তপ্ত শোণিতের স্বাদ কি বুঝবে?

লজ্জালী উত্তর দিল না। সে তখন সত্যিই ভাবছে, পীরসাহেব কি সত্যিই পুরুষত্বহীন এক কাম্বাক আদমি? না, সৎ হবার ভান করে চরিত্রবান এক বীর্যময় সাত্ত্বিক পুরুষ!

যদি দ্বিতীয় অর্থের অধিকারী হয়, তাহলে লজ্জালী তার রমণী

দেহের একটি একটি মোহিনী ঐশ্বর্য মেলে ধরে ঐ চরিত্রবানের চরিত্র কলঙ্কিত করবে। কিন্তু উৎসাহ হঠাৎ স্তিমিত হয়ে আসছে কেন ?

এইসময় সেই রক্ষী নিশানা দিয়ে দূরে দেখালো পীরসাহেবের বাসস্থান।

আর সঙ্গে সঙ্গে লজ্জালী রক্ষীর হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে তাকে জানালো—এবার বিদায় হও খাঁ সাহেব। যদি ঐ পীর পয়গম্বর মানুষটিকে বেহেস্ত থেকে দুনিয়ার মাটিতে নামাতে পারি, তাহলে আবার দেখা হবে।

এই বলে লজ্জালী আর অপেক্ষা না করে সেই বাসস্থানের দিকে এগিয়ে চললো।

নিঝুম একটি ছোট প্রকোষ্ঠ। চতুর্দিক উন্মুক্ততার মধ্যে এক পাশে এই পবিত্র পীরের বাসস্থান।

তখন রাত্রি কত হবে কে জানে ?

আগে যে শব্দের ঐক্যতান জেগেছিল, এখন আর নেই।

প্রাঙ্গনের মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ লজ্জালীর বুকটি ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

এমন সময় কোথা থেকে একটি পেচক চীৎকার করে বিদঘুটে শব্দ করলো।

লজ্জালীর তাতে কোন ভয় নেই। এমনি তারা রাত্রিবেলা বড় একটা নিদ্রা যায় না। তারই বয়সী অনেক রমণী জোয়ানী বয়সের দিলকে সেলাম জানাতে জেগে থাকে। তাই তাদের কাছে রাত্রির ভয়াবহতা পরিচিত। কতদিন এমনি গভীর নিশীথে তারা অলিন্দে দাঁড়িয়ে আসমানের চুপি চুপি প্রহর যাপনা দেখেছে।

লজ্জালী হঠাৎ গবাক্ষ দিয়ে একজন লম্বিত দাড়ির মানুষকে কক্ষের মধ্যে আলোর সামনে পাঠরত দেখলো।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে হৃত খুশির হিল্লোল পুনঃসঞ্চার হল।

মোল্লাসাহেব এখনও জেগে আছেন? তাকে জাগাবার জন্যে কোন ছলাকলার আশ্রয় নিতে হবে না? এই কথা চিন্তা করে লজ্জালী প্রগলভ হল।

এবার তার রমণী জীবনের ক্ষমতা। যদি পারে পীরকে শপথ থেকে মাটির সর্গে নামাতে, তবেই তার এই যৌবন, এই লুব্ধ দেহ, রমণী জীবন সার্থক। এই গভীর রাত্রে অন্তঃপুর ছেড়ে এক অনিশ্চিতের অভিসারে নিজেকে সঁপে দেওয়া সার্থক হবে।

আর তার কুসুম সুরভিত পবিত্র মাসুম যৌবন এতদিন ধরে যে সৎকার্যে ব্যয়ের জন্য সযত্নে রক্ষিত ছিল, তা উপযুক্ত পথ পাবে। হোক প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ের রক্তে না থাক যুবকের মত উন্মাদ শক্তি, তবু সেই প্রৌঢ় মানুষটি এতদিন ধরে নিজের কৌমার্য ধরে রেখেছেন—এই ক্ষমতাই যে লজ্জালীকে উৎসাহিত করেছে। আর তার জন্যেই এই নিশিথ অভিসার।

বাইরের জাফরীর মাঝে চোখ স্থাপন করে লজ্জালী অনেকক্ষণ ধরে ভেতরের মানুষটিকে দেখলো। একটি স্বর্ণময় বর্তিকার আলো সামনে নিয়ে রাশিকৃত পুস্তকের মধ্যে উজ্জ্বল চক্ষু দুটি ন্যস্ত করে একটি স্বাস্থ্যবান দেবপুরুষ একমনে অধ্যয়নে রত।

রক্তাভ মুখমণ্ডলের ওপর যেন কিসের এক অনির্বাণ দ্যুতি। কিসের এক দাম্ভিক জ্যোতি সমস্ত মুখমণ্ডল থেকে বের হয়ে কক্ষ আলোকিত করেছে। লম্বিত শ্মশ্রুরাশির ওপর মেহেদি রঙের প্রলেপ। প্রশস্ত বক্ষের ওপর কোন আচ্ছাদন নেই। বিরাট সেই বক্ষকে সৌন্দর্য দান করে পৌরুষ রোমরাশি বক্ষের প্রান্তভাগে আকীর্ণ।

বসে আছেন একটি মেহগনি কুর্সিতে। পরণে একটি সাধারণ লুঙ্গি জাতীয় পোষাক।

লজ্জালীর হঠাৎ কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। এর আগে অনেকগুলি আওরত পীরসাহেবকে বশীভূত করবার জন্যে এই রাত্রে

এখানে এসেছে কিন্তু কেউ তাঁকে জয় করতে পারেনি। কেন পারেনি তার প্রমাণ বুঝি আর গোপন নেই।……কেউ পারে না। এমনি এক দৃঢ়চেতা মানুষের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার ক্ষমতা কারুর নেই।

কিন্তু সে পরাজিত হয়ে চলে যাবে বলে তো আসেনি! বরং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই নিজের যৌবন প্রকটিত করে ছুটে এসেছে। পুরুষ যদি হয়, পুরুষত্ব যদি লুপ্ত না হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় তাকে অবশ করতে পারবে।

এখন এখানে এসে মনে হচ্ছে, তার ধারণাই ভুল। দুনিয়ার সমস্ত পুরুষই এক নয়, তার মধ্যে পুরুষত্বের এমন এক ক্ষমতা নিয়ে এক একজন আছে, যাকে বশীভূত করতে জগতের কোন রমণীরই কর্ম নয়। বরং তাদের কারুর কৌমার্যের বহ্নিতে জোয়ানি আওরতের রক্ত হিম হয়ে যায়।

এই পীর সাহেবের জ্যোতিতেও যেন তার রক্ত হিম হয়ে যেতে লাগলো।

লজ্জালী অনেকক্ষণ ধরে সেই আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে তার স্বভাব ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিযোগিতায় পরাভূত করতে হবে। হোন্ তিনি কৌমার্যজয়ী শ্রেষ্ঠপুরুষ। 'আমিও কি মাস্তুম ইজ্জত নিয়ে এতদিন নিজেকে রক্ষা করি নি?' আওরত ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সমস্ত কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে, আবার সৃষ্টি করতে পারে প্রেমের অমৃতময় স্বর্গীয় নন্দনকানন।

একথা যদি ঐ আল্লা উপাসক দাম্ভিক পুরুষ মোল্লা পীরমহম্মদ না বুঝে থাকেন, তাহলে মিথ্যা চেষ্টা তাঁর এতদিনের পুস্তক অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্য বুদ্ধি।

এই কথা ভাবতে ভাবতে শক্তি সঞ্চয় হতে হঠাৎ লজ্জালী তার

ওড়নার আবরণ সরিয়ে দিল। ঝলকে উঠলো কাঁচুলীর অভ্যন্তরের মাসুম জোয়ানি লীলায়িত যৌবন সোহাগ চূড়া। দেহের বাঁকে বাঁকে জ্বলে উঠলো কামনার রক্তবর্ণ শিখা। নিতম্বে যমুনার স্রোতের জোয়ার তুলে, চোখে টেনে মোহিনী আকর্ষণ—লজ্জালী পাশের অলিন্দ দিয়ে যে কক্ষে পীরসাহেব পাঠরত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

নিঃশব্দে কোন তান সৃষ্টি না করে সঙ্গীত যেমন অন্তরের মাঝে জেগে ওঠে, তেমনি লজ্জালী সঙ্গীতের মত পা টিপে টিপে পীর মহম্মদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু মোল্লাসাহেব তখন পুস্তকের মধ্যে সমাসন্ন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান কিছু ছিল না। গভীর নিশিথের নিস্তব্ধ রজনীতে জ্ঞানগর্ভ মানুষ পুস্তকের কালো কালো হরফ থেকে কি এক আধ্যাত্মিক রস আহরণ করে নেমে গেছেন সমুদ্রের কোন্ অতল সীমাহীন প্রদেশে—যেখানে বাহ্যরূপ নিতান্তই গৌণ।

লজ্জালী মাসুম বক্ষের একান্ত নগ্নতার সৌন্দর্য নিয়ে নিঃশব্দে কমল প্রস্ফুটিত করে অপেক্ষামানা থাকলো। উদ্দেশ্য, মোল্লা চোখ তুললেই সামনে দেখতে পাবেন কমল দলের প্রস্ফুটিত লীলা সৌন্দর্য। আর যদি শরীরে এতটুকু সুপ্ত বাসনা থাকে তাহলে জেগে উঠবে পরতে পরতে। অন্ততঃ লজ্জালীর তাই ধারণা।

আজ রমণী হয়েছে পণ্য!, আর পুরুষকে জয় করার জন্যে তার এই ছলাকলার প্রয়াস। অবশ্য যুগে যুগে রমণীই এগিয়ে আসে তপস্বী পুরুষের কাছে। ভেঙে দেয় তার ধ্যান।

হঠাৎ পীরমহম্মদ চোখ তুললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে পড়লো, সম্মুখে প্রস্ফুটিত দুই পীন পয়োধর। যেন গুলাবের গোলাপী আভা নিয়ে কোন এক জ্যোতির বলয়ে শ্বেতশুভ্র দুই স্বর্ণচূড়া রাজ্যের শোভা নিয়ে দৃশ্যমান।

লজ্জালী কাঁচুলীর বন্ধন খসিয়ে বক্ষের মাস্থম লজ্জাকে মেলে দিয়ে আঁখি মুদে দাঁড়িয়েছিল।

পীরমহম্মদের সেই দৃশ্য দেখে কেমন যেন অধ্যয়ন তন্ময়তা ছুটে গেল। শরীরের মাঝে নিদ্রিত রিপুগুলি ধীরে ধীরে জেগে উঠলো। উত্তেজনা জেগে তাঁর বলিষ্ঠ বাহুর শক্তি যেন শিথিল করে দিল।

তিনি বিস্মিত হলেন, বার বার তাঁর কেমন যেন নেশা জেগে উঠলো কিন্তু চোখ দুটি সরিয়ে নিতে পারলেন না। লজ্জালীর বক্ষ সৌন্দর্য এত আকর্ষণীয় ছিল যে, সংযমী মোল্লাসাহেব ষড়রিপুর বশীভূত হয়ে পড়তে লাগলেন।

মা, তুমি তো বক্ষে সহস্র পীযুষধারা নিয়ে দুনিয়ার সন্তানদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে এসেছ, তবে কেন এ মূর্তি তোমার? বসনের আচ্ছাদনের আড়ালে গোপন করে রাখো তোমার লজ্জা। তুমি তো এমন চঞ্চল নও, তবে কেন তোমার এই ভয়ঙ্কর ব্যভিচারিণী মূর্তি?

কিন্তু হল না, মাতৃত্ব সম্বোধনেও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করলো না তার শক্তি লঘু করতে।

কপালের সোপানশ্রেণীতে ঘর্মবিন্দু জমে উঠলো। মেহেদি রঙের লম্বিত শ্মশ্রুরাশিতে কি যেন চিক চিক করে উঠলো।

লজ্জালী সংযত পুরুষের অবস্থা অবলোকন করে মৃদু হাস্য সংবরণ করলো। কিন্তু তার সেই বক্ষের কুসুমাস্তীর্ণ বর্ণসুষমা জেগে থাকলো স্থিরভাবে।

প্রহর এগোতে লাগলো। রজনী আরো গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে সরে যেতে লাগলো।

এই সময় পীরসাহেব অতীত বর্তমান বিস্মৃত হয়ে একটি বাহু উত্তোলিত করে লজ্জালীকে কাছে ডাকলেন।

লজ্জালী সরে গেল।

পীরসাহেব আবার ডাকলেন।

লজ্জালী এবার হঠাৎ বক্ষের ওপর ওড়নার আবরণ দিয়ে দিল।

পীরসাহেব চীৎকার করে উঠলেন।

'আমার চোখের সামনে থেকে তুনিয়ার তুর্লভ সৌন্দর্য দর্শনের আনন্দ কেড়ে নিও না।'

জয়ী লজ্জালী হঠাৎ বাতিদানের আলো এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল।

তারপরের কথা এখানে অব্যক্ত থাক্।

ভোরের আলো পূর্বগগনে উদিত হলে লজ্জালী এলোমেলো বসনে, অবিন্যস্ত কেশপাশে জয়ের আনন্দে বেরিয়ে এসে অন্তঃপুরের পথ ধরলে সে রক্ষীদের দ্বারা অতর্কিতে বন্দিনী হল।

আর এই বন্দীত্বের আদেশ রাজমাতা হামিদা বানুই দিয়েছিলেন।

পীরমহম্মদ চরিত্রহীন এই কথা যখন প্রাসাদপুরীর চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, তখন লজ্জালী কারাকক্ষে বসে অনুতাপ না করে আনন্দে নিজের দেহের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখলো। তার রমণী জীবন আজ সার্থক।

১৪

পীরমহম্মদ চরিত্রহীন হয়েছে এটাই রাজ্যের সবচেয়ে বড় অমঙ্গল সংবাদ। কে সেই পবিত্র দৃঢ়চিত্ত মানুষটিকে কলঙ্কিত করলো, তা জানার কারো দরকার নেই। তাই লজ্জালীর কথা কেউ জানতে চাইলো না।

কিন্তু হামিদাবানু এই আওরতটিকে ক্ষমা করলেন না। হোক পিতৃপুরুষ বাবর শাহের পত্নী বিবি মুবারিকার আত্মীয়া। যে অপরাধিনী, তাকে ক্ষমা নয়। তার চরমতম শাস্তি সম্রাজ্ঞী কঠিন মনে প্রচার করলেন। যে বক্ষ সৌন্দর্য দিয়ে ধার্মিক শ্রেষ্ঠ পুরুষকে বশ করেছে, সেই স্তনযুগলের অগ্রভাব কর্ত্তন করে নেওয়া হবে। আর মুখমণ্ডলের লাবণ্য অগ্নি তাপে ঝলসে দেওয়া হবে।

এতেও বুঝি হামিদা খুশি হলেন না ভাবতে লাগলেন—স্বামী বেঁচে থাকলে আর যদি পীরসাহেবকে এমনি অবস্থায় দেখতেন, তাহলে আরো চরমতম কি শাস্তি প্রয়োগ করতেন! পীরসাহেব যে তাঁর বড় প্রিয় ছিল, তিনি যে তাকে পয়গম্বর উপাধি দিয়েছিলেন!

হামিদা যখন বেগম হারেমে বসে প্রতিশোধের জ্বালায় ছটফট করছেন, তিনি শুনলেন রাজদরবার কর্তৃক পীরমহম্মদের ধর্মীয় উপদেষ্টা পদ কেড়ে নিয়ে তাকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

পীরমহম্মদ মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন, সে আদেশ। শুধু প্রার্থনা জানিয়েছেন, অন্যায়কে অন্যায় বলে যদি মেনে নেওয়াই হয়ে থাকে, তাহলে যে আওরতটি আমার চরিত্র কলঙ্কিত করেছে, তাকে সঙ্গে দেওয়া হোক।

কিন্তু রাজ্যের বিচার এত মধুর নয়। পীরসাহেবের প্রার্থনায় কেউ কর্ণপাত করেনি।

তবে হামিদা শুনে লজ্জালীকে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে বড় বিলম্বে। তখন রাজমাতার শাস্তি লজ্জালীর ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। সে সেই জ্বালায় হারেমের এক অন্ধপ্রকোষ্ঠে ছটফট করছে।

এসব কিছুই আকবর জানতো না। সে বালক বলে, জীবনের অনেক গোপন রহস্য তাকে জানানো হত না। শুধু সে জেনেছিল পীরমহম্মদ কি কারণের জন্যে যেন পদগৌরব বঞ্চিত হয়ে রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছেন।

এইসব ব্যক্তিদের খুব বড় একটা আকবর পছন্দ করতো না। পীরমহম্মদ তো নয়ই। কারণ এই পীরসাহেব শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এসে তাকে বড় তিরস্কার করতেন। আর পাঠ মুখস্থ করার জন্যে বড় পীড়াপীড়ি করতেন। তাই এঁর বহিষ্কারে তার কোন করনীয় থাকলো না। বরং সে মনে মনে বললো—আপদ বিদেয় হয়েছে ভালই হয়েছে।

জ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দিয়ে এঁরা এত আত্মঅহঙ্কারী হয় যে, সাধারণ মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করেন না।

আসলে আকবর এইসব ব্যক্তিদেরই ভয় করতো। নিজের মূর্খতার জন্যে আর কি ?

ঠিক এই সময়ই শিবালী এসেছিল অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে।

আকবর বাঁদীর সাহায্যে শিবালীকে মায়ের কাছে পাঠিয়েছিল। বলে দিয়েছিল, যেন ভাগ্যহীনা কিশোরীর কোন অযত্ন না হয়।

হামিদা তখন খাসকক্ষে শুচিশিল্প কার্যে ব্যস্ত ছিলেন।

সেই কিশোরী লাজনত বদনে সামনে এসে উপস্থিত হতে তিনি তাকে দেখে শিউরে উঠলেন। শরতের স্বচ্ছ আকাশে মাটির স্বর্গে যেমন বৃক্ষশাখে সবুজ পত্রলয়ের আবির্ভাব হয়, তেমনি একটি সবুজ কিশলয়ের মত নরম সরম বালিকা।

একটি ফুটন্ত ফুল। সবে কোরক থেকে জেগে উঠে বৃন্তে আধো আধোভাবে ফুটেছে। এখনও তার পূর্ণকুসুম তনুটি মেলেনি।

হামিদার তখনই স্মরণে এল সন্তান আকবরের পাশে এই কিশোরীকে কেমন মানাবে? কিন্তু শিহরিত হলেন এই কথা ভেবে, এই হারেমে এই পবিত্র কুসুমটি ততদিন অক্ষতভাবে রক্ষিত হবে কি না? তিনি কি পারবেন, বুকের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে নিষ্পাপ মেয়েটিকে?

এমনি আরেকটি কিশোরী মাধবীলতার মত তারই সতর্ক পাহারায় বেড়ে উঠছে। কিন্তু তার নিরাপত্তা কতদিন থাকবে তিনি জানেন না। যখনই তাকে তিনি দেখেন, আর শিউরে ওঠেন!

আলিমন কেন যে তাঁর কাছে এল, তাই তিনি ভাবেন। অথচ অবহেলা করবারও উপায় নেই। তাঁরই সম্পর্কের রেশমী বন্ধন ধমনীর রক্তের সঙ্গে জড়িত। পিতা মীর্জা আকবর জামীর কন্যার শাদী দিয়ে পিসতুতো ভগ্নী সুলতানার কাছে বাকী জীবন কাটিয়ে গেছেন। সেই সুলতানার লেড়কা রশিদ তারই লেড়কী এই আলিমন।

স্বামী বেঁচে থাকতেই আলিমন এখানে এসেছিল, তখন সে বাচ্চা শিশু। রশিদ ও তার তিন বিবিকে আদিল শাহ কেটে ফেলার পর নিরাশ্রয়া আলিমনের খবর পেয়ে সম্রাট হুমায়ুন কোলে করে এনে হামিদাকে দিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন—ঈশ্বর তোমার প্রতি করুণাময়, তাই কন্যাবিহনের শোক থেকে তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এই শিশুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সত্যিই কি ঈশ্বর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?

তাই যদি হবে তাহলে আলিমনকে নিয়ে এত চিন্তা কেন?

আজ আলিমনের বয়েস বারো কিন্তু আগে একে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা জাগে নি, যত বড় হচ্ছে তত যেন বুকের রক্ত তাঁর শুকিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্রী এই অন্তঃপুর, জঘন্য জীবনের মধ্য দিয়ে এখানে আওরতরা নিত্য নতুন ঘোলা জলের স্রোত বইয়ে চলেছে। এখানে পবিত্র জীবনের কোন শুচিশুভ্রতা নেই। নেই কোন সুন্দর সংগীতের অমৃতময় প্রবাহিনী ধারা।

শুধু ব্যভিচার অত্যাচার, ঈর্ষা, দ্বেষ—কুটিল জীবনের এক নব নব উপাখ্যান সর্বদাই এই হারেম প্রকোষ্ঠে তৈরী হচ্ছে। মর্মরময় সোপান শ্রেণীতে কালিমাবর্ণ কলঙ্কের লাখো লাখো ছোপ পড়ছে। অন্ধকার চাপাগলির ঘুলঘুলির মাঝে শুধু ফিস ফিস ষড়যন্ত্র। মহলের থামের আড়ালে কারা যেন লুকিয়ে থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। শুধু নিঃশব্দ পদশব্দ, অথবা ধ্বনি জাগিয়ে ছুটে পালানো।

দিনের বেলা যদিও বা খানিকটা ছন্দলয়ের পার্থক্য বিবেচিত হয়, কিন্তু রাত্রিবেলা তার কোন সীমা থাকে না। তখন যেন অন্তঃপুরের মহলগুলি হঠাৎ জাগ্রত হয়ে কেমন যেন দৈত্যের আকার ধারণ করে। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ছাতের খিলান থেকে ঝাড়ের বাতি নেমে আসে। গান, বাজনা, নৃত্য, সে এক মোহনীয় মজলিশের মহোৎসবের কোলাহল জেগে ওঠে।

হামিদা জানেন, এই হল হারেমের রীতি। এই ধরণের জীবন প্রবাহ স্বামীর সময় থেকেই হারেমে দেখে আসছেন। প্রথম প্রথম তাঁর বড় খারাপ লাগতো। বাদশাহের জীবন ধারণের সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। জৌলুসের পিছনে যে অন্ধকারের বীভৎস রূপ আছে, সে দৃশ্য এই রাজপুরীতে এসেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্বামীকে কতবার তিনি বলেছেন—আলেমপনা, এই রীতির কি কোন পরিবর্তন হয় না? আমার যে রমণী হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কেমন যেন সঙ্কোচ জাগে? এর চেয়ে সাধারণ জীবন অনেক সুখের।

সম্রাট স্বামী কোন উত্তর দিতে পারেন নি। দেবেন কি? উত্তর তাঁর কাছে কোথায়? তিনিও যে জন্মাবার পর এই অন্তঃপুরের

বীভৎসতাই দেখে এসেছেন। তাঁর কাছে নতুনত্ব কি? নতুনত্বের মর্ম বুঝবেন কেমন করে?

সম্রাটের মত তাঁরও একদিন অভ্যাস হয়ে আসে। তিনিও হারেমের বীভৎসতা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন জেগেছে আলিমনকে নিয়ে।

ভালমন্দের বিচার তাঁর আছে, কিন্তু ঐ বালিকার কেমন করে থাকবে? অল্প বয়েস, চঞ্চলমতি মন, মন্দের প্রতিই ঝুঁকবে বেশী। তাই তাঁকে কঠোরহস্তে আলিমনের ভার নিতে হয়েছে! তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে। কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অনেকের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে হয়েছে।

রাত্রিবেলা কক্ষের বাইরে একদম না। কক্ষের ভেতর থেকে বাইরের কোলাহল, সঙ্গীতের তান, নূপুরের ঝঙ্কার ইত্যাদি ভেসে এলে শ্রবণেন্দ্রিয় রুদ্ধ করে রাখতে হবে।

কিন্তু নিষেধ পথের দিকেই যে আকর্ষণ করে বেশী। নিষিদ্ধ পথ, বিজয়ের পথ। সে পথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে মানুষেরই প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

আলিমন কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বার বার তার কান দুটি বাইরে ছুটে যায়।

সবে ফুটেছে কমলটি। কোরক থেকে বের হয়ে গোলাপি অবয়বটি সূর্যের মুখে ধরেছে। বক্ষে হিল্লোলের জোয়ার জাগছে। চোখের নীচে নেমে আসছে গাঢ় অন্ধকারের একটা গভীর রহস্য! সেখানে সুর্মা দিতে আরো গভীর। যেন সমুদ্রের অতলে প্রবালের জৌলুসের ছড়াছড়ি।

হামিদার ইচ্ছা, একে যদি ঠিকমত রক্ষা করতে পারেন, পারেন যদি তার কৌমার্য অক্ষয় রাখতে—তাহলে পুত্রবধূ করবেন কিন্তু সে ইচ্ছা মনে মনে আছে, কাউকে প্রকাশ করেননি।

কারণ সবই অনিশ্চয়তার ওপর রক্ষিত। হয়তো রাজ্যই থাকবে

না। পুত্রের জীবন হবে সংশয়। মুঘল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবার কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে হয়তো অবশিষ্ট মুঘলদের ভারতবর্ষের ওপারে সমরখন্দে পালাতে হবে। আবার নতুন করে তৈমুরের মত রাজ্য বিস্তারের কল্পনা মনে ধারণ করে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে হবে।

তাই যে বাসনা অনেক পরের, তার চিন্তা মন থেকে সরিয়ে বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। শুধু হামিদা কেন রাজ্যের সকলকে এই নীতি মেনে চলতে হয়। উপায় কি? এ ছাড়া পথ কোথায়? অনিশ্চয়তার জীবনে এর চেয়ে কি আর উত্তম কিছু থাকতে পারে?

এদিকে আলিমন একদিন রাত্রিবেলা একটি বাঁদীকে উৎকোচদানে বশীভূত করে বাইরে বেরিয়ে গেল। উদ্দেশ্য, কেন মহিষী কক্ষের বাইরে যেতে দেন না, সেই রহস্যের সন্ধান করা। অবশ্য কিশোরীর মনের কৌতূহল চরিতার্থ করা।

আর যদি অন্য গোপন উদ্দেশ্য থাকে, তা থাকতে পারে। সে একমাত্র আলিমন নিজেই জানে, আর কেউ জানে না। তার গোপন মনের সে উচ্ছ্বাস।

আলিমন বেশ সুন্দরভাবে সাজগোজ করে মহলের গলি দিয়ে অবাক দুই চোখ নিয়ে দেখতে দেখতে চলেছে। জ্ঞান হবার পর কখনও এমনি ভাবে রাতের উজ্জ্বল পরিবেশটি দেখেনি। কোন সময় বাইরে বেরলে তার চোখে পুরুবস্ত্রের পট্টি বেঁধে দেওয়া হত। তাই রাতের আলো ঝলমলে উজ্জ্বল রোশনাই দেখার সৌভাগ্য তার কোনদিনও হয়নি।

চুরি করে একদিন বেরিয়ে আসতে তাই তার চোখ দুটি কেমন যেন ধাঁধিয়ে গেল। চোখের ওপর চেপে বসলো তীব্র আলো ঝলমলে রশ্মির জোরালো প্রতিফলন। কানের মধ্যে প্রবেশ করলো নৃত্যের ছন্দমাধুর্য, সেই ছন্দে আলিমনের কিশোরী দেহও

নাচতে চাইলো। সে নিঃশব্দে পায়ে ছন্দ সৃষ্টি করে, হাতে মুদ্রা এনে সেই আলোকিত প্রাঙ্গণে নাচতে নাচতে চললো।

আম্মি মা সত্যিই বেরসিক আওরত আছে। নাহলে এমনি এক বেহেস্তের দর্শন থেকে সরিয়ে নিয়ে কক্ষে আবদ্ধ করে রাখে?

এই কথা যখন সে ভাবলো, ঠিক তার কয়েক মুহূর্তর মধ্যে হঠাৎ দুজন স্থুলকায় বাঁদী এসে তার দুটি কোমল মৃণাল বাহু সজোরে চেপে ধরলো।

আলিমনের মুখে আর কথা নেই। শুধু স্তব্ধ হয়ে সে অবাক চোখে আলোর সমুদ্রে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

আলিমন বুঝেইছিল, আম্মি তার সন্ধান পেয়েছে এবং এই প্রহরিণী দুজন তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্মে ছুটে এসেছে।

কিন্তু হামিদার চিন্তা, এমনি করে আর কদিন তিনি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে একে ধরে রাখবেন! একদিন যখন সে বিদ্রোহী হবে?

ঠিক এরই চার দিন পরে শিবালী এল। আলিমনের বয়েসের মত আর একজন কিশোরী।

হামিদার মস্তকে যেন বাজ পড়লো। পুত্র আকবর বলে পাঠিয়েছে, যেন এই রাজপুত বালিকাকে সযত্নে মায়ের অধীনে রাখা হয়। কত বড় গুরুদায়িত্ব। কিন্তু শিবালীর দিকে তাকিয়েই হামিদার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল।

ঠিক আলিমনের মত সত্যফোটা কুসুমতনু। অজানা এক শিহরণে সভয়ে তনুটি সরমজড়িত। এ সময় সযত্ন পরিচর্যা না পেলে পথভ্রষ্টা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিছু জানে না, জগতের কোনকিছু জটিলতার মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা আসেনি, অথচ উত্তম আছে, কৌতূহল আছে। এবয়সে স্বভাবত যা হয়। ভালমন্দের বিচারের চেয়ে কৌতূহলই বেশী। ঠিক শিশুর মত। শিশু যেমন প্রথম চোখ মেলে বিস্ময়ে কৌতূহল প্রকাশ করে, তেমনি।

তাই সাবধানতা সবচেয়ে বেশী দরকার। সেদিন আলিমন কি

কাণ্ড করেছিল? ভাগ্যিস তিনি জানতে পারলেন, তা না হলে একটা বিশ্রী দৃশ্যের ছবি মনের মধ্যে নিয়ে একরাত্রে সহস্ররাত্রে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতো, তারপর তাকে ধরে রাখাই মুস্কিল হত। বিকৃতি রুচি মনের মধ্যে রেখাঙ্কিত করে একটি তরুণ বয়সের অপক্ক দেহে নানান প্রতিক্রিয়া দেখতে হত। দোষ কার? আলিমনের দোষ নেই।

পরিবেশ মনুষ্য জীবনকে নতুন করে পরিচয় দান করে। আলিমন পরিবেশের সমুদ্রে অবগাহন করে নতুন রূপ পেত।

কিন্তু একদিন তাকে বাঁচিয়েছেন, কদিন বাঁচাবেন? তাই ভাবনা অহরহ।

এরপর আবার এল এক রাজপুত কিশোরী।

যাই হোক, পুত্রের নির্দেশকেই মেনে নিয়ে সেই কিশোরীকে হারেমে স্থান দিলেন, এমন কি আলিমনের মতই তাকে পাহারার মধ্যে রাখলেন। তবে আলিমনের সঙ্গে একসাথে নয়, আলাদা অন্যকক্ষে।

কেন আলিমনের সাথে তিনি আলাপ করে দিলেন না, কারণ আছে। দুজনেরই বয়স কাঁচা। দুজনের বুদ্ধি অপরিণত। সেই জন্যে দুজনে এক জায়গায় থাকলে যদি কোন মতলব তৈরী করে?

হামিদা প্রখর বুদ্ধি প্রকাশ করে এই দুটি কিশোরীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করলেন।

কিন্তু এত সাবধানতার মধ্যেও তাদের রক্ষা করা গেল না।

তিনি মহিষী হলে কি হবে, খুব রাশভারি প্রকৃতির রমণী ছিলেন না। হৃদয়ের ভেতরটা ছিল কোমল। অন্তর মমতায় ভরা। বাইরের আকৃতিতে কাঠিন্য আনলেও বেশীক্ষণ তা বজায় থাকতো না। এ স্বভাবের পরিচয় নগণ্য বাঁদী পর্যন্ত জানতো।

তাই লজ্জালীর শাস্তি যখন প্রয়োগ করেছিলেন, অনেকে তাঁকে ক্ষমা করার জন্যে অনুরোধ করেছিল।

কারণ তাঁর চেয়ে বেশী বয়সের অনেক রমণী হারেমে ছিল, তারা মনে করতো, ইচ্ছে করলে তারা মহিষীর কার্যের প্রতিবাদ করতে পারে।

অন্তঃপুরের কর্ত্রীর যে কর্তৃত্ব সবার পালন করা উচিত, এ উপলব্ধিও অনেকের ছিল না।

শিবালী হারেমে আসার পর তাই অনেকে তাকে দেখতে এল।

হামিদা মনে মনে বিরক্ত হলেন কিন্তু সম্মুখে কিছু বলতে পারলেন না। কেমন যেন তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

অথচ অন্তঃপুরের এই বিভিন্ন স্বভাবের রমণীদের তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এদের আওতায় এই বালিকা কিছুদিন থাকলে বুদ্ধিতে যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তার আর কোন সীমা নেই। যেমন এখানে এক একটি দুষ্টচরিত্রের বিকৃতমনা আওরত আছে। একের স্পর্শ সহস্রের মধ্যে ক্রিয়া করে, একেবারে জঘন্য করে তোলে।

শিবালীর জন্যে তিনি চিন্তিত হলেন কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারলেন না।

আলিমনের বেলায় এরকম হয় নি। তাকে কেউ দেখবার জন্যে পাগল হয়নি এবং কেউ তাঁর কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করেনি।

কিন্তু শিবালীর বেলায় যেন সমস্ত হারেমটি কেমন আলোড়িত হয়ে উঠলো। কেউ কেউ কাফের রমণীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা হয়ে ইসলাম ধর্মের নজীর দিল। তবে অন্য কাফের রমণী যে হারেমে ছিল না তা নয়। রমণীর আবার ভিন্নধর্ম কি আছে, এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই মুঘল সম্রাটরা যে কোন ধর্মের রমণী সুন্দরী খুবসুরত হলেই হারেমে এনে পুরতেন। রমণী যে ঘরেই জন্ম নিক যার ঔরসে। পরিণত বয়সে যার অঙ্কশায়িনী হয়, তারই ধর্মের অধীনা।

সুতরাং ছিল অনেক হিন্দু রমণী। তবে আজ আর তারা হিন্দু

ছিল না, এখন গরুর গোস না পেলে রসুই ঘরে গিয়ে ঝামেলা বাড়ায়।

শিবালী কিন্তু রাজপুত রমণী হয়ে হিন্দুত্ব নিয়ে থাকলো। কি জানি কেন হামিদা শিবালীর জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা আরোপ করলেন। সমস্ত হিন্দুর মত ব্যবস্থা। এ মনে হয় পুত্রের প্রতি স্নেহ-ভাবাপন্ন হয়ে। হামিদা পুত্রের মনের পরিচয় জানতেন বলে।

কিন্তু এই ব্যবস্থাই হল কাল। অন্তঃপুরের মধ্যে বিক্ষোভের বহ্নি ধূমরাশির সৃষ্টি করে নতুন এক চক্রান্তের আকার নিতে লাগলো। আস্তে আস্তে ধূমরাশি চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

হামিদা বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের খাসকক্ষেই বেশী সময় থাকতেন। তাই অন্তঃপুরের অন্যাংশের বিক্ষোভ তাঁর কর্ণগোচর হল না। যদি হত তাহলে হয়তো নিজেকে সংশোধিত করে শিবালীর সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা করতেন।

এদিকে এই রাজপুত কিশোরীর সর্বনাশ চাইলো অন্যান্য রমণীরা। মুসলমান হারেমে হিন্দুর এই ঔদ্ধত্য ক্ষমাহীন।

বাইরেও খবরটা ছড়িয়ে গেল। আমীর অমরাহদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠলো। তখন মীর্জাদের ওপর অত্যাচার চলছে। শিয়ারা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শেখ গুদাই নামক একজন শিয়া মুসলিমকে পীরমহম্মদের স্থানে সদর বা ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের মধ্যে বেশ তখন গণ্ডগোল।

আবার হামিদাবানু পীরমহম্মদকে রাজপুরীতে নিজের ক্ষমতায় আনিয়েছেন। বৈরাম খান সম্রাজ্ঞীর এরূপ বিরুদ্ধতায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

সেই সময় শিবালীর সংবাদ গোপনে গোপনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে একেবারে রাষ্ট্র হয়ে গেল। শিবালীর নামটা কেউ জানতো না, জানতো কাফের রমণী।

এক কাফের সৈনিক নন্দন সিং ক্ষুদে সম্রাটের ঔদ্ধত্যে রাজপুরীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। কাফেরের ওপর তখন বিদ্বেষ মুঘলদের বেশী। এই বেইমান কোটি পুতুল প্রতিমার উপাসক জাতি এদেশে বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার জন্যে রাজ্যজয়ে এত বিড়ম্বনা। তাছাড়া রাজপুতদের ওপরও স্বভাবত মুঘলদের ক্রোধ বেশী।

সংগ্রাম সিংহ যদি সেদিন খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত না হতেন, তাহলে আজ মুঘল রাজবংশের কি যে পরিণত হত, ভাবা যায় না। সেইজন্যে সমগ্র রাজপুত জাতি ছিল মুঘলদের শত্রু। এদিকে সে সময়ে মেবারের রাণা উদয় সিংহ রাজপুতনায় দারুণ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। আর সেই দেশের কোন নারী পুরুষ মুঘলরা দেখলে সব অনুগ্রহই জলাঞ্জলি দিত।

শিবাজীর ওপর এইজন্যে আমীর ওমরাহরা ক্ষেপে উঠেছিল কিনা বোঝা গেল না। তবে নন্দন সিং সম্রাটের অনুগ্রহে সেনা-বিভাগে মোতায়েন হয়ে অস্ত্রবিদ্যার সুকৌশলগুলি আয়ত্ব করছিল। সেনাবিভাগের সকলেই মুঘল, কিছু বন্দী আফঘান, পাঠান প্রভৃতিও ছিল। তবে তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। গোলামের গোলাম, এমনি ক্ষমতা ছিল।

মুঘলরা বীরের জাতি। ইসলাম ধর্মের প্রচার কামনায় আল্লার প্রেরিত দূত রূপে জগতে আবির্ভূত হয়েছে। এই চিন্তা করেই সমস্ত মুঘলরা জীবন ধারণ করতো। তারা যেমন অন্য মুসলমানদের পছন্দ করতো না, তেমনি হিন্দুদেরও শত্রু মনে করতো।

নন্দন সিং সম্রাটের প্রেরিত বিধর্মী সৈনিক। তাকে সরানোর কথা কেউ চিন্তা করতো না, তবে তার প্রতি প্রসন্নভাব কেউ প্রকাশ করতো না। তাচ্ছিল্যই তার ওপর সবচেয়ে বেশী আরোপ করা হত। নন্দন সিং সহ্য করতো। বুঝতো সব কিন্তু উপায় কি? স্বজাতির অবহেলা তাকে স্বদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করলো,

এখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বিদেশীর উপেক্ষাও হজম করতে হবে।

নন্দন সিং আপন চিন্তায় বিভোর ছিল, যদি না থাকতো তাহলে কারুর না কারুর মুখে শুনতে পেত নিজের ভগ্নীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কাহিনী। সে শুধু ভগ্নীর সম্বন্ধে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে, সে রাজমাতার অধীনে রাজসিক অন্তঃপুরে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।

এদিকে তখন শিবালীকে হারেম থেকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র অন্তঃপুর কর্ত্রী সম্রাজ্ঞীর আড়ালে ইমারত রচনা করছে।

হামিদা যেখানে থাকতেন, সেটি একটি আলাদা মহল। অন্তঃপুরের সঙ্গে সন্নিবেশিত, আবার যুক্ত নয়ও বলা যায়। এমন এক জায়গায় তাঁর মহল যেখান থেকে কর্ত্রীর সব কর্তব্যই তিনি সারতে পারতেন। আবার অন্তঃপুরের বিরাট হট্টগোলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

শুধু দুজনকে তিনি তাঁরই সংলগ্ন মহলের পূর্ব ও পশ্চিমে দু'কক্ষে স্থান দিয়েছিলেন। আলিমন ছোটবেলা থেকেই তাঁর সযত্ন সতর্কে বাস করছিল, বর্তমানে এসেছে শিবালী। শিবালীকে যত্নদান করার উদ্দেশ্য—পুত্রের প্রতি স্নেহভাবাপন্ন হয়ে।

পুত্র দিন দিন বৃক্ষের মত বেড়ে উঠছে। একদিন সে এই রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বিবেচিত হবে। তাকে এখন আর কিশোর বলে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। তার বুদ্ধি প্রখর হচ্ছে। একদিন সে বুদ্ধি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হবে। তার ইচ্ছাও আস্তে আস্তে তৈরী হচ্ছে। পুত্রের ইচ্ছাকে সেলাম জানাতে হবে। এখন তার ইচ্ছাকে সেলাম না জানালে পরে তার মনে বিক্ষোভ জাগবে। ভুলতে পারবে না অবহেলা।

সেইজন্যে পরিণত মনের অগ্রগামী সেই পুত্রকে স্তুতিদানের জন্যে শিবালীর ওপর হঠাৎ তিনি যত্নবান হয়ে উঠলেন।

কিন্তু হামিদার মনের কথা কে বুঝবে? কে বুঝবে কেন তিনি শিবালীর ওপর হঠাৎ স্নেহভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন?

প্রাসাদপুরীতে মনের গোলামী কেউ করতো না। তলিয়ে কোন জিনিস ভাবার পূর্বেই বাইরের দর্শনে বিচার সমাপ্ত হত।

তাই সম্রাজ্ঞীর মানসিক অনুসরণ কেউ করলো না।

এদিকে তখন শিবালীকে সরানোর ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়েছে।

গভীর রাত্রে সম্রাজ্ঞী যখন নিদ্রা যাবেন, প্রহরী ও প্রহরিণীরা পাহারা দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়ে ঘুমে ঢুলবে, এই সময়ে সেই রাজপুত বালিকাকে নিদ্রিতাবস্থায় তুলে নিয়ে একেবারে পাতালপুরীর আর কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পাচার করা হবে। তারপর—

না, তারপরের কর্মধারা তখনও ঠিক হয়নি।

সর্বাগ্রে তাকে সম্রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠ থেকে সরানোর ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়েছে। তবে উদ্দেশ্য দুটি গোপনে আড়ালে লালিত হচ্ছে, তার মধ্যে একটি বিধর্মী আওরত বলে তাকে হারেম থেকে সরিয়ে দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি, লালসায় উন্মত্ত বিশেষ ব্যক্তিরা এই অল্প বয়সের মাসুম আওরতের কুসুম তনুটির প্রস্ফুটিত শতদলে ভোগের কুমকুম রচনা করবে বলে স্বপ্ন দেখছে।

রমণীই তুলে দিচ্ছে আর এক নিষ্পাপ রমণীকে কলঙ্কিত করার জন্যে লম্পট পুরুষের হাতে। কি বিচিত্র এই জীবন প্রবাহ?

যাই হোক, অনেক আওরত গুপ্তচর ছিল হামিদার কিন্তু আশ্চর্য তারা জানা সত্বেও সম্রাজ্ঞীর কাছে এ সম্বন্ধে নিরুত্তরই থাকলো।

একটা বিরাট ষড়যন্ত্র এই রাজপরিবারের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কি করে গোপন হয়ে থাকে, এটাও ভাববার বস্তু।

একটা তুচ্ছ ঘটনাও বড় আকার নিয়ে অনেক সময় প্রাসাদের মর্মর প্রাচীর পর্যন্ত উত্তপ্ত করে রাখে। আবার অনেক বড় ষড়যন্ত্রও নিঃশব্দে থমথমে আবহাওয়া সৃষ্টি করে এক সময় বিস্ফোরণ ঘটায়।

গভীর নিশুতি রাত্রে একদিন শিবালীকে নিদ্রিতাবস্থায় কক্ষ থেকে সরিয়ে ফেলা হল।

হামিদা জানলেন প্রত্যুষে। রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসে দুঃসংবাদটি পরিবেশন করলো এক স্থূলকায় বাঁদী। মালেকা বেগমসাহেবা, রাজপুত লেড়কী ঘরমে নেই। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন হামিদাবানু। মুহূর্তে মানসিক সন্দিগ্ধতা তাঁর দৃঢ়ভিত্তির ওপর চেপে বসলো। এই রকম যে একটা কিছু হবে, তিনি যেন অনেক আগে থেকেই অনুমান করতে পাচ্ছিলেন।

কিন্তু তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর অসম্মানের জন্যে। যে লেড়কীকে তিনি তাঁর রক্ষাধীনে আশ্রয় দিয়েছেন, তাকে সরানোর অর্থ সম্রাজ্ঞীকে অবমাননা করা।

আরো গভীর করে কিছু ভাববার আগেই তিনি সেই বাঁদীকে গম্ভীরস্বরে ক্ষুব্ধভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন—কে কে গতরাত্রে শিবালীর কক্ষে পাহারায় ছিল?

বাঁদী পূর্বেই ভয়ে কাঁপছিল, মালেকা যে এইধরণের কথা জিজ্ঞেস করবেন, তা তার অজ্ঞাত নয়। তাই সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—আমি, মেহেদী, নূরমানা, জাবেদী চারজনে ছিলাম।

জলদি তাদের এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

বাঁদীটির নাম রহিমা। রহিমা কাঁপতে কাঁপতে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

হামিদার তখন ক্রোধে মুখখানি রক্তিমাকার ধারণ করেছে। ভাবছেন পুত্রের কাছে তাঁর কোন অনুযোগেরই অর্থ হবে না। তার গচ্ছিত সম্পত্তিকে তার মা রক্ষা করতে পারে নি। তার অক্ষম মা। ক্ষমতা থাকা সত্বেও নিরুপায়। একথা কি বুদ্ধিমান সন্তান বুঝবে? কিন্তু কে চুরি করলো শিবালীকে?

তখন তাঁর ধীরে ধীরে কিছু কিছু ষড়যন্ত্রের রশ্মি চোখে পড়লো। এই অন্তঃপুরে অন্যান্য রমণীরা শিবালীর আগমনের পর কেমন যেন বক্রধরণের কথা বলতে শুরু করেছিল। তখন হামিদা বুঝেও বুঝতে চান নি। তাঁর ক্ষমতা অপর্যাপ্ত। তিনি মৃত সম্রাটের প্রিয়তমা পত্নী, বর্তমান সম্রাট আকবরের জননী। এই রাজ্যে পদস্থব্যক্তির যে ক্ষমতাই থাক—সবার উর্দ্ধে তাঁর ক্ষমতা। তাঁকে অবহেলা করে কিছু ঘটতে পারে, এ যেন কল্পনাই ছিল না।

অথচ তাই আজ ঘটলো।

পরক্ষণে মনে পড়লো খানসাহেবকে। এক ঐ লোকটি তাঁর সব ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে এই ধরণের গর্হিত কাজে অগ্রসর হতে পারে।

এই হারেমে প্রবেশের পর একদিনও সে সম্মুখে এসে সাক্ষাৎ করে নি। কোন প্রয়োজন হলে লোক মারফৎ কার্য সম্পন্ন করেছে। একি অবহেলা? না, অন্য কিছু! এই এড়িয়ে চলার মধ্যে যেন কোথায় প্রচ্ছন্ন এক অর্থ নিহিত আছে।

অথচ দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পূর্বে সম্রাটের মৃত্যুর পর দিশেহারা রাজপরিবার নিয়ে যখন মুঘলরা সমুদ্রের অতলে ডুবছে। সেসময় বৈরাম খানের কাছে শপথ দান হামিদা বিস্মৃত হন নি।

সেইজন্যে রাজ্য পুনপ্রাপ্ত হয়ে হামিদাকে কিছুদিন ধরে ভনিতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারপর ভয়ে ভয়ে এই হারেমে প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু আশ্চর্য, হারেমে প্রত্যাবর্তনের পর একদিনও বৈরাম খান কোন হেতু নিয়েই সামনে আসেন নি। অবশ্য বাইরে অত্যাচারের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়েছে। মীর্জাদের বিনাশ, সুন্নীদের উচ্ছেদ, অনুচরদের শাস্তি দিয়ে সে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

প্রথম প্রথম হামিদার ভয় ছিল। পরে আর ভয় থাকে নি। সাহস প্রকাশ হয়ে সম্পূর্ণ নিজেকে নির্ভয় করেছেন। উপলব্ধি জেগেছে, হয়তো সেই আকাঙ্ক্ষা বোধ আর নেই বলে খানসাহেব মনকে সংযত করেছেন।

তাছাড়া মধ্যস্থতায় আকবর আছে। আকবরকে যত তাচ্ছিল্যই করা হোক্, সে যে তরবারী চালনায় একজন সুনিপুণ রণবিদ্— সে কথা ভুললে হবে না। হয়তো আকবরের কথা চিন্তা করেই তার জননীর ওপর থেকে আকাঙ্ক্ষা সরিয়ে নিয়েছেন।

তবু হামিদার ভয় ছিল। রমণী মনের সেই সুপ্ত কোমলাংশে যেন কিসের কম্পন সর্বদা অনুভূত হত। বার বার রাত্রিকালে অন্ধকার থামের প্রাড়ালে মনে হত, কে যেন পিছন থেকে এসে দুই বাহু দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে আসছে। তাঁর কণ্ঠনালি কেমন যেন চেপে যেত। কথা বের হত না। স্বর জেগে উঠতো না। এই যখন তাঁর মধ্যে জেগে উঠতো, তিনি মৃত স্বামীর ছবি মনের মধ্যে এনে সাধ্বী হতে চাইতেন।

এইসময় কক্ষে সেই চারজন বাঁদী এসে তসলিম করলো।

হামিদা হঠাৎ সব আক্রোশ তাদের ওপর আরোপ করে সম্রাজ্ঞীর মত গর্জে উঠে বললেন—বেসরম বাঁদী, নোকরীর সম্মান ক্ষুণ্ণ করে কিঁউ তোমলোক নিদ্ গিয়ারাহা। বেইমান লোককো কৌন সাজা রাজ কানুন হ্যায়, তোমলোক জান্‌তি নেহি। বলো, রাজপুত লেড়কি কাঁহা! নেহি তো তোম্‌লোককো ঠাণ্ডি ঘরমে ভেজ দেউঙ্গা।

চারটি বাঁদীই সমস্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললো—মালেকা আমরা কিছু জানিনা। কসুর মাফ করে দিন্। লেড়কী রাতমে নিদ্ গিয়েছিল। শুভামে উসকো পালংমে নেহি দেখা। কে জানে কৌন ডাকু লে গিয়া।

হামিদা বুঝলেন, এরা প্রহরায় অবহেলা করে ঘুমিয়েছে বটে

তবে নিরপরাধ। ঘুমোয় সকলেই। রাতভোর ডিউটি থাকলেও শেষের দিকে কেউ আর জেগে থাকে না।

আর যারা শিবালীকে বের করে নিয়ে যাবে বলে মনস্থ করেছিল, হাজার কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেও শিবালীকে রক্ষা করা যেত না।

কড়া পাহারার যেমন কড়াকড়ি আছে, শিথিলতাও আছে।

তবু হামিদা ভাবতে লাগলেন, এদের নিয়ে কি করবেন, দেবেন এদের কারাগারে নিক্ষেপ করে? নাকি মুক্তি দেবেন?

কিন্তু তিনি এদের মুক্তি দিলেও পুত্র আকবর জানতে পারলে তো তাঁকে মুক্তি দেবে না?

খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে না ভাবতে পারলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ তিনি সর্দার বাঁদীকে ডেকে চারটি অপরাধিনীকে তার হাতে তুলে দিলেন। বললেন—এদের পিঠে দশটি করে চাবুকের প্রহার আরোপ করবে। কার্যে অবহেলার জন্যে এই শাস্তি।

তারা চলে গেল।

হামিদা নিজের কক্ষে সম্পূর্ণ একা হলেন।

প্রত্যুষের আলো অনেকক্ষণ ফুটেছে। পক্ষীদলের কূজন জাফরি ভেদ করে কক্ষের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করছে। হামিদার ছোট্ট কপালের জমিতে স্বেদ বিন্দু ফুটে উঠেছে। তিনি বাইরে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন কিন্তু অন্তরে তাঁর দারুণ উত্তেজনা। কান্না আসছে কি?

না, এত সহজে তাঁর কান্না আসে না। জীবনের কত জটিল বিড়ম্বনায় চড়াই উৎরাই দিয়ে নামতে উঠতে হয়েছে। স্বামীর সুখের দিনের তিনি সঙ্গী ছিলেন না। দুঃখের যাঁতাকলে পেষন সহ্য করতে করতে কত বিপদজনক পরিখা তিনি পার হয়েছেন। শুধু নিজে পার হন নি, স্বামীকে পর্যন্ত পার করেছেন।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, তাও বুঝি ছিল সুখের। সেখানে ছিল স্বস্তি, ছিল এক চিলতে শান্তি। আজকের এই বিপদের মধ্যে কোথায় যেন সেই স্বস্তি নেই। আছে দারুণ কলঙ্ক, অসম্মান আর অস্বস্তিকর এক জীবনের জটিল প্রবাহ।

তিনি নিজে এমন অক্ষম যে পুত্রের গচ্ছিত সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেন নি। অথচ তিনি এই হারেমের সর্বময় কর্ত্রী। এই হারেমে আছে প্রায় পাঁচশত রমণী। তাদের ইচ্ছে করলে এখুনি ঘাতকের কাছে প্রেরণ করে মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিতে পারেন। অথচ এরাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে উৎসাহী। তাঁর ক্ষমতাকে অবহেলা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে।

তবে কি তারা জানে, সম্রাজ্ঞীর ক্ষমতার আর কোন মূল্য নেই? সেইজন্যে তারা এতদূর এগিয়েছে কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে তারা সত্যিই ভুল করেছে। যে সম্রাট সিংহাসনে বসে আছে, তার জননী এই সৌভাগ্যবতী রমণী। সম্রাট স্বামীর মৃত্যু হতে পারে কিন্তু সম্রাট পুত্রের তো মৃত্যু হয় নি! এই যখন অকাট্য প্রমাণ থরে থরে সাজানো, তখন কেন এই অন্তঃপুরিকারা এতটা সাহস প্রকাশ করলো?

প্রত্যুষের সেই স্নিগ্ধ পরিবেশ থেকে দিনের গতি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। আর হামিদার চিন্তা একই ধারায় নানান জটিল জটের বাঁধুনিতে আবর্তিত হয়ে কেমন যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে থাকলো। অনেকে ভেবেছিল, রাজপুত লেড়কীর অন্তর্ধ্যানে রাজ-মহিষী দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অন্তঃপুরের ধারাবাহিক জীবন ওলোট পালট করে দেবেন। হয়তো রসুই ঘরে গিয়ে খানাপিনা তৈরী করতে নিষেধ করে দিয়ে সমস্ত জেনানা মহলের আহার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবেন।

সে সব কিছুই করলেন না, এমন কি কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে কক্ষে আবদ্ধ হলেন দেখে সকলে হকচকিয়ে গেল

আবার বেলা এক প্রহরের সময় সর্দার বাঁদীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—সেই চার বাঁদীকে চাবুক মারা হয়েছে কিনা।

সে যখন বললো—এখনও হয়.নি বেগমসাহেবা! সিপাহীদের কাছে সংবাদ গেছে, তারা ফুরসৎ হলে আওরত সিপাহী পাঠাবে বলেছে বলে মুলতুবী আছে।

হামিদা বললেন—ওদের মুক্তি দিয়ে দে।

তাতে আবার সকলে অবাক হল।

একি পরিবর্তন হঠাৎ মহিষীর? এমন শান্ত স্বভাব তো বড় একটা তার দেখা যায় না।

হামিদা তখন ভাবছেন, অন্যকথা। তাঁর সারাদিনের চিন্তার মধ্যে একটি পরিসমাপ্তির সুর জেগে উঠেছে, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে সেই ব্যক্তিটি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে চলেছে। মনে হয়, এই সুযোগটি সে হাতছাড়া হতে দেয় নি। একটি প্রস্তরখণ্ডে দুটি প্রাণী বধের আয়োজন করা হয়েছে। সদ্যফোটা কুসুম তনু ঐ রাজপুত লেড়কী শিবালী, ওকে দেখলে সকল পুরুষেরই কামনা জাগ্রত হয়, তারও সম্ভবত জাগ্রত হয়েছে। আর তাছাড়া সে ব্যক্তি কখনও চরিত্রবানের প্রমাণ যখন দেয়নি, তখন এটাই স্বাভাবিক।

আর তাঁকে জব্দ করা। একদিন যার প্রতি আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, সে সুযোগ হাতছাড়া করতে আজও বৈরাম খান চায় না।

কিন্তু একটা কথা, বয়স তো আজ তার কম হয় নি, কি আছে এই নিঃস্ব দেহেতে এখন?

স্বামীর নির্বুদ্ধিতার শাস্তিই তাঁকে পেতে হচ্ছে।

যতদিন নিজে জীবিত ছিলেন, সম্মুখের পথেই চেয়েছেন, পিছনের অন্ধকার গলিপথে সভয়ে তাকিয়ে দেখেন নি। যদি একবার দেখতেন? বোধ হয় সেখানে ভয় আছে বলেই সে পথে ভুলেও দৃষ্টিদান করেন নি।

তবে কি তিনি জানতেন, বৈরাম খানের এই আচরণ? তাহলে নিশ্চয় তিনি জানতেন, তাঁর প্রিয়তমা একদিন তাঁর স্মৃতি ভুলে কলঙ্কিত হবে! মনে হয় তিনি জেনেও নিরুপায় ছিলেন। রক্ষা করার কোন ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল না বলে গোপনে অশ্রুত্যাগ করে নিজেকে লুকিয়েছেন!

আজ যদি তাঁরই সেই রচিত পথে অনুগমন করে তাহলে দোষ কোথায়?

কিন্তু জ্ঞানত অবস্থায় কি করে এই পঙ্কিল পথে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়? জীবনের সায়াহ্নবেলায় যখন এত পথ নিরুদ্বেগে এলেন, তখন এই জোয়ারহীন পথে রাজ্য ও পুত্রের স্পন্দন রক্ষা করতে নিজের এই বলিদান—না না কিছুতে তা সম্ভব নয়।

তবে বৈরাম খানকে ডেকে তিনি স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতে পারেন, সে কি চায়? কেন সে তাকে এমনি বিড়ম্বনার মাঝে নিমজ্জিত করে সম্রাজ্ঞীর পথ থেকে নামিয়ে দিতে চায়? আজ তাঁর শরীরে এমন কিছুই দুর্লভ বস্তু নেই, যার আকর্ষণে খানসাহেবের এত উন্মাদনা! বরং তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আরো মাসুম জোয়ানি খুব-সুরত লেড়কী সওদা করে আসুন। তাতে ধনাগারের দৌলত যদি সব দিতে হয়, তাতেও তিনি রাজী।

হামিদা শেষপর্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয় হলেন, খানসাহেবই শিবালীকে চক্রান্ত করে সরিয়েছেন।

আর লুকোচুরি খেলা নয়, এবং সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বৈরাম খানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

এই কথা মনে আসতেই সারাদিনের দুশ্চিন্তা সরে গিয়ে কেমন যেন হামিদার মধ্যে দুর্জয় সাহস পুনসঞ্চার হল। পরিচারিকাকে ডেকে আদেশ দিলেন—খানখানানসাহেবকে সেলাম জানাও।

পরিচারিকা শুনে অবাক হল। শুনতে পায় নি এমনি ভাণ করে দাঁড়াতে হামিদা ধমক দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ বৈরাম খান খানান সাহেব। তাঁকে আমার কক্ষে আসবার এত্তেলা পাঠিয়ে দাও।

পরিচারিকা দ্রুত অদৃশ্য হল।

হামিদা বানু দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কক্ষের কোণে কোণে তখন স্বর্ণবাতিদানে উজ্জ্বল আলো প্রজ্বলিত হয়েছে। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ধূসরতার প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়েছে। নামাজের আহ্বানে মসজিদের তোরণদ্বারে আজানের উদাত্ত কণ্ঠস্বর প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মোল্লাদের কাতর প্রার্থনা।

সারাদিনের শুষ্কপ্রায় মুখখানি। বিলাস অভাবে আরো শুষ্ক। কেমন যেন কে রক্ত মুখ থেকে শুষে নিয়েছে। চোখে নেই সুর্মার অঞ্জন। গণ্ডে নেই লালচে আভা। ঠোঁটে নেই তাম্বুল রঙ। চুলের বিন্যাস অভাবে কেশপাশ অবিন্যস্ত। এমনটা সচরাচর হামিদার দেখা যায় না। আজ যেন সবই নিয়ম হারা। বসনেরও কোন চেকনাই নেই। প্রত্যূষের সেই বসন এখনও পরনে আছে। ত্যাগের কোন উৎসাহ ছিল না। আহার পর্যন্ত করেন নি সারাদিন।

হঠাৎ দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যহের বিলাস ব্যসনের দিকে মন দিলেন। নিজেই পরলেন নতুন একটি জমকালো বসন। চুল বিন্যাস করলেন। চোখে সুর্মা দিলেন। মুক্তাভস্ম দিয়ে মুখমণ্ডল সুন্দর করলেন। গণ্ডে রক্তিমাভার স্পর্শ দিলেন। ঠোঁটে তাম্বুল

রঙ। দেহে ছিল হীরা চুনি পান্নার অলঙ্কার। আরো জমকালো জড়োয়ার অলঙ্কার জড়িয়ে নিজের বয়স এক দশক নীচে নিয়ে এলেন।

এসব শেষ করতে কিছু বেশী সময় নিলেন না। কারণ খানসাহেব সংবাদ পেলেই যে আসবেন, সে তিনি জানেন। জানেন বলেই তিনি দ্রুত নিজেকে তৈরী করলেন।

দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা করে ফিস ফিস করে বললেন—আমার বিনিময়ে সেই বালিকা উদ্ধার পেতে পারে না কি? তবে যদি সে গতরাত্রে নিপৃষ্ট না হয়ে থাকে তবেই এই বিনিময় নতুবা অন্য ব্যবস্থা নেমে আসবে এই মনের বৃন্তে!

হঠাৎ সুর্মা আঁকা চোখের দুকোণে দু'ফোটা মুক্তা বিন্দু চিক চিক করে উঠলো।

একি তিনি কাঁদছেন? কেন? মন উৎসর্গে সাড়া দিচ্ছে না বলে এই কান্না! নাকি এতদিনের মহব্বত সেই সম্রাটের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে পোষণ করে আজ ভুলতে হবে বলে এই হাহাকার?

এই সময়ে রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করে মন্ত্রী বৈরাম খান কক্ষে প্রবেশ করলেন। এসে যথারীতি রাজমহিষীর সম্মানদান করে সেলাম পেশ করলেন, তারপর একান্ত অনুগতের মত বললেন—আজ্ঞা করুন বেগম সাহেবা! হঠাৎ আমাকে সেলাম দিয়েছেন কেন?

হামিদা তখন একদৃষ্টে নিষ্পলক চোখে খান সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছেন। এতখানি আনুগত্য একি সত্যিকারের, নাকি এর পিছনে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছলনাই অধিক? বুঝতে পারলেন না কোন্‌টা ঠিক? সন্দিগ্ধ হয়ে তাই একদৃষ্টে খানসাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর এক সময় একান্ত স্ফুরিতস্বরে বললেন—কেন ডেকেছি আপনি কি বুঝতে পারছেন না?

বৈরাম খান মস্তক আন্দোলিত করে বললেন—না।

রাজপুত লেড়কী কোথায় ? সরাসরি আক্রমণ।

বৈরাম খানের প্রশস্ত কপালে কুঞ্চন ফুটে উঠলো। তিনি অল্প হাসির রেখা মুখে এনে বললেন—এই কথা জিজ্ঞেস করার জন্যেই কি আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন ?

হ্যাঁ, সেই বালিকাকে আমার প্রয়োজন। আমি জানি সে আপনার হুকুমে আমার অধীন থেকে সরে গেছে।

প্রমাণ !

প্রমাণ কিছু নেই, অনুমান। তবে এ অনুমান অমূলক নয়।

যদি বলি এ অনুমান সবৈব মিথ্যা।

খোদার নামে শপথ করে বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। এ আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই করা হয়েছে।

কিন্তু হামিদা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। সম্রাজ্ঞীর আসন থেকে নেমে এসে একেবারে খানসাহেবের পায়ের কাছে জানু পেতে বসে পড়লেন। কাতরস্বরে বললেন—লেড়কা আকবরের জন্যে আমি ভিখ্ চাইছি। তার গচ্ছিত সম্পত্তি খোয়া গেলে সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হবে। সেই কারণের জন্যে আমার এই উতলা। খানসাহেব, আপনি তো এ পরিবারের সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী, আপনি কি আমার এই নিরুপায় অবস্থা বুঝতে পারছেন না ?

বৈরাম খান কিন্তু এতটুকু তরল হলেন না। বরং মুখখানি অন্যপাশে ন্যস্ত করে বললেন—আপনার যদি কথা সমাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে যেতে দিন। এ অবস্থায় আপনার কক্ষে বেশীক্ষণ থাকলে উভয়েরই ক্ষতি হবে। সম্রাজ্ঞীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হোক, আমি তা চাই না।

হামিদা কেমন যেন আহত বোধ করলেন। মুহূর্তে তাঁর মুখখানি রাঙা হয়ে আবার মিলিয়ে গেল। তারপর নিম্নস্বরে বললেন—এখনও কি আমার সম্মান আছে ? রাজপুত লেড়কীকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে কি তা ক্ষুণ্ণ হয়নি ?

বৈরাম খান তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বললেন—তুচ্ছ ব্যাপার। এই নিয়ে কারো মাথা উত্তপ্ত করা সত্যিই শোভা পায় না। রাজ্য ও রাজত্বের মাঝে অনেক গুরুতর সমস্যা আছে, সেই সমস্যাই প্রধান। এক অনাত্মীয় বালিকা কোথায় গেল, তাই নিয়ে অধিক আন্দোলন করা অন্তত সম্রাজ্ঞীর উচিত নয়।

কিন্তু সে যে পুত্র আকবরের গচ্ছিত সম্পত্তি! তার কাছে কি জবাবদিহি করবো?

আকবরের প্রসঙ্গে বৈরাম খান একটু চুপ করে থাকলেন। আকবরকে তিনিও যে দিন দিন ভয় করতে শুরু করেছেন, এতেই বোঝা যায়। তবু তিনি এক সময় তাও মন থেকে সরিয়ে দিয়ে বললেন—সে বালক। সব সমস্যা বোঝবার বয়স এখনও তার হয়নি। এখনও তার শিক্ষণকাল অসমাপ্ত। তাকে জবাবদিহি না করে শাসন করলেই উচিত বিবেচনা হবে।

হামিদা ম্লান হেসে বললেন—আকবর যে বালক নেই, তার বুদ্ধি যে দিন দিন প্রখর হচ্ছে এ আপনিও জানেন, আমিও জানি। শাসন কাকে করবেন? একদিন যে তারই শাসনের তলায় আমাদের উভয়কেই দাঁড়াতে হবে।

এ কথায় বৈরাম খানের মন একটু অন্যমনস্ক হল। তিনি চুপ করে থেকে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

হামিদা বুঝতে পারলেন খানসাহেবের অবস্থা। তাই সান্ত্বনা দানের জন্যে বললেন—তবে সে আপনাকে ও আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। আমরা এমন কর্মকে প্রশ্রয় দেব না, যা তাকে দুঃখ করতে উৎসাহিত করে।

তাতে বৈরাম খান চুপ করে থাকলেন।

তখন হামিদা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কাতর হয়ে বললেন—আমার বিনিময়ে কি সেই বেগুণা আওরতটি মুক্তি পায় না?

বৈরাম খান হঠাৎ চমকে উঠলেন! মৃত সম্রাটের পত্নী এত বড় কথা বলতে পারেন, এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কিন্তু যার জন্য এই আত্মত্যাগ, সেই রাজপুত লেড়কী যে গত রাত্রেই ইজ্জত হারিয়েছে। এ কথা এই মুহূর্তে শুনলে মহিষীর অবস্থার কি হবে? আজ বলতে দ্বিধা নেই, আকবরের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়েই তিনি সেই রমণীকে কৌশলে নষ্ট করেছেন। সে কথা গত রাত্রের এক উত্তেজনা মুহূর্তের স্মৃতি। শিবাজীর মাসুম ইজ্জত দেখে নিজের প্রবৃত্তি আর তিনি দমন করতে পারেননি, তাই অপেক্ষা না করে দুজন বলশালী রক্ষীর সাহায্যে তার ওপর পাশবিকতা সৃষ্টি করেছেন।

হঠাৎ বৈরাম খান সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে পলায়নের জন্যেই দ্রুত বললেন—সে আর হয় না বেগম মহিষী! আমি এখন যাচ্ছি, পরে এ সম্বন্ধে বলবার চেষ্টা করবো।

খানসাহেব দ্রুত পলায়ন করলেন।

হামিদা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। খানসাহেব হঠাৎ কেন ঐ ধরণের আচরণ করে পালালেন, কিছু বুঝতে পারলেন না।

কেমন যেন তার সন্দেহ হল? তবে কি? না না এসব দুষ্ট চিন্তা মনে স্থান দেবেন না।

কিন্তু নিজেকে বিনিময় করতে চাইলেন, অথচ বৈরাম খান আমোল দিলেন না, তাতেই বোঝা যায়, কিছু একটা গুরুতর ঘটনা এর মধ্যে নিহিত আছে।

তারপরই আকবরের কক্ষের সেই দৃশ্য।

আকবর সরাব প্রত্যাশা করেছিল, আর পায়নি বলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে মাকেও অপমান করতে ছাড়ে নি। কেউই আকবরের মানসিক অবস্থার গতিবিধির সন্ধান পায়নি। সে যে মাতার কক্ষের দৃশ্য দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে সঁপে দিয়েছে, এ কথা তখন কে বুঝবে?

তাই হামিদা পুত্রের কাছ থেকে অবমাননা পেয়ে ছুটে চলে এসেছিলেন নিজের কক্ষে। সেদিনকার অবস্থা তাঁর চিন্তা করা যায় না। স্বামী কোনদিন যাঁকে এতটুকু কটুকথা বলেন নি, তাঁর এই আঘাত বড় বুকে বেজেছিল।

তিনি সেদিন বুঝে উঠতে পারেননি, কার এই অভিশাপে তাঁর এই লাঞ্ছনা? কেন পুত্র হঠাৎ এমনি আচরণে অভ্যস্ত হল? মাকে সে আপন হৃদয়ের তুলনায় শ্রদ্ধা করতো, সেই মাকেই যখন সে অবজ্ঞা করলো, তখন বুঝতে হবে কিছু একটা দারুণ সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কি সে ঘটনা?

তু'চোখে যমুনার স্রোত নিয়ে হামিদা কেমন যেন পাগল হয়ে গেলেন। পুত্রের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধারা তিনি জানতেন। সে যে দিন দিন ধরে নিজেকে সম্রাটের মত উপযুক্ত করে তুলছে, তাই দেখে তিনি গর্বিতা। কখনও উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, কোন লম্পট স্বভাবের পরিচয় নয়। এমন কি পিতার যে দোষগুলি ছিল, সেই দোষের সংশোধনেই তার আগ্রহ বেশী।

সেই পুত্র আজ সরাব পান করতে চাইলো। এই বিষাক্ত অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেবার কথা শুনেই তিনি ছুটেছিলেন বাধা দিতে কিন্তু বাধা তো দিতে পারলেন না, উপরন্তু অপমান নিয়ে ফিরলেন। পুত্র তাঁকে সবার সামনে এমন ভাবে অপমান করলো, যাতে মনে হয়, সব আক্রোশ তাঁরই ওপর প্রযোজ্য। আজ সে মাতার জন্যে মদকে আশ্রয় করেছে।

তবে কি সে জানতে পেরেছে, তার মাতার চরিত্র পবিত্র নয়, মা মুঘল রমণীর স্বভাবেরই একটি দিককে আয়ত্ব করেছেন। তাই যদি পুত্র জেনে থাকে তাহলে মায়ের আত্মহত্যা করাই উচিত। পুত্র জানবে তার মা কলঙ্কিনী, এর চেয়ে তুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

এই কথা যখন হামিদা ভাবলেন, তখন জগতের সমস্ত লজ্জা

এসে তাকে কক্ষের মধ্যে ঘিরে ধরলো। তাঁর মনে হল, শুধু পুত্রই জানে না তাঁর কলঙ্ক—সমস্ত রাজপুরীর লোকেরাই জানে। শুধু তারা অধ্যস্তন বলে কোন উক্তি প্রকাশ করে না।

সম্রাট হুমায়ুন শাহের প্রিয়তমা পত্নী হামিদা বানু চরিত্রহীনা। ভবিষ্যৎ সম্রাট আকবর শাহ বাহাদুরের জননী কলঙ্কিনী। একদিন তখন ঐ পুত্রের যশ দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে, তখন লোকে তার সাথে সম্রাটের মাতার কলঙ্কিত জীবনের ইতিহাসও সংযুক্ত করবে।

এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে হামিদা বানু জোড় হাত করে উর্দ্ধমুখা হয়ে আল্লার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে অশ্রু ত্যাগ করতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, একি বিড়ম্বনার মাঝে আমাকে আজ নিমজ্জিত করলে খোদা? কি তোমার অভিপ্রায়? আমি তো এখনও কোন অপরাধই করিনি, চিন্তাতে মানুষ কি চরিত্র হারায়? আমি চিন্তাই করেছি আর তার জন্যেও দায়ী সম্পূর্ণাংশে আমি নয় সম্রাট। সম্রাটের নির্বুদ্ধিতাতেই এই চিন্তাধারার ঢল নেমেছে। আর তারই পরিণতি এই।

তবু তার জন্যেও দোষ কোথায়?

এই দোষে কি পুত্র স্বভাবধর্মের দৃঢ়তা হারিয়ে নীচে নেমে যেতে পারে?

এদিকে তখন কদিন ধরে আকবর কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সরাব পান করে চললো। আর হামিদা আপন কক্ষের হর্ম্যতলে গালিচার জাজিমের ওপর শুয়ে অবিরাম অশ্রু ত্যাগ করে চললেন। আর আল্লাকে বলতে লাগলেন—খোদা, মৃত্যু দাও, নতুবা শান্তি দাও। পুত্রের অধঃপতন মায়ের চোখে আর দেখিও না। রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক্। মুঘল বংশ সিন্ধুর জলে লীন হোক। তবু এই পরিণতি যেন না হয়। এই পরিণতি যদি অবিরাম চলে, তবে মৃত্যু এসে যেন আমার সব জ্ঞান হরণ করে নেয়।

হামিদার মৃত্যুও হল না।

আকবরের কোন পরিবর্তনই দেখা গেল না। বরং অধঃপতনের অন্ধকার পথে সে আরো দ্রুত এগিয়ে চললো।

একদিন সংবাদ রাষ্ট্র হল, সম্রাট প্রাসাদে নেই, কোথায় যেন চলে গেছে।

ঠিক সেই সময়েই শিবালী হামিদার কাছে এসে পৌঁছলো।

হামিদা তখন পুত্রের বর্তমান পরিণতির পরিণামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজের দোষ মনে করে অনুতপ্ত জীবনে কক্ষের রুদ্ধদ্বারের মাঝে জীবন্মৃতের মত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন। কদিনে তাঁর শরীরের যে শ্রী ফিরেছে, তা দেখবার মত। মুখখানিতে কে যেন কলুষ মাখিয়ে কালিমাবর্ণ করে দিয়েছে। চোখের তলায় জমেছে এক বুক কালি। চোখের জলের পুরুদাগে গণ্ডের অনেকখানি অংশ কর্দমাক্ত। ঠোঁটের রক্ত কে চুমুকে শুষে নিয়েছে।

হামিদা মরতেই চেয়েছিলেন কিন্তু মৃত্যু তাঁর হয়নি। মৃত্যু হলেই বুঝি ভাল হত, তাহলে এত যন্ত্রণা তাঁকে সহ্য করতে হত না।

মাঝে মাঝে শুধু খবর নিয়েছেন পুত্রের। এখন পুত্র অধঃপতনের কোন সর্গে বাস করছে, জেনে নিয়ে আরো শোকার্ত হয়েছেন।

সপত্নীরা এসেছেন সান্ত্বনা দিতে। আকবরের ধাত্রীমারা এসেছেন শান্ত করতে কিন্তু হামিদার মন কারো কথাতেই সান্ত্বনা পায়নি। পাবে কি করে? এই পুত্রের দ্বারা যে তাঁর অনেক আশা ছিল, সে আশা আজ জলাঞ্জলি। মনে হচ্ছে মুঘল পূর্বপুরুষরা বেহেস্ত থেকে অভিসম্পাত দিয়ে হামিদাকেই দায়ী করছেন। এত মেহনত করে এই রাজ্যপ্রাপ্তি, সেই রাজ্য সামান্য কারণে হাতছাড়া হতে

বসেছে। উত্তম পুরুষ আকবরের কোন দোষ নেই, পারিপার্শ্বিকতাই তাকে নরকে নামিয়ে দিচ্ছে। না মৃত পূর্বপুরুষদের সহস্র হাতগুলি আশীর্ব্বাদ করে তাঁদের বংশকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন।

এর মধ্যে হামিদা কয়েকদিনের কয়েকবার সবার অগোচরে পুত্রের কক্ষের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে এসেছেন। প্রহরাধীন কক্ষে প্রবেশের সাহস তাঁর হয়নি। পুত্র তাঁকে বিতাড়িত করেছে, অপমানিত করেছে। তার কক্ষে প্রবেশের সাহস আর কোথায়? সে স্নেহ যে একটি দিনের একটি মুহূর্তে স্রোতে জলে ধুয়ে গেছে। আর কি সেই মাতাপুত্রের মাঝে আকর্ষণ কখনও সৃষ্টি হয়? মাতার স্নেহ এখনও সেই ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে প্রবাহিত। শুধু পুত্রের আর সেই মাতার স্নেহক্রোড় আকাঙ্ক্ষিত নেই।

সেইজন্যে আজ গোপনে হামিদাকে পুত্রের সংবাদ নিতে হচ্ছে। চুরি করে দেখতে হচ্ছে পুত্রের সেই চন্দ্রের মত উজ্জ্বল প্রতিভায় ভাস্বর মুখখানি।

প্রহরীরাই একমাত্র জানে, তাঁর এই গোপন নিঃশব্দ যাওয়া-আসা। কিন্তু তারা নফরের নফর, গোলামের গোলাম। শুধু চোখ মেলে তারা দেখলো, কোন কথা বললো না। তাদের অব্যক্ত কথা-গুলির মাঝে মাতার মনের কাতরতাই কি প্রতিফলিত হয়ে ওঠেনি?

জীবন্মৃতা সম্রাজ্ঞীর আচ্ছন্নতার মধ্যে শুধু পুত্রের গোপন মুখ-দর্শনই শেষপর্যন্ত তাঁকে আরো কয়েকটি দিন বাঁচিয়ে রাখলো।

বেটা আমার সরাব পান করতে শিখলো। বেটা আমার শোণিতের মাঝে কলুষের বীজ পরিবেশন করলো। কেন এ কাজ করলো? সামনের দুর্গম পথ পরিক্রমা না করে কেন দরিয়ার পানিতে ডুবে মরলো।

আমি অক্ষম মাতা, পারলাম না তাকে বীর্যবান করতে। সম্পূর্ণ দোষই যে আমার! আমার গর্ভের মাঝে দূষিত রক্তে প্রবাহমান ধারা ছিল বলে এই সম্ভব হল।

একদিন বৈরাম খান এসে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করলেন।

তাঁকে দেখে হামিদার যেন সমস্ত আচ্ছন্নভাব লুপ্ত হয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো বিক্ষুব্ধ প্রবৃত্তি। অস্বাভাবিক চীৎকার করে ঝাড়লণ্ঠনের বুকে দোলা সৃষ্টি করে বললেন—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে খানসাহেব! এবার নিশ্চিন্তে দোস্তের সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করুন। প্রতিবন্ধক আর কেউ এসে আপনার বিলাস মনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

একথা যদিও বলা তখন খুবই অন্যায়। আকবরের অধঃপতনে কার যে চক্রান্ত আছে বোঝা মুস্কিল। তাছাড়া বৈরাম খান না থাকলে যে যেখানে সকলে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে যে দাঁড়াতে পারতো না—এ বোধও তখন হামিদার ছিল না। তিনি তখন পুত্রের দুরবস্থায় কেমন যেন সংযত হতে ভুলে গেছেন। আর সংযত হয়েই বা কি করবেন? ধ্বংসের মসীলিপ্ত চিত্র যখন দ্রুত চোখের সামনে নেমে আসছে, তখন সব অনুশাসনই তো ভেঙে গুড়িয়ে যায়!

সেদিন বৈরাম খান আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সম্রাজ্ঞী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—থাক্ নিজের সাধুতার প্রমাণ আর নাইবা দিলেন। আমার স্বামী একজন বড় যোদ্ধা, সুনিপুণ শাসক, বন্ধুবৎসল ছিলেন কিন্তু তিনি মানুষ চিনতে পারতেন না বলেই আজ আমাদেরও তার জন্যে যথেষ্ট দুর্ভোগ করতে হচ্ছে।

বৈরাম খান তারপর নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন। আর দাঁড়াতে সাহস করেন নি। আর দাঁড়ানো সঙ্গত নয় বলেই পালিয়েছিলেন। দোষ যে তাঁর নেই তা নয়, তবে সে কথা অপরের মুখে শুনতে কারই বা ইচ্ছে করে?

তারপর একদিন যখন খবর এল পুত্র আকবর প্রাসাদে আর নেই কোথায় যেন চলে গেছে। সঙ্গে আর কিছু নেয় নি, শুধু নিজের অশ্বটি ছাড়া। চলে গেছে মনে হল এইজন্যে যে

সে একবেলা চলে যাবার পরও যখন ফিরলো না তখন খবরটা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

হামিদা বানু শুনে তখন নিজেকে প্রকৃতস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এমন যে একটা কিছু হবে এ যেন তিনি জানতেন। এই সময় দুটি বাঁদীর প্রহরাধীনে শিবালী এসে তাঁর সামনে নতমুখে দাঁড়ালো।

আর সঙ্গে সঙ্গে হামিদার সমস্ত বিক্ষোভটা পরিবর্তিত হয়ে অন্য একটা ভয়ঙ্কর রূপ নিল। মুহূর্তে তাঁর চোখদুটি স্ফীত হয়ে অগ্নিদীপ্তি বিকীরণ করলো। কোমল বাহু দুখানি কঠিন হয়ে আসুরিক শক্তি যোজনা করলো। ক্ষুব্ধ দুই চোখে কিছুক্ষণ জ্বালা প্রকাশ করে একদৃষ্টে শিবালীর নতমুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, এই আওরতটির জন্যেই আজ তাঁর পুত্র অধঃপতনের অন্ধকার গহ্বরে নেমে গেছে। দায়ী এই কলঙ্কিতা রমণী। সে যদি সেদিন লুণ্ঠিতা না হত, তাহলে এই ভীষণ বিশ্রী পরিণতির মুখোমুখি হতে হত না। শিবালীর যে কোন অপরাধ নেই, তাকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, একথা সেইমুহূর্তে হামিদার মনে থাকলো না।

তাঁর প্রথম সম্ভাষণই হল স্বভাবের বিপরীত। তিনি অস্বাভাবিক চিৎকার করে বললেন—বেসরম কুত্তী কাফের, আবার আমার কাছে ফিরে এসেছিস্ কেন? আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। তোর মুখ দেখা পাপ।

সেই মুহূর্তে একবারও হামিদার মনে এল না, দোষ তাঁর নিজের। নিজের অক্ষমতায়-ই আকবরের গচ্ছিত সম্পত্তি খোয়া গেছে। এখন এই নিরপরাধিনী কিশোরীকে দায়ী করলে কি হবে?

সে এখন ক্ষতবিক্ষত। তার স্বপ্ন গেছে। এসেছিল ভ্রাতার সঙ্গে নিরাপদ আশ্রয়ে বাঁচতে। তবু সে ছিল নারী। সে জানতো,

একদিন কারো মনে ধরা পড়লে তার অন্তঃপুরের অন্ধকার অংশ আলোকিত করবে। সে হবে প্রেয়সী। তারপর হবে জননী। কারণ সে যে নারী! কিন্তু আজ সে সব আশা ভরসা তার জলাঞ্জলি গেছে। একটি রাতের কোন এক অশুভ মুহূর্তে দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলপূর্ব্বক তার সব কেড়ে নিয়েছে। এখন সে কলুষিত এক নিপৃষ্ট কুসুমের মত জগতের পরিত্যক্ত এক নষ্টা কিশোরী।

শিবালী দু'চোখে প্রবল কান্নার স্রোত নিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু হর্মতলে পড়েছে। চোখ দুটি তুলতে তার ভয় করছিল। আজ কারো চোখের দিকে তাকাতেই তার সাহস হয় না। লজ্জা, না লজ্জা, নয়। লজ্জার উর্ধ্বে যদি কিছু পৃথিবীতে থাকে, তাই তার হয়েছে। এমন কি এই মুহূর্তে যদি ভাই এসে সামনে দাঁড়াতো, তাহলেও বোধ হয় সে তার দিকে তাকাতে পারতো না।

বয়স তার তখনও ঠিক পরিণত নয়, না হলে সে মৃত্যুর কথাও ভাবতে পারতো। তবে এখানে মরা যে সহজ নয়, তা সে দেখেছে। সর্বদা পিছনে পিছনে প্রহরী চর এরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। না হলে যে কক্ষে তাকে একা কদিন অসহ্য এক সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়েছিল, সেখানে সে নিজের গলা টিপে কণ্ঠরোধ করতে পারতো।

কিন্তু তার যে তখনও পরিণত মন আসে নি। কি তার গেছে, কি অমূল্য রত্ন খোয়া গেছে। একদিন রাত্রে তাকে কক্ষ থেকে তুলে নিয়ে এসে বলপূর্বক তার ওপর দুর্বৃত্তরা কি অত্যাচার করেছে—সেই উপলব্ধি বোধই তার এখনও জাগে নি। তবে কিছু গেছে। যা গেছে কোন রমণীর তা গেলে সে আর পৃথিবীতে নিষ্পাপ জীবন গ্রহণ করতে পারে না। সে উচ্ছিষ্ট হয়েছে। পরিত্যক্ত আবর্জনা তুল্য এক জীবনের মুহূর্তে এসে সে পৌঁচেছে।

এই বোধটুকু তার হয়েছিল বলে সে কেমন যেন এক যন্ত্রণার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তবু তার মধ্যে এক আচ্ছন্নের অবস্থা ছিল। পরিচারিকারা তাকে নিয়ে এসে সম্রাজ্ঞীর সামনে উপস্থিত করতেও কোন ভাবান্তর জাগে নি কিন্তু যখন সম্রাজ্ঞী বিশ্রী এক আচরণ করে আঘাত করলেন, তখনই তার চমক জাগলো। সমস্ত চেতনার গলিপথগুলি হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠলো।

সে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলে মহিষীর পায়ের কাছে বসে পড়লো।

আর সেই মুহূর্তে হামিদা হয়ে উঠলেন আরো কঠোর আরো ক্ষমাহীনা। তিনি তখন ভাবলেন, একে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে কি হবে? আওরত কলুষিত হলে তার আর মূল্য কি? পুত্র যদি পুনরায় ফিরে এসে একে ক্ষমা করে, তবু সেই পুত্রকে নিষেধ করতে হবে। এর আগের মূল্য যখন আর নেই তখন একে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেওয়া উচিত। মরে না গেলে বিষাক্ত বাষ্প আরো ছড়াতে পারে, তাতে সমস্ত সংসার যদি এতটুকু স্থিতি হবার ক্ষমতা পায়, তাহলে এর বিষে সব লয় হয়ে যাবে।

তাই তিনি কাতরতা মন থেকে সরিয়ে পায়ের কাছে উপবিষ্ট শিবালীর কাছ থেকে ছিট্‌কে দূরে সরে গেলেন এবং বললেন— নিকালো, দূর হয়ে যা। দূর হয়ে যা এই প্রাসাদের সীমানা ছেড়ে। নইলে আমি চাবুক মেরে তোর স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ করে দেব।

হঠাৎ হামিদার দৃষ্টি পড়ে গেল শিবালীর মুখের ওপর। এতক্ষণ তিনি মেয়েটির মুখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলছিলেন। লক্ষ্য পড়ে যেতে তাঁর মাতৃ অন্তরের কোথায় যেন হাহাকার জেগে উঠলো। তিনি যে এমনি কখনও কঠোর ও মমতাহীনা নয়, তাই তাঁর মনে হল। না, তবু না। মমতা বড় শয়তানী বস্তু। একবার তার বৃত্তে ধরা পড়লে আর ছাড়া পাওয়া যায়

না। কিন্তু কিছুতে নিজেকে নিবারিত করতে পারলেন না। সজল অশ্রুমুখী কাতর মুখখানা কেমন তাঁর দিকে ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেউ যে তার ওপর অত্যাচার করেছে, তার কোন চিহ্নই ঐ নিষ্পাপ মুখে নেই। সেই সরল প্রস্ফুটিত কুসুমিত মুখখানি, প্রথম যেদিন পুত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে গচ্ছিত রেখেছিল। ঠিক তেমনি আছে। তেমনি লাবণ্যে ঢলঢল, চন্দ্রের সুষমায় আবোরিত মুখখানি। সাগর নীলের স্বচ্ছতায় ভরা দুটি আয়ত ব্যাকুল চক্ষু, তার ওপরে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ভ্রূযুগল। গণ্ডের রক্তিমাভা কি অদৃশ্য হয়েছে? না, তাও আছে। এখনও পুষ্টগণ্ডের নিটোল প্রান্তসীমায় প্রত্যুষের সূর্যরঙের রশ্মি। কলুষ যদি এই তনুটির মাঝে স্পর্শদান করতো, তাহলে কি এমনি ঐশ্বর্য থরে থরে প্রজ্জ্বলিত শিখা নিয়ে দ্যুতি ছড়াতো?

হামিদা আরো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে বিচারকের চোখে শিবালীর দিকে তাকালেন। না, কই চোখের তলায় তো অন্ধকারের ধূসরতা কলঙ্কের রেখা টানে নি? তবে কি তিনি যা চিন্তা করেছেন, সব ভুল! খোদা, তাই যেন হয়। মেয়েটি যেন নিষ্পাপ থাকে। পবিত্র থাকে। আকবরকে খুঁজে বের করে যেন তার হাতে সঁপে দিতে পারেন।

এই কথা চিন্তা করে হঠাৎ হামিদা তাঁর কোমল স্বভাবে ফিরে এলেন। কণ্ঠের স্বরের মাঝে স্নেহের প্রাবল্য যোগ করলেন। শিবালীকে কাছে ডাকলেন। ভীরু মেয়েটি হঠাৎ এই পরিবর্তনে চমকিত হয়ে আরো ভয় নিয়ে হর্ম্যতল থেকে উঠে বেগমমহিষীর সন্নিকটে অগ্রসর হল।

হামিদাবানু মহিষীর আসন থেকে নেমে এসে এই অপরিচিতা কিশোরীটিকে সস্নেহে বক্ষের কাছে টেনে নিলেন। আবেগে তার মস্তকে নিজের করাঙ্গুলি দিয়ে সান্ত্বনা দান করলেন। তারপর একান্ত চাপাস্বরে বললেন—ওরা তোর কোন ক্ষতি করে নি তো!

জানিস এই জেনানামহল বড় জঘন্য। এখানে ভাল মনের কেউ সহজ নিঃশ্বাস নিয়ে থাকতে পারে না। আমার তাই সর্বদা ভয় করে। এই রাজসিক বৈভবের মধ্যে এমন জৌলুসহীন অন্ধকার কেন? বেটা আকবর যদি কোনদিন সম্রাটের পূর্ণক্ষমতা আয়ত্ব করতে পারে, তাহলে এই জেনানামহল পূর্ণ সংস্কার করতে বলবো।

তারপর শিবালীর মুখখানি তুলে ধরে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে আবার জিজ্ঞেস করলেন—ওরা তোর কোন ক্ষতি করে নি তো! আমার পুত্র আকবর এখনও নাবালক, তার মনে ও দেহে কোন কলুষতার স্পর্শ লাগে নি। তোকে আমার পুত্রের বেগম আক্ষা দেব, যদি তোর নিষ্পাপ পবিত্রতা সর্বজন গ্রাহ্য হয়। আমি জানি, পুত্র তোর প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই বলে হামিদা শিবালীর চিবুক তুলে ধরে চোখের অন্তর্নীলে ডুবুরি নামালেন।

আর নিজেকে শিবালী রোধ করতে পারলো না। চোখের জল তার রুদ্ধ হয়েছিল, খানিকটা অবাক ও বিস্ময়। এমন রাজপুরীতে তো কখনও তার স্থান হয় নি, এমন বৈভব সে কখনও দেখে নি! এখানকার এই অদ্ভুত মানুষদের সঙ্গে তার পরিচয় এই প্রথম। তাই বেগমসাহেবার ক্ষুব্ধ আচরণ, আবার অনুগ্রহ প্রদর্শন সবই তার কাছে অবাক লাগছিল কিন্তু ক্ষুব্ধ আচরণ, সে বুঝতে পেরেছিল, অনুগ্রহ তার বোধের বাইরে। তবু শেষ কথায় বুঝেছিল, তার পুত্রের সঙ্গে শাদির কথা এই বেগম ভেবেছিলেন। সেই পুত্র যে এইরাজ্যের সম্রাট, আর সে তাদের একদিন উদ্ধার করে এনে আশ্রয় দিয়েছিল, তাও অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু বার বার বেগমসাহেবা 'ওরা তোর কোন ক্ষতি করে নি' জিজ্ঞাসা করতে তার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। আবার দুই আয়ত চোখে জল টলমল করে উঠলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে হামিদার বুঝতে আর বাকী থাকলো না।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কোমলতা অন্তর্হিত হল। স্ফুরিত হল সেই আগের বিক্ষোভ। ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষিপ্তস্বরে অস্বাভাবিক চীৎকার করে বাঁদীকে ডাকলেন—এই কে আছিস? চাবুক নিয়ে আয়।

চাবুক এসে হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছলে তিনি বাতাসে আন্দোলিত করে সপাসপ এলোপাথারি মারতে লাগলেন সেই কিশোরীর দেহ লক্ষ্য করে।

হর্মতলে কার্পেটের জাজিমের ওপর আছড়ে পড়ে গেল শিবালী। না, কোন আর্তনাদ নয়। এমনভাবে প্রহার তো একদিন তার বিমাতাও করতো। তবে তার মধ্যে কোন কারণ থাকতো না, আজ কারণ আছে।

শিবালী বুঝতে পেরেছে, এই সম্রাজ্ঞীর কাছে তার অনেক মূল্য ছিল কিন্তু আজ আর তার কিছু নেই।

বসন ছিন্ন হল। গাত্রবর্ণ উন্মুক্ত হল। রক্ত ফুটলো গৌরবর্ণ দেহের কোমলাংশ ফেটে তবু কোন শব্দ না।

আর হামিদা তখন হত্যার নেশায় প্রবল উত্তেজনায় বিক্ষিপ্ত ভাবে চাবুক চালিয়ে চলেছেন। নিষেধ কে করবে? নিষেধের কেউ নেই বলেই তাঁর স্বাধীনতা অপর্যাপ্ত। তিনি চান একেবারে শেষ করে দিতে। এই কুলষিত কিশোরীকে বাঁচিয়ে রাখলে তাঁরই অপমান বেশী। যদি কখনও তার পুত্র এর দেখা পায়? আর সে যদি জেনে-শুনে একে আবার আকাঙ্ক্ষা করে? তার চেয়ে পৃথিবী থেকে তাঁরই চাবুকের প্রহারে শেষ হয়ে যাক্। এ হত্যায় বুঝি কোন পাপ নেই। আছে আল্লার আশীর্ব্বাদ। এই ভেবেই বোধ হয় হামিদা চাবুক চালাচ্ছিলেন।

তারপর যখন থামলেন, তাকিয়ে দেখলেন হর্মতলে একটি ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বিকৃতস্বরে চীৎকার করে বাঁদীকে ডেকে বললেন—একে নিয়ে যা। যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে রাজপুরীর বাইরে

ফেলে দিয়ে আসতে বলবি। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে আবার আমার কাছে নিয়ে আসবি।

বাঁদী দু'হাতে রক্তাক্ত নিস্পন্দ শিবালীর দেহটি তুলে নিয়ে চলে গেল।

আর হামিদা তখন কেমন যেন দু'হাতের মধ্যে মুখখানি ধরে নিজেকে কি এক প্রবল শক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন।

ভেঙে গুড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলে বুঝি সবচেয়ে শান্তি পেতেন। কিন্তু তা যখন হল না, যখন চেতনাশক্তি বিলুপ্ত না হয়ে তা জেগে থাকলো, তখন ভাবতে চেষ্টা করলেন তার বর্তমান অবস্থা!

কিন্তু কিছুতে কিছু ভাবতে পারলেন না।

উত্তেজনা তখনও তাঁর দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায়। অপরিসীম শ্রমের জন্যে সমস্ত দেহের ওপর এক ক্লান্তি নেমে এসেছে। ডান হাতখানির যেন কোন চলৎশক্তি নেই।

সবচেয়ে ক্ষতবিক্ষত তখন তাঁর মনটি। রক্তাক্ত শিবালীকে নিয়ে যাবার পরই তাঁর জ্ঞান ফিরলো, এ তিনি কি করলেন? কি জন্যে ঐ নিরপরাধিনী ভাগ্যহীনা বালিকাকে ওমনি বেধড়ক প্রহার করলেন? এমনি প্রকৃতি তো কখনও তাঁর ছিল না! হঠাৎ তাঁর স্মরণ হল পুত্রকে। আকবর আজ রাজপুরীতে নেই। এমন কি কোথায় আছে কয়েক সহস্র লোকের কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। সে এমনি অনুপস্থিত হয় নি। জীবনে কি এক দুর্বহ মুহূর্তে প্রাসাদের বিলাস কক্ষে থাকতে পারে নি বলে একান্ত দীনের মত কোথায় কোন্ নীল আসমানের উন্মুক্ত জমিনে নিজেকে লুকোতে গেছে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই অপরাধে ঐ বেগুনা কিশোরী জিন্দেগী কোরবানী দিয়েছে। ঐ কিশোরী যদি নাগালের মধ্যে না থাকতো, তাহলে কোন বাঁদীই এই সাজা ভোগ করতো। বাঁদীর কি কোন অপরাধ ছিল?

তবু এই কিশোরী সাংঘাতিক এক অপরাধ করেছিল। সে নিজে কিছু না করলেও তার নসীব তাকে অপরাধিনী করেছিল, তাই যথেষ্ট। নসীব কেমন করে তাকে সম্রাটের ভাগ্যের সঙ্গে জড়ালো সে কথা এখানে অবান্তর। অনেক সময় দুনিয়াতে অনেক অসম্ভব ঘটনাও ঘটে যায়।

হামিদা আবার কেমন যেন সমুদ্রের তলায় ডুবে যেতে লাগলেন। কোথাও আলো নেই। সব নিবীড় অন্ধকার। কোথাও শান্তি নেই। চতুর্দিকে শুধু দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা।

চতুর্দিকে এত ঐশ্বর্য কিন্তু কোথাও জৌলুস নেই। ধনাগারে নাকি অপর্যাপ্ত ধনরাশি। রত্নাভাণ্ডারে রত্নের শেষ নেই। তবু যেন মনে হচ্ছে শুধু সীমাহীন শূন্যতা প্রাসাদের চতুর্দিকে পর্বতের আকার নিয়েছে।

হঠাৎ হামিদা অনুভব করলেন, তাঁর ধমনীর রক্ত চলাচল স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি ঢুকে যাচ্ছেন, নিবীড় এক অন্ধকারের সীমাহীন পাতাল সমুদ্রে। এই উপলব্ধি তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করতে তিনি চেতনাকে ক্ষণিক রুখে দাঁড়াবার জন্যে চীৎকার করে বললেন—এই কে আছিস্? আমার বেটা মুন্না আকবরকে খুঁজে বের করার জন্যে কি চতুর্দিকে লোক ছুটেছে? কোতয়ালি, কোতয়ালিতে খবর ছুটিয়ে দিতে বল্—আমার বেটা আকবর যেন জিন্দা প্রাসাদে ফিরে আসে। তার যেন কোন ক্ষতি না হয়। তার কোন ক্ষতি হলে আমি আর এ দুনিয়াতে থাকবো না।

তারপর হামিদা কেমন যেন টলতে টলতে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে এক সময়ে হর্মতলে পড়ে গেলেন। দুজন বাঁদী এসে নিঃশব্দে তাকে পালঙ্কে তুলে দিয়ে সেবা কার্যে ব্যাপৃত হল।

হামিদা জানলেন না, অনেক আগে থাকতেই তখন সম্রাটকে

খোঁজার জন্যে দলে দলে ভাগ করে ঘোড়সওয়ার সিপাহীরা চতুর্দিকে ছুটেছে।

১৭

সেই শাহনশাহ আকবর। পৃথিবীর ইতিহাসে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। সেই আকবর একদিন কৈশোরোত্তীর্ণ যৌবনের প্রথম মুহূর্তে রাজ্য ছেড়ে, আত্মীয় স্বজনের গণ্ডি ছেড়ে পৃথিবীর সমস্ত মায়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে কোথায় বিবাগী হয়ে চলে গিয়েছিল।

কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না। মনে হয়, সাধারণ মানুষের মত একটি রাজপুরুষের জীবনে এই বিড়ম্বনা নিতান্ত গল্প কথা।

হয়তো আকবরের কাছেও কৈশোরের সেই ভাববিলাস পরে আর মনের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করেনি। মানুষ পরিণত মনে অনেক ঘটনা তলিয়ে ভাবতে পারে। হয়তো আকবর পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু সে অনেক পরের ঘটনা।

সম্রাট নেই। কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। দলে দলে সিপাহী সওয়াররা ফিরে আসছে, এইটাই সেদিন প্রাসাদপুরীর মধ্যে দারুণ এক দুঃসংবাদ।

আকবরের খাসভৃত্য রহিম। রহিমকে বার বার প্রশ্ন করা হচ্ছে, সম্রাট তাকে কিছু বলে গেছেন কি না।

রহিমের কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

আমি খোদার দোহাই কিছু জানি না। বাদশাহ আমাকে সরাব এনে দিইনি বলে জুতি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারপর

থেকেই আমি তার সামনে যাই নি। তবে মহম্মদ জানাতে পারে!

মহম্মদকে ডাকা হল।

তাকে জিজ্ঞেস করতে সে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললো—আজ্ঞে, আমি হুজুরের খিদমতে ছিলাম। আমি নাস্তা করতে যাবার সময়ে দেখে গেছি, হুজুর এক তয়ফাওয়ালীর কাছে গীত শুনছেন। হাদিকে জিম্মা করে দিয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম।

হাদিকে ডাকা হল।

হাদি আবার একটু রসিক লোক। সে বললো—হ্যাঁ হুজুর গীত শুনছিলেন। আমি দওরোজার বাইরে হুকুমের অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ দেখি, হুজুর সেই তয়ফাওয়ালীর সাথে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় যান, দেখবার জন্যে খানিক পথ গেলাম কিন্তু তারপর জেনানামহলের দিকে চলে যেতে আমি আর হদিশ রাখতে পারলাম না।

আসলে কোন সন্ধানই এ থেকে মিললো না। নফরগুলি শুধু কার্যে অবহেলা করার গাফিলতিতে কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হল।

তবু এমনি করেই অনুসন্ধান চললো। যত বাইরে থেকে সিপাহীসওয়ারের দল বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে লাগলো, ততো ভিতরের অনুসন্ধান চললো নানান কৌশলে।

শান্ত্রী পাহারাদারদের দুজনকে নোকরী থেকে ছুটিয়ে দেওয়া হল বুড়ো হয়েছিল, তাকত কমে গেছে, চোখের রোশনীতে আর আগের প্রখরতা নেই বলে তাদের দেশে চলে যেতে বলা হল। কারণ সংবাদ পাওয়া গেছে, ঠিক কোন্ সময়ে বাদশাহ প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে। তখন সিংহদরজায় সর্দার শান্ত্রী পাহারাদার ছিল ঐ দুজন। তারা কেন বাদশাহকে ঠিক পয়চান্ করতে পারে নি? ঘোরতর অপরাধে তারা অপরাধী।

এমনি ভাবে নাবালক সম্রাটের অন্তর্ধ্যানের নানান অনুসন্ধান চললো।

প্রাসাদের মধ্যে বেশ একটা চাপা গুমোট ছড়িয়ে থাকলো। সম্রাট যখন ছিল, তখন হয়তো তাকে খুব মনে পড়তো না কিন্তু সম্রাট না থাকাতে যেন অভাবটা আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠলো।

নহবতখানায় শাহনাইয়ের রাগিনী থেমে গেছে।

শাহনাই বেজে কি হবে? মাঙ্গলিক ধ্বনি বর্তমানে প্রাসাদের স্পন্দনে অসম্ভব। যাকে ঘিরে এই এত এলাহী কাণ্ড, সেই সম্রাট নেই।

বৈরাম খান এক ভাবনার সমুদ্রে পড়েছেন। ভাবছেন অনেক কিছু। এদিকে যুদ্ধে যেতে হবে। কিছু কিছু অধীন ভূখণ্ডে বিদ্রোহ মস্তক উত্তোলিত করছে। নিজে সিপাহশালার। বসে থাকলে তাঁর চলবে না। রাজ্যবিস্তার। বিদ্রোহ দমন। বিলাসের শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। দায়িত্ব অনেক। আভ্যন্তরীন যে কোন গণ্ডগোলই থাক্ সেদিকে মন আচ্ছন্ন করলে চলবে না। এমন কি সলিমার সান্নিধ্যও তাঁকে ত্যাগ করতে হবে! সলিমা বেশ সুন্দর বয়েৎ লেখে। ভাল ভাল গীতের মত বাত।

কিছুতে তিনি সব বুঝতে পারেন না। বুঝবেন কেমন করে? ওসব কি কোনদিনও তার অভ্যাসে এসেছে যে বুঝবেন! তরবারী ও অশ্বক্ষুরের ধ্বনি যত দ্রুত বুঝতে পারেন, এই কবিতার ভাষা, না—বড়ই বোধগম্য।

তবে সলিমার সান্নিধ্য বড় মধুর। এমন পেয়ার বুঝি কখনও দিলে আসে নি। যেন ঠিক বসোরাই গোলাপের মত মধুর সুরভি। গুলাবী সরাবকেও হার মানায়। সে কাছে থাকলে কেমন যেন কঠিন বাহুর বলিষ্ঠতা শিথিল হয়ে যায়।

সেই সলিমার পেটে বাচ্চা এসেছে। বড় সুখবর।

খবরটা যখন সে সরমে রাঙানো রক্তিম চোখে দিয়েছিল।

সেই কথাই বর্তমানে বার বার মনে পড়ে। সেই কথাই তাঁর মনের সমস্ত পরিধি ঘিরে কেমন এক মধুর আচ্ছন্নের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

সলিমা, পেয়ারী খসবু। মেরে মাশুক। মেরে দিলের রোশনাই। সে আমার সোহাগের ইজ্জত রেখেছে। দিয়েছে এক অমূল্যরত্ন, যা কোন বেগম দিতে পারে নি।

এই আনন্দেই তখন খানসাহেব আত্মহারা।

এই তো তুদিন আগে। তখনও আকবর এই প্রাসাদেই অবস্থান করছে। পুরীতে তখন বিশেষ গোলমাল ছিল না।

সারাদিনের কাজের পর খানসাহেব রৌশন আধেরীতে প্রবেশ করলেন। এইসময় তিনি প্রত্যহ শান্তি নিবারণের জন্যে এখানে আসেন। সলিমার আধেরীতে। সলিমার সাথে শাদি হবার পর একদিনও এই নিয়মের গাফিলতি করেন নি।

রৌশন আধেরী' নতুন মহল। সলিমার সাথে শাদি হবার পর তৈরী হয়েছে। এখানেই খানসাহেবের বাকী সময় কাটে।

রৌশন-আধেরীর নির্মাণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। যেন বেহেস্তের একটি অংশ এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। চন্দ্রের সুষমা দিয়ে, সূর্যের রশ্মি দিয়ে, ফুলের রেনু দিয়ে। মহলে প্রবেশ করলেই পাবেন নানা জাতের সুগন্ধ। কোন কক্ষে আতরের তীব্র সুগন্ধ, কোন কক্ষে গোলাপের মিষ্টিমধুর সুবাস। পাবেন কস্তুরী মৃগনাভির সুগন্ধ। অগুরুর সুবাস। তারপর কতরকমের গন্ধ যে তার ইয়ত্বা নেই। কোনটি জোরালো কোনটি আবার মৃতু। কোনটির সুগন্ধ নাসাগ্রে প্রবেশ করলে মাথা ঘুরে যায়। আবার কোনটির মধুর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে আঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে করে।

সুগন্ধের রকমারীর সাথে মিল করেই যেন কক্ষের নির্মাণ।

যে কক্ষে যেমন জোরালো সৌরভ, সেই কক্ষে আলো, বাতাস, রঙ, দর্পণের অবস্থান, সাজানোর কৌশল—সবই সেই সৌরভের মত। খুব জোরালো গন্ধ নাসাগ্রে প্রবেশ করলে যেমন দেহান্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তেমনি উত্তেজনার সাথে মিল করে নগ্নসৌন্দর্য কক্ষের দেয়ালের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত হয়েছে।

খানসাহেব মুঘল শিল্পরীতিকে নকল করেই বিলাসের নতুন নতুন পন্থা সৃষ্টি করেছেন।

নয়া কিসিমের দুনিয়ায় নতুন মাসুম লেড়কীর অধিকার পেতে তাই এই রৌশন-আধেরী তৈরী হয়েছিল। আর সেখানে রাত্রে প্রথম প্রহর থেকে শেষ প্রহর পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কক্ষে অবস্থান করে খানসাহেব রমণীর সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন। সে রমণী অন্য কেউ নয়, তারই শাদি করা মেহেবুবা সলিমা বেগম।

প্রতিটি প্রহরে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে। কোথাও মৃদু আলো, কোথাও আলো নেই। কোথাও নীল, সবুজ, লাল, হলুদ, জাফরান, চকোলেট, আকাশরঙ, নানারঙের রোশনাই ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের মাঝে আছে। সেখানে তিনি সলিমাকে নিয়ে প্রবেশ করেছেন।

সলিমা কক্ষের মাঝে বেহেস্তের রূপ দেখে কবিতার বয়েৎ উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করেছে। মূর্খ খানসাহেব বুঝতে না পেরে পত্নীকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—কি যা তা প্রলাপ বকছো?

সলিমা আহত হয়েছে। প্রলাপ? কাব্য, সঙ্গীত যার মাঝে না থাকলো, সে তো দুনিয়ার অর্ধেক সুখ থেকে বঞ্চিত হল!

সলিমা স্বামীর প্রকৃতি দেখে বিমূঢ় হয়েছে। তিনি আওরতের দেহটা বোঝেন। দেহের মধ্যে যে সঙ্গীতের পিপাসা আছে তা বোঝেন না। দেহ গ্রহণের পূর্বে যতটুকু ক্রীড়া করলে হয়, সেইটুকু হয়তো নেশার মতই করেন, তারপর ক্লান্ত হয়ে শয্যাগ্রহণ করে গভীর ঘুমে হারিয়ে যান। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে চলে যান, তখন ফিরেও একবার তাকান না।

এমনি প্রিয়জনের আকাঙ্ক্ষা কারই মধ্যে থাকে। তাই মনে মনে সলিমা বেগম ব্যথাতুরা। কিন্তু কি করবে? শাদীর ইন্তেজার। ইচ্ছে না থাকলেও স্বামীকে আর বদল করতে পারবে না। আওরতের এই হচ্ছে বিপদ, অথচ শাদীর পূর্বে এই পুরুষটিকে কি ভালই লাগতো।

ঠিক এমনি সময়েই জানতে পারলো সলিমা—তার গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের কোষে কোষে কি এক আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। আনন্দটা মনের পরতে পরতে এমনি কানাকানি হয়ে উঠলো যে, সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, স্বামী আসবে রাত্রির প্রথম প্রহরে—তখন পর্যন্ত এই সংবাদ বক্ষের সীমিতে ধরে রাখাই মুস্কিল হবে।

এত্তেলা পাঠিয়ে দিল। জরুরী তলব। এখুনি না এলে নয়া বেগমের গোসা হবে।

বৈরাম খান কখনও সলিমার কাছ থেকে এমনি তলব পান নি। রাজকার্যে গভীরভাবে ব্যস্ত ছিলেন। মীর আর্জের কাছ থেকে পত্নীর এত্তেলা পেয়ে মুচকি হেসে একবার জরুরী কাজগুলির দিকে তাকালেন, তারপর সূর্যাস্তের পূর্বেই সেরেস্তা থেকে বেরিয়ে রৌশন-আধেরীর পথ ধরলেন।

তখন তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি, এমনি সুসংবাদ। ভাবছিলেন, আওরত দিল্। হয়তো কোন খোয়াবে দিল্ ধড়ফড় করেছে, এত্তেলা পাঠিয়েছে। গেলে কাছে এসে বুকের মাঝে গণ্ড পেতে দিয়ে সোহাগ নেবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে খানসাহেব রৌশন আধেরীর মধ্যে প্রবেশ করতে ছুটে এল সলিমা মেঝেতে ওড়না লুটোতে লুটোতে। এসে বুকের মাঝে ছোট্ট মাথাটি পেতে দিয়ে লাজরক্তিম চোখে মৃদু

হেসে বললো—এক্ আচ্ছি খবর আজ শুনায়েঙ্গে। কিন্তু পরিবর্তে তুমি আমাকে কি দেবে বলো?

বৈরাম খান পত্নীর এরূপ আচরণে বিস্মিত হলেন। বুঝে উঠতে পারলেন না, কি সে খবর?

শুধু বললেন—আমার তো আর কিছুই নেই বিবি অদেওয়ার। বেশ, বলো আর তুমি কি চাও?

অনেক, অনেক দৌলত। যে দৌলত ব্যয় করলেও কোনদিন শেষ হবে না।

বৈরাম খান ঘাড় নেড়ে বললেন—বেশ, চেষ্টা করবো। এবার বলো কি সে সুসংবাদ?

আমি অন্তঃসত্বা। বলতে গিয়ে কে যেন সলিমার রক্তিম মুখের ওপর আবীর ছড়িয়ে দিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেতে সে মাথা নত করলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে বৈরাম খানের মেজাজ পরিবর্তিত হল। তিনি দারুণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তারপর বললেন—সাচ্।

'কি বার্তা শুনাইলে প্রিয়া এই বান্দাকে
আনন্দ রাখিব কেমনে, বলো দেখি মনে'

হঠাৎ আনন্দের আতিশয্যে খানসাহেবের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কবিতার ছত্র বেরিয়ে এল।

সলিমা শুধু চমকে উঠলো না, বৈরাম খান নিজেও চমকালেন। সঙ্কুচিত হয়ে সলিমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভস্বরে বললেন—আনন্দটা সহ্য করতে পারি নি, তাই বেরিয়ে এল। তোমাদের কাছ থেকে শুনে শুনেই আমার শেখা।

সলিমা তখন কি বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। এই স্বামীকে কিছুদিন ধরে রসহীন বেরসিক কামবক্ত বলে মনে মনে তাচ্ছিল্য করে আসছে। আজ সেই স্বামীই তাকে অবাক করে দিয়ে কাব্যরস পরিবেশন করলো।

এখন যেন তার মনে হচ্ছে, তার সংবাদের চেয়ে বুঝি স্বামীর সংবাদের গুরুত্বই বেশী। স্বামীকে যতখানি সে চিনেছে, তার চেয়ে আরো অনেক চেনা বাকী আছে।

এইসময় বৈরাম খান বিব্রত হয়ে সলিমার কাছ থেকে পালানোর জন্যে বললেন—বহুৎ সুকরিয়া সলিমা বেগম। আমি আজ বহুৎ খুশ হয়েছি। এখন যাচ্ছি, পরে আসবো, অনেক কাজ ফেলে এসেছি।

সলিমা বিদায় দেবার পূর্বেই খানসাহেব দ্রুত অদৃশ্য হলেন।

খুশীতে সলিমার দুটি চোখের রোশনাই জ্বলে উঠলো। রাত্রিতে সে তার শোধ তুললো। তার আগে এসেছিল তার কক্ষে কটি সোনার রেকাবে করে অনেক মণিমুক্তা, হীরাজহরৎ, মূল্যবান বসন খানা ইত্যাদি। এ যে তার খুস্ খবরের নজরানা বুঝতে পেরেছিল সলিমা। স্বামীর দর্দ ছিল একটিও তার বাচ্চা ছিল না বলে। অন্য বেগমগুলির পেটে বাচ্চা এল না বলে খানসাহেব তাদের ত্যাগ করেছে। বাচ্চার জন্যে খানসাহেবের দিলের মাঝে বড় দুখ্।

রাত্রে তাই আসতে সলিমা খানসাহেবকে বললো—তোমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে তো!

খানসাহেব তখনও যেন কি ভাবছিলেন? উত্তর দিতে তাই তাঁর বিলম্ব হল, বললেন—কি যে খুশী হয়েছি, তোমায় বোঝাতে পারবো না। এতদিনে যেন আমার বুকের জ্বালা কিছু কমে গেল। মনের ইচ্ছে, দুনিয়াতে আমার কিছু অধিকার আছে। আমার সৃষ্টি দুনিয়াতে আমার নাম রাখবে।

সে রাত্রে খানসাহেব অঢেল সরাব পান করলেন। খুশির সরাব। যে সরাবের মৌতাতে দেহের অনুতে অনুতে খুশির হিল্লোল বয়। অন্যদিন পান করতেন জ্বালা নিবারণের জন্যে ও কামনা উচাটনের জন্যে। সলিমার উত্তপ্ত দেহের বাঁকে বাঁকে

যে বিদ্যুতের স্পর্শ, সেই বিদ্যুতের বহ্নির সাথে মিতালীর জন্যে অঢেল সরাবের মাতোয়ারা।

আজ আর পৌরুষ জাগ্রত করবার কোন প্রয়োজন নেই। তার পৌরুষের স্বীকৃতি সলিমার গর্ভের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। আওরত ধরেছে তার পৌরুষের স্বীকৃতি—তাকে আরো আদর, সোহাগ দিতে হবে। যে সোহাগ কোনদিনও কেউ পায় নি।

সে রাত্রে খানসাহেব এতটুকু নিদ্ গেলেন না। সলিমাকে নানাভাবে সোহাগ দান করে রাত্রির শেষ প্রহর পর্যন্ত জেগে থাকলেন।

সলিমা বললো—খানসাহেব নিদ্ যাও। দিনমানে তবিয়ৎ খারাপ লাগবে।

নেহি, আজ আমি নিদ্ যাব না। এ রাত মেরে খুশিকে রাত। এ রাতে মেরে মেহেবুবাকে পাশে নিয়ে আসমানের চাঁদোয়া রোশনী দেখবো। তুমি আমাকে দিয়েছ ইজ্জত। তুমি আমাকে দিয়েছ সিংহাসন। আর আমি তোমায় কিছু দেব না!

এই রাতের খানসাহেবকে কেউ দেখলো না, শুধ্ দেখলো একজন, সে সলিমাবেগম। বৈরামখানের নতুন বেগম।

তাই বৈরামখান তখন অন্য মেজাজে অন্য মনে অবস্থান করছিলেন। আর ভাবছিলেন, কেন সম্রাট এ সময়ে গোসা করে রাজপুরী ছেড়ে চলে গেল? ছেলেমানুষ না হলে কি এমন কাজ করে?

এদিকে তখন হামিদাবানুর কক্ষে হাকিম এসে দাওয়াই বাতলাচ্ছে।

হামিদাবানু চিকের আড়ালে অবস্থান করছেন, সামনে বাঁদী হাকিমকে রোগ বাতলাচ্ছে।

হামিদা বিরক্ত হয়ে বলছেন—দাওয়াই জরুরৎ নেই। আমি ভাল আছি। বেটা ফিরে এলে আমাকে জলদি খবর দিবি।

হাকিম তারপর চলে গেল।

হামিদা তখন শুয়ে শুয়ে ভাবছেন—তবে কি বেটা জীবন কোরবাণি দিয়েছে? তাহলে আমার মউৎ কেউ আটকাতে পারবে না। থাক্ পড়ে এই অন্ধকারের জৌলুস। দৌলতের আকর্ষণ থেকে সরে গিয়ে মৃত্যুকেই আপন করতে হবে।

শুধু আসে চোখে জল। সে জল যে কিছুতে রোধ হয় না। কিছুতে না। চোখ দুটি যে দৃষ্টি হারাতে বসেছে। রোতে রোতে আঁখোকে রোশনী চল্ যাঁ্যাতে হেঁ।

মনে হচ্ছে চোখের এই জ্যোতি চিরকালের অন্ধকার নিয়ে আসবে। আর রোশনী থাকবে না। আর জ্বলবে না দিনের সেই অত্যুজ্জ্বল সূর্যরশ্মি, রাত্রের জ্যোৎস্না ধারা মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে এনে দেবে আঁধারের প্রতিছায়া। তাই যদি আসে আসুক, তবে চেতনা কেন জেগে থাকবে? চেতনা বিলুপ্ত হলেই তো সব শান্তি। তখন স্বামীর বিচ্ছেদ, পুত্রহারার বেদনা—আর মনে যত কামনা বাসনা আছে সব লয় হয়ে যাবে।

মন বলছে আকবর আর আসবে না। নিজের পুত্রকে তিনি ভালভাবেই চেনেন, একবার বীণের টঙ্কার ছিঁড়ে গেলে তা আর জোড়া লাগে না। আকবরের মনের তার কেন ছিড়লো? কি তার হল? কোন্ বেদনায় সে পাতালের হিম গহ্বরে সজ্ঞানে প্রবেশ করলো? তার মনে কি একবারও রাজৈশ্বর্যের লোভ জাগে নি! দৌলতের ওপর তো সবারই লোভ হয়। এ কার পুত্র তাঁর গর্ভে এল? এমন নিরাসক্ত মানুষ তো জীবনে দেখা যায় নি। স্বামীর মধ্যেও ছিল বৈভবের লোভ, তাঁর চোখের নীচে সর্বদা সে দেখেছে লালসার রঙীন চিহ্ন। তাঁরই রক্ত শরীরে নিয়ে

পুত্র একি নিদর্শন প্রকাশ করলো? তবে কি সে মায়ের রক্তধারা অনুসরণ করেছে?

কিন্তু হামিদা কিছুতেই নিজের মনের নিরাসক্ত রূপ দেখতে পেলেন না। তাঁর মনে হল, তিনি লোভের সোপানশ্রেণীতেই এখনও ঘোরাঘুরি করছেন। এখনও তাঁর মধ্যে আছে অদৃশ্য স্পৃহা। যদি লোকলজ্জা না থাকতো, তাহলে হয়তো পঙ্কিল পথেই এগিয়ে যেতেন।

এইতো সেদিন, সেই রাজপুত লেড়কীর বিনিময়ে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন। যদি তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খানসাহেব এগিয়ে আসতেন?

হয়তো সেই পাপেই আজ এই অধোগতি। এখনও যদি কেউ তাকে জোর করে অধিকার করে, তিনি বলপ্রয়োগ করতে পারবেন না।

কিন্তু পাপ কি? অন্দরমহলের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রত্যহ তো কত মলিনতা জমে উঠছে! কত আওরত এগিয়ে গিয়ে লালসার শয্যায় শয়ন করছে, তারা কি পাপ করছে? তাদের কি সেই পাপের শাস্তি হচ্ছে? তবে কেন তার জন্যেই বা এই শাস্তি নির্দিষ্ট হয়েছে!

কেমন যেন আর কিছু হামিদা ভাবতে পারলেন না। কেমন যেন তাঁর মনে এল, এবার সব ভাবনার শেষ।

পুত্র যখন হারিয়ে গেছে, তাঁরও শেষ যবনিকা নেমে আসবে।

বহুদিন তিনি বাইরের আলোর জগতে যান নি, একটিবার প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যে দেয়ালের জাফরীর কাছে সরে গেলেন। কতকগুলি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে আসমানের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। কটি রঙীন পারাবত শূন্যে চক্রাকারে ঘুরছে। তারা গোল হয়ে আবর্ত সৃষ্টি করে করে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। দূরে অন্যাংশে যখন চলে যাচ্ছে, জাফরীর ভেতর দিয়ে তাদের আর দেখা

যাচ্ছে না। আবার যখন চোখের সীমানায় আসছে, তখন সেই পারাবতের চক্রাকারের আবর্তন, দৃষ্টিপথে আসছে। সূর্যের প্রতি-ফলনে সেই ক্রীড়াচঞ্চল পারাবতগুলি দেখে হামিদার মানসিক চাঞ্চল্য যেন আরো বেড়ে গেল।

আকবরের পোষা এই পারাবতগুলি। প্রাসাদেরই একটি অংশে গম্বুজের ছাতের খিলানে তাদের বাসস্থান। খিদমতে আছে ফরিদ। ফরিদকে বিশ্বাস করে আকবর। ফরিদ নিজেই কেমন যেন পারাবতের মত। তবে পারাবত বকবকম করে আর ফরিদ নিঃশব্দে থাকে। ঠিক বিপরীত।

হামিদা ফরিদকে অনেকবার দেখেছেন। ছেলেটি বাল্যকাল থেকে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত, এখন যুবক হয়েছে। মরদের তাকত শরীরে পেয়েছে, কাজ সেই একই। রাজকুমারের পারাবতের পাহারা, পরিচর্যা, এমন কি পারাবতদের আস্তানার কাছেই তাকে সর্বদা থাকতে হয়।

লোকটি কেমন যেন আজও শিশু। 'এই সেদিনও দেখেছেন হামিদা। আকবরের চেয়ে বেশ কিছু বয়সে বড়। অথচ মরদের মত সিনা নেই। চোখ দুটি কেমন যেন ভাবলেশহীন। কেমন যেন ঐ পারাবতের মত আবর্তে চোখদুটি সর্বদা ঘোরে।

হামিদার সেদিন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল—ফরিদ, তুমি জিন্দা আছো তো!

আজ সেই ফরিদকে বড় মনে পড়ছে। কেন মনে পড়ছে তিনি জানেন না। আকবর নেই, অথচ লোকটা কেন যে এখনও পারাবত উড়িয়ে চলেছে, তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। পারাবতগুলিকে বন্দীজীবন থেকে মুক্তি দিয়ে সরে পড়লেই তো পারে কিন্তু হামিদা তখন সে সবকিছু ভাবছিলেন না, ভাবছিলেন এমন এক ঘটনা যা শুনলে চমক জাগে।

আকবর নেই। ফরিদ আছে। শিবালী নেই। আলিমন আছে।

হঠাৎ আলিমনের কথা মনে আসতে তিনি তার খোঁজ নেওয়ার জন্যে ছটফট করে উঠলেন। এতদিন আলিমনের কোন সন্ধানই নেওয়া হয় নি। এমন কি তাঁকে কেউ জানাতে সাহস করে নি।

তবে কি আলিমন পালিয়েছে? কিম্বা সে ঢুকে পড়েছে ঐ রঙ্গীন জেনানামহলের লালসার পঙ্কে?

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ডাকলেন—বাঁদী, আলিমনকে এখানে নিয়ে এস।

সম্রাজ্ঞীর হুকুম, কিছু সময়ের মধ্যেই পালিত হ'ল।

আলিমন ধীরপায়ে এসে একান্ত ভীরুমনে আম্মিকে তসলিম পেশ করলো।

একদৃষ্টে হামিদা সেই সদ্যফোটা কুসুম তনুটির দিকে কেমন এক অনুসন্ধিৎসু চোখের প্রতিফলন সৃষ্টি করলেন। এই ফসলটিও সযত্নে বর্দ্ধিত হচ্ছিল পুত্রের ভোগের জন্যে। একদিন তিনি এর সঙ্গেও পুত্রের শাদী দিতেন। কিন্তু আজ পুত্র নেই, সুতরাং এর মূল্য কি? একে আর সযত্নে লালন করে কি হবে?

পদ্মকলির মত চোখের দুটি পাপড়ি আনত করে আলিমন দাঁড়িয়েছিল। সে বোধ হয় ভাবছিল, আম্মি তাকে কেন হঠাৎ সেলাম দিলেন? ইদানীং তার আম্মিকে বড় ভয় করে। বেটা চলে যাবার পর একদিনও সে আম্মির কাছে আসে নি। তাকে ডাকেনি, আর সে ডাকও প্রত্যাশা করে নি। আম্মি যেন কেমন পালটে গেছে দূর থেকেই শুনেছিল। সেই থেকেই তার ভয়।

তাছাড়া তারও কানে গেছে শিবালীর সেই ঘটনা। সেই রাজপুত লেড়কী, যাকে নাবালক সম্রাট এনে আম্মির হেফাজতে জমা দিয়েছিল।

আম্মি তাকে চাবুক মেরে শেষ করে দিলেন। দোষ তার কি ছিল আলিমন জানে না? তবে তার সেই থেকেই আম্মিকে দারুণ ভয়।

আজ তাকে ডাকতে সে তাই মনে মনে ভাবছিল, তবে কি তাকেও আম্মি এমনি চাবুক মেরে শেষ করে দেবে? বিচিত্র নয়। গোস্তাখি কিছু থাকুক না থাকুক, মনে হয় বেটার জন্যে রাজমাতার দেমাগ বিগড়ে গেছে।

হামিদা তখন ভাবছিলেন অন্যকথা। এতদিন অনেক মুসাবিদা করে এই আত্মীয় লেড়কীকে মানুষ করে তুলেছেন। আওরতকে সাবধানে রাখতে যে সর্তকতার প্রয়োজন, তা তিনি পালন করেছেন কিন্তু সে কিসের জন্যে? আওরত ভোগের জন্যেই সৃষ্টি। আলিমনকে অপরের ভোগের জন্যে তিনি পালন করেন নি। কৌন্ এক নওজোয়ান সৈনিক এই প্রস্ফুটিত কুসুমকে দলিত করবে তার জন্যে কোন ইন্তেজারী নয়!

আজ কারো মঙ্গলই তিনি চান না। আকবর যখন নেই, তখন আলিমনের নিষ্পাপ মাসুম রত্ন গোল্লায় যাক্।

হামিদা কেমন যেন সরাবী নেশার এক আচ্ছন্নতার মধ্যে প্রবেশ করলেন। কেমন যেন প্রতিহিংসা! তুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা। কি এক ভয়ঙ্কর ইচ্ছা তার মধ্যে খেলা করে উঠলো। বাইরে তখনও প্রকাশ হয় নি, হলে হয়তো আলিমন আতঙ্কে পরিত্রাহি করে উঠতো।

হামিদা হঠাৎ আলিমনের কাছে সরে গিয়ে কোমলকণ্ঠে বললেন—তেরা দিলসে চিরাগ জ্বলা হ্যায়? রাতমে নিদ্ আতি হ্যায়? সাচ্ বলো। ঝুটি মাত কহো। আমারও এমনি জোয়ানী মন ছিল, ছিল চোখের মধ্যে হাজারো খোয়াবের স্বপ্ন। দিল্ ধড়ফড় করতো। এক্ নওজোয়ান মরদ কো লিয়ে হাজারো রাত চোখে ঘুম আসতো না। আমাকে বল্ তুই, সরম নেহি।

একি কথা বলছেন আম্মি? এ কোন সম্রাজ্ঞী!! এ কোন্ আওরত! একে তো কোনদিন চেনে না আলিমন! এমন সহানুভূতিশীলা রমণী কোত্থেকে এল? আম্মি হঠাৎ পালটে গিয়ে

তার ওপর অনুগৃহীত হয়েছেন। নাকি এতদিন সর্তকতার মধ্যে বন্দীজীবনে বাস করিয়ে মনের মধ্যে অনুতাপ জেগেছে ?

জাগে সত্যিই জাগে তার মনে অনেক স্বপ্ন, হাজারো হাজারো খোয়াব। ইচ্ছে করে, রাতের অপ্সরলোকে অন্তঃপুরের রঙমহলে ঝাড়লণ্ঠনের আলোর ঔজ্জ্বল্যের নীচে নিজেকে মেলে দিতে। শরীরের মধ্যে কি যেন সর্বদা আলোড়ন জাগায় ? বক্ষের মাসুম স্তন্ত আস্তে আস্তে পুষ্টতা লাভ করছে। সেখানে যেন কিসের শিহরণ! কিসের যেন এক জিজ্ঞাসা সর্বদা তাকে কুরে কুরে খায়! শোণিতের মধ্যে কোথায় যেন দারুণ অগ্নিতাপ, সর্বদা শোণিত ফুটছে দেহের শিরার মধ্যে।

তবু সব ভাল লাগে। ভাল লাগে ভোরের নহবত রাগিনী। আব্বাসের শাহনাইয়ের মধুর সুরে ভোরের নিদ টুটে যায়। জাফরীর ভেতর দিয়ে আসমানের নীলে চোখ চলে যায়। সেখানে রঙফেরা শুরু হয়। সূর্যোদয়ের সেই রক্তিম লাজরঙ বুঝি আলিমনেরও গণ্ডের সীমানায়।

এসব কথা অনেকদিনের। এ সব স্বপ্ন প্রতিদিনের কিন্তু সে স্বপ্ন একান্ত নিজের মনের সঙ্গোপনে লালায়িত হয়, কাউকে বলার নয়।

কিন্তু হঠাৎ সেই কথাই আম্মি আজ জিজ্ঞাসা করলেন। আম্মিকে সে শ্রদ্ধা করে এইজন্যে যে, তিনি যদি তার মন গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে না রাখতেন, বোধ হয় কোনদিন সে হারিয়ে যেত। একদিক দিয়ে আম্মি তার আপন মায়ের মত কাজ করেছে। মা আজ জিন্দা থাকলে কি এমনি সর্তকতার মধ্যে মেয়েকে রক্ষা করতেন না ?

সেই প্রকৃতি বোঝা যায়, সম্রাজ্ঞীকে সে জায়গায় চিনতে তার কষ্ট হয় নি কিন্তু আজ এই আকৃতি দেখে সে কিছুতে চিনতে পারলো না।

আবার তার সেইমুহূর্তে মনে পড়লো, রাজপুত লেড়কী চাবুকের আঘাতে মৃত্যুকে বরণ করেছে। সেই চাবুক এই রমণীই মেরেছে। মাত্র তিনদিন আগে সেই ঘটনা ঘটে গেছে। সেই কথা চিন্তা করে আলিমনের সমস্ত দেহটি অজানা এক ভয়ে কেঁপে উঠলো।

হামিদা এইসময় আবার কোমলকণ্ঠে বললেন—কি চুপ করে আছিস্ কেন? বলতে দ্বিধা কিঁউ?

এইসময় আলিমন ভীতকণ্ঠে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলো—এ বাত কেন জিজ্ঞেস করছেন আম্মি?

হঠাৎ হামিদা দারুণ সহজ হয়ে গিয়ে সহজস্বরে বললেন—যদি তোর অভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণ করবো।

চমকে উঠলো আলিমন।

তারপর বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আম্মি!

হামিদা যেন শানিত ছুরিকা শানিয়ে তুললেন, একটু স্বরে রূঢ়তা সৃষ্টি করে বললেন—আম্মি নয়, সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীর হুকুমং তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

না, না আমি কিছু চাই না। আলিমন বুঝতে পারলো যেন সম্রাজ্ঞীর কৌশল, বুঝে সে মুখে হাত চাপা দিল। দু' হাতের তালুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো।

আলিমনের কান্নায় যেন হামিদা আরো কঠিন হলেন, বললেন—রোনে কিঁউ? কাঁদছো কেন? তুমি কি মনে মনে মরদের আকাঙ্ক্ষা কর না? আমি তোমায় সেই নওজোয়ানের সন্ধান দেব। সুখ ঔর সোহাগ তুই পাবে। যাও ঘরে যাও।

আলিমন হঠাৎ হামিদার পায়ের ওপর বসে পড়লো।

আম্মি জিন্দেগী কোরবাণী দেব, ইজ্জত হারাতে কোশিস কর না। আমি মজবুর।

হামিদার মনে কোন কোমলতার স্পর্শ লাগলো না। তিনি

কেমন যেন ব্যঙ্গস্বরে বললেন—তুনিয়া কিতনা হাসিন। ইজ্জত কিসিকে লিয়ে? আওরতকা ইজ্জত সিসাকা মাফি। মহালকী অন্দরমে চুপ চুপসে দেখো, সব মালুম হো য্যায়গা। যাও আপনা ঘরকা অন্দরমে যাকে আপনা সুরতকা উপর চেকনাই লাগাও। আজ মেরা ফর্জ হ্যামি পূরণ করবো।

আলিমন দেখলো, আম্মি তাঁর কর্তব্য মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন। তাঁকে হাজার অনুরোধ করলেও কর্তব্যচ্যুত হবেন না। এ রাজপুরীর প্রতিটি মানুষেরই দৃঢ়তা। মনে একটা কিছু ইচ্ছা এলেই হয়। সে ইচ্ছা থেকে কেউ কখনও কাউকে টলাতে পারবে না।

কিন্তু তার ইজ্জত নিয়ে কেন এই ছিনিমিনি খেলা? রাজকুমার গোসা করে প্রাসাদ ত্যাগ করতে অপরাধ হল তাদের?

তবু একবার শেষ চেষ্টা।

আলিমন তখনও হামিদার পায়ের কাছে বসেছিল, জলভরা দুটি ব্যাকুলদৃষ্টি তুলে একবার শেষ আবেদন জানালো—আম্মি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমার পায়ে পড়ে ভিক্ষে চাইছি আমার ইজ্জত। আওরত মরতে দ্বিধা করে না, কিন্তু—।

হামিদা বিরক্ত হয়ে বললেন—যা, যা, বকবক করিস নি। আমি তোকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করে তুলেছি। আমার যা খুশি হবে তাই করবো। কারুর কোন কথা কোনদিন শুনিনি, আজও শুনবো না। মেরা হুকুম, মেরা ফর্জ।

এই কে আছিস্? হামিদা হঠাৎ পরিচারিকাদের তলব করলেন।

বাঁদী এসে কক্ষে ঢুকলে তিনি সম্রাজ্ঞীর মত হুকুম করলেন—আলিমনকে তার কক্ষে দিয়ে এস।

আলিমন তবু একবার সম্রাজ্ঞীর দিকে ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকালো কিন্তু হামিদা মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন।

বাঁদী আলিমনকে নিয়ে চলে গেলে তিনি কেমন যেন মনের মধ্যে এক সান্ত্বনার স্পর্শ পেলেন! মনে হল, এই স্বভাবের মাঝে বুঝি তার স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি নিজেকে এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন। মনে কোন দয়ার লেশমাত্র নেই, আলিমনের দিকে তিনি একবারও তাকান নি। তাকালে পাছে কাতর হয়ে পড়েন! না, কোন কাতরতা নেই।

তাঁর জীবন যখন বরবাদ হয়েছে, সমস্ত আশাবাদী জীবন বরবাদ করে দেবেন।

আবার বাঁদীকে ডাকলেন, ডেকে পারাবত প্রহরী ফরিদকে ডাকতে পাঠালেন। ফরিদ, ফরিদই হবে সেই মরদ যে আলিমনের মাসুম কুসুমের বুকে প্রথম চিহ্ন অঙ্কিত করবে। কেমন যেন অট্টহাসি করতে ইচ্ছা জাগলো। প্রতিহিংসা।

কিন্তু কার ওপর এই প্রতিহিংসা?

ফরিদ এসে দাঁড়ালো।

সেই নিঃশব্দ প্রহরী। কেমন যেন ভাবলেশহীন, নিরুৎসাহ দুই চোখ। শিরদাঁড়া ভাঙা কালো মিশমিশে একটি ভয়াল চেহারা। বেঁচে আছে কি মরে গেছে, দেখলে বোঝা যায় না। মরদের চেহারার মধ্যে কোন বলিষ্ঠতা নেই। তার চোখের দৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন নেই যা দেখে তার মনের কথা বোঝা যাবে।

হামিদার সামনে দাঁড়িয়ে সে বার বার একটি হাত উপর দিকে তুললো আর নামালো, অর্থাৎ নিঃশব্দে সে সেলাম পেশ করলো।

হামিদা সেই মুহূর্তে আলিমনকে ভাবলেন। দুধে আলতা বর্ণের ওপর মিশকালো ধূসরতার মিলন। ফরিদের ঘুমন্ত পৌরুষ কি আলিমনের যৌবন দেখে জাগ্রত হবে না?

কোথায় যেন একটি বাজপাখী বিশ্রী শব্দ করে ডেকে উঠলো।

হামিদা ডাকলেন—ফরিদ !

জী, মালকিন।

আমার চোখের দিকে তাকাও।

ফরিদ তাকাবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না, তার যে শিরদাঁড়া ভাঙা। তাছাড়া তার দৃষ্টিতে কোন তীক্ষ্ণতা ছিল না, কেমন যেন চিড়িয়ার মত ভীরু দুটি চোখ।

ফরিদ তুমি মরদ ?

জী, বেগমসাহেবা।

হঠাৎ গর্জে উঠলেন হামিদা। না, তুমি মরদ নও।

ফরিদ ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

হামিদা ফরিদের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন—প্রমাণ দিতে পারবে ?

ফরিদ মাথা দোলাতে লাগলো।

তাহলে আজ রাত্রে আমার লোকের সঙ্গে চলে আসবে। যাও নিকাল যাও।

ফরিদ ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কক্ষ থেকে পলায়ন করলো।

ফরিদ চলে গেলে তিনি মনে মনে কেমন যেন পৈশাচিক হাসি হাসলেন। তারপর বাঁদীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, আজ রাত্রি দু'প্রহরের পর ফরিদকে এনে আলিমনের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে দেবে। আলিমনের দরজার বাইরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করবে, যেন সে কোন অবস্থায় পালাতে না পারে।

তারপর দিনের সূর্য বিদায় নিয়ে রাত্রি এগিয়ে এল। যত রাত্রি এগিয়ে চলে, কক্ষের মধ্যে হামিদা উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করেন।

রাত্রি যে আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ হয়ে আসছে তা তিনি বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন গভীরতার গাঢ় সুষুপ্তি তমিস্রা নেমে

আসছে অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে। এতক্ষণ কিছু কোলাহল ছিল, সরাবী আওরতের বেভুল সওয়াল মর্মরগাত্রে প্রতিধ্বনি তুলে সোচ্চার হয়েছিল। গীতবাদ্য শোনা যাচ্ছিল, ঘুঙুরের রুনুঝুনু ধ্বনি হর্ম্যতলের কার্পেটে নরম পায়ের ছন্দ সৃষ্টি করছিল। তার মধ্যে কারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাও ছিল। কে কাঁদে জানার দরকার নেই। জেনানা দারোগা সবই জানে। আফিমের জোরালো মৌতাতে মতিবিবির কান্না চিরকালের। রাত হলেই যেন কান্নাটা তার বুক ঠেলে বের হয়ে আসে। বেরিয়ে এসে গড়িয়ে গড়িয়ে অলিন্দ দিয়ে চলে।

এই রাত্রের প্রথম প্রহরেই দেউড়ির ওপর চাপা কথাবার্তা। কার কক্ষে যেন নতুন ইসারা সৃষ্টির জন্যে কক্ষে কক্ষে একটা ষড়যন্ত্র। চুপ, ওকে বাঁচতে দাও? ওর যৌবন যে হারেমের চারদেয়ালের মাঝে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাত্র একরাত্রির একটি মুহূর্ত, তোমার মধ্যেও কি কোন বাসনা নেই? জেনানা দারোগো রূপমের কাছে অনুরোধ।

রূপম অনুরোধ রেখেছে। সেও যে আওরত, তার দিলেও মাঝে মাঝে সাহারার ইঙ্গিত জেগে ওঠে। এমনি প্রায়ই বাইরে থেকে লোক মহলে এসে ঢোকে, তারপর নিঃশব্দে কখন নতুন এক জগতের চিত্র সৃষ্টি করে চলে যায়। হয়তো সে আর কোন-দিনও আসে না। তাকে হয়তো কেউ মনেও রাখে না। তার আগমন চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। কিম্বা চোখে কাপড় বেঁধে নিয়ে আসে তারপর নিয়ে চলে যায়।

এমনি চলে প্রায়ই বিক্ষুব্ধ আওরতের স্পৃহা মেটাতে অভিযান। স্পৃহা নয় জীবন। জিন্দিগী। এই জায়গায় বহু রমণীর একসাথে ষড়যন্ত্র একত্রীভূত হয়। তারা আর পরস্পরকে ঈর্ষা করে না। উভয়ের নসীব যে একই সুরে বাঁধা। উভয়ের যে চাহিদা একই, তাই তারা সম্মিলিত চেষ্টায় মিলে যায় উভয় উভয়ের আকাঙ্খা পূরণ করতে।

হামিদা সবই জানেন কিন্তু ওদের সঙ্গে মিতালী করতে পারেন না। ওদের সঙ্গে মিতালী করতে পারলে যে এই বিরাট চিন্তা তাঁকে অব্যাহতি দিত—তিনি নেমে যেতে পারতেন, তুচ্ছ এক কামনা বাসনার সোপান থেকে সোপানে—সে কথা ভেবেই তিনি আজও আহত।

আজ কিন্তু সে সব কথা তার মনে ছিল না। শুধু রাত্রির প্রহরের দিকে কান দুটি পেতে উত্তেজনার মুহূর্তে এসে পৌঁছেচেন। অন্তঃপুরের কোলাহলের দিকে শুধু তাঁর কান গেছে সময় নির্ণয়ের জন্যে। কোলাহল থামলে চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা নেমে এলে তাঁর কান দুটি আরো সজাগ হয়ে ওঠে।

তাঁরই মহলের মধ্যে তিনটি কক্ষের পরের অংশে আলিমন থাকে। মাত্র কটি মর্মরময় দেওয়ালের ব্যবধান। মনে হল যেন তিনি সে ব্যবধান অতিক্রম করে আলিমনের রুদ্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

প্রাসাদের গম্বুজশীর্ষে নহবতখানার উঁচুমঞ্চে প্রহর ঘোষণা হল। রাত্রি এক প্রহর অতিবাহিত হবার ধ্বনি অনেকক্ষণ চলে গেছে, এখন দুই প্রহরের ধ্বনি বিঘোষিত হবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফরিদ শিরদাঁড়া ভাঙা কুব্জদেহ নিয়ে জুলজুলে চোখে তারই কক্ষের কাছ থেকে আলিমনের রুদ্ধকক্ষের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

সেই কথা ভেবে হামিদার একটি কান প্রহর ঘোষণার দিকে ও অন্যটি তাঁরই কক্ষের বাইরে অলিন্দের হর্ম্যতলে পদশব্দ শোনার জন্যে মেলা ছিল।

উত্তেজনার মুহূর্তে হামিদা ভাবতে লাগলেন—আলিমন কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে? নিশ্চিন্তে কোমল শয্যার বুকে অবগাহনের নিদ্রা! তবে মনে হয় সে ঘুমোয়নি। সে কাঁদছে, আলুলায়িত কেশদাম হর্ম্যতলে মেলে দিয়ে কার্পেটের ওপর শুয়ে পাগলের মত কাঁদছে।

কত খেয়াবের রঙীন বুদ্বুদ নিয়ে সে মাসুম ইজ্জতকে দৌলতের মত পাহারা দিয়ে চলেছে। আজ খেয়ালী সম্রাজ্ঞী তা লুট করবেন।

হামিদা কেমন যেন নিজের দেহের বস্ত্রের আবরণ ভয়ে ভয়ে টেনে দিলেন। যদি ফরিদ ভুল করে তাঁরই কক্ষে প্রবেশ করে? তাঁর অবশ্য মাসুম ইজ্জত নয় তবে ঐ কামবক্ত ফরিদ—না, না এমন লালসা এখন আর তাঁর মধ্যে নেই ?

উত্তেজনা তাঁর সমস্ত শরীরকে ঘর্মে সিক্ত করেছে, মাথার মধ্যে কিসের যেন দামামা বেজে চলেছে, তবু ভাল লাগছে। সব ধ্বংস করবার মুহূর্তে এসে কেমন যেন অন্ধকারের গহ্বরে প্রবেশ করতে করতে উল্লাস। আলিমনকে নিয়ে এ খেলায় বেশ আনন্দ জাগছে। যে ফরিদ মরদ কিনা সন্দেহ হয়, সেই ফরিদের মাঝে মরদের উত্তেজনা, আর আলিমন যখন মনে মনে এক সুপুরুষ রাজকুমারকে আশা করছে, সেই সময় কিম্ভুত কিমাকার এক ফরিদ গিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করবে। কিন্তু যদি ফরিদ পৌরুষহীন এক অপদার্থ মরদ হয়? যদি আলিমনকে নষ্ট করবার কোন ক্ষমতাই তাঁর না থাকে ?

তবে আজই মৃত্যু হবে তার। পুরুষহীন সেই অপদার্থকে সর্পের পিঞ্জরার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আর আলিমনকে ছুঁড়ে দেবেন সরাবপ্যায়ী একদল উন্মত্ত সৈনিকের ভেতরে শকুন যেমন মাংস পেলে ছিড়ে খুঁড়ে খায়, তেমনি নারীমাংস ভক্ষণ করবে সেই সিংহসদৃশ উন্মত্ত সৈনিকরা।

কিন্তু সে পরিকল্পনা পড়ে।

চুপ, হ্যাঁ হ্যাঁ পদশব্দ ভেসে আসছে। এইসময় প্রাসাদ গম্বুজে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে অনুরণিত হতে থাকলো।

উল্লাস, হ্যাঁ উল্লাস। যে কুসুম আকবরের জন্যে সযত্নে রক্ষি

ছিল, তার বিহনে সে কুসুম দলিত করা হচ্ছে। অন্য কেউ যাতে ভোগ না করতে পারে তার জন্যে এই ষড়যন্ত্র।

হামিদার ইচ্ছে করলো আলিমনের কক্ষের মধ্যে ছুটে যেতে। আওরত তার মাসুম ইজ্জত হারাবে। দস্যু তার ইজ্জত কেড়ে নেবে। সে দস্যু তারই হুকুমে বাধ্য নফর, অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে মৃত্যু অনিবার্য।

আলিমনের কক্ষের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তি যতখানি পারলেন, প্রেরণ করলেন।

নিজে আওরত, বোঝেন শাদির ইন্তেজারের পূর্বে ইজ্জত গেলে আওরতের অবস্থা কি হয়? তাই আলিমনের বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করে উল্লসিত হলেন।

হামিদা যখন আলিমনের কক্ষের দৃশ্য অনুমান করছেন, সেইসময় আলিমনের কক্ষের মধ্যে সে এক অচিন্তনীয় দুর্লভ ঘটনা।

জোয়ানী মাসুম কিশোরী, সবে যার কুসুমটি কোরক থেকে চোখ মেলেছে, সে ঘুমোয়নি। নিশ্চিন্তে সুকোমল শয্যাগহ্বরে শুয়ে আরামের সুখস্বপ্ন দেখেনি। সে দুশ্চিন্তায় দ্বিপ্রহর ধ্বনির অপেক্ষায় ছুরিকা হস্তে কক্ষের মধ্যখানে দণ্ডায়মান।

আত্মরক্ষার জন্যে একখানি বক্রাকৃতি ছুরিকা হাতের মুঠিতে ধরে আততায়ীর জন্যে অপেক্ষামানা।

কোন প্রসাধনের ইন্তেজারিতে নিজেকে লোভনীয় করেনি। সাধারণত যে প্রসাধন আলিমনের সর্বদেহ ঘিরে থাকে আজ তাও নেই। আজ ইচ্ছে করে সে যেন নিজেই রূপহীনা হতে চেয়েছে। কেশবিন্যাস নেই, চুলগুলি কেমন যেন এলোমেলো। চোখে সুর্মা নেই, ঠোঁটে তাম্বুল রঙ নেই। গণ্ডে লাজরঙ নেই। পোষাকে চেকনাই নেই। অন্যদিন হলে রঙীন কাঁচুলীর বন্ধনটা সুক্ষ্ম মসলিনের কামিজের আড়ালে লোলুপ হয়ে উঠতো। এখনও আলিমনের

বক্ষসৌন্দর্য যে পরিপূর্ণ লাভ করে নি তার চাক্ষুস প্রমাণ ছোট্ট বুকের প্রান্তসীমায়।

সেই আলিমনকে আজ হারাতে হবে ইজ্জত। ছিনিয়ে নেবে এক সায়েদ বেওকুব শয়তান মরদ। যে আম্মির ফরমায়েসীতে হুকুম তামিল করতে আসছে। বেওকুব সে মরদ। দোষ অবশ্য তার কিছু নেই, সে নফর হুকুমের দাস, হুকুম তামিল না করলে জিন্দা এ প্রাসাদে থাকবে না!

কিন্তু তাকেই আজ আলিমন বধ করবে। হ্যাঁ যে বৃদ্ধ জংলী লোভীর মত ছুটে আসছে তার ইজ্জত ছিনিয়ে নিতে—তার খুনে হাত রাঙা করবে।

এই ভেবে কেমন যেন পাগলের মত আলিমন ছুরিখানা হাতের মুঠিতে ধরে রুদ্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বেশক সেই হারাম শয়তান নিশ্চয় লোভীর মত ছুটে আসছে।

অন্য সময়ে হলে যে কোন মরদের জন্যে আলিমন কত ইয়াদ করতো। তবে সে শয়তান নয়, সে ঘোড়সওয়ার রাজপুত্র, বলশালী যোদ্ধা, পুরুষচিহ্ন তার সর্ব অবয়ব ঘিরে। তেমন কেউ এসে তার সব কেড়ে নিলেও দুঃখ ছিল না। তার জন্যেই তো এই ইজ্জত সর্তকতার মধ্যে রক্ষিত!

হঠাৎ সেই দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি প্রচারিত হয়ে উঠলো। তার পরেই কক্ষের দ্বারের কাছে কার যেন পদশব্দ এসে থামল।

কক্ষের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল বর্তিকার আলো। ছুটে গিয়ে আলিমন সব আলোগুলি নিভিয়ে দিল। কক্ষের মধ্যে অন্ধকার নেমে এল। বাইরে থেকে জ্যোৎস্নার কিছু আলো জাফরী দিয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করেছিল। কিছু আলোছায়ার প্রতিবিম্ব কক্ষের মাঝে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

আলিমন সেই আবছায়া আলোতে একটি লোককে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে দেখলো। কিন্তু ও কি? এতো কোন বলশালী

সৈনিক পুরুষ নয়! কেমন যেন কুব্জদেহ, বিকৃত পুরুষ। মুখখানা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারের কালো রূপের সাথে সেই কালোবর্ণ যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু দুটি ক্ষুধিত চোখের হায়নার দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ।

আলিমন সেই দুটি ভাঁটার মত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে ছুরিকা উত্তোলিত করলো।

এমনি সময়ে সেই ফরিদ ছুটে এসে তার হাতটি সজোরে চেপে ধরলো।

হামিদা ফরিদের ঘুমন্ত পৌরুষ জাগিয়ে তুলেছিল। এমন কি সম্রাজ্ঞী তাচ্ছিল্যভাবে প্রকাশ করেছিলেন সে মরদ নয় বলে। সেইকথা স্মরণ করেই ফরিদের নিস্পৃহমনে ঘুমন্ত সেই উদ্দাম যৌবন জোয়ারের প্রাবল্য সৃষ্টি করলো। সে ক্ষিপ্ত সিংহের মত প্রবলশক্তিতে আলিমনের হাত থেকে ছুরিকা ছিনিয়ে নিয়ে তুলে নিল আলিমনের দেহটি মেঝে থেকে একটি লঘু পদার্থের মত। এই সময় যদি ফরিদকে হামিদাবানু দেখতেন, তাহলে তিনিও ভয়ে শিউরে উঠতেন। ফরিদ যে বেয়াদপ অপদার্থ কামবক্ত নয় তার প্রমাণ হত সঙ্গে সঙ্গে। সে যে শুধু অক্ষমের মত চুপ করে পারাবতের তদারক করে বেড়ায় না তার প্রমাণ হত।

সিংহের উত্তপ্ত দুই বাহুর কবলে একটি মাসুম আওরতের মাখন নরম ছোট্ট দেহটি। আলিমন কেমন যেন তলিয়ে যাচ্ছে! অগাধ সমুদ্রের এক অসীম অতলে ডুবে যেতে যেতে আলিমন সজাগ হবার চেষ্টা করলো কিন্তু দেহ যেন কেমন দুর্বল অসহায়, অবশ হয়ে সব শক্তি হারিয়ে ফেললো। অক্টোপাসের মত কিসের যেন বিরাট শক্তি সব ভাবনার শেষ করে দিয়ে গ্রাস করে নিল তার সত্তা।

আর এমনি সময়ে ওদিকে হামিদা কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছেন। ভুরু দুটিতে তাঁর হঠাৎ জিজ্ঞাসার রেখা ফুটে উঠেছে। নিস্তব্ধ কেন? আর্ত চীৎকার ভেসে আসে না কেন?

তবে কি তার ভুল হল? ফরিদ এক সক্ষম মর্দানা, আলিমন তাকে দেখে পেয়ার করলো! তাই যদি না হবে তাহলে কেন আলিমনের চীৎকার রাতের স্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে দিল না।

বেইজ্জতের সেই আনন্দ যদি মনে উল্লাস না জাগালো, তবে এর প্রয়োজন কি?

ঠিক এমনি সময়ে রমণী কণ্ঠে এক পরিত্রাহি চীৎকার। মনে হল মর্মর প্রাচীরের ব্যবধান আর নেই। নেই কোন অবরোধ। সব লয় করে দিয়ে রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে নেমে এসেছে চীৎকারের প্রতিটি বিদঘুটে আওয়াজ।

আলিমন যে আত্মরক্ষা করতে পারে নি, এই চীৎকারই তার প্রমাণ। ফরিদ যে পৌরুষহীন কামবক্ত নয়, তারও প্রমাণ এই চীৎকার।,

হঠাৎ কেমন যেন উল্লাসে খুশি হয়ে হামিদাবানু সারাকক্ষময় হাসতে হাসতে পাগলের মত গড়িয়ে পড়লেন।

কেমন? বেটা চলে গেছে বলে সবকিছু ঠিক নিয়মে চলবে? কিছুই হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাবে ঘটবে না? তারই জগতে সব হারালো, আর সকলের সব ঠিক থাকলো! তা যে হল না, আলিমনের চীৎকারই তার প্রমাণ!'

ফরিদ উপযুক্ত পুরুষ। সে সাফল্য লাভ করেছে। মরদের মত কাজ করেছে। তাকে আগামী কল্য কোন পুরস্কারে ভূষিত করতে হবে।

হামিদাবানু পাগলের মত সারা কক্ষময় ছোটাছুটি করে হেসে চললেন। তাঁকে সেই মুহূর্তে এক সাধারণ পৈশাচিক রমণীর মত মনে হল। সম্রাজ্ঞীর সেই গাম্ভীর্য কোথাও নেই। হারেমের কোন একজন অতি সাধারণ ঈর্ষাকাতরা ভাগ্যহীনা রমণী। যেন সরাবী নেশাতে রঙীন হয়ে না পাওয়ার বেদনাতে বিকৃত মস্তিস্ক এক

সাধারণ। প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ করে চলেছে তার নাগালের মধ্যে যা কিছু পাচ্ছে।

এক সময় হামিদাবানু আচ্ছন্ন হয়ে এলেন। না, কোন অনুতাপ নয়। বরং প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার পর যে মানসিক অবস্থা হয়, সেরূপ।

রাত্রি প্রায় শেষের দিকে গড়িয়ে চললো। এ সময় ফরিদ পাশের অলিন্দ দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল, তার পায়ের পরিচিত শব্দ একবার হামিদাবানুকে সজাগ করলো, তারপর আর কিছু মনে নেই। শুধু কান্না ভেসে আসতে লাগলো আলিমনের। সে কান্না বুঝি কোনদিনও শেষ হবে না, এমনি তার বিচিত্র লয়।

•

প্রভাতের ঠিক পূর্বক্ষণে, তখনও আকাশে আলো জাগে নি, শুধু প্রত্যূষের পূর্বাভাষ পূর্বগগনে রঙের তুলি বোলাবার উপক্রম করেছে। ঠিক এমনি সময়ে বাঁদী এসে হামিদাবানুর কক্ষে প্রবেশ করে সেলাম পেশ করলো—বেগমসাহেবা, বাদশাহ আকবর শাহের এত্তেলা এসেছে, তিনি এখন আগ্রাপ্রাসাদে, তিনি কয়েকজনকে আগ্রায় পাঠাবার জন্যে হুকুম দিয়েছেন।

বেটা জিন্দা আছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন হামিদাবানু অচৈতন্য হয়ে একপাশে ঢলে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়লো।

বাদশাহের হুকুম এসেছে বিশেষ করে ফকির নূরউল্লা খাঁ ও মীর আবদুল লতিফ মিঞাকে আগ্রা প্রাসাদে পাঠাতে ও কিছু তয়ফা-ওয়ালির সাথে খুবসুরত যুবতী আওরত।

জ্ঞান ফেরার পর বাঁদীকে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন হামিদাবানু—মেরা পাত্তা কুছ নেহি ভেজা হ্যায়!

জী, নেহি বেগমসাহেবা।

ম্যায় বেটাকা আম্মি হুঁ, হ্যামকো নেই জানে বোলা।

নেহি।

কিন্তু আমি যাবো। তাঞ্জাম বোলাও।

বেগমের কথানুযায়ী হুকুম পালিত হল। তাঞ্জাম সাজানো হল। সঙ্গে বিশজন সশস্ত্র রক্ষী অশ্বে সওয়ার হয়ে প্রহরা নিল। ফকির নূরউল্লা খাঁ ও মীর আবদুল লতিফ সঙ্গে চললেন। আর একজন হামিদার সঙ্গ ছাড়লেন না। পীরমহম্মদ শেরওয়ানী। পীরমহম্মদ এতদিন পদগৌরব হারিয়ে চরিত্রহীনতার কলঙ্ক নিয়ে হামিদারই অনুরোধে রাজপুরীতে বাস করছিলেন, তবে আগের আর সেই গৌরব নেই। তবু কোনরকমে জীবনধারণ করছিলেন কিন্তু হামিদা চলে যাচ্ছেন শুনে তিনিও সঙ্গী হতে চাইলেন। বাদশাহ আকবরের কাছে থাকবার তাঁর বাসনা। কি ভেবে হামিদা তাঁকে নিয়ে যেতে রাজী হলেন।

আলিমনের খোঁজ করলেন হামিদা কিন্তু তাকে প্রকৃতস্থ অবস্থায় পাওয়া গেল না।

আলিমনের জন্যে হামিদার মনের মধ্যে কেমন যেন আপসোস সৃষ্টি হল। বেচারী লেড়কী? আর ক'ঘণ্টা আগে আকবরের পাত্তা

এলে এমনটি তো আর হত না! মেয়েটি জিন্দেগী কোরবানী দিল। ইজ্জত একজনের মানসিক দৈন্যতার জন্যে হারিয়ে ফেললো।

শিবালীর কোরবাণীর জন্যে তাঁর কোন আপসোস নেই! তাকে ষড়যন্ত্র করে চুরি করেছিল বলে তার ইজ্জত গেছে। সেই ইজ্জত-হারা লেড়কীকে শেষ করেছেন তিনি শুধু পুত্রের ভালোর জন্যে। পুত্র যদি জিন্দা থাকে, তাহলে পেয়ারের ইন্তাজারে সেই কলঙ্কিনীকে অঙ্কশায়িনী করতে পারে, এই ভয়ে।

কিন্তু আলিমন, নিষ্পাপ কুসুম কোমলটি তাঁরই খেয়ালের হাড়ীকাঠে বলি হল। কিন্তু দোষ তার কতটুকু ছিল?

সম্রাট পুত্র যখন জবাব চাইবে কি তিনি জবাব দেবেন? বলতে পারবেন কি তাঁর নিজের দুর্বল মনের পরিণাম? মৃত সম্রাটের প্রিয়মহিষী হয়ে শক্তিহীনার মত খেয়ালের পরিচয় দিয়েছেন! পুত্র ক্ষমা করবে? যদি তিনি মা না হয়ে এক সাধারণ রমণী হতেন, সম্রাটের বিচার রুদ্রমূর্তিতে রক্তচক্ষু মেলে নেমে আসতো না?

তার চেয়ে আরো বড় এখন মানসিক অনুশোচনা। এ তিনি কি করলেন? গতরাত্রে এ তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? পুত্র-বিহনের সমস্ত ব্যর্থতা ঐ এতটুকু কিশোরীর মধ্যে দিয়ে পালন করলেন? জীবনে আজ পর্যন্ত এমন কোন গর্হিত কাজ করেন নি, যা তাঁর সমস্ত জীবন ঘিরে ক্লেদোক্তে ভরিয়ে রাখবে। আজ সেই গ্লানিতে অবশিষ্ট জীবন তার পিচ্ছিল করে দিল। সারা দুনিয়া তাকে ক্ষমা করলেও তিনি নিজেকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারবেন না।

গতরাত্রে একবারও অনুশোচনা জাগে নি, উল্লাস মনে অলঙ্কার পরিয়েছিল। তিনি পিশাচের সাহায্যে পিশাচিনী হয়ে ধ্বংসের যজ্ঞ আয়োজিত করেছিলেন। উন্মত্ত হয়ে সব লয় করে দিতে শুরু করেছিলেন। আরো হয়তো করতেন, যদি আকবরের সংবাদ এমনি আকস্মিক না এসে পৌঁছতো!

একটিমাত্র সংবাদে সমস্ত প্রকৃতি আজ এই প্রত্যূষে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এল অনুতাপ, আপসোস, বেদনা। চিন্তাধারায় নতুন এক সমতা সৃষ্টির পরিত্রাহি টানাপোড়েন এল। যে ক্লেদাক্ত গ্লানির সৃষ্টি হল, অন্তত মানসিক সৌকর্যের জন্যে তার পূরণ দরকার কিন্তু কেমনভাবে সে অভাব পূর্ণ হবে ?

তাঞ্জামে ওঠবার পূর্বে শেষ একবার তিনি তাঁর গর্হিত অপরাধের ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেন। অর্থাৎ আলিমনের সেই উল্লেখযোগ্য কক্ষে।

তিনি অন্তঃপুরের সর্বময় কর্ত্রী, তাঁর গতিবিধি সর্বত্র। তাঁর একটি অঙ্গুলি হেলনে অন্তঃপুরের রিস্তাদার সম্ভ্রান্ত মহিলা থেকে শুরু করে বাঁদী পর্যন্ত ঘাতকের কাছে প্রেরিত হতে পারে! সেই কর্ত্রী আজ আলিমনের কক্ষে ঢুকতে কেমন যেন লজ্জা অনুভব করলেন।

আজ পরেছেন তিনি জমকালো পোষাক। পুত্রের সংবাদটি শোনার পর গোসলখানায় ঢুকে গোলাপ সুরভিত পানিতে স্নান করেছেন। গতরাত্রে কেন অনেক দিনরাত্রের গ্লানি দেহমন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রবনের ধারার নীচে অনাবৃত দেহকে ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর কক্ষে ফিরে এসে পোষাক নির্বাচন করে একটি একটি করে টুকরো অঙ্গের কোমলাংশে তুলে দিয়েছেন। যে অলঙ্কারগুলি দেহে ছিল, আরো ঔজ্জ্বল্যদানের জন্যে কিছু যোগ করেছেন।

এখন তিনি অন্য কেউ নয় রাজমাতা, মৃত সম্রাটের মহিষী, সৌভাগ্যবান পুত্রের জননী। পূর্বে পুত্রের বিহনে মৃত্যু কবুল ছিল, এখন সেই পুত্র জীবিত আছে সংবাদ পেয়ে তিনি আবার নতুন করে বসন পরে মৃত্যুকে পরিহার করেছেন।

কিন্তু তবু যেন কি হারিয়ে গেছে? হাজার বাইরের পোষাকে ঔজ্জ্বল্য আনলেও মনের সেই দৃঢ়তা ফিরবে না, সেখানে তিনি গত

রাত্রে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আলিমনের কক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। দুর্বল মনে ভীতদৃষ্টিতে নিঃশব্দে আলিমনের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কক্ষের অভ্যন্তরে তাকাতেই তাঁর সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে গেল।

আলিমন হাত পা বাঁধা অবস্থায় কক্ষের হর্ম্যতলে লুণ্ঠিত।

কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তার? এক রাত্রে এত পরিবর্তন হয়? রজনীগন্ধার মত শ্বেতশুভ্র গোলাপী আভায় জড়ানো কমনীয় মুখখানি একরাত্রে কে যেন ভুসো কালির প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে। দুটি নীলোৎপল ডাগর চোখের তলায় আরো পুরু কালো দাগের ছোপ। রক্ত নেই মুখে। পাণ্ডুর পেলবতা। বসনের কোন ঠিক নেই, আবরুরও নেই উৎসাহ। কেমন যেন স্খলিত বসনে একান্ত মৃতপ্রায় হয়ে হর্ম্যতলে পড়ে আছে। পড়ে আছে লম্বিত কেশপাশ সারা মুখের কিছু অংশ আবোরিত করে হর্ম্যতলে একান্ত অবহেলায়।

সেইমুহূর্তে ফরিদকে শাস্তি দিতে হামিদার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো। লোকটিকে কামবক্ত উজবুক বলেই জানতেন তিনি কিন্তু সে যে তা নয়, তার প্রমানই হল এই। এই আলিমন। এই আলিমনের ধ্বংসাবশেষ।

ফরিদ যে জোয়ান মরদ, তার শিরায় শিরায় যে উন্মাদ রক্তের সীমাহীন উন্মত্ততা ছিল, এই আলিমনের অপুষ্টদেহের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তার ছাপ অঙ্কিত করে গেছে।

এই ফরিদকেই তিনি জানতেন দুর্বল এক নপুংসক বলে। অন্তত পুরুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলেও একটি আওরতকে ভোগ করার তার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আজ তার সব ভুল ভেঙে গেল, সম্মুখের এই আলিমনকে দেখে। ফরিদ যেন সেই দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ, যার ক্ষমতায় লক্ষ রমণী আলিমনের মত অবস্থায় উপনীত হতে পারে।

নিঃশব্দে সেই পারাবত প্রহরী, শিরদাঁড়া ভাঙা, উজবুক, বেকুব ফরিদ তার সবচেয়ে বড় শক্তির প্রমাণ দিয়ে গর্বিতা সম্রাজ্ঞীকে অপমান করে গেছে।

সেই মুহূর্তে হামিদা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে বিবশ চোখে আলিমনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আলিমনের মুখের মধ্যে একখণ্ড বস্ত্রের টুকরো পূরে রাখা হয়েছে। অস্বাভাবিক চীৎকারে মহলের শান্তি বিঘ্নিত করছিল বলে হামিদার হুকুমে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাত পা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, অর্ধনগ্ন অবস্থায় কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে অনর্থ করছিল বলে।

কিন্তু তাতে কি আলিমন কিছু অন্যায় প্রকাশ করেছিল?

মনে পড়ল হামিদার গতরাত্রের শেষ প্রহরের স্মৃতি।

ফরিদের পদশব্দ তাঁর কক্ষের পাশের অলিন্দ দিয়ে মিলিয়ে গেলে তিনি কেমন যেন অর্ধচেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। হয়তো সেই লুপ্ত চেতনা তাঁর সহজে ফিরে আসতো না, এই করেই বোধ হয় আস্তে আস্তে প্রত্যুষের আলো এসে কক্ষের জাফরির ফুটো দিয়ে উঁকি মারতো কিন্তু তা হল না।

হঠাৎ আলিমনের অস্বাভাবিক চীৎকারে প্রাসাদের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করলো। থর থর করে যেন কেঁপে উঠলো কঠিন মর্মরের মজবুত দেয়াল।

আর সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে পেলেন হামিদা। বিস্ময়ে সে সময়ে ভাবলেন—এত পরে আলিমন চীৎকার করলো কেন? ফরিদ তো অনেকক্ষণ চলে গেছে, তবে কি আলিমন ভাবছিল, কেমন করে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে? সেই কথা ভাবতে গিয়েই তার এত সময় অপব্যয় হল! তারপর ভাবলেন হয়তো এর কোনটাই ঠিক নয়। আলিমন চেতনা হারিয়েছিল বলেই এতক্ষণ নিঃশব্দ ছিল, না হলে অনেক আগেই তো একবার

চীৎকার করেছিল! মাঝের যে সময় ফাঁক থেকে গেছে, সে সময় আলিমন তার আপন সত্তার মধ্যে ছিল না।

তারপর বাঁদী এসে জানিয়েছে, বেগমসাহেবা, ছোটবিবিকে কক্ষে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

তখনও আকবরের খবর আসেনি। হামিদার মধ্যে তখনও বিদ্বেষের ধোঁয়াটে বাষ্প। তিনি আদেশ দিলেন—ওর হাত পা বেঁধে মুখে বস্ত্রখণ্ড প্রবেশ করিয়ে রাখো।

সেই অবস্থায় এই সকাল পর্যন্ত আছে। আদেশ তুলে না নিলে এমনি অবস্থায় সাত, দশ দিনও থাকবে।

হামিদা বানু হঠাৎ কেমন যেন সঙ্কোচ অনুভব করলেন। এই পরবর্তী আদেশ সত্যিই তাঁর দেওয়া উচিত হয় নি।

নির্যাতন তো তার ওপর যথেষ্ট হয়েছে। যে কোন আওরতের ওপর এমনি নির্যাতন হলে ঠিক সে এমনি আচরণ করতো। আলিমন অতিরিক্ত কি করেছে? একটু বেশী করে কাঁদবে না, চোখের জল ফেলবে না? যন্ত্রণায় ছটফট করবে না—এ কেমন করে হয়? এই আচরণই তো স্বাভাবিক!

সেই স্বাভাবিক আচরণকে প্রতিরোধ করবার জন্যে আবার নির্যাতন করেছেন!

হামিদা বানু নিজেকে বড় অসহায়া মনে করলেন। গতরাত্রে এ কি তাঁর হয়েছিল? বলি হল এই নিষ্পাপ কুসুমটি? অথচ এর দোষ কি? বেটার জন্যে এ জিন্দেগী কোরবাণী দিল?

অনুশোচনায় সমস্ত অন্তর বার বার ভরে উঠে তাঁর যাত্রার পথ দুর্গম করে তুললো।

তিনি আলিমনকে কিছু বলবেন বলে এগিয়ে গেলেন।

হর্ম্যতলে লুণ্ঠিতা আলিমনের দুটি চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় জল গড়িয়ে চলেছে। সে অবাক দু'চোখে শুধু আম্মির দিকে তাকিয়ে আছে। মনের মধ্যে তার আবার এক আশঙ্কা

ক্রিয়া সৃষ্টি করছিল, সম্রাজ্ঞী আবার কোন্ নির্যাতনের ভূমিকা নিতে এসেছেন!

কিন্তু হামিদা স্বরে কোমলতার স্পর্শ আনলেন। আলিমনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মুখের ভেতর থেকে বস্ত্রখণ্ডটি বের করে দিলেন। কালিমাবর্ণ মুখখানির ওপর সস্নেহে হাতের স্পর্শসুখ দান করে বললেন—নসীবহীনা বেটি কাঁদিস না। আমি অন্যায় করেছি। সত্যিই সাংঘাতিক অন্যায় করেছি। তোর জিন্দেগী বরবাদ করে দিয়েছি। তোর মাসুম ইজ্জত এক ঝুট আদমীর পাশবিকতায় রক্তাক্ত করেছি। ভুলে যা বেটি, এক রাতের কাহানী ভুলে যা। আমি কথা দিচ্ছি, তোর জোয়ানী ইজ্জতে আমি আবার রোশনী জ্বালাবো। একটি কালো রাতের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি বিস্মৃত হয়ে নতুন এক আসমানের দিশারী সৃষ্টি করে দেব।

হামিদাবানু তবু যেন কেমন হারিয়ে যাচ্ছিলেন। পিছলে পড়ছিলেন। নিজেকে আবার চেপে ধরে দীর্ঘনিঃশ্বাসকে রোধ করলেন সবেগে।

বিশ্বাস কর। একটিবার আর বিশ্বাস কর। ছোট্টি বেলা থেকে তোকে নিজের হাতে মানুষ করে আসছি। তোর আম্মির পদ আমিই নিয়েছি। সেই আমি তোকে বলছি। এ চিহ্ন কিছু নয়। এ দাগ সবার জীবনেই কুমারী অবস্থার কিছু কিছু সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া আমাদের হাতে সব আছে। রাজ্য, রাজত্ব, শাসন, বিচার—মানুষের সমস্ত ক্ষমতা আমরা নিয়ন্ত্রিত করছি। আমরা সেই সমাজের উচ্চমণি হয়ে সমাজ সংস্কার করতে পারবো না? আমারই হুকুমে এক ভাগ্যহাত নওজোয়ান সম্ভ্রান্ত সৈনিক তোকে শাদি করবে। তখন নিশ্চয় তোর এই সামান্য কলঙ্ক আর থাকবে না। আওরতের জিন্দিগী যা চায়, তুইও তাই পাবি।

কিন্তু এই সান্ত্বনাদানে আলিমনের মুখের উপর কোন ভাবান্তর সৃষ্টি হল না। মনের মধ্যে কি হল কে জানে? তবে তার

চোখের দরবিগলিত অশ্রুধারা রুদ্ধ হয়েছিল, ডাগর চোখদুটি স্ফীত হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে হামিদার দিকে তাকিয়েছিল। হয়তো সে ভাবছিল, সম্রাজ্ঞীর হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? কেন এই সান্ত্বনার প্রলেপ?

হামিদাবানু এবার আলিমনের হাতের বাধন ও পায়ের বাধন খুলে দিলেন। দিয়ে বললেন—ওঠ্ মেরে বেটি? গোসলখানায় গিয়ে ঠাণ্ডি পানিতে সমস্ত শরীর ধৌত কর, ঠাণ্ডিপানিতে সমস্ত গ্লানি ধূয়ে যাবে। তারপর কিছু আচ্ছা খানা খেয়ে নিদ্ যা। দেখবি শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

হঠাৎ আলিমন করলো কি—কোন কথা মুখ দিয়ে বের না করে, শুধু একদলা থুতু মুখ থেকে বের করে হামিদাবানুর মুখের ওপর ছিটিয়ে দিল। সমস্ত কথার বুঝি এতেই প্রত্যুত্তর হল।

আর হামিদাবানু ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালেন। নিজেকে অনেকখানি নিচে নামিয়ে দিয়েছিলেন, একেবারে সামান্য বাঁদীর মত হাতজোড় করে গোস্তাখির ক্ষমা চাইছিলেন। সেইজন্যে কণ্ঠে নেমে এসেছিল, এক গাঢ় তন্ময়তা। সান্ত্বনা দিয়ে তিনি নিজের দোষ স্খালন করছিলেন। সেইজন্যে কণ্ঠে নেমে এসেছিল, এক গাঢ় তন্ময়তা। সান্ত্বনা দিয়ে তিনি নিজের শুধু দোষ স্খালন করছিলেন না, মেয়েটিকে নরকের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করবার জন্যে চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু আর নয়, নিজের সেই পদমর্যাদার অহঙ্কারে সচেতন হয়ে ক্ষুব্ধভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর মুখের ওপরকার থুতুর প্রলেপ অপসারিত করতে করতে দ্রুত কক্ষত্যাগ করলেন।

ঠাণ্ডিপানিকা দরিয়ামে ডুব দিলে সব গ্লানি ধূয়ে মুছে যাবে। আবর্জনাপূর্ণ কক্ষে ঝাড়ু দিলে যেমন কক্ষ পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি নয়া সুরতে ঝিকমিক করবে। ছোট মেয়ে বলে সম্রাজ্ঞী

মিঠি মিঠি বাত বলে ভোলাতে এলেন। আসলে নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে এই প্রচেষ্টা।

আরো লোভ দেখালেন, 'এক নওজোয়ান ভাগ্যবান সৈনিক পুরুষকে ভুলিয়ে তোর নষ্ট ইজ্জত তার কাছে সঁপে দেব। কেউ কোন কথাই বলতে পারবে না। বললে তাদের গলা টিপে ধরবার জন্যে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে সদাজাগ্রত প্রহরী আছে।'

ওরা সব পারে, দিনকে রাত করতে, রাতকে দিন করতে। ওদের মুখের ওপর সত্যিই কারো কথা বলবার উপায় নেই। না হলে তার এমনি হাল হল কেন? কি সে অন্যায় করেছিল?

আলিমনের চোখ দুটোয় আবার জল ছাপাছাপি হয়ে উঠলো।

এখন আমি কি করবো? এই বরবাদী ইজ্জত নিয়ে এই জৌলুসের হারেমে বেঁচে থাকা বড়ই মুস্কিল।

ঠিক আচরণই সম্রাজ্ঞীর ওপর করা হয়েছে। তাঁর উচিত শাস্তি। কিন্তু এতেও জ্বালা নির্বাপিত হল কই? সামান্য থুতু মুখে ছিটিয়ে দিয়ে কি তার ইজ্জত হারানোর চিরকালের বেদনার উপশম হয়?

তবে এই শুরু। এরপর সেই আম্মি, যাকে সে সবচেয়ে বেশী পেয়ার করতো, তাকে যতদিন বেঁচে থাকবে, বার বার আঘাত অপমানে জর্জরিত করে যাবে। সকলে জানবে, সম্রাজ্ঞী এমন এক অপমান করেছে, যা এক সামান্য মেয়েও ক্ষমা করলো না।

সেই মুহূর্তে আলিমন নতুন এক শপথ গ্রহণ করে উঠে দাঁড়ালো, নতুন এক অভিনব প্রতিহিংসার নেশা মনের মধ্যে আসতে তার ভেতরে যন্ত্রণা অনেক উপশম হল।

আজ আর সে কিশোরী নয়, আজ আর সে ছোট নয়। সে একরাত্রে সম্পূর্ণ আওরতের মর্যাদা পেয়ে দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার মাঝে প্রবেশ করেছে। এমন কি ঐ আম্মি যে তাকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন, যিনি আজ বিনা কারণে ইজ্জত নষ্ট করে

দিলেন, তাঁরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে এই জৌলুসে রাঙানো হারেমের মধ্যে আগুন জ্বালাবে। আর যে বেটার জন্যে তিনি তার সর্বনাশ করলেন, সেই বেটার দিলেও আগুন জ্বালাবে।

এই কথা ভাবনার মধ্যে আসতে আলিমন হঠাৎ কেমন যেন উল্লসিত হয়ে উঠলো। কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে সে খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে সমস্ত কক্ষে কেমন যেন প্রতিধ্বনি তুলে চতুর্দিকে কি এক ঈর্ষার আগুন ছড়িয়ে দিল।

সে পাগল হয়ে গেল কিনা দেখবার জন্য এক বাঁদী হঠাৎ অনুসন্ধান করতে এলে তাকে দেখে আলিমন চুপিসাড়ে হাত নেড়ে ডাকলো—বহিন শোনো, একটা কাজ করে দেবে? বেগমসাহেবা তাঁর খাসকক্ষে এখন কি করছেন একটু দেখে এসে আমাকে বলবে?

আলিমনের কথা শুনে বাঁদী কেমন যেন অবাক হয়ে গেল, বললে—বেগমসাহেবা তো রাজপুরীতে নেই! তিনি বেটার কাছে আগ্রার প্রাসাদে চলে গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আলিমনের সবকিছু মনে পড়লো। মনে পড়লো হামিদা বানু কেন এসে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন!

হঠাৎ সে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে বসে পড়লো। এবার বুঝি তার আর কান্না থামবে না। সত্যিই তার ইজ্জত চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল।

রাতের যমুনায় শান্ত স্রোতধারা।

দূর থেকে সেই নিঃশব্দ ঢেউগুলি কেমন যেন সহস্র সৈনিকের চুপিসাড়ে যাওয়ার মত মনে হচ্ছে। রাতের যমুনায় কালোপানির উচ্ছ্বাস। কালো জলের ওপর পড়েছে রাতের অপ্সর আলো।

অপ্সরলোকে যেমন হীরা মানিক্যের ছটা আছে তেমনি রাতের যমুনায় আছে আরো বিজলীর চমক। নীল আসমানের ছায়া পড়েছে যমুনার চমকিত বুকের ওপর। ঢেউগুলি সেই ছায়ার আলিঙ্গনে বিদ্যুতের রোশনাই জ্বেলে আনন্দে নৃত্যের জলসা বসিয়েছে।

ঢেউগুলি কি চমৎকার নৃত্যের ছন্দ সৃষ্টি করে দূর থেকে তীরে মিলিয়ে যাচ্ছে! যেন এক একটি যৌবনপ্রাপ্তা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ কুমারী কন্যা। যাদের বক্ষে আছে শুধু বিদ্যুতের চমক। রোশনী জ্বেলে তারা মরদকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। 'এস, আনন্দ সাগরে অবগাহন করি, রঙমহলে চিরাগ জ্বালাই। দুনিয়ার সব মজা লুটে নিয়ে নতুন এক জিন্দিগীর প্রতিষ্ঠা করি।'

নতুন জীবন শুরু করবার জন্যেই আকবর এসেছে আগ্রায়।

দিল্লী পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক কারণে। অনেক বেদনার স্মৃতি সেখানে ছেড়ে এসে এখন এখানে নতুন জীবনের প্রত্যাশা।

কিন্তু ভাল লাগছে না কেন? আবার কি তার মধ্যে দুষমন ভর করতে শুরু করেছে? এই নিঃসঙ্গতা কেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে? এই নিঃসঙ্গতাকে পরিহাস করবে বলেই তো সে সর্বদা মজলিসের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে!

আগ্রায় এসেই একটি আচ্ছা মজলিশ মহল নিজের পছন্দমাফিক নির্বাচন করেছিল। এবং সেখানে দিনরাত শুধু নাচ, গান, বাজনার

মাতোয়ারা। সুরেলা গায়িকা, খুবসুরত তয়ফাওয়ালী নর্তকী, জোয়ানী আওরতের উষ্ণ তাপে ভরে নতুন এক খুশির মৌতাতে চতুর্দিক রঙীন করে রেখেছিল। সরাবের খসবু সুগন্ধও সেই মজলিশে অঢেল ছিল।

আজও সেই মজলিশে রাতের রহস্যময় বর্ণ মেখে এক খুবসুরত তয়ফাওয়ালী নর্তকী নৃত্য করছে। এখনও আসছে রঙমহল থেকে তার ঘুঙুরের মিঠে ছন্দ। নর্তকীটি লক্ষ্ণৌর নবাব হারেমের সবচেয়ে সেরা জৌলুস। তার দেহের বাঁকে বাঁকে আছে সাহারার মরুপ্রান্তরের তৃষিত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। খাটো ঘাঘরার নীচে অনাবৃত সুডৌল পা দুখানি নাচের সময় ঠিক ঐ যমুনার ঢেউয়ের মত চঞ্চল হয়।

মদির চোখে সে অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়েছিল। জোরালো আলো ও প্রাণমাতানো যন্ত্রসঙ্গীতের তানে নেশাও জেগেছিল। নেশার রঙীন মৌতাতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে বোধহয় এই নিঃসঙ্গতা বোধ হত না কিন্তু হঠাৎ সব কেমন যেন এক ঘেয়ে মনে হল। মনে হল ঐ তয়ফাওয়ালীর নাচে কোন মাদকতা নেই, নেই কোন বেলোয়ারী ঝাড়ের রোশনাই। ইয়ারবক্সীরা নর্তকীর যৌবন তরঙ্গের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে উল্লাসে 'হুররে' দিয়ে উঠছিল। ওরা কেন হুররে দিচ্ছিল আকবর বুঝতে পারে না। তার কিছু ভাল লাগছিল না। তার সব বিতৃষ্ণা লাগছিল।

যৌবন তার দ্বারে আগত হয়েছে। যৌবনকে সে সেলাম জানিয়েছে। যৌবনের উদ্দামস্রোতে ভাসবার জন্যে এই নতুন প্রাসাদে এসে সে উঠেছে। উঠেছে জীবনের অবক্ষয়কে পিছনে ফেলে নতুন রঙে মন রাঙাতে। আর বিষাদ নয়। আর মালিন্য নয়। অন্ধকার পক্ষকে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নতুন করে বাঁচবে। দুঃখের তাপে আছে শয়তানের দোস্তি। শয়তানকে শক্তি প্রয়োগে

সরিয়ে দিয়ে নতুন আসন প্রতিষ্ঠা করবে বলে এই প্রাসাদে এসেছে।

হয়তো এখানে আসা তার হত না। কিন্তু শুধু এল—না থাক্ সে সব কথা এখন আর মনে আনবে না। বড় ত্বঃখের সেই বিচিত্র দিনগুলি বিদায় নিয়েছে।

মীর আবহুল লতিফ এখন কাছে থাকলে বড় ভাল হত অন্তত সান্ত্বনার বাণী তার কাছ থেকে শোনা যেত। ফকির নূরউল্লা থাকলেও তার গীত শুনে কেঁদে মনের ভার লাঘব হত কিন্তু দিল্লীতে খবর গেছে, কেন যে তারা আসতে দেরী করছে কে জানে?

আকবর সেইজন্যে সেই মজলিশ থেকে উঠে এসে এই অলিন্দের কিনারে দাঁড়িয়েছে। এই স্থানটি তার বড় ভাল লাগে। এমনি উন্মুক্ত নীলিম আসমান চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে মনের প্রসারতা বর্ধিত করে। তার নীচেই অসীম জলের সুদূরপ্রসারী স্রোতের শান্ত প্রবহমান ধারা। দিনের বেলা সূর্যের প্রখর কিরণরশ্মিতে সোনালীবর্ণের জৌলুস, রাতের রূপালী জ্যোৎস্নাধারায় সুর্মা চোখের গভীর রহস্যময়তা।

ঐ রঙমহলের হাজার বাতির জৌলুসের চেয়ে এই ঐশ্বরিক মিঠে আলোর বুঝি তুলনা নেই। এখানে এসে তাই দাঁড়িয়েছে। এখানে আছে হৃদয়ের আশ্বাস। উন্মাদনার কোন চঞ্চল প্রাণমাতানো আলোড়ন নেই। যৌবন আছে এই পরিবেশের। তবে সে যৌবন উদ্দাম নয়, শান্ত ধীর স্থির মিঠে আমেজে ভরপুর। যেন আগ্রার সরু গলি দিয়ে কেউ নিঃশব্দে বীণ বাজিয়ে গভীর রাতের শেষ প্রহরে গান গেয়ে চলেছে। তার গানে কথা নেই, আছে সুর, সে সুরে আছে শুধু মূর্ছনা। সেই মূর্ছনায় চোখে ঘুম এনে দেয়।

আর একজন তাকে প্রচুর সুখ দিতে পারতো, দিতে পারতো

স্বস্তি—সে হল সেই রাজপুত কিশোরী শিবালী কিন্তু সে কাছে পর্যন্ত যেতে দেয় না। এগিয়ে গেলে সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলে—ঝুটি আওরত কো পাশ মাত আইয়ে। তারপর তার চোখে জল এসে পড়ে, ছুটে পালিয়ে যায়।

আকবরের বুকের মধ্যে কি একটা যন্ত্রণা যেন সীমাহীন বেদনা নিয়ে তাঁর পাজরগুলি লয় করে দিতে চায়। এই যন্ত্রণাই এখন তার বুকের মধ্যে। এই যন্ত্রণাই এখন তাকে নতুন বেদনায় মহ্যমান করেছে। কেবলই তার বলতে ইচ্ছে হয়েছে।

শিবালী, তুমি ঝুটি আওরত নও। তুমি আমার দিলের মেহবুবা। দিল্‌কা রোশনী। আমি তোমাকেই প্রথম দেখেই মহব্বতের জালে আটকে গেছি। কিন্তু তখন আমার উসর কম ছিল, ছিল দিলের মধ্যে মোহের আবেশ কিন্তু প্রকাশ করার সাহস ছিল না। আজ আমি সেই সরম পরিহার করেছি, আজ আমি মরদের ক্ষমতা আহরণ করেছি। আজ আমি বাদশাহ, আমার খুশির ওপর রঙমহলে লাখো লাখো বাতি জ্বলবে কিম্বা একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। সুতরাং আমার মহব্বত যাকে দেব, তার নসীব দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচা।

মহব্বতের জন্ম কেমন করে হয়, আমি জানতুম না। লেড়কী দেখলে দিল তড়পায়, সেদিনও তড়পাতো কিন্তু সেদিন এর কারণ বুঝতে পারতাম না। ভাবতাম বুঝি বহিনের স্নেহ এর আসল নাম কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙেছে। নারীপুরুষের আসল সম্পর্ক মাতা ও বহিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার চেয়েও এক ঐশ্বরিক মিলন সম্পর্ক আছে, যা সৃষ্টির মাঝেই তার আসল সমাপ্তি।

রমণী ভোগের জন্যেই উৎপত্তি হয়েছে, দুনিয়াতে সে এসেছে পুরুষকে সাহায্যের জন্যে। পুরুষের প্রয়োজনের জন্যেই তাদের সৃষ্টি। কিন্তু এ ছাড়াও যে রমণীর প্রয়োজন আছে, তার প্রমাণ নিজের মা। মাতার আদর্শই তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, ধাত্রী-

মাদের স্নেহ তাকে দিয়েছিল বৃক্ষের মত বেড়ে ওঠার ক্ষমতা। আজ এই যে জ্ঞানের উন্মেষ, তাও রমণীর সাহায্যে হয়েছে। তাই রমণী তার শ্রদ্ধার পাত্রী! সে কোন বাঁদীকে পর্যন্ত কোনদিন তুচ্ছ করে না।

আজ রমণীর ওপর বিতৃষ্ণা জেগেছে প্রিয়তমা মাতার অদ্ভুত প্রকৃতি দর্শনে। সব শ্রদ্ধা তার অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। তবু এক এক সময় তার মনে হয়, সব রমণী কি এক? হয়তো এদের মধ্যে পার্থক্যও আছে।

তার সাক্ষ্য এই শিবালী। শিবালীকে বেইজ্জত করেছে হারেমের ষড়যন্ত্র। একরাত্রে সেই ফুলের মত কুসুমটি হারিয়েছে তার পবিত্রতা। মাতা তার নিরাপত্তা দানে অক্ষম হয়েছেন, পরে শেষে চাবুক দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়েছেন।

বেগমসাহেবা জানেন শিবালী মৃত, তার ছোট দেহটি দগ্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা যে দেওয়া হয় নি, শিবালীর জিন্দা থাকাই তার প্রমাণ।

সেদিনের কথা কখনও ভুলতে পারে না আকবর।

সে নিঃস্ব জীবনের সাধনা নিয়ে একান্ত দীনের মত ফকিরের বেশে পথে পথে ঘুরছিল। ভুলতে চাইছিল সে বাদশাহ পুত্র। সে দৌলতের জৌলুসের মধ্যে মানুষ, মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে তাদের সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্যেই তার জন্ম। এসব ভুলে সে খাঁটি একটি মানুষে পরিণত হবার জন্যে সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে, প্রচণ্ড জলের স্রোতে নিজেকে সিক্ত করে নতুন মেহনতের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে।

তাছাড়া হয়তো কারোর ওপর অভিমান আছে কিন্তু তা সে মুখ্যভাবে ধরে নি। মীর আবদুল লতিফ বলেছেন—দুঃখ পাওয়া দরকার। দুঃখ না পেলে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলির চেতনা আসে না।

হয়তো সেই জন্যে সে সমস্ত বৈভব থেকে নিজেকে সরিয়ে এই নির্জনে এসেছে।

দিনের বেলায় অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে সে যমুনার ধার দিয়ে ছুটে চলে। কোথাও আশ্রয় নেয় না, বা বিশ্রাম করে না। মাঝে মাঝে অশ্বের গতি রুদ্ধ করে আসমানের চন্দ্রাতপের দিকে বিবশদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, দিক চক্রবালে মাঝে মাঝে একঝাঁক পক্ষীর দেখা মেলে। তারা দল বেঁধে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে অনেকদূরে চলে যায় কিন্তু হঠাৎ আকবর কখনও কোন একসময় দেখতে পায়, একটি পক্ষী একা একা পাগলের মত আসমানের একইস্থানে ঘোরে! সে ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন নেমে আসে নীচে।

আকবর মনে মনে ভাবে—ঐ চিড়িয়ার এ হাল হল কেন? কেন ঐ একঝাঁক পক্ষী তাকে নির্বাসন দিয়ে পালিয়ে গেল? কি দোষ তার?

তবে কি চিড়িয়াটি নিজেই দলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নেমে এল? কিন্তু কেন? জগতে একক জীবন যে পরিচালনা করা যায় না, একি সে জানে না? নাকি যুদ্ধ করবার জন্যেই তার জন্ম? নতুন জগত সৃষ্টি করবার জন্যেই এই দল ত্যাগ করে তার বেরিয়ে পড়া!

এমনি কত জটিল চিন্তার আবর্তে ঢুকেই আকবরের দিন কাটে। এরই মধ্যে সে যমুনার কল্লোল শোনে। যমুনার জলের নানান ছন্দ কানে শুনতে শুনতে তার দিন কাটে। শুধু রাত্রিবেলা সে কোন যায়গায় গিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেখানেই মেলে একটুকরো একটি পোড়া তণ্ডুল রুটি।

যার আহারের জন্যে বকাওলবেগী খানা পরীক্ষা করে দেয়। খানা হবে সুখাদ্য, মোগলাই বিরানীর সাথে মাংসের কাবাব। মুর্গীর রোষ্টের সাথে পুরি কা ঠাট। আপেল, খেজুর, বাদাম, পেস্তা

যার মুখে সর্বদা থাকতো সেই আরামপ্রিয় বাদশাহ পুত্র আজ একটুকরো তণ্ডুল রুটিতে তৃপ্ত থাকে।

এমনি করেই চলছিল জীবন! এমনি করে আর কতোদিন চলতো, কে জানে? রাজসৈন্য তাকে খুঁজে বের করতে পারে ভেবেও সে আত্মগোপনের আশ্রয় নিয়েছিল। তার শরীরে ছিল না রাজসিক পোষাক। ছিল ছিন্ন এক পিরান, মলিন এক পায়-জামা, মাথায় ছিল এক মোল্লার টুপি। মুখের ওপর সবে কিছু কিছু শ্মশ্রুর আবির্ভাব হয়েছে। এই আকৃতি দেখে রাজসৈন্য কেন স্বয়ং বৈরাম খানও চিনবে না, জানতো। তাই সে নিশ্চিন্ত হয়ে যমুনার ধারেই বিচরণ করে বেড়াতো। পাছে তার অশ্বটিকে চিনতে পারে বলে সে অশ্বের সারাশরীরে একটি পাতার বাহার সৃষ্টি করেছিল।

এমনি সময়ে একদিন একটি বাদশাহী অশ্বকে ধীরগতিতে যমুনার কিনার দিয়ে সে আসতে দেখলো। কিন্তু ওকি? কেউ তার ওপর কোন সওয়ার করে নেই? একটি কি যেন বস্তু অশ্বের পিঠে রক্ষিত হয়ে আছে, অশ্ব নিজের খেয়ালে এগিয়ে আসছে।

এসব দৃশ্য সে দূর থেকে দেখছিল, তারপর অশ্বটি কাছে আসতে সে দেখলো, একটি রমণীর লম্বিত কেশগুচ্ছ অশ্ব পিঠ থেকে নিচের দিকে ঝুলছে।

সে ত্বরিৎপদে লুকায়িত স্থান থেকে বেরিয়ে অশ্বটির গতিরোধ করলো।

কিন্তু একি? এ আওরতের হালত এমনি কেমন করে হল? একে যে বড় চেনা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন বহু পরিচিত!

রমণীটি তখন অজ্ঞান অচৈতন্য। গায়ের কামিজ ছিন্ন মলিন, মুখের ওপর অনেক কালসিটের দাগ। গায়ের ছিন্ন কামিজের অনাবৃত অংশ দিয়েও রক্তাক্ত চিহ্নের ছোপ দেখা যাচ্ছে। সুন্দর

মুখখানি আর সুন্দর নেই। পাণ্ডব বর্ণ মুখের ওপর কতকালের অত্যাচারের চিহ্ন। কে এই অমানুষিক অত্যাচার করলো এই কুসুম কোমল লেড়কীর ওপর? মনে হচ্ছে তাকে চাবুক দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে মৃত্যু ঘটাতে চেয়েছে। কেন? কেন? এমন কি অন্যায় করেছিল এই প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমের মত বেগুণা আওরতটি? যার জন্যে এই অমানুষিক অত্যাচার করে মউৎ সৃষ্টি করছিল।

মরে গেছে কিনা দেখবার জন্যে আকবর সেই অচৈতন্য মেয়েটির গায়ে হাত দিল। না, স্পন্দন এখনও চলছে, তবে ক্ষীণ।

এখুনি একে সুস্থ করতে হবে, এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আকবর চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু কেমন করে সে সুস্থ করবে? এই উন্মুক্ত যমুনার তীরে লোকালয়হীন পরিবেশে একটি আওরতের চেতনা ফিরিয়ে আনা মুস্কিল। তাছাড়া সে আওরতের স্বভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ! যদি সুস্থ হয়ে এই আওরত তাকে দোষী করে? তাছাড়া তার উমর এখন কিছু পরিণত নয়, যে অভ্যস্ত ব্যক্তির মত পরোপকারের ব্রত নিয়ে তৎপর হবে।

তবু সে এগিয়ে গেল অশ্বের কাছে। একটু ইতস্তত করে তুলে নিল অশ্ব থেকে অচৈতন্য দেহটি। এই প্রথম সে আওরতকে এমনি সান্নিধ্যে স্পর্শ করলো। সেই মুহূর্তে তখন তার সেই অনুভূতি জেগে উঠেছিল।

তারপর যমুনার স্রোতের কিনারে তৃণগুল্মর জাজিমে মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে আচলা ভরে জল তুলে নিয়ে এসে মেয়েটির মুখের ওপর ছড়িয়ে দিল।

সূর্যের অসামান্য প্রখর জ্যোতি পড়েছে মেয়েটির মুখের ওপর। সুন্দর মুখখানির চক্ষুদুটি নিমীলিত। গণ্ডের রক্তাভ পুষ্টতায় সরু সরু কালোদাগের ছোপ। তাম্বুল রঞ্জিত চিকন অধরের ওপর কোন রক্তের আভা নেই। কে এক চুমুকে এই প্রস্ফুটিত লালের

সমারোহকে তুলে পাণ্ডুর রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ বক্ষের ওপর আকবরের দৃষ্টি গেল, বক্ষবাসটি ছিন্ন। কাঁচুলীর অভাবে বক্ষের কুসুম স্তম্ভ ছিন্ন কামিজের অন্তরাল থেকে দৃশ্যমান।

তাড়াতাড়ি আকবর সঙ্কুচিত হয়ে নিজের ঝোলার মধ্যে থেকে অবশিষ্ট একটি মলিন পিরান বের করে অচৈতন্য দেহের ওপর চাপা দিল।

আবার জলের ঝাপ্টা দিল মুখের ওপর।

এবার একটু ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠলো। ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হল।

আকবর আলতোভাবে সস্নেহে কপালের ওপর হাত বুলোলো। চুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে শুশ্রূষা দান করলো।

চোখ দুটি উন্মীলিত হল।

কে, কে তুমি ?

মেয়েটি ঘোলাটে চোখে চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আকরের মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ে স্থির হয়ে গেল।

আকবর তখন শিবালীকে চিনতে পেরেছে। সেই অপূর্ব দৃষ্টি কি কখনও ভোলা যায় ? সে যে বুকের কোমল তটে পাথরের বুকে অঙ্কিত হয়ে গেছে। একটিবার মাত্র দেখা, মুখখানি অতো মনে নেই। তবে মুখের ওপর কালোদাগগুলি না থাকলে বুঝি তাকে অনেক আগেই চিনতে পারতো কিন্তু দৃষ্টি সে ভোলেনি। তার প্রথম প্রেমের অঙ্কুর যে ঐ দৃষ্টির কোমল বৃন্তেই জড়ানো ছিল। তাই মেয়েটির চোখের পাপড়ি উন্মোচিত হতেই সে অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠলো।

শিবালী তোমার এ হাল কে করলো ? কে দিল তোমার কোমল অঙ্গে চাবুকের আঘাত ? কে করলো এই নির্যাতন ? কেন কেন কিজন্যে তুমি অপরের চোখে হলে হিংসার শিকার ? বলো, বলো শিবালী। আমি যে তোমাদের ভ্রাতা ও ভগ্নীকে

বড় আশা নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলাম। নন্দন সিংয়েরও কি এই হাল? সে কোথায় গেল? উত্তর দাও শিবালী!

আকবর কেমন যেন বুকের অদম্য জোয়ার চেপে রাখতে না পেরে ক্রন্দনে গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করলো।

মায়ের কাছে তোমাকে জিম্মা করে দিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি পেলে একটি একান্ত নিরাপত্তার আশ্রয়। কিন্তু দেখছি, মা করেছেন বেইমানী। মা তার নারীত্বের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে এক কিশোরীর ওপর বদ্‌লা নিয়েছেন। মা এত নীচ, এত নিষ্ঠুর হৃদয়!

কি এমন অপরাধ এই কিশোরীর ছিল? হয়তো বিনা অপরাধে তাকে নির্যাতনের আওতায় ক্ষতবিক্ষত করেছেন, কিন্তু কেন?

শিবালীর ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল—আমি কোথায়?

আকবর তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো—তুমি আমার কাছে, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

কে তুমি?

আমি আকবর।

শিবালী মুখটি ঘুরিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললো—আকবর নেই, সে মরে গেছে। তুমি কে মুসাফির? সত্য পরিচয় দাও। আমি নসীবহীনা ব্যর্থ লেড়কী, আমার সঙ্গে দিল্লাগী কর না।

আকবর বুঝলো, শিবালী তার সত্য পরিচয় বিশ্বাস করে নি, তার পোষাক, মুখের চেহারা হয়তো তাকে অবিশ্বাসের সুযোগ দিয়েছে। তাই সে তখনকার মত পরিচয় গোপন করলো। তাছাড়া এখন তার সত্য পরিচয় দিয়েই বা কি হবে? আকবরকে শিবালী বিশ্বাস করবে কেন? তার আশ্রয় থেকেই তো তার এই হাল হয়েছে!

তাই সে বললো—আমি এক নওজোয়ান মুসাফির বিবি। তোমার পরিচয়?

আমি এক লেড়কী।

কে তোমার এই হাল করলো ?

শিবালী আসমানের দিকে নির্দেশ করে বললো—ঐ ঈশ্বর।

শিবালী তুমি আমায় চিনতে পারছো না !

কে তুমি ?

আমি আকবর !

কে আকবর।

মুঘল সম্রাট আকবর।

সে মারা গেছে।

কে বললো, সে মারা গেছে ?

সবাই বলে।

শিবালী তোমার এই হাল করলো কে ? আমি যে তোমাকে অন্তঃপুরে মায়ের কাছে জিম্মা করে দিয়েছিলাম !

সে কথার কোন উত্তর শিবালী দিল না। চুপ করে সে যমুনার স্রোতের ওপর সূর্যের রঙ ফেরা দেখতে লাগলো। চোখ ছুটির কোলে মুক্তার বিন্দু টলমল করছে। মুখের ওপরকার বিশ্রী দাগগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে কেমন যেন বীভৎস আকার ধারণ করেছে।

শিবালী, আমার গোস্তাখি কি ? আমাকে তুমি বলবে না কেন ?

তবু কোন উত্তর শিবালীর তরফ থেকে প্রতিধ্বনিত হল না। সে তাকিয়েছিল অস্তমিত সূর্যের বিলীয়মান দ্যুতির দিকে। দূরে কয়েকটি শ্বেতশুভ্র বক পাখী পাখা মেলতে মেলতে উড়ে চলে গেল।

ঠোঁটছুটি তার ফুলে ফুলে উঠছিল। কি এক অব্যক্ত বেদনা অভিমানের রূপ নিয়ে শতধা হয়ে ঐ যমুনার ঢেউয়ের মত কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কে দায়ী? তার এই দুরবস্থার জন্যে কাকে দায়ী করবে? জন্ম যার অশুভ লগ্নে, নির্যাতন যার কণ্ঠের হার—এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই তার অন্যায়।

তবু কিন্তু মন প্রবোধ মানলো না। মনে হল, সান্ত্বনা বুঝি এখানেই আছে, এই মানুষ যেন তার অতি আপন। কিন্তু তার জানতে সাধ হল, সৌভাগ্যবান এই বাদশাহের এত সুখ, তবু কেন তিনি পথে পথে মুসাফিরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন? তারপর ভাবলো, হয়তো এই বিদেশী রাজপুত্রদের এও এক খেয়াল। তিনি খেয়ালের বশে বিলাসের সুখশয্যা পরিত্যাগ করে নিয়েছেন ফকিরের বেশ। তার জীবন এই খেয়ালের আওতায় পড়েই ধ্বংস হয়ে গেল।

না, আর নয়। এদের ছায়াতে আছে নিদারুণ অভিশাপ, নিঃশ্বাসে আছে বিষ। এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে অনির্দিষ্টের পথে ছুটে চলাও মঙ্গলের।

শিবালী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলো কিন্তু শরীর তাকে দিল না পদদ্বয় সঞ্চালিত করতে। তবু সে বার বার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ সে দুর্বলতায় দাঁড়াতেও পারলো না। থর থর করে কেঁপে উঠলো তার সারা শরীর। টলে পড়ে গেল মাটিতে।

ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল আকবর।

কিন্তু শিবালী তাড়াতাড়ি নিজেকে আকবরের সান্নিধ্য মুক্ত করে নিতে গেল—আমাকে স্পর্শ করবেন না বাদশাহ!

আকবর কিছু বুঝতে পারলো না, শুধু অবাক হয়ে বললো—আমার কসুর কি বিবি? মনে হচ্ছে যেন আমিই সব দোষে দোষী।

শিবালী মাথা নত করলো। আবার তার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। মাথাটা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বললো—

কারুর দোষ নেই বাদশাহ। দুনিয়ায় যার মা নেই, তার কেউ নেই। মা হারা সন্তানদের এমনি দুঃখেই জীবন দগ্ধ হয়।

মায়ের কথা বলতে আকবরের হঠাৎ মনে পড়লো, তার মায়েব কথা। মায়ের কথা মনে পড়তেই তার শান্ত মনে হঠাৎ বিক্ষোভ জেগে উঠলো।

মায়ের জন্যেই আজ সে এই পথে এসে নেমেছে। অথচ এই মাকে সে কত ভালবাসতো। মায়ের আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলার জন্যে তার মেহনত কম ছিল না।

কিন্তু সে আশা তার আর নেই। আওরত প্রবৃতির তাড়নায় নিজের সুখের জন্যে পুত্রস্নেহ, স্বামী সোহাগ সব ভুলে যায়। এখন সে আওরতকে সত্যিই অশ্রদ্ধা করে। আওরত রঙমহলের শোভা, পুরুষের প্রবৃত্তির খাদ্য, বিলাসের উপকরণ আর সন্তান উৎপাদনের জন্যে তাদের প্রয়োজন। এছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কিছু প্রত্যাশা করা মুর্খের কাজ।

আকবর এর মধ্যে রমণীদের সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতাই মনে পোষণ করেছিল। তবে তার মধ্যে কষ্ট অনুভবও করতো। মা কেন এমন হল? মা তো আওরত নয়, তিনি জননী। তাঁর কর্তব্য যে অনেক! তাঁর পুত্র হতে চলেছে একজন বিরাট বড় পুরুষ। যার জীবন নিয়েই একটা ইতিহাস রচনা হবে, তার মাতার সংযম ধারন, পবিত্র এক চরিত্রের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়? যে মাতার আদর্শে পুত্রের ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত! না, আর চিন্তা করতে ইচ্ছে হয় না।

আওরতের কোন চরিত্রও নেই, আদর্শও নেই। তারা তুচ্ছ এক প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে দুনিয়াকে বিষাক্ত করতে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হল, শিবালীও তো আওরত, সেও নিশ্চয় এমনি কোন ইচ্ছাকে প্রশয় দিয়েছে! মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। সমস্ত কোমল তন্ত্রগুলি কঠিন হয়ে বিক্ষোভের আশ্রয় নিল।

শিবালী তখন আবার সেই যমুনার ধারেই বসে পড়েছে সে মাথা নীচু করে নীরবে রোদন করছিল। ভাবছিল, এখন সে কি করবে? রাজকুমারের সান্নিধ্যে বড় উন্মাদনা, এখান থেকে পালানোই শ্রেয়। তাছাড়া এরা বাদশাহের পুত্র, নিজে বাদশাহ। এদের রাজপুরীতে কত লোক। তার মত কত আওরত অন্তঃপুরে আছে। এরা বড় কথা ভাবে। যুদ্ধ করে, রাজত্ব কায়েম করে দৌলতের অধিকারী হয়ে নতুন জগতের রঙমহলে প্রবেশ করে আত্মহারা হয়। হৃদয় বলে কোন নগন্য বস্তু এদের শরীরে নেই। পূর্বে যদি একথা সে বুঝতো, তাহলে তার ইজ্জত বলি যেত না। হায়, কেন সে আগে বুঝলো না? তখন তার মন আরো অপরিণত ছিল। আশ্রয়ের জন্যে মন উদ্বিগ্ন ছিল। বিমাতার অত্যাচারে মনে মর্মপীড়া ছিল, সেই জন্যে আশ্রয়ের জন্যে ও ভাইয়ের দুশ্চিন্তার জন্যে রাজকুমারের প্রস্তাব দুর্লভ মনে হয়েছিল।

আজ সে বুঝতে পারছে, সেই সমর্থনই তাদের অন্যায় হয়েছে. না জানে ভ্রাতার অবস্থা কিরূপ! ভ্রাতার অবস্থা জানার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু পায় নি। কেউ তার ভ্রাতার খবর এনে দেয় নি! সে ভ্রাতার সঙ্গকামনাই করেছিল কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করে নি!

সম্রাজ্ঞী তাকে চাবুকের আঘাত দিয়ে মৃত্যু আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু মৃত্যু তার হয় নি।

অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীরা তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছিল। তারা তার মুমূর্ষ দেহ একটি অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দিয়ে গোপন পথে বাইরে বের করে দিয়েছিল। তখন সে অর্ধচেতনার মধ্যে যন্ত্রণার আবর্তে কাল কাটাচ্ছে। সে সবই বুঝতে পারছিল, অথচ না বোঝার জগতে ছিল। তারপর অশ্বপৃষ্ঠেই তার জ্ঞান হারিয়ে গেছে।

রাজকুমার সেই জ্ঞান ফিরিয়েছেন।

এই যখন সে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ আকবর অস্বাভাবিক দৃঢ়স্বরে বললো—রমণী সত্যি করে বলো, তুমি কোন্ অপরাধে এই দণ্ড পেয়েছে? আমার মনে হচ্ছে, তুমি এক গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়েছিলে বলে রাজদণ্ড তোমার ওপর নেমে এসেছে!

রাজকুমারের এই পরিবর্তনে শিবালী চমকিত হল কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ জেগে উঠলো, সে ব্যঙ্গস্বরে বললো—জাঁহাপনার নিরাপদ আশ্রয় আমাকে প্রতারিত করেছে, তাই দোষ কার আমি জানি না—তবে রাজপুরুষদের চক্রান্তে আমার মাসুম ইজ্জত আজ লুণ্ঠিত।

যে কথা বলতে চায় নি, সে কথা ক্ষোভের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যেতে শিবালী লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলো।

আর আকবর হল স্তম্ভিত। সে নির্বাক হয়ে শুধু শিবালীর অবনত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। সে দৃষ্টিতে শুধু অসহায় হীনতা।

অনেক পরে নিস্তেজকণ্ঠে বললো—আমার মা কি এই চক্রান্তের মাঝে আছেন?

জানি না।

হঠাৎ আকবর জানু পেতে শিবালীর সামনে বসে পড়ে আবেগ বিহ্বলকণ্ঠে জোড়হাত করে বললো—মাফি চাইছি। আমি মাফি চাইছি। আমার রাজ্যের সমস্ত নারী পুরুষের হয়ে আমি মাফি চাইছি।

আকবরের আন্তরিকতায় কোথায় যেন গভীর এক কাতরতা ছিল। শিবালীর অন্তরে তা স্পর্শ করলো, তার দুর্বল দেহ হঠাৎ কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। নেমে এল চোখে নিবীড় অন্ধকার। আবার সে চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

আকবর আর কালবিলম্ব করলো না, শিবালীর দেহ অশ্বে তুলে নিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

তখন অন্ধকার নেমে আসছিল। দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত্রির উপস্থিতি জেগে উঠছিল। রাত্রি তার প্রতিদিনের নিয়মে অন্ধকারের ধূসরতা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত তুনিয়ার ওপর কালো বস্ত্রের আচ্ছাদন পরিয়ে দিক। আকবরের মনে কিন্তু আলোর প্রকাশ শুরু হল। কে যেন প্রদীপ হাতে আলো ছড়াতে ছড়াতে অনেক আলোর প্রতিফলনে আকবরের হৃদয়াকাশ রাঙিয়ে দিল।

আর সেইসময় আকবরের জ্ঞানোন্মেষ হল। মনে পড়ল মীর আবতুল লতিফের কথা। আঘাত না পেলে খাদহীন হওয়া যায় না। আজ আঘাতের বেদনাতে সে হারিয়ে গিয়েছিল। চলে এসেছিল সমস্ত বৈভবের প্রত্যাশা ছেড়ে নিঃস্বের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার আঘাতই তাকে দিল মুক্তির উপায়। কুয়াশা সরে গেল। ধোঁয়াটে মেঘের আস্তরন সরে গিয়ে হীরার ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল কিন্তু এ হীরা মেকি কাচের দ্যুতি নয়, আসল হীরার প্রতিফলনে সমস্ত বেদনার অবসান হল।

শিবালী হারিয়েছে ইজ্জত। তার আজ জীবনের ওপর কোন মোহ নেই। নেই বলেই সে কত কাছে? তাকে আজ কত কাছে পেয়ে সে ভাবতে পাচ্ছে, তাকে নিয়ে সে নতুন স্বর্গরচনা করতে পারে। শাদির ইন্তেজারে এই ইজ্জতহারার তুঃখ সে ভুলিয়ে দিয়ে পবিত্র করে তুলতে পারে। সম্মান দিতে পারে।

সেইজন্যে আজ ভাল লাগছে। শক্তি যেন সেইজন্যে আবার পুনরুদ্ধার হচ্ছে।

নতুন এক অভিনব চিন্তার আবর্তে প্রবেশ করে আকবরের বাহুতে নতুন বলের সঞ্চার হল। সে অশ্বের গতি বার বার বর্দ্ধিত করতে লাগলো। যেন একটি ঝড়ের মত প্রবল বেগে অশ্ব ছুটে চললো তুর্দ্দামবেগে। আপাতত লক্ষ্য তার আগ্রাপ্রাসাদ। সেখানে

গিয়ে সে নিজেকে মেলে দেবে। নতুন রঙমহল সাজাবে। নতুন বেলোয়ারী ঝাড়ের অসামান্য দ্যুতিতে ভরিয়ে দেবে বিলাস কক্ষ। সেখানে আর কেউ নয়, শিবালী ও সে।

নতুন মহব্বতের জন্ম নেবে। শিবালীর একটি কলঙ্কিত চিহ্ন অপসারিত করে আওরতের সম্মান দান করবে।

২০

কিন্তু সবকিছু সহজ যদি হত!

কল্পনা যদি সবটুকু বাস্তবে পরিণত হত, তাহলে এ দুনিয়ার গতি প্রকৃতি এতো বিচিত্র হত না।

আকবর নিঃস্বের মাঝে বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে ফকিরের বেশ ধারণ করে দরগায় দরগায় কাটাচ্ছিল। তখন সে জানতো না, এর শেষ কোথায়? শুধু শান্তি, স্বস্তি মনের একটু স্থিতির জন্যে সে এই নির্জনে চলে এসেছিল। যে সরাব তাকে বেহোঁশ করে নি, যে আওরত তাকে অবশ করতে পারে নি, শুধু জ্বালাই মনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেই জ্বালা নিবারণের জন্যেই সে প্রাসাদ পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল। মানুষ শুধু স্বার্থের নোকর, এই স্বার্থের জন্যে তার মধ্যে জঘন্য আচরণের সরীসৃপ হাত-পা মেলে আছে। তার মা, মাকে যে সে সব চেয়ে ভালবাসতো। মায়ের আদর্শে নিজেকে সে অনুপ্রাণিত করতে চাই তো, সেই মা-ও তার স্বার্থশূন্য নয়। তিনি এক তুচ্ছ আদিম প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে পুত্রের কাছে ঘৃণার পাত্র হলেন।

সেই জ্বালাই আকবরকে পথে বের করেছিল, সে জ্বালাই আজ শরীরে অহরহ।

শিবালী যদি এমনি হঠাৎ না আসতো, তাহলে যে কি হত,

বলা মুস্কিল। তবে সব ঘটনার মধ্যে যেমন পরিত্রাণের উপায় থাকে, তেমনি বুঝি পরিত্রাণও লুকিয়ে ছিল।

শিবালী ইজ্জত হারাতেও আকবরের কোন দুঃখ জাগলো না। মহব্বত যার মধ্যে প্রথম জন্ম নিয়েছে, সে কি সামান্য এই কারণে তার প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করতে পারে? তাই শিবালীকে কাছে পেয়ে আকবরের যন্ত্রণা উপশম হল। সে নতুন জীবন শুরু করার জন্যে অদম্য উৎসাহে আগ্রার প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলো।

আগ্রার প্রাসাদ তখন সংস্কার হয়ে নতুন রূপ পেয়েছিল। প্রাসাদ নতুন অধিকার করে পুরোনো কাটামো ভেঙে ফেলে অভিনব সব মহল, কক্ষ ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল! কথা ছিল, একটি শুভদিন দেখে আগ্রা শহর সজ্জিত করে আমীর, ওমরাহ, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদিদের নিয়ে বাদশাহ আড়ম্বরে প্রাসাদে এসে প্রবেশ করবেন। সেদিন প্রাসাদে উৎসব হবে। খিলানে খিলানে মশাল জ্বলবে। আলোর সমুদ্রে স্নান করবে নবসংস্কৃত প্রাসাদ গম্বুজ। নহবতখানায় সারা দিনরাত্রি ধরে সোহিনীরাগে সানাই বাজবে। কক্ষে কক্ষে হীরা চুনি, পান্নার রোশনাই জ্বলবে। ফুলের ঝুড়ি নামবে। রক্তগোলাপের বুকে গুলমোহর, রাধাচূড়া, আকাশমণি, রজনীগন্ধা ফুলের সমারোহ হবে। মৃগ কস্তুরীর সুগন্ধ, বিভিন্ন সুরভির বিভিন্ন আতর ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের বুকে নতুন সৌরভের আমন্ত্রণ জাগাবে। সরাবের ফোয়ারা ছুটবে। নর্তকীরা নাচবে অবিরাম। বিশ্রাম তাদের দেওয়া হবে না। যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, নিজেরাই হর্ম্যতলে ফরাসের ওপর অচৈতন্য হয়ে গড়িয়ে পড়বে।

এই সব পরিকল্পনাই আগ্রা প্রাসাদের দ্বারোৎঘাটনের জন্যে ছিল। আর এই দিনের সুখচিন্তায় রাজকর্মচারীরা সময় পরিমাপ করতো। কবে আসবে সেদিন, যেদিন আবার উৎসবের মৌতাতে আনন্দের ফোয়ারা বইবে। সেদিন যে অনেক অঢেল স্বাধীনতা,

প্রচুর ভাল খানা, বাঁদীদের সাথে সরাবের নেশায় কিছু অসংলগ্ন আচরণ—এই স্বপ্নেই নফরশ্রেণীর লোকেরা বিভোর ছিল। উৎসবের সময় কোন আইন নেই। যে যেখানে যা খুশি করতে পারে। উৎসবের আনন্দটাই বড়! সেদিন কোন শাসন নয়। সেদিন কোন বিচার নয়। এমন কি বন্দী মুজরিমদের পর্যন্ত লঘু অপরাধ হলে মুক্তি মিলতো।

কিন্তু কিছুই হল না। একদিন গভীর রাত্রে আকবর শিবালীর অচৈতন্য দেহ নিয়ে অশ্বে সওয়ার হয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে উর্দ্ধশ্বাসে এসে রুদ্ধ ফটকের সামনে দাঁড়ালো।

শান্ত্রী পাহারাদার সিংহদরজার ওপরে দাঁড়িয়ে অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করে বাজখাইকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—হুশিয়ার কৌন হ্যায় তুম?

আকবর তখন খুব ক্লান্ত অনুভব করছিল। তাছাড়া তখন রাত্রি কম নয়। অবিলম্বে বিশ্রাম দরকার। শিবালীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা কর্তব্য।

তাই শান্ত্রী পাহারাদারের কথায় বিরক্ত হয়ে বললো—শরিফ আদমির সঙ্গে কথা বলতে পার না! আমি তোমার নোকর নয়, আমি বাদশাহ আকবর। ফটক খুলে দাও।

কিন্তু শান্ত্রী পাহারাদার হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে হাঃ-হাঃ রবে অট্টহাস্য করে উঠলো।

শাহনসা আকবর এখন দিল্লী প্রাসাদের খাসকক্ষে মখমল শয্যায় শুয়ে আরাম উপভোগ করছেন। তুমি দুষমন আছো। তুমি কোন দুষ্ট মতলব নিয়ে এই রাত্রে সেই মহান বাদশাহের নাম নিয়ে এই প্রাসাদে প্রবেশ করতে চাইছো। কি তোমার আসল মতলব বলো?

আকবর মনে মনে ম্লান হাসলো কিন্তু তখন তার কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছিল না। সে বুঝলো, এই রক্ষী তাকে কিছুতে বাদশাহ মনে করবে না। তার পোষাক পরিচ্ছদ, আকৃতি আগমন কিছুই

বাদশাহের মত নয়। সুতরাং প্রাসাদ সর্দার মীরবক্সী মুনিম খাঁর স্মরণ ছাড়া এই রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হবে না। আর সে তাকে ভালভাবেই চেনে। অন্তত মুনিম খাঁ সামনে এসে দাঁড়ালে আর কোন অসুবিধা হবে না।

আকবর বললো—সিপাহী, মীরবক্সী মুনিম খাকে এত্তেলা দাও।

শান্ত্রী আবার হেসে বললো—এখন মুনিম সাহেব সরাবের নেশায় বেহোঁশ হয়ে আওরতের ক্রোড়ে শুয়ে নিদ্‌ যাচ্ছেন। তাকে জ্বালাতন করতে যাব, এমন আহম্মক আমি নয়।

তখন আকবর ক্ষেপে গেল, হঠাৎ মুঘল সাঙ্কেতিক স্বরে চীৎকার করে উঠলো। এই সাঙ্কেতিক ভাষা একমাত্র মুঘল সৈন্যরাই জানতো।

আর সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রী পাহারাদারের চৈতন্য হল। তার পরিবর্তন দেখবার মত। হঠাৎ সেই বহু পরিচিত কণ্ঠস্বরটি চিনতে পারলো। এমন কণ্ঠস্বর বুঝি তামাম হিন্দুস্থানে কারুর নেই।

সে সভয়ে ওপর থেকেই সেলাম পেশ করতে লাগলো। আর বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো, বাদশাহ এই রাত্রে কেমন করে কোথা থেকে এলেন? কেন এলেন? কি অভিপ্রায়ে?

সিংহদরজা প্রচণ্ড শব্দ জাগিয়ে ঘড়্‌ ঘড়্‌ নিনাদে খুলে গেল। আর আকবর অশ্ব ছুটিয়ে দিয়ে সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো।

সে রাত্রে আর কেউ নিদ্রার মাঝে থাকতে পারলো না। বাদশাহ হঠাৎ অতর্কিতে এসেছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হতে সকলের চোখে ঘুম ছুটে গেল। মহলে মহলে সাড়া জেগে উঠলো। কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলে উঠলো। অলিন্দে অলিন্দে নতুন মশালের পুন-সংস্থাপন হল।

মুনিম খাঁ নিরুদ্বেগে বেশ আরামে প্রচুর সরাব গলাধঃকরণ করে সুখশয্যায় একটি আওরতের ক্রোড়ে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ রক্ষীর মুখে অসম্ভব সংবাদ শুনে খোয়াবের মৌতাত থেকে ছিট্‌কে গিয়ে আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালেন। নেশা ছুটে গেল।

তিনি টলায়মান দেহ সোজা করবার আপ্রাণ প্রয়াস করতে করতে পিরান গায়ে ঝুলিয়ে বাদশাহকে কুর্ণিশ করতে ছুটলেন।

কিন্তু আকবরের তখন মনটি সম্পূর্ণ অন্য এক অভিনব সুরে বাঁধা ছিল। কারুর কোন অন্যায়ই তার চোখে পড়লো না। এমন কি পাহারাদারের তকলিফেও তার ক্ষমা এগিয়ে গেল।

সে একান্ত শান্তমনে সুস্থমস্তিস্কে শিবালীর উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে নিজে গোসলখানায় গিয়ে ঠাণ্ডা জলে ভাল করে স্নান করলো, তারপর শরীরে আরাম নেমে এলে কক্ষে প্রবেশ করে শয্যার ওপর নিজেকে লুটিয়ে দিল। তারপর ক্লান্ত শরীরে তৎক্ষণাৎ ঘুম নেমে এল।

সে ঘুম ভাঙলো, পরদিন এক প্রহর বেলা চলে যাবার পর। ঘুম ভাঙতেই তার মনে পড়লো শিবালীকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে শয্যাত্যাগ করে ছুটলো অন্দর মহলে।

শিবালী তখন ম্লান দৃষ্টি নিয়ে শুষ্কবদনে গবাক্ষ দিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়েছিল। মুখের ওপর সেই চাবুকের আঘাতের কালো কালো দড়ির মত বীভৎস দাগ। সুন্দর মুখখানি কেমন যেন এই আঘাতে অসুন্দর হয়ে গেছে।

কি ভাবছিল শিবালী তখন, কে জানে?

পরণে তার একখানি অতিসাধারণ শাড়ী। দেহে কোন অলঙ্কারের চিহ্ন নেই। অথচ তার জন্যে মূল্যবান জরির কামদার বসন, জড়োয়ার অলঙ্কার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। সে সব স্পর্শ না করে সে পরেছে দীনার বসন। রিক্তের সামান্য আবরণ! এতেই মনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছিল।

এমন সময়ে আকবর এসে কক্ষে প্রবেশ করলো। কিন্তু শিবালীর পরিবর্তে অন্য এক আওরতকে পিছন ফিরে গবাক্ষের দিকে

মুখ করে থাকতে দেখে বিরক্ত হয়ে বললো—তৌম কৌন হো, রাজপুত লেড়কী কাঁহা গ্যয়ি !

শিবালী বোধ হয় তখন কাঁদছিল, তাড়াতাড়ি কাপড়ের অগ্রভাগ দিয়ে চোখের জল মুছে এদিকে ফিরলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আকবর অবাক হয়ে গেল।

এ ক্যয়া তাজ্জব কা বাত! এইসি হালত ক্যায় কিয়া হ্যায়! আচ্ছি কাপড়া ক্যাহে নেহি পিনা!

শিবালী কোন উত্তর দিল না।

উত্তর না পেতে আকবর একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। সে পরেছে বাদশাহী রাজসিক পোষাক। কণ্ঠে তার দামী মুক্তার মালা। কানে দুলছে হীরার কুণ্ডল। রক্তবর্ণের জরিদার পিরানের ওপর সলমা চুমকির বুটি। পায়ে জরিদার নাগরাই চপ্পল। চোখে সুর্মার অঞ্জন।

এইসময় শিবালী নিম্নকণ্ঠে ধরাগলায় বললো—আমার জন্যে আপনি আর চিন্তা করবেন না বাদশাহ। আমাকে এমনিভাবে জীবন কাটাতে দিন।

এইসি জওয়ানী উমর, কে তোমায় দেখবে ?

শিবালী চুপ করে মাথা নত করে থাকলো।

আকবর আরও কণ্ঠ খাদে নামিয়ে কাতরস্বরে বললো—কেন তুমি এমনি প্রতিজ্ঞা করছো ? যে সামান্য অপরাধ তোমার চরিত্রকে পরিবর্তিত করেছে, আমি আমার পেয়ারের রোশনী জ্বালিয়ে সেই অপরাধ মুছে দেবো। একজন মরদ যদি তোমার আওরত জিন্দিগী সম্মানিত করে, তুমি নিশ্চয় তাকে অস্বীকার না করে সেলাম জানাবে।

শিবালী মাথা নত করে নিম্নস্বরে বললো—তা হয় না রাজকুমার। ঝুট আওরত জেনে শুনে কোন পুরুষকে নষ্ট করতে পারে না।

মহব্বত! পেয়ার কী ইন্তেজাম! দিলকা সুরভি! আসমান কি তারা! এসব কি তবে ঝুট? মিথ্যা!

শিবালী চুপ করে থাকলো।

আকবর কেন যেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

চুপ কেন আছো? কিছু বলো। আমি আকবর বাদশাহ। আমার বংশগৌরব আছে। আমার পৌরুষ মিথ্যা নয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানের লোক আমার শক্তির নমুনা পেয়েছে। আমি বিধর্মী হতে পারি কিন্তু আমার মহব্বতের তো কোন ধর্ম নেই! তাঁর রূপ একই। তুমি আমাকে অস্বীকার করতে পারো। কিন্তু মহব্বতকে অস্বীকার করতে পারো না। আওরত আমি বিলাসজীবনে অনেক পেতে পারি, আমি বাদশাহ। একদিন আমাকে নাবালক বলে সকলে দূরে সরিয়ে রাখতো, আজ কেউ দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। আজ ইচ্ছে করলে বহু আওরতের মালিক হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে ভাসতে পারি কিন্তু তাদের সঙ্গে তো মহব্বত হবে না, হবে উত্তপ্ত মনের আকাঙ্খা পূরণ! সেইজন্যে তোমার কাছে আমার এতো প্রার্থনা!

শিবালী আর চোখের জল রোধ করতে পারলো না। স্রোতের আকারে বেরিয়ে মাটিতে টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগলো।

তারপর আকবর থামলে বললো—রাজকুমার, আমাকে ক্ষমা করুন।

ক্ষমা! আমি যদি কাউকে ক্ষমা করি, আমার মহব্বতের অগ্নি কি নির্বাপিত হবে?

আমি কি করবো? শিবালী ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বললো। আপনাকে কি করে বোঝাবো, আমার মনের অবস্থা। আমিও কি চাই না আপনার এই মহব্বতকে সেলাম জানাতে?

তাহলে কেন এমনি করছো? আমি তো বলছি, যা গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই। আমি তোমায় সম্মান দান করছি।

তখন শিবালী কান্না রোধ করে বললো—আমিও যে আপনাকে

শ্রদ্ধা করি, তা কি আপনি জানেন না? যাকে ভালবাসা যায়, তাকে ঝুটা যৌবনের নিষ্প্রভ আগুনে পোড়ানো যায় না।

তাহলে তুমি মজবুর!

শিবালী মাথা নত করে থাকলো।

কিন্তু তোমার এই অবহেলায় আমার পরিণাম কি হবে জানো? দিলের কোরবানী দিতে আমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবো। প্রথম প্রস্ফুটিত মহব্বত ঠোক্কর খেয়ে যে রক্তে রাঙা হল, তার পরবর্তী পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। যদি শক্তি থাকে তাহলে এই প্রাসাদের কক্ষে বসে তোমার অবহেলার সাক্ষ্য প্রদর্শন কর।

এইবলে আকবর উর্দ্ধশ্বাসে কক্ষত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিবালী আছড়ে পড়লো মাটিতে। কান্নায় পৃথিবীকে চৌচির করে দিতে চাইলো। একি অবস্থায় পড়লাম আমি? অভিমানী নওজোয়ান বুঝলো না রমণী মনের বেদনা! এমন একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ, যাকে পেলে প্রত্যেক রমণীর জীবন সার্থক। সেও কি সার্থক হত না? তার জীবনেও যে নেমে আসতো এক রোশনীভরা সুন্দর শান্তি।

কিন্তু ঝুট্ কলঙ্কিত ইজ্জত নিয়ে জেনে শুনে একজন প্রেমিককে প্রতারিত করা, এ অন্য কোন রমণী হলে করতে পারে, সে পারে না। সে পারে না বলেই বাদশাহের এই উত্তপ্ত মহব্বতকে ফিরিয়ে দিতে হল। কিন্তু ফিরিয়ে দিতে গিয়ে যে বুকের মধ্যে আলোড়ন জেগে উঠলো, সেই আলোড়ন বাইরে অপ্রকাশ থাকলো বলেই আকবর বুঝলো না।

শিবালী যখন কেঁদে কেঁদে বুকের ভার লাঘব করতে গিয়ে আরো ভারী করে তুললো, সেই সময় ওদিকে রঙমহলের মাঝে বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো। নর্তকীর পায়ের ঘুঙুরের বোল উঠলো,

তবলার ত্রিতালের ঝড় উঠলো। বীণ বেজে উঠলো মধুর সুরে। খসবু সরাবের সোনার পেয়ালায় তুফানের ঝড় উঠলো।

হাজারো মাশুকের বুকে আগুন জ্বালাবার জন্যে তয়ফাওয়ালী দেহের বঙ্কিম বাঁকে বিজলীর চমক সৃষ্টি করে নাচে। চোখে আনে মোহিনী মায়া। বুকে তোলে ফাগুনের ঝড়। মধুপিয়াসী মৌমাছিরা যেমন ফুলের বৃন্তে বৃন্তে ঘুরে রেনু সন্ধান করে ফেরে, তেমনি তয়ফাওয়ালী বহুমনের সীমিতে ঝড় তোলবার জন্যে হাজারো ছলা-কলার আশ্রয় নেয়।

কিন্তু আকবরের মনে বুঝি কেউ দাগ সৃষ্টি করতে পারে না। তার তখনও মন অপরিণত ছিল, সে তখনও অভিজ্ঞ পুরুষের মত রমণীভোগ্য হয়ে ওঠে নি। সে চেয়েছিল প্রেম, মিললো বেদনা। বেদনাতেই জন্ম নিল নতুন এক বিতৃষ্ণা।

তাই রঙমহলও তাকে দিতে পারলো না নিরবিছিন্ন সুখ।

শুধু কাঁদে যমুনা নিঃশব্দে ঢেউ সৃষ্টি করে অবিরাম। ক্লান্ত নিঝুম সূর্যের ম্লান দীপ্তি নীল আসমানের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে, মনে হয় যেন কোথায় হারিয়ে গেছে তার অসামান্য রোশনী। নীড়হারা পক্ষীর নেই কোন নীড়। শুধু তার বিক্ষিপ্ত ঘোরাফেরা ব্যাকুলতায়।

এমন কেন হয় ?

হৃদয়ের এ জন্ম নতুন। দেহের পেশীতে যেন আর কোন শক্তি নেই, সব দুর্বল হয়ে গেছে। শুধু দাহ।

আওরত দিতে পারে পুরুষকে শক্তি। বুঝি সেই শক্তি লাভ করতে না পারার জন্যে দুর্বলতাই শয়তানের রূপ নিয়েছে। দাহিকা নিয়েছে তার সুযোগ্য আসন। শুধু পুড়িয়ে চলেছে।

কিছু ভাল লাগে না। দেমাক শুধু বিগড়ে থাকে। রঙমহলে বসে থাকে আকবর। জোয়ানী আওরত মৃণাল বাহু তুলে পানপাত্র এগিয়ে দেয়। ঢেলে দেয় সে মুখে কিন্তু নেশা হয় না। আওরত

তার উত্তপ্ত দেহের সান্নিধ্য দিয়ে তরুণরক্তে ঝড় তোলার চেষ্টা করে কিন্তু কোথায় যেন সব ঝড় থেমে গেছে।

আকবর বাঁদীর সাহায্যে শিবালীর সংবাদ নেয়।

শিবালী শুধু কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে তার দুটি চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে।

আকবর বুঝে উঠতে পারে না—এ কি হচ্ছে? যে নিজেই নিজের সৌভাগ্য প্রত্যাখান করলো, তবে সে কিসের বেদনায় দগ্ধ হচ্ছে?

তারপর সে লোক পাঠিয়েছিল দিল্লীতে। ফকির নূরউল্লা, মীর আবদুল লতিফ ও কিছু আওরত দরকার। আর সে যে আগ্রায় আছে তার খবর।

একটু রূপ বদলের দরকার, বড় একঘেয়ে জীবনের মত লাগছে।

২১

সেদিন আকবর যমুনার ধারের অলিন্দতেই দাঁড়িয়েছিল।

প্রাসাদের কোল ছুঁয়ে ঢেউগুলি আছড়ে এসে পড়ছে। অশান্ত সেই ঢেউয়ের কানাকানি অবিরাম। সন্ধ্যা নেমে আসছে। সূর্য অস্তাচলে। সূর্যের শেষ বিদায়ী রশ্মিতে গোধূলীর রক্তরাগ। লাজনম্র সরমের রঙ। যেন দয়িতের আলিঙ্গনে মাসুম আওরতের কর্ণমূলে লালরঙ জেগেছে। তার দু'চোখে আবেগের অন্ধকার নেমে আসছে। প্রদোষের অন্ধকার।

তেমনি প্রকৃতির চোখেও অন্ধকারের ঘোর জেগে উঠছে। যমুনার স্রোতের কলরোল সেই মাসুম আওরতের বক্ষের আলোড়নের মত উদ্দাম হয়েছে।

পারাবত ডানা মেলে উঠতে উঠতে ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছচে।

আকবর কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না, সে অলিন্দের কিনারায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল—এমন কোন আওরতের দেখা মিলবে না, যাকে দেখলে হঠাৎ তার চোখে চমক জাগবে! তাহলে শিবালীকে ভোলা যায়। শিবালীর সুরত তার মন ছিঁড়েছে, রক্তাক্ত করেছে বুক। বেদনায় তার সমস্ত দেহ নীল হয়ে গেছে। শিবালীর প্রত্যাখানে তার শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। সেই শক্তিকে পুনরুদ্ধার করার জন্যে এমন কোন বিজলীর মত রোশনী জ্বালা আওরত চাই। যে তার সব দর্দ ভুলিয়ে দিয়ে নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করবে। সেইজন্যে সে দিল্লীতে আওরতের জন্যে লোক পাঠিয়েছে।

এই যখন সে ভাবছে হঠাৎ বান্দা এসে সেলাম জানিয়ে খবর দিল—দিল্লী থেকে সকলে এসেছেন। রাজমাতা বেগমসাহেবাও এসেছেন।

মা, মাকে কে আসতে বললো? আমি তো মাকে আসতে বলিনি!

বান্দা সেলাম করে চলে গেল।

আস্তে আস্তে মনের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে লাগলো। মা এসেছেন! তাহলে এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফয়সলা হয়ে যাবে। কিন্তু কেন তিনি এলেন? তিনি যে মা, তাঁকে বলতে যে সমস্ত হৃদয় চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে! তিনি না এলেই কি পারতেন না? দোষ তাঁর যাই থাক্, অপরাধ তিনি যত কিছুই করে থাকুন, অন্তত সন্তান যে বিচার করতে পারে না, এ বোধ এখনও তার আছে।

কিন্তু এখন যখন এসেছেন, সে কি করবে?

মায়ের কথা শুনেই যে তার সমস্ত প্রবৃত্তি বিদ্রোহের অগ্নিতে সিঞ্চিত হল। শিবালীর পরিণাম, তার অবস্থা, সবই যে মায়ের পাপে, এ তো সে ভুলতে পারবে না! বিশেষ করে শিবালীর

অধঃপতনে তার ক্ষতি হল বেশী। মহব্বত ফুটলো না কুসুম বৃন্তে। সেই ক্ষোভ লুকিয়ে রাখবে সে কেমন করে?

দিল্লী থেকে আগত ব্যক্তিদের সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। নূরউল্লাকে দেখে আশ্বস্ত হল, আবতুল লতিফকে দেখে উল্লসিত হল, পীরমহম্মদকে দেখে সেলাম জানালো—কটি খুবসুরত আওরতের দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে মনে মনে মৃদু হেসে—তারপর মায়ের দিকে সে তাকালো।

হামিদা পুত্রের বদনে চোখ না রাখতে পেরে মাথা নত করে রেখেছিলেন।

আকবর সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো, তারপর সকলকে বিশ্রামের জন্যে অনত্র যাবার জন্যে বলে মায়ের আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়ালো।

কক্ষের মধ্যে আর কেউ নেই। শুধু আকবর ও হামিদা বানু।

আকবর হঠাৎ এই রমণীকে ক্ষমা করবে না বলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। এখন ইনি তার মা নয়। ইনি একজন অপরাধিণী রমণী। বহু অন্যায় করে এখন বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়েছেন, বাদশাহ তার বিচার করবে! হ্যাঁ, কঠিন বিচার। কাজির বিচার। কোমলাঙ্গী বলে কোন ক্ষমা নয়। আওরত ব্যভিচারিণী, বিশ্বাসহন্ত্রী। তার উপযুক্ত শাস্তি বড় চরম।

আকবর আবার তাকাল মায়ের নতমুখের দিকে। মা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, পুত্র তার বিচার করবে। তাই অন্যসময় হলে যিনি ছুটে এসে পুত্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতেন, তিনি দূরে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তস্কে সঙ্কোচের মধ্যে কালাতিপাত করছেন।

সেইজন্যে আরো ক্রোধ আকবরের মধ্যে জেগে উঠলো। অপরাধী সে জানে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব!

হঠাৎ বাদশাহ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো—রাজপুত লেড়কী কোথায়?

হামিদা জানতেন, আকবর এই কথাই সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করবে। তাই শুনেই তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। তিনি মুখ তুললেন, ছ'চোখে জল টলমল করছে। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—সে হারিয়ে গেছে।

হারিয়ে গেছে!

হ্যাঁ। ইনসান তার জিন্দিগী বরবাদ করেছে!

নেহি ঝুট্। তুমি ঝুট্ বলছো।

পুত্রের তীক্ষ্ণকণ্ঠস্বরে হামিদা চমকিত হলেন কিন্তু তিনি নিস্তেজ রইলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন—ঝুট্ নেই বেটা আমি সাচ্ বাতই বলছি। শিবালীর ইজ্জত হারেমের ছুষমন লুটে নিয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি না। তুমি চক্রান্ত করে তাকে ছুষমনের কাছে ঠেলে দিয়েছ।

আমি?

হামিদা কেমন যেন নিজের পুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে নেই। তাঁর মনে হতে লাগলো তিনি এক অন্যব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে কৈফিয়তের সওয়াল দিচ্ছেন। জবরদোস্ত কোন এক হাবিলদার ব্যক্তি।

আকবর তখন চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে। একেবারে ক্ষোভের শেষ সোপানে। মাথার মধ্যে তার আগুনের প্রদাহ। মায়ের উপর কোন করুণা নেই। যিনি তার মা, তিনি অন্য রমণী। যিনি তার সামনে সমস্ত অপরাধের বিচারের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তার মা নয়।

তাই রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করে বললো—যে আওরত ঝুট্, সে সাচ্ বাত বলছে, একি আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

আমি ঝুট্! বেটা তুই একথা বলছিস্? হামিদা কেমন যেন ককিয়ে উঠলেন।

কে তোমার বেটা? আমি কোন নকলী আওরতের বেটা

নয়। আমার মা, আমার পিতার কবরের সঙ্গে কবর শায়িত হয়েছেন। সেই মায়ের আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। এখন যদি কেউ মা বলে পরিচয় দেয়, তাহলে আমি তাকে নফরৎ করবো।

রোখ্ যা বেটা। রোখ্ যা। অউর মাত না কহো। আমার সমস্ত হোঁশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

টলে পড়ে যেতে যেতে হামিদা একটা কেদারার পিঠ দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। চোখদুটি তার ঝাপসা হয়ে গেল। বেহোঁশ হয়ে যেতে যেতে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। এখনও অনেক বাকী আছে। পুত্রের হাতে চাবুক। সে চাবুকের আঘাত যে এখনও শেষ হয় নি। ফিস ফিস করে বললেন—আর কোন কিছু বলার আছে! আর কোন অভিযোগ!

আকবর কেমন যেন দমে যেতে লাগলো। মাকে যে সে বড় পেয়ার করে। মাকে এমন করে বলতে যে তার সমস্ত শরীর মন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে যে ভুলতে পারছে না তার অধঃপতন। কেন সে দিল্লী দুর্গ ছেড়ে দরবেশের পোষাক পরে ফেরার হয়েছিল, তা অজ্ঞাত নয় অজ্ঞাত নয় শিবালীর বরবাদী জীবন। শিবালী তাকে প্রত্যাখান ক'রে তার মহব্বতের প্রথম জন্মকে নষ্ট করে দিল। সে আজ মনপ্রাণ অপবিত্র করে সুরা ও রমণীতে আসক্ত হয়ে উঠেছে। এ সবের জন্যে দায়ী কে? দায়ী এই সামনে দণ্ডায়মান তার মা। না, না এ তার মা নয়। মা মরে গেছে। মা রাজসিক হারেমের বিলাসের মধ্যে সস্তা এক রমণীর চরিত্র নিয়ে পুত্রের স্নেহ ভুলে দেহগত সুখের আরামে সব বিস্মৃত হয়েছেন। এখন তার বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে কম্পিত হয়ে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন।

না, কোন অনুগ্রহ নয়। শুধু আঘাত ও প্রতিঘাত। এই [illegible] যদি তাতে কোন চৈতন্য হয়, তবেই মঙ্গল। যা গেছে, তা তো ফিরে আসবে না।

তাই আকবর আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললো—তুমি কি প্রমাণ করে দিতে পারবে, আমি যেসব কথা বললাম—সব ঝুট্?

হা আল্লা। হা খোদা। আমার বেটার কাছে আজ কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে, আমার চরিত্রের মধ্যে কোন গলতি হয়েছে কিনা!

তারপর আকবরের দিকে ফিরে বললেন—বলো কি জানতে চাও? তারপর নিজেই বললেন এর চেয়ে মৃত্যুও যে ভাল ছিল। আমি কি করে আমার বেটাকে বোঝাবো, আমার চরিত্রের মধ্যে কোন কলঙ্কই লাগে নি। আমি মৃত সম্রাট হুমায়ুন শাহের প্রিয়তমা বেগম। সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান। তবে কি কেউ চক্রান্ত করে আমার পুত্রের মনের মধ্যে বিষ ঢুকিয়েছে? রাজ্য ও রাজত্বের মধ্যে অনেক বিষাক্ত আবহাওয়া। কেউ চক্রান্ত করেও পুত্রের মনের মধ্যে এমনি দূষিত বাতাসের স্রোত প্রবেশ করাতে পারে। এই সম্ভব। তাই বললেন—বলো বাদশাহ, কে তোমার মনের মধ্যে এমনি সন্দেহের বীজ বপন করলো?

আকবর মায়ের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ করে চোখ বুজিয়ে বললো। বলতে তার বড় সরম জাগছিল।

আমি নিজের চোখে দেখেছি। একদিন আমার কক্ষের ছাদে দাঁড়িয়ে জেনানা মহলে তোমার কক্ষে চোখ গিয়েছিল। বেসরম সেই দৃষ্টি। সেইদিন থেকে আমার সব প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

হামিদার মনের মেঘ আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগলো, মনে পড়তে লাগলো পুত্রের পরিবর্তনের দিনটি।

শিবালীকে বাঁচানোর জন্যে তিনি বৈরাম খানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বৈরাম খানের পা জড়িয়ে ধরে শিবালীর ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছিলেন।

সেদিন সে সময় কক্ষের স্বর্ণবাতিদানে প্রথম আলোর বিচ্ছুরণ জেগে উঠেছিল, বাইরে সন্ধ্যার ধূপছায়া নেমে আসছিল। মস্‌জিদে

আজানের জন্যে মিনার তোরণ দ্বারে মোল্লা দাঁড়িয়ে কাতর আহ্বান জানাচ্ছিল। মনে পড়ছে আজ। মনে পড়ছে সেদিনটির কথা।

কিন্তু পুত্র যদি সেই দৃশ্য দেখে থাকে, তাহলে তিনি বোঝাবেন কেমন করে বৈরাম খানই সেই দুর্মুখ যে নিয়েছে শিবালীর মাসুম ইজ্জত। না, তাহলে পুত্রের তরবারী বৈরাম খানের শোণিতে স্নান করবে। বৈরাম খান না থাকলে রাজ্য আর রক্ষা হবে না। একা পুত্র এই বিরাট রাজ্য কি করে সামলাবে? তেমনি তাকত যেদিন ফিরে আসবে, সেদিন না হয় খানসাহেবের অপরাধের বিচারের জন্যে পুত্রকেই উৎসাহিত করবেন।

তাই আজ শুধু বললেন—তুমি যা দেখেছ, ঠিকই দেখেছ। আমি তোমার চোখের দৃষ্টির কোন সমালোচনা করছি না। তবে তুমি আমায় বিশ্বাস কর। আমি যা কিছু করেছি ও করছি সবই তোমার ও রাজত্বের ভালোর জন্যে। সেদিন শিবালীর জন্যেই আমাকে তকলিফ পেতে হয়েছিল। শিবালীর ইজ্জত রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি। কোন মাসুম আওরত যে ঐ বিষাক্ত হারেমে একদিনও অটুট ইজ্জত নিয়ে বাস করতে পারে না, তারই প্রমাণ হয়েছে। তোমার গচ্ছিত রাখা সম্পত্তির এমনি অবমাননা দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি। আমার অক্ষমতাই আমাকে শোকার্তা করেছে কিন্তু তোমার অবহেলা আবার আমাকে বেদনা দিয়েছে।

হামিদা আবার দম নিয়ে বললেন—শিবালীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলাম তোমারই ভালোর জন্যে। তার ঝুট ইজ্জত তোমাকে অপবিত্র করলে তোমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। আমি জানতাম, তুমি তাকে পেয়ার কর। তুমি এই শিবালীকে আবার পেলে তোমার পেয়ারই বড় করে দেখবে, ইজ্জতের কোন দোহাই দেবে না কিন্তু আওরতের ইজ্জত যদি গেল তাহলে কি থাকলো? আজ তোমাকে বলতে কোন লজ্জা নেই পুত্র, আজ তুমি জওয়ান

হয়ে উঠছো। এরপর একদিন তুমি রমণী ও পুরুষের জীবনে অনেক গোপন রহস্যের খোঁজ পাবে। কিন্তু আওরতকে কখনও বেইজ্জতের দোষ দিও না। আমি মা বলে তোমাকে ক্ষমা করলাম, কোন আওরতকে এমনি অসম্মান করলে সে এক আত্মহত্যা করবে, নয়তো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। যদি অবশ্য তার ইজ্জত হানি না হয়ে থাকে।

আকবর কেমন যেন লজ্জায় মাথা নত করেছিল। মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। এই মাকে ভুলে কত নির্যাতন করেছে। তার সম্বন্ধে কত বিশ্রী কথা চিন্তা করেছে।

হামিদা তখন আবার বলে চললেন—শুধু শিবালী হারায় নি, আর একজন তোমার এই ভুলের মাশুল দিয়েছে। আলিমন। আজ আলিমনের জন্যে সবচেয়ে দুঃখ জাগছে। বেচারী লেড়কী। তোমার প্রাসাদ পরিত্যাগই আমার মনে জাগ্রত করলো, তুমি আর জিন্দা নেই। মৃত্যুই তোমার অশান্ত দেহকে দরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে।

তোমাকে হারানোর শোক আমাকে উগ্র করলো। ধ্বংস করতে চাইলো সব। সমস্ত ধ্বংস করে পুত্রহারার শোকে আহুতি দেব বলে এগিয়ে গেলাম। আলিমন তোমার জন্যেই হারেমে আমার তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠছিল। কিন্তু তার আর প্রয়োজন কি? যাকে কন্যার মত স্নেহ করে পুত্রবধূ করবো বাসনা ছিল, তা আর থাকলো না। সেই মাসুম লেড়কী অন্যের কামনার ইন্ধন হবে, এই বোধ জেগে উঠতে পারাবত প্রহরী ফরিদকে ইজ্জত নষ্ট করতে হুকুম দিলাম। জানতুম, ফরিদের মর্দানা তাকত বেএক্তিয়ার, সে আলিমনকে ভোগ করতে পারবে না কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল।

ফরিদ চলে যাবার পরই তোমার সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছলো। আর তখনই আমার অনুশোচনা তীব্র হল। আমি

আসবার সময় আলিমনের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম কিন্তু সে ক্ষমা করে নি। সে আমাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এখন বলো কার দোষ? আমার যদি কোন গোস্তাখি হয়ে থাকে, শাস্তি দাও। পুত্রস্নেহ যদি আমাকে চঞ্চল করে তুলে থাকে, তাহলে সে দোষও কি আমার?

তুমি আমাকে আসবার জন্যে কোন আমন্ত্রণ জানাও নি, তবু আমি এসেছি। পুত্রের কাছে মা আসবে, এতে আর আমন্ত্রণের কি আছে? আমি তাই তোমার সমস্ত অশ্রদ্ধাকে মস্তকে স্থাপন করে এসেছি। লাজলজ্জা আমার কিছু নেই। আমার পুত্র হবে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। স্বামী যে কবুল সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, পুত্রের মধ্যে দিয়েই তা সম্পূর্ণ হবে। এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই আমি সর্বদা তোমাকে দুনিয়ার সমস্ত অবিচার থেকে আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করছি কিন্তু কোথায় যেন মাঝে মাঝে আলোড়ন জেগে উঠে সব উলটে দিচ্ছে। জানি না শেষপর্যন্ত সেই অমৃতময় লক্ষ্যে গিয়ে পোঁছতে পারবো কিনা!

এইসময় আকবর ছুটে এসে মায়ের পায়ের তলায় বসে পড়ে পা দুটি জড়িয়ে ধরলো।

মা, আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমার লম্পট পুত্র। আমি বহুৎ বহুৎ অন্যায় করেছি। আমি তোমার মর্ম বুঝিনি। তুমি আমাকে এতো পেয়ার কর, আর আমি তোমায় পেয়ারের বদলে অনেক অনেক আঘাত দিয়েছি!

আকবর বালকের মত মায়ের পাদুটি জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো।

সমস্ত মেঘ যেন সরে গেল। আলোর প্রতিফলনে চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হামিদার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো। সস্নেহে হাতদুটি প্রসারিত করে পুত্রকে তুলে নিলেন। তারপর বললেন—মনকে দৃঢ় কর বেটা! ক্ষমা সবসময় তোমার জন্যে

আমার কাছে আছে। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। দুনিয়ার এমন এক নাম অঙ্কিত করতে হবে, যা কেউ কখনও করে নি।

মাতা ও পুত্র দুজনে বহুদিন পরে আবার একত্র মিলেছে। এই দুটি প্রাণের মধ্যে যে নিবিড় স্রোত ছিল, সে স্রোত হঠাৎ ভিন্নগামী হয়েছিল, সুর কেটে গিয়ে বিরাট এক ব্যবধান দুজনের মাঝখানে প্রাচীর তুলেছিল। আর কোনদিন এই দুটি হৃদয় একত্র মিলবে না, এমনিই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে ছিল। তারপর মিলতে, পুরোনো সম্বন্ধে জোড় লাগতে, পরিচিত সুর ফিরে আসতে দুজনে অনেকক্ষণ তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রোদন করলো।

হামিদার মনের মেঘ সরে গেল।

আকবরের বুকের ভার লাঘব হল। কিন্তু তার আবার সেই মুহূর্তে জেগে উঠলো, যা হারালো, তার মূল্যায়ন কেমন করে হবে?

মা জানে, শিবালী মরে গেছে। শিবালীর মৃত্যুর প্রয়োজন হয়তো ছিল, মার কথাই ঠিক। নষ্টা আওরতের ঝুটা সান্নিধ্যে মহব্বত রচনা করার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু সে শিবালীকে না দেখলেই বুঝি সম্ভব হত। শিবালী আবার তাকে দর্শন দিয়ে মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। এখন সেই ঝুট্ আওরত জেনেও তার হৃদয় পূর্বের মত উন্মাদ। শিবালী প্রত্যাখান করতে আরো প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে। আওরত সকলেই এক কিন্তু এক একজনের মধ্যে এমন এক আকর্ষণ থাকে, যা কিছুতেই প্রত্যাখান করা যায় না। শিবালীর মধ্যে সেই আকর্ষণ আছে।

সে শুধু দিল্ পুড়িয়ে চলেছে। দাহ সৃষ্টি করে নিজেও পুড়ছে, অন্যকেও পোড়াচ্ছে। সে নিজেকে গোপন করে নি। লোভের আকর্ষণে কলঙ্কিত জীবন নিয়ে তাকে কলঙ্কিত করে নি। অকপটে বলে দিয়েছে তার বর্তমান পরিচয়টি। সেইজন্যে তাকে সান্নিধ্যে চাইতে মন এতো আগ্রহী হচ্ছে। দস্যু একবার লুণ্ঠন করেছে তার রমণী রত্ন। সে তো ইচ্ছে করে আদিম প্রবৃত্তি নিবারণে

এগিয়ে যায় নি, সেইজন্যে দোষ তার কোথায়? তাকে কেন মানুষ আওরত জীবনের পবিত্রতা থেকে মাটিতে নামিয়ে দেবে?

এইসব কথাই এখন বার বার জাগে। মা আসবার পূর্ব পর্যন্ত সে শিবালীর খোঁজ নিয়ে জেনেছে, রাজপুত লেড়কী শুধু কেঁদেই চলেছে। সে বুঝি এমনি কাঁদতে কাঁদতে কোনদিন চোখের রোশনী হারাবে। বেহোঁশ দুনিয়ায় চলে গিয়ে মানুষের পৃথিবীতে বাস করে সমস্ত কামনা বাসনার উর্ধ্বে উঠে যাবে।

এমনি যদি কোন অবস্থায় গিয়ে পড়ে, তাহলে একটি সুন্দরী রমণী কুসুম বাগিচার অরণ্য থেকে চিরতরে বিদায় নেবে।

না না এ কিছুতে হবে না। শিবালীকে ফিরিয়ে দিতে হবে সম্মান। তার রমণী সম্মান। তার আশা, আকাঙ্ক্ষা। তার সুন্দর বেহেস্তের মত খোয়াব। তার মুখে আবার হাসি হাসবে। সে প্রথম দিনের মত লাজরক্তিম নয়নে ভুরু উত্তোলিত করে অপাঙ্গে দৃষ্টি ফেলে হাসবে।

সেইমুহূর্তে মনে পড়লো আলিমনকে কিন্তু আলিমনের কি ব্যবস্থা হবে? সেতো তারই ভুলের জন্যে হারালো ইজ্জত। কিন্তু আলিমনের জন্যে তার মনে কোন দোলা জাগলো না। তাকে সে কয়েকবার দেখেছে, আজ পর্যন্ত মনের মধ্যে কোন রোমাঞ্চ জাগে নি। মা যদি মনে মনে তার সঙ্গে শাদীর কথা ভেবে থাকেন, তাহলে বাকী চিন্তা মা-ই করবেন।

আলিমনকে ফরিদের বিবি করে দিলেই চলবে। ফরিদ তাদের গলতিতে লাভ করবে এক শরীফ আদমির লেড়কী। যার নসীব যেখানে গিয়ে ঠোক্কর খায়।

সম্রাটের চিন্তা শিবালীকে নিয়ে। রাজ সরকার তাকে দিতে চেয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়। একটি ভাগ্যহীনা রমণী বিমাতার অত্যাচারে দেশত্যাগ করে একটু আশ্রয়ের জন্যে ছুটে এসেছিল। তাকে মুঘল রাজ তাদের বংশের ঐতিহ্যে হারেমে এনে নিরাপদ

আশ্রয় দিয়েছিল। মহব্বতের জন্ম অনেক পরে। প্রথম দেখে দোলা জেগেছিল। সে প্রত্যেক পুরুষের রমণীর প্রতি স্বাভাবিক কারণেই জাগে। মহব্বতের জন্ম অনেক পরে মনের মধ্যে আলোড়িত করেছিল, আর তার পূর্ণতা আসে সেই যমুনার তীরে হঠাৎ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় তাকে মৃতবৎ দেখে।

মহব্বতের জন্ম অনুগ্রহ থেকেই সৃষ্টি হয়। অনুরাগ অনুগ্রহের আত্মীয়ের রূপ।

এই সময় হামিদা বললেন—বেটা তুম ক্যয়া সোচ্ রাহা? বাজে চিন্তায় মন আচ্ছন্ন করে মেজাজ খারাপ কর না। দুষমনের এই মর্জিকে পরিত্যাগ করে বাহুতে শক্তি সঞ্চার কর।

কিন্তু আম্মি, শিবালীর কি হবে? সে যে আমার সব মেজাজ বিলকুল খারাপ করে দিয়ে জিন্দেগী বরবাদ করে দিয়েছে!

হামিদা তাচ্ছিল্য করে বললেন—ছেড়ে দাও বেটা সামান্য এক আওরতের কথা। উপযুক্ত মর্দানা তাকত পেলে আচ্ছা আচ্ছা সুরতওয়ালী লেড়কী জেনানা মহলে মজুত হবে। আমি খুব শীঘ্র তোমার শাদি দেব বেটা।

আওরতের বিষয় নিয়ে মার সঙ্গে আকবরের আলোচনা করতে সরম জাগলো। সে সেই সরমে মাথা নত করলো। কিন্তু আবার আতঙ্কিত হল, শিবালীর কথা মাকে না বললেই তো নয়! সে জিন্দা আছে, সে এই হারেমে আছে, একথা মাকে না বললে কিছুক্ষণ পরে মা যখন জানতে পারবেন, তখন তার প্রতারণা ভেবে দুঃখ পাবেন। তাই সমস্ত লাজলজ্জাকে দূরে ঠেলে দিয়ে জিবের আড়ষ্টতাকে ধ্বংস করে চোখ বুজিয়ে বলে ফেললো—মা, শিবালী জিন্দা আছে। সে এখানে আছে। সে তোমার চাবুকের আঘাতে মরে যায় নি। শুধু কিছু বিশ্রী দাগ তার সুরতের ওপর বীভৎসতা সৃষ্টি করেছে। তারপর যমুনার কিনারায় অশ্ব

পৃষ্ঠে একদিন কেমন করে তাকে মৃতবৎ পেয়েছিল, তার ইতিহাস বললো। শুধু গোপন করলো তার সঙ্গে শিবালীর কথাবার্তা। আর গোপন করলো শিবালীর কাছে নিজেকে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা। শিবালী প্রত্যাখান করে এখন নির্জন কক্ষে একা বসে বসে রোদন করছে, সে কথাও বললো না।

হামিদা আকবরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে একযুগ চুপ করে থাকলেন। তারপর অনেক পরে অস্ফুটস্বরে বললেন—রাজপুত লেড়কী নেহি মরচুকা! জিন্দা হ্যায়! তাজ্জব কি বাত?

আবার বললেন—বাঁদীরা বেইমানী করেছে। জেনানা সর্দার ঝুট বাত বলেছে। আর—। হামিদা কেমন যেন বিবশ চোখে মর্মর দেয়াল ভেদ করে অতীতে চলে গেলেন। সেই কাফের লেড়কী তাঁর গোর চেপে ধরে দোয়া চেপেছিল। তিনি দয়া করেন নি।

দয়া করতেন, যদি জানতেন সে পবিত্র আছে। দস্যু তাকে নষ্ট করেছে। তার জন্যে দায়ী যেন সে নিজে। যেই নষ্ট করুক, আওরতের ইজ্জত গেলে মৃত্যুই তার ফিরে যাবার সহজ পথ। তাই চাবুক দিয়ে মেরে তাকে শেষ করে দিয়েছিলেন কিন্তু এখন শুনছেন, সে জিন্দা আছে। চক্রান্ত করে হারেমের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে।

হঠাৎ তাঁর মনে আবার সেই ক্ষোভ সঞ্চারিত হল। ইচ্ছে হল, এখুনি হুকুম পাঠিয়ে দিল্লীর অন্তঃপুরের সেই চক্রান্তকারী স্ত্রীলোকদের ধরে নিয়ে এসে বেইমানের শাস্তি দেন কিন্তু শক্তি তাঁর বড় সীমাবদ্ধ। উৎসাহ থাকলেও সহজ নয় সেই বিচার। হিংসা, প্রতিহিংসা, চক্রান্ত হানাহানি শুধু চলেছে। আর সে চলবেই যতদিন না পূর্ণশক্তি তাদের আয়ত্বে আসে।

এই সময় আকবর বললো—আম্মি, তাহলে শিবালীকে নিয়ে কি করবো?

মৃত্যুই তার সহজ পথ। আত্মহত্যা যদি না করতে পারে, তাহলে গুপ্তহত্যা করে তার মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করে দাও।

এই কথা শুনে আকবর শিহরিত হয়ে মায়ের ভাবলেশহীন প্রস্তরবৎ কঠিন মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

২২

মা' শুকেরে বুকে ল'য়ে কাহারো শয়ন,
বিরহ-ব্যথায় কারো ঝরিছে নয়ন ;
হরষে মগন কেহ প্রিয়তমে পেয়ে
প্রতীক্ষায় পথপানে কেহ আছে চেয়ে !
কত যে বিভেদ আহা এই দুইজনে,
বুঝি কেমনে তুমি বুঝিবে কেমনে ?
ফরক আস্ত্ মিয়ানে আঁকে ইয়ারশ্ দর্‌বর্
বা আঁ কে দো চশম্ এন্‌তেজারশ্ বর্‌দর্।

শেখ সাদীর বয়েৎ। শেখ সাদীও কি তার মত এমনি জখম হয়েছিলেন ? না'হলে এমন কথা এল কেমন করে ? এযে সাচমুচ বেউকুব দিলের মুসিবাদ কী সওয়াল!

আমার শক্তি চলে গেছে। আমি হারিয়েছি জিন্দেগী। এখন বেঁচে আছি এক বেহোঁশ চেতনা নিয়ে।

তবে কি এরই নাম মহব্বত? এই যদি মহব্বতের আসল তকমা হয়, তাহলে চাই না সে মহব্বত। বরবাদী দুনিয়াতে কেউ বাঁচতে পারে না, আমিও বরবাদী দুনিয়া চাই না। কিন্তু শিবালীকে চাই না এ কথাতো বলতে পারবো না! সে যে আমার হৃদয়ের স্পন্দন, খুনের লালরঙ, আসমানের সব চেয়ে বড় উজ্জ্বল তারা। তাকে পাই নি বলেই তো এই জখম

দিল। এই এত কথা। এই হাহুতাশ। এত করুণ সুরের মর্মভেদী কান্না।

বাদশাহ আকবর নিজের খাসকক্ষে বসে শুধু ভেবে চলেছে। দুনিয়ায় কোমল মনের অনেক দুঃখ। মীর আবদুল লতিফ বলেন—দুখ পাওয়া উচিত। আঘাতে আঘাতে বিজলীর চমক ঠিকরোয়, শরীরটা বাইরের আকৃতি। শরীরের ভেতরে আছে যত কলকব্জা। সে কল বড় কোমল, সামান্য ছোঁয়াচে স্পর্শকাতর হয়। সেই স্পর্শের মাঝে আনতে হবে সহনের আর্তি। সহন আসে অধ্যবসায়।

সেই অধ্যবসায়ের কাল তোমার চলেছে। তোমার মন এখন ...ঞ্চল। চঞ্চল মনে শুধু ঢেউয়ের কানাকানি। ঢেউ যখন থামবে, ... অনেক জল, সেই জল ঝরে ... এক ফোঁটা জল ...াকবে না। কোন আঘাতে ...র ওপরে বসে দুনিয়ায় নতুন এক

... আসবে না। হৃদয় এই সব আধ্যাত্মিক ... ...ওয়াল শুনতে চায় না। এখন মনে হয় মীর আবদুল লতিফ একজন ধাপ্পাবাজ লোক। ভাল বাত শোনাবার জন্যে তার নোকরী বলে ভাল বাত শুনিয়ে যায়। আসলে এই সব কথার কোন অর্থ হয় না। মানুষ চঞ্চল, সে স্থির নয়। যেদিন সে স্থির হবে, সেদিন তার মৃত্যুই হবে। চঞ্চল মানুষের কলরবেই দুনিয়া মুখর, যেমন বিহঙ্গকুলের কলকাকলি। যার চঞ্চলতা নেই, পৃথিবী তার অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

মা আসার পর থেকে সে পাঁচ দিন তার এই কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ আছে।

দিল্লী থেকে যে আওরতগুলি এসেছিল, তাদের এক এক করে —সে এই কক্ষে আনিয়েছে। উদ্দেশ্য, যদি কারো সুরত তার মনে

ধরে, তাহলে তাকে গ্রহণ করে শিবালীর দুঃখ ভুলবে। সেইজন্যে একটি একটি নানাজাতের মরসুখী ফুল চোখের সামনে মেলে ধরেছে। কারো সুর্মালাঞ্ছিত চোখ, বঙ্কিম কটাক্ষ, উন্নত নাসিকা, উদ্ধত গ্রীবা, ত্রিকোণসদৃশ চিবুক, ঘনকৃষ্ণ ভুরুদ্বয়, সুডৌল মুখাকৃতি, সুউন্নত বক্ষ, ক্ষীণকটি, ভারী নিতম্ব—এমনি সব বিভিন্ন রূপের সৌন্দর্য নিয়ে নওজোয়ান আকবরের সামনে দাঁড়ালো।

এখন আর আকবরের লজ্জা করে না। সে যেন দু'চার বছরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, এমনি অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত কারো চোখে, কারো চিবুকে, কারো বক্ষে, কারো নিতম্বের ওপর চোখ রাখলো। হঠাৎ আকর্ষণ অনুভূত হয় কিন্তু কেমন যেন জমাট বা[illegible]
না। মনের তারে কোথায় [illegible]
কি বেহাগের ছন্দে ধর[illegible]
জাগিয়েছে, সেখানে যে অ[illegible]
না। তাই যারা মনে অনেক [illegible]
এসেছিল, তারা রাজকুমারের চোখের [illegible]
করে।

আকবর তাদের অবজ্ঞা করে না। শুধু ক্লান্ত স্বরে ব[illegible] [illegible]য় মজবুর হুঁ। আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। তোমাদের সুরত, যৌবন, দিল সব আছে, আমাকে হয়তো তোমরা হাজারো রাত খুশি রাখতে পারতে কিন্তু আজ আমার চোখে ধরেছে আঁধি রাতকা গজব, রোশনী হারিয়ে আমি বেউকুব হয়ে গেছি। দিলের মধ্যে ঢুকেছে দুষমনের হুশিয়ারি—তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। যদি আবার দেমাগ ফিরে পাই তাহলে তোমাদের স্মরণ করবো।

আগ্রায় যে সব ইয়াররা মহফিলের জন্যে এসে জুটেছিল, তাদের কেউ কেউ হুকুম নিয়ে কক্ষে ঢুকে বলল—আলেমপনা, তোমার একি মুসিবাদ কি ফরমাইস? সবে একটু রঙমহলের খোয়াব জমে উঠেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম, মজা বন্ কর দেও।

আকবর ইয়ারদের হেসে বলল—যে চিজ দিলের মজা বানায় না, চোখে শুধু আমেজ আনে—সে মজাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি চাইছি এমন একটা কিছু, যা কেউ কখনও করে নি। তোমরা কেউ সেই মজার খোঁজ দিতে পারবে ?

ইয়াররা নিরুত্তরে পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করলো।

আকবর এই সব সাধারণ লোকদের বোধের বাইরে কথা বলেছে বলে নিজে লজ্জিত হল, তাই হেসে বলল—যাও তোমরা আনন্দ করগে যাও। রঙমহলের আলো জ্বলেই থাকবে। জোর কদমে মহফিল কর। আরো সরাবের ফরমাইস পাঠিয়ে দিচ্ছি, নয়া তয়ফা, নয়া মাসুম চিড়িয়া।

ইয়াররা বাদশাহের জয় ঘোষণা করে বিদায় হল।

এই পাঁচদিনের মধ্যে আরো একটি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে চলেছে আকবর—শিবালীর গতিবিধি। মা চান, রাজপুত লেড়কীকে ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে। হয়তো তার হুকুম নেবার কোন প্রয়োজন মনে করবেন না। মায়ের সে ক্ষমতা আছে। মা পুত্রের ভালোর জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন। মায়ের মনের আকাঙ্ক্ষা আকবর বুঝে ফেলেছে। তাই মাকে আর তার ভুল হবে না। মা হয়তো অনেক মারাত্মক কাজ করবেন, সে শুধু পুত্রের মঙ্গলের জন্যে। পুত্রস্নেহে অন্ধ রমণী ছুনিয়ার সমস্ত কানুনকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবেন।

সেখানে আকবর মাকে বাধা দিতে পারবে না। তাই ভয় হয়, তার অজান্তে বুঝি মা শিবালীকে সরিয়ে দেবে।

রাজপুত লেড়কী সেই তারই নির্বাচিত কক্ষে আছে। সে শুধু রোদন করছে। চোখে তার কত জল আছে ? জলের শেষ কি নেই ? অশ্রু কি অপর্যাপ্ত জলাধার নিয়ে ঐ ছোট্ট বুকের জমিনে বাসা বেধেছে ? যখন বান্দাকে চুপি চুপি খবর আনতে বলে, তখনই সে এসে জানায়—বিবিজী রোতি হ্যায়। আবার যখন পাঠায় সেই জবাব।

আকবর রেগে যায়, বান্দাকে গালি দিয়ে বলে—কৌন বোলা তোমকো এইসি সওয়াল ?

জী, বাঁদী।

ঝুট্ বোলা। কেউ সারা দিনরাত কাঁদতে পারে ? যাও, আচ্ছা খবর লে আও। সাচ খবর নেহি হোনেসে তোমকো জুতি মারকে নিকাল দেউঙ্গা।

আকবরের ইচ্ছে করে শিবালীর কক্ষে যেতে। মা যখন প্রাসাদে আসেন নি, তখন সে স্বাধীন ভাবে জেনানামহলে গেছে, এখন মা আসতে তার যেন স্বাধীন্ সত্তা বিক্রিত হয়েছে। সরম নয়, মায়ের সম্মানের প্রতি হুশিয়ারী কানুন। জেনানামহলের কর্তৃত্ব রাজপুরীর সেরা রমণীর আয়ত্বে। মা তার সেরা রমণী, তার আয়ত্বাধীন পরিধিতে ঢোকার ক্ষমতা থাকলেও উৎসাহ নেই। তবু শিবালীর জন্যে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করতে আকবরের বাসনা হয় কিন্তু উৎসাহ জাগে না।

তাই এই বান্দার সাহায্য নেওয়া।

বান্দা এসে জানায়—হুজুর, সাচমুচ নয়া বিবি রোতি হ্যায়। দিনভর রোতে রোতে আন্ধা হো য্যাতি হ্যায়। নাস্তাপানি কুছ নেহি কিয়া। বেগমসাহেবা ভি মদৎ করনে গিয়্যা। মালকিন মুশকিল মে ফাঁশ গেয়্যি।

আকবরের মুখের ওপর হঠাৎ খুশি ঝলকে উঠলো। মা রাজপুত লেড়কীকে মদৎ করছেন! তার মা, তার আম্মি। তার সারা দুনিয়ার এক পেয়ারী মা। মা তার পুত্রের মনের কথা বুঝেছেন। পুত্রের জন্যে তিনি সব করতে পারেন। পুত্রের জন্যেই তিনি এই আওরতের কাছে নিজের সম্মানকে নামিয়ে এনেছেন। না হলে মা এক সামান্য রমণীর কাছে নিজেকে সঁপে দেবেন, এমন দেমাগ তার নেই। তিনি অনেক বড় বংশের মেয়ে। সম্রাটের প্রিয়তমা ভার্যা, তাঁর দেমাগ মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনেরও অনেক উঁচুতে। সেই মা

আজ বাধ্য হয়ে ঐ রমণীকে নাস্তাপানি করে তবিয়ৎ আচ্ছা করতে বলছেন। আর কি বলছেন মা? শুধু কি নাস্তাপানি করবার জন্যে অনুরোধ করছেন?

আকবর যেন মায়ের আরো সহানুভূতিপূর্ণ কথা শুনতে পেল। মা সেই ক্রন্দনমুখী লেড়কীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলছেন—মেরে বেটি উঠো। নাস্তাপানি করে তবিয়ৎ আচ্ছা করে নাও। সুরতের ওপর কত কালি পড়েছে দেখেছ? এমন করলে মেরে বাচ্চার দিল বিগাড় যাবে। সে তোমাকে বহুৎ পেয়ার করে। পেয়ার কী ইজ্জত সবচেয়ে উঁচা হ্যায়। আমি নিজে আওরত, আমার খসম্ সম্রাট আমাকে সবচেয়ে পেয়ার করতেন। তাঁর অন্য অনেক বেগম ছিল কিন্তু এমন পেয়ার কাউকে দেন নি। আমি সেই পেয়ারের সম্মান রেখেছি। সম্রাটের বংশের সেই পেয়ারের ধারা আমার জওয়ান পুত্রের মধ্যেও স্রোত বইয়েছে, আমি সেই পেয়ারকে কোতল করতে চাই না। উঠো, মেরে বাচ্চা কী দিল্ আচ্ছাকে লিয়ে মেরে সাথ তোম ভি মদৎ কর। বেটা তোমকো সবচেয়ে জাদা পেয়ার ক্যা ইনাম দিয়া হ্যায়।

এমনি কোন কথা কি মা বলছেন না? যদি বলেন তাহলে যে সবচেয়ে খুশি সে হবে। শিবালী যে প্রত্যাখান তাকে করেছে, মায়ের এই অনুরোধে কি তার সেই বজ্রের মত দৃঢ়সঙ্কল্প একটু শিথিল হবে না? নিশ্চয় হবে। এই মা একদিন এর মৃত্যু চেয়েছিলেন। মৃত্যুর জন্যে চাবুকের দ্বারা সহস্র দাগ সৃষ্টি করেছেন। আজ মদৎ করছেন। পুত্রের জন্যে অনুরোধ করছেন।

শিবালী কি বিস্মিত হবে না? তার মত এক ভাগ্যহীনা কিশোরীর ভাগ্যে এই সৌভাগ্য! পূর্বে স্বয়ং বাদশাহ তাকে ভালবাসা দান করেছে, এখন রাজসম্রাজ্ঞী তাকে বেটির সম্মান দিয়ে সোহাগ জানাচ্ছেন!

আকবরের মনে আবার খুশির রঙবেরঙের পালতোলা নৌকো

অসীম জলরাশির বুকে নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে চললো। খুশির মেজাজে আবদ্ধ কক্ষের মধ্যে পুরো একদিন অতিবাহিত হল, তারপর আস্তে আস্তে উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল।

কোথায় পরিবর্তন, না মা এল, না এল সেই লেড়কী। মহব্বতের নিশানা ছুটে গেল, সরাবী আঁখোতে আর আমেজের বুদ্ধুদ নেই। নেই মনের মধ্যে কোন উষ্ণস্পর্শের মাদকতা, উৎসবের সমারোহ।

হঠাৎ তার রাগ চড়ে গেল। বেরিয়ে পড়লো খাসকক্ষ থেকে। চলে গেল পশুশালায়। খাচার মধ্যে ছুটি ক্ষুধিত সিংহ ধরা ছিল। কোন এক জঙ্গল থেকে এমনি অনেক পশু ধরে খাচার মধ্যে বন্দী করে রাখা হত। ছিল ব্যাঘ্র, সিংহ, গণ্ডার, হরিণ, বন্যমহিষ। এদের পোষ মানিয়ে ময়দানে যুদ্ধ দেখবার জন্যে আনা হত। হঠাৎ সেখানেই চলে এল আকবর।

খুলে ফেললো ছুটি সিংহের খাঁচা। সিংহ ছুটি ক্ষুধার জ্বালায় ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করে তেড়ে এল। আকবরের হাতে ছিল একটি ধারালো ছোরা। তারও শরীরে ছিল রাগ। সেও ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সিংহ ছুটির ওপর।

প্রাসাদের লোকেরা হায় হায় করে উঠলো। মুনিম খাঁ বুঝলেন বেয়ারা বাদশাহের জান এবার খতম হবে।

অন্তঃপুরে কান্নারোল উঠলো। হামিদা বোরখা ঢেকে ছুটে এলেন কিন্তু কে তখন বাদশাহকে বাঁচাবে?

আকবর তখন ছুই সিংহের বিশাল দেহের মাঝখানে শিশুর মত। বার বার সেই হিংস্র সিংহ ছুটি দাঁত দিয়ে ও নখ দিয়ে আকবরের নরম দেহ ছিঁড়ছে। বাদশাহের শরীর চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। ছিন্ন প্রায় কামিজের ওপর শুধু তাজা রক্তের ছোপ।

সিংহ ছুটি গর্জন করছে ভীষণ। সামনে মনুষ্য শিকার। নরম পুষ্ট মাংস। অনেকদিনের উপোসী দেহ। ক্ষুধার জ্বালায় বিশাল

উদরে পাক দিচ্ছে। তাছাড়া এমন লোভনীয় শিকার বড় সহজে একটা মেলে না। তাই প্রবল আক্রোশে দেহ ফুলিয়ে তারা ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ করছে। যেন অনেকদিনের শত্রু, অনেক প্রচ্ছন্ন রাগ শরীরে জমা আছে, এবার সেই সব রাগ ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো।

আর আকবর! মুঘল বংশের বর্তমান বংশধর আকবর তখন কি ভাবছে, বোঝা যাচ্ছে না। তবে তার ভীষণাকৃতি দেখে অন্যান্য রাজন্যরা ভয়ে জড়োসড়ো। তারা ভাবছেন, এই জোয়ান পুরুষ যদি সিংহ বধ করে অজেয় হয়, তার হিম্মতের কাছে প্রত্যেককেই মাথা নত করতে হবে।

এদিকে হামিদা ও অন্যান্য রমণীরা অন্তরালে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন—ওকে বাঁচাও। হিংস্র পশুরা ওকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু কে বাঁচাবে? ক্ষুব্ধ দুই সিংহ ও সিংহীর সামনে যাবার সাহস কারো নেই। কয়েকটি রক্ষী হুকুমের ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

পশুশালার সামনে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে এই মৃত্যু অভিনয় সংঘটিত হচ্ছিল। পশুশালার রক্ষক সর্দার জলমন খাঁ এগিয়ে এল, পাশ থেকে কে যেন তাকে টেনে নিল। ভীড়ের জন্যে সেই হাতের মালিককে লক্ষ্য করা গেল না।

এদিকে আকবর সর্বশক্তি নিয়োগ করে সিংহের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। তার হাতে একখানি শুধু ধারালো ছুরিকা। সে কায়দায় পেলেই ছুরিকা প্রবেশ করাচ্ছে সিংহের দেহান্তরে। শুষ্ক হাতের মাঝখান দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ছুরিকা ও রক্তের স্রোত নিয়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে। যন্ত্রণায় সিংহ দুটি গর্জন করে লম্ফ দিয়ে পালটা আক্রমণ করে আকবরকে দ্বিগুণভাবে ক্ষতবিক্ষত করছে। এমন সময় একটি থাবা আকবরের একটি চোখের ওপর পড়লো। চোখটি মুহূর্তে স্থানচ্যুত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আকবর টলে

পড়লো কিন্তু সে সামান্য সময়। তার তখন উত্তেজনা মাথার মধ্যে আগুনের সৃষ্টি করেছে।

হামিদা আতঙ্কে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ওকে তোমরা বাঁচাও! ওকে তোমরা বাঁচাও!

কিন্তু কেউ শুনছে না সম্রাজ্ঞীর কথা। তখন আদেশ নয়, অনুরোধ। হুকুম নয়, ভিক্ষা। তাই বোধ হয় কারোর শোনার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া শুনবে কেন? এইতো সুযোগ! বাদশাহ সরে গেলে আবার একটি নতুন পরিবর্তন! তাতে লাভ বৈ ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

তাই সম্রাজ্ঞীর আদেশ কেউ মানছে না। যদি বাদশাহ রক্ষা পায় তাহলে এই অমান্যের শাস্তি পেতে হবে কিন্তু সেই অদূর চিন্তা কে করে? এখন পূর্ণ আস্থা, বাদশাহ পরিত্রাণ পাবে না। সুতরাং তাদের লাভই হবে।

তাই চক্ষু উৎপাটিত হতে অনেকে মনে মনে উল্লসিত হল কিন্তু বাইরে তারা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো।

আকবরের একটি চোখ ঝুলে পড়েছে। মুখমণ্ডলের ওপব হাজারো নখাগ্রের চিহ্ন। রক্তে শুধু মুখ ভাসছে না, সমস্ত শরীর চুঁইয়ে রক্তের ঢল নামছে। দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে, ঘাম ঝরছে দারুন উত্তেজনায়। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে হাঁফাচ্ছে আকবর, তবু তখনও বিক্রম কম নয়। বিক্রম কম হলে যে অপরপক্ষ তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। একটি সিংহ হলে হয়তো এতক্ষণে সে কাবু করতে পারতো কিন্তু দুটি। দুটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। একটি আক্রমণ করলে অন্যটি সুযোগ বুঝে এসে পালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই দুদিকে দৃষ্টি রেখে যেতে হচ্ছে কিন্তু মাঝে মাঝে সে তা পাচ্ছে না, তাই অপরপক্ষের কামড়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে।

এখন আর তার মনে নেই, সে কেন সিংহের খাঁচা খুলে তাদের

আক্রমণ করলো? কার ওপর আক্রোশে এই বিপরীত ভূমিকা! সিংহ তার কোন ক্ষতি করে নি। তবে কি তুনিয়ার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই প্রতিহিংসার ভূমিকা? কে জানে, আকবরের মনে তখন কি ছিল?

কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, একটি সিংহ বিকটাকার চীৎকার করতে করতে ভূমিতে চিরশয্যা গ্রহণ করলো। অবশিষ্ট আর একটি, কিন্তু তার শেষ গর্জন আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে। সম্ভবত সেটি সিংহী। সিংহীর তেজ আরো বেশী, সে রক্তাক্ত অবস্থায় হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে বার বার আকবরকে আক্রমণ করতে লাগলো। আকবরের হাতে সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। সে ছুরিকা উত্তোলিত করছে, ও সিংহীর সর্বাগ্রে বসিয়ে চলেছে। সিংহী যন্ত্রণায় বড় বড় লাফ দিয়ে আকবরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। আকবর ক্ষিপ্র-গতিতে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাচ্ছে। সিংহী আততায়ীকে আক্রমণ করতে না পারার নিস্ফল আক্রোশে আরো ক্ষিপ্ত হচ্ছে। সে দারুণ হাঁফাচ্ছে, নিঃশ্বাসের দ্রুততায় তার সমস্ত শরীর আলোড়িত হচ্ছে।

তবু সে পশু, তার যেমন শরীর বিশাল, তেমনি ক্ষমতা অপর্যাপ্ত কিন্তু মনুষ্যশরীরে আকবর? তবু আকবরই যেন জয়ী হল। সিংহী আরো কয়েকটি লম্ফ প্রদান করে শত্রুকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে এক সময় ভূমিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে আরামে চোখ বুজলো। তারপর তার দেহ চিরআরামের কোলে ঢলে পড়লো। নিস্পন্দ অসাড় হয়ে গেল দেহ।

আকবর কিছুক্ষণ টলায়মান দেহে ছুরিকা হাতে সিংহীর দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর সিংহীর আর নড়াচড়ার শব্দ না দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল। অগণিত দর্শকের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ তার নিজের চোখটির কথা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে বসে পড়ে চোখটি চেপে ধরলো, তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল।

এবার ছুটে গেল আমীর ওমরাহ রক্ষীরা।

হামিদা তখন বীর পুত্রের জয়ে গর্বিতা, তবু সন্তানের জীবন সংশয়ের ভয়ে আতঙ্কিতা। চীৎকার করে বললেন, আমার বেটাকে আমার খাসকক্ষে নিয়ে চলো। উপযুক্ত শুশ্রূষার দরকার। হাকিমকে খবর দাও।

তিনি যেন কেমন পাগল হয়ে কি করবেন ভেবে না পেয়ে আনন্দে, হরষে, বেদনায়, আতঙ্কে প্রলাপ বকতে লাগলেন।

২৩

তুনিয়া ঠিকই আপন নিয়মে চলেছে। তার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। তার পরিবর্তন সহজে বোঝবার উপায় নেই।

মানুষের পরিবর্তন বোঝা যায়। অমোঘ কালের পলিমাটিতে পড়ে তার আকৃতির ওপর ছোপ পড়ে। যে শিশু জন্ম নিল, তার বৃদ্ধি কেউ রুখতে পারবে না, সে বৃক্ষের মত লতাপাতার সমন্বয়ে বেড়ে উঠবেই। কিশোর যুবক হবে, যুবক প্রৌঢ় হবে—এ নিয়তির বিধান।

তাই সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রাণীর এই বৃদ্ধি কেউ রুখতে পারবে না। রুখতে গেলে প্রাণীর জন্মের প্রথম সূচনাতে ফিরে যেতে হবে।

আগ্রা প্রাসাদেরও কটি দিন বিদায় নিল। নব সংস্কৃত এই প্রাসাদপুরীতে এখন নব নব মনুষ্যের কলরব। যমুনা আর এখন শান্ত নেই, তার বুকে এখন নৌকোবিহার চলেছে। নারী-পুরুষের কলগুঞ্জনে সেই নিস্তব্ধ জলোচ্ছ্বাস এখন মুখর।

এসেছে দিল্লীপ্রাসাদ থেকে অনেক লোক। অন্তঃপুরে অনেক

রমণী এসেছে। হুমায়ুনের কটি বেগম এসেছেন। হামিদা যাদের ভালবাসেন তাদের সব আনিয়েছেন। আলিমনকে আনিয়েছেন, শাহজাদা হিন্দালের প্রথম বেগমের কন্যা রুকমিকে আনিয়েছেন। আনিয়েছেন আরো কটি কুমারী আত্মীয়াকে। শাহজাদা আসকারীর একটি কন্যা আমিরজান, কামরানের দুটি কন্যা হাজী ও গুল-ইজারকে। গুলবদন এসেছেন, সঙ্গে তাঁর দুটি কন্যা উমরি ও গুলজার-ই।

এর মধ্যে রুকমিকে নিয়ে হামিদা কিছু ভাবছেন। রুকমির ওপর তাঁর কর্তব্য আছে। হিন্দাল তাঁদের জন্যেই মৃত্যুকে বরণ করেছেন? তাঁরই কন্যা রুকমি।

আকবরের দ্রুত শাদী দিতে হবে। শাদী না দিলে অশান্ত মনের কোন স্থিতি আসবে না। রাজকার্যে সে একেবারেই মন সংযোগ করে না। আজ না হয় অনভিজ্ঞ বলে তাকে পরিত্যাগ করা হয় কিন্তু চিরকাল তো এইভাবে যাবে না। তাই হামিদা মায়ের কর্তব্য নিয়ে গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে আছেন। দীঘিতে জাল ফেলে ধীরে ধীরে তীরে ভেড়াতে হবে।

এসেছেন আর একজন রমণী। মাহাম আনাঘা। এই রমণীটিকে অনেক দিন ধরে মনে মনে হামিদা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি আসতে হঠাৎ হামিদার বুকে বল ফিরে এল। ইনিও আকবরের শিশুকালের ধাত্রীমা ছিলেন।

আকবরের ধাত্রীমা ছিল অগুণতি। যার কোন পূর্ণ তালিকা নেই।

তবে প্রত্যেকের জন্যেই নিজামতের মাসোহারা ছিল, তারা যে যেখানেই থাকুন, মাসোহারা ঠিকমত রাজসরকার থেকে প্রেরিত হত। তবে কয়েকজন তখনও রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন নাদীম কোকার পত্নী ফকিরউন্নিসা। নাদীম কোকা সৈন্য-বিভাগের কর্মচারী। খাজা গজনীর পত্নী ভাওল আনাঘা। খাজা

গজনীও তাই। জিজি আনাঘার কথা আগেই বলা আছে। শামস উদ্দীনের বিশ্বস্ততা আকবরও ভোলেনি। তোগ বেগীর পত্নী কোকা আনাঘা। তোগ বেগী অশ্ব থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন বলে তাঁর পত্নী বেওয়া হয়ে অন্তঃপুরেই কাল কাটাচ্ছেন। হাকিমা, বিবিরূপা, জহবানী, দয়াভায়ল আরো অনেক ধাত্রী অন্তঃপুরে ছিলেন। ছিলেন আরো দুজন, সাদৎ ইয়ার কোকার মা খালদর আনাঘা ও জৈন খান কোকার মা পিজা জন আনাঘা। সাদৎ ইয়ার ও জৈন খান এক হাজারী মনসবদার হয়ে রাজপদ অলঙ্কৃত করে আছেন। আকবর তার প্রতিটি ধাত্রীমাকে শ্রদ্ধা করতো বলে রাজসরকার থেকে বিশেষ ব্যবস্থা তাঁদের জন্যে করে দিয়েছিল। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তার জন্যে মায়ের প্রতি যেমন তার কর্তব্য আছে, তেমনি আছে পালিতা মায়েদের জন্যে। তাঁরা একদিন স্নেহময়ী ক্রোড় দিয়ে, বক্ষের সুধা দিয়ে তাকে পুষ্ট না করলে আজ তার এই বৃদ্ধি কেমন করে হত? বেতনভোগীরা শুধু কি বেতনই নেয়? কোন কর্তব্য করে না? তার প্রমাণ এই ধাত্রী-মায়েরা। আকবর তার বিবেকবুদ্ধি দিয়ে সব সময়ে এই ধাত্রীমায়েদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে।

মাহাম আনাঘা স্বামীর আবাস লাহোর প্রদেশের বুরনা অঞ্চলে গিয়েছিলেন, পুত্র আধম খাঁ এখন উপযুক্ত, তাঁর বাসনা ছিল, পুত্রকে নিয়ে তিনি রাজপরিবারে এসে আস্তানা নেবেন। আধমকে উপযুক্ত পদে বহাল না করলে শান্তি নেই। রাজসরকারের নিয়ম ছিল, ধাত্রীমার স্বামী ও পুত্র নিজামতে উচ্চপদ পাবে। আধম খাঁর পিতা ছিলেন হুমায়ুনের পার্শ্বচর, এখন আধম খাঁ উপযুক্ত হয়েছে, সুতরাং তার দাবী অগ্রগণ্য।

কিন্তু যাই যাই করেও মাহাম বেগম স্বামীর আবাস ছাড়তে পারেন নি। এইসময় দুবার গেল সম্রাজ্ঞীর খত নিয়ে অশ্বারোহী দূত। 'বহিন, জিও, ঔর জিনে দো। তোমায় বেটা জালালুদ্দিন

বড় বিপদে পড়েছে। আমি একা, তাকে ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। আমার পাশে কেউ নেই, যার বুদ্ধি নিয়ে কাজ করবো। এসময়ে তোমার সাহায্য আমার বড় দরকার। সত্বর চলে এসো। সঙ্গে আধমকে আনতে ভুলো না।'

প্রথম খতের উত্তরে মাহাম আনাঘা কি ভেবে অশ্বারোহীকে বলেছিলেন—বেগমসাহেবাকে বলো, আমি মাস দুয়েক পরে যাবার চেষ্টা করছি।

অশ্বারোহী চলে গেলে মাহাম মনে মনে হেসে ভেবেছিলেন—তার উত্তর পেয়ে বেগমসাহেবা মুষড়ে পড়বেন, যদি অবশ্য তিনি সত্যিই বিপদে পড়ে থাকেন। তাঁর প্রয়োজনটা আর একটু বৃদ্ধি করবার জন্যেই মাহাম বেগম এই কৌশল অবলম্বন করলেন। আধমকে বললেন—বেটা, তৈয়ার হো যাও। দ্বিতীয় সংবাদ পাঠালেই আমরা রওনা হব। এবার রাজপুরীতে ঢুকে অন্যভূমিকা। এখন আর জালালের মা নয়, এখন অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব আমার। আমার হুকুমে বেগম মহিষী সব পাগল করবে। আর তোমার পদ উজিরের পদ! বৈরাম খানকে সরিয়ে যদি উজিরের পদ না দিতে পারি, তবে আমার আওরত জীবন ব্যর্থ। তবে ইয়াদ রাখবে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করলে কিন্তু বিপদে পড়বে।

মাহাম আনাঘার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। এমন বুদ্ধি সচরাচর আওরতের থাকে না। বিশেষ করে—সে সময়ের রাজপুরীতে কারো ছিল না। হামিদাবানুও তাঁর বুদ্ধির কাছে নগণ্য। এমন কি বড় বড় ধুরন্ধর রাজন্যরাও এই রমণীর বুদ্ধির কাছে মাথা নত করবেন। রাজনৈতিক চক্রান্তে, অন্তঃপুরের বিশৃঙ্খলাকে বুদ্ধির কৌশলে বশে আনতে তার ক্ষমতার তুলনা নেই। হামিদা মাহামকে জানতেন বলেই গোপনে লোক পাঠিয়ে তাকে আনতে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

হামিদার বিশ্বাস ছিল, মাহাম বিবি এলে অন্তত বুদ্ধি দিয়ে

সমস্ত বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন। দিন দিন যেরকম সমস্যার উদয় হচ্ছে, তাতে একার পক্ষে সামলানো মুস্কিল। অথচ অন্তঃপুরে কেউ নেই যার কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন।

আকবরই যেন একটি বিরাট সমস্যা। তার নব নব পরিবর্তন যেন তাঁকে চমকিত করছে। অথচ কঠোরহস্তে পুত্রের লাগাম চেপে ধরলে বেয়াড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। আবার বল্গা ছেড়ে দিলে ভেসে যেতেও পারে, তার জন্যেও আতঙ্ক। এইজন্যে আরও তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির দরকার, যাতে সব দিক রক্ষা হয়। নদীর দুকূল না ভাঙ্গে।

তাই আবার লোক পাঠালেন মাহামের কাছে।

মাহাম আনাঘা তৈরী হয়েই ছিলেন, পুত্রের হাত ধরে অশ্বে সওয়ার হলেন। পুত্রকে বার বার সাবধান করে দিলেন—বেটা এখানে যা বেয়াদপি করেছ, করেছ। রাজপুরীতে গিয়ে অক্ষরে অক্ষরে আমার কথা মেনে চলবে। আমার আদেশের এতটুকু অবমাননা করলে কিন্তু বিপদে পড়বে। রাজদণ্ড প্রতি কথায় কোতলের আদেশ দেয় মনে রেখো!

তারপর মাহাম আনাঘা আগ্রার রাজপুরীতে এসে পৌঁছলেন।

এক একজন পৃথিবীতে জন্মায় যেন রাজশক্তি নিয়ে জন্মায়। রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে যে যে গুণের সমাবেশ দরকার, তা যেন অনায়াসে করায়ত্ত। সে রমণী হোক বা পুরুষ হোক। মাহাম আনাঘার সে শক্তি ছিল। তাঁকে রাজতখতে বসিয়ে দিলে তিনি নির্বিবাদে রাজ্য পরিচালনা করতে পারতেন।

কিন্তু বিধাতা বিরূপ। মাহাম আনাঘা এক সৈনিকের জোরু। সিংহাসনের স্পর্শ তাঁর কাছে আসমান স্পর্শের মত। ভাগ্য যাকে ক্ষমতা প্রসারে সাহায্য করে নি, তাঁর বুদ্ধি সামান্য কক্ষের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু সুযোগও তো মানুষের জীবনে আসে? এইসব রমণী পুরুষের জীবনে সুযোগই সবচেয়ে মুল্যবান। আর

সেই সুযোগ এলে সদ্ব্যবহার করতে জানলে ভাগ্যের ওপর আর দোহাই দিতে হয় না।

মাহাম আনাঘা বোধহয় সেই সুযোগ নিলেন।

হামিদা তাঁকে কাছে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। অশ্ব থেকে বোরখা ঢাকা অবস্থায় নামার সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে একটি কক্ষের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পুরলেন। তারপর বাইরে জেনানা সর্দারের পাহারা রেখে মাহাম বিবিকে অকপটে সব বললেন। আকবর বড় মুসিবাদে ফেলেছে। এদিকে একটি রাজপুত লেড়কীকে পেয়ার করে, তাকে শাদী করতে চায়। অথচ সেই রাজপুত লেড়কী দিল্লীর অন্তঃপুরে রাজ চক্রান্তে ইজ্জত হারিয়েছে। জেনে শুনে এক ইজ্জতহারা লেড়কীর সাথে কি করে নয়া জমানার মিলন দিই! তাছাড়া বেটা এখন হিন্দুস্থানের বাদশাহ। তার চরিত্রের পবিত্রতাই সবচেয়ে দরকার। এই মরদ তাকত শুরুতেই যদি ঝুট আওরতের সঙ্গ পায়, তাহলে কি ভবিষ্যৎ তার সুখের হবে?

আরো একটি লেড়কীকে পেয়ার দিয়ে বড় করেছিলাম। সে আমারই আত্মীয়ের কন্যা। বচপন থেকে তাকে লালন করে হঠাৎ বেটার জন্যেই তাকে হারাতে হল। বলে হামিদা আলিমনের বর্তমান পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করে গেলেন। সেও এখন আছে এই অন্তঃপুরে।

তাছাড়া রঙমহলে চলেছে অহরহ মজলিশ। নতুন নতুন আওরত, তয়ফা নর্তকীতে রঙমহল মঞ্জিল সরগরম।

বন্ধ করবার উপায় নেই। শাসন করবার দিন চলে গেছে। রঙমহল থাকে ক্ষতি নেই। বাদশাহী নিয়মে এসব রীতি বাদশাহী ঠাট্। বিলাস জীবনের মধ্যেই আছে শক্তির ইন্ধন। আকবর মর্দানা জমানা পেয়েছে। আর তাকে নিষেধ করার কোন উপায় নেই। মুঘলবংশের ঐতিহ্যই পালন করছে! পিতা, পিতামহ

তৈমুরের চরিত্রের প্রতিচ্ছবিই তার মধ্যে সৃষ্টি হবে, এর মধ্যে কোন অবাক নেই কিন্তু বিলাসজীবন ছাড়া যে অন্য কর্তব্য আছে, এ কথা ভুললে চলবে কেন ?

এখনও সে নিজামতের কোন কাজকর্ম বোঝে না, বুঝতেও চায় না। আতালিক খানসাহেবের ওপর সব নির্ভর। বাদশাহ শুধু সিংহাসনে বসে, আর শাসন পরিচালনা করে আমীর ওমরাহরা। তাঁরা সর্বদা ষড়যন্ত্র করে চলেছেন। বিদ্রোহ লেগেই আছে। অন্যান্য বহু স্বাধীন রাজ্য মাথা তুলে মুঘল শক্তিকে ধ্বংস করতে চায়। নতুন কোন রাজ্য জয়ের উৎসাহ নেই, অথচ আকবরের রণকৌশল এই অল্পবয়সে সমস্ত হিন্দুস্থানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অল্পবয়সে যার বাহুতে এতশক্তি, সে না জানে পরিণত বয়সে কত শক্তি পাবে ? এই বলে হামিদা কদিন আগের সেই দুই সিংহ সিংহীর সঙ্গে আকবরের লড়াইয়ের কথা বললেন।

সেই পুত্রকে যদি আজকে সুচিন্তিতভাবে রক্ষা না করি, তাহলে কবরে গিয়েও শান্তি আসবে না। না, জানে খোদাতাল্লার কি অভিপ্রেত ? এই বলে হামিদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

মাহাম আনাঘা এর মধ্যে জিজ্ঞেস করলেন—শুনলুম আতালিক বৈরাম খানসাহেবের একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে !

হামিদা মাহামের চিন্তাকে অনুসরণ করে হঠাৎ চমকে উঠলেন, তারপর নিস্পৃহকণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ। সলিমার এক বাচ্চা পয়দা হয়েছে।

মাহাম আনাঘা আবার জিজ্ঞেস করলেন—খানসাহেবের কি প্রথম এই লেড়কা পয়দা হল ?

হামিদা আবার চমকালেন, বললেন—হ্যাঁ। আর কোন বেগমের পেটে বাচ্চা আসে নি।

তাহলে তো খুবই মুস্কিল ! খানসাহেব এই লেড়কার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই চিন্তা করবেন।

হামিদা মাহামের কথার অর্থ ধরতে না পেরে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ? কি বলতে চায় মাহাম বিবি ?

মাহাম আনাঘা অন্ধকারে রাখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বললেন—খানসাহেব এতদিন পরের ছেলের জন্যে অনেক স্বার্থত্যাগ করেছেন। নিজের জীবন এই করেই শেষ হয়ে গেল। এবার পুত্রের জন্যে কি কিছু করবেন না ? যখন তিনি মুঘলদের আত্মীয় হয়ে উঠেছেন !

হামিদা তবু মাহামের মুখের ওপর বোকার মত তাকিয়ে রইলেন।

এবার মাহাম আরো চাপাস্বরে বললেন—বেগমসাহেবা আপনি একটু শক্ত হোন। পুত্রের ভবিষ্যৎ দেখতে গেলে আরো কঠিন হতে হবে। খানসাহেবের লেড়কাকে সরিয়ে দিন। একেবারে বিলকুল সাফ। তাহলে খানসাহেব আর বেইমানি করতে পারবে না, বাদশাহের আতালিক থেকে চিরকাল এখানে মুখ বুজিয়ে থাকবে।

কিন্তু সেকথা শুনে হামিদা শিউরে উঠলেন, আতঙ্কে বললেন না, না এ হয় না। খানসাহেব যত শত্রুতাই করুন, তিনি এ পরিবারের দোস্ত। সম্রাট হুমায়ুন শাহ তাহলে আমাদের ক্ষমা করবেন না। তিনি উপযুক্ত জেনেই এই অনাত্মীয় দোস্তকে পুত্রের আতালিক নিযুক্ত করে গেছেন। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত তাঁর তো কোন বেইমানি দেখছি না !

মাহাম নির্লিপ্তভাবে বললেন—কিন্তু বেইমানি করতে কতক্ষণ ? এতদিন ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। এখন পুত্রের আজাদী পিতার ফর্জ। পুত্রের জন্যেই তিনি এখন সিংহাসন কায়েম করবেন।

হামিদা তখন বললেন—সে যখন করবেন, তখন ব্যবস্থা করলেই হবে। আমি খানসাহেবের সম্বন্ধে খুব চিন্তিত নয়, আমি ভাবছি আমার পুত্রের কথা।

।

কিন্তু আগে থাকতে সাবধান হলে কি চলতো না?

না, না—সলিমার জিন্দেগী বরবাদ করতে আমার ধর্মে লাগবে।

তখন মাহাম বললেন—বেগমসাহেবা, আপনি বড় কোমল মনের রমণী। গোস্তাখি নেবেন না, এত নরম হলে পুত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারবেন না।

হামিদা নীরবে মাহামের ভৎর্সনা হজম করলেন।

মাহাম দেখলেন এত সহজে কার্য উদ্ধার হবে না, ধীরে ধীরে জাল ফেলে তারপর তুলে নিতে হবে, তাই একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সহজ হয়ে হেসে বললেন কিছু মনে করবেন না বেগম-সাহেবা। আমি এমনি বলছিলাম। আপনার মনের গতিবিধি নিরুপণের জন্যে পরীক্ষা করছিলাম।

তারপর মাহাম বললেন—আপনি জালালের শাদী দিয়ে দিন। শাদী দিলে মর্দানা অস্থিরতা মন্দীভূত হবে।

এই কথায় হামিদা উৎসাহ পেলেন, বললেন—আমিও সেই কথা ভেবেছি। শাহাজাদা হিন্দালের এক বেটি আছে, নাম রুকমি তাকে এখানে আনিয়ে রেখেছি। তার সঙ্গে আকবরের শাদী দেব।

তারপর নিরুৎসাহ হয়ে বললেন—কিন্তু আকবরকে রাজী না করাতে পারলে তো এই শাদী হবে না। সে এখন সেই রাজপুত লেড়কীর মহব্বতে বিভোর, জোর করতে গেলে অন্য উপসর্গ দেখা দেবে। সেইজন্যে মুশকিলে পড়ে আছি।

মাহাম বললেন—রাজপুত লেড়কীকে ভাগিয়ে দিন।

কিন্তু তা করলে আকবর চালাকী ধরে ফেলবে।

তাহলে তাকে আত্মহত্যা করতে বলুন।

সেও আকবর ধরে ফেলবে। ভাববে এই আত্মহত্যার মধ্যে মায়ের কারসাজি আছে।

তাহলে তাকে দুসরা কোন আদমির সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে

আকবরের সামনে ফেলে দিন। আকবরের দিলের মহব্বত ছুটে যাবে। সেই নিজেই ঐ লেড়কীর জান নিয়ে নেবে।

কিন্তু লেড়কীটি যে বেয়াড়া। শুধু রোতি হ্যায়। না কুছ্ নাস্তাপানি করে। না, আরামকে লিয়ে কুছ। দিনভর মু বন্ করকে রোতি হ্যায়।

ওর কোন আত্মীয়স্বজন নেই? কাঁহাসে আয়া হ্যায়।

এই কথা বলতে হামিদা একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—একটি ভাই ছিল, নন্দন সিং। তা সে দিল্লীর সেনানিবাসে থাকতো। সেনাবিভাগে নো'করী নিয়ে সেখানেই বহাল ছিল। এই কদিন আগে আকবর তাকে আনতে পাঠিয়ে ছিল।

এই বলে হামিদা আবার থামলেন, তারপর মাথাটা নত করে বললেন—আমি ফৌজ পাঠিয়ে তাকে পথিমধ্যে সরিয়ে দিয়েছি।

মাহাম বিস্মিত হয়ে বললেন—জানে সাফ!

হ্যাঁ। সাফ না করলে সে যে আগ্রায় এসে মহা হুলুস্থুল সৃষ্টি করতো। কারণ তার বহিনের এই হালত দেখে সে বাতলা নিতে চাইতো। আর তার সামনে আমাকে আসামী হয়ে দাঁড়াতে হত।

মাহাম মনে মনে বেগমকে বাহবা দিয়ে মুখে বললো—জালাল জানে?

না। জালাল জানলে সে এক বিপদ। এই দুটি ভ্রাতা ভগ্নীকে সেই আশ্রয় দিয়েছিল। সে এখন জানে, দিল্লীতে রাজকার্যে আটক পড়ে গেছে বলে নন্দন সিং আসতে পারছে না, তবে খুব শীঘ্র আসবে।

এই গোপনতা যেদিন উন্মোচিত হবে?

হঠাৎ হামিদা মাহামের হাত ধরে বললেন—বহিন তোমাকে সেই বিপদ উদ্ধার করতে হবে। আমি সেইজন্যেই তোমার আগমন প্রার্থনা করছিলাম। আমার বড় বিপদ, চতুর্দিক থেকে কেমন করে যেন সব বিপদ এসে উপস্থিত হচ্ছে।

মাহাম ধীরে ধীরে হামিদার হাতের ওপর আশ্বাস দান করলেন। তারপর বললেন—আমি যখন এসে পড়েছি, তখন কিছু ভাবনার নেই।

হামিদা বোধ হয় সেই আশ্বাসে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন, তাঁর মুখের কালো মেঘ সরে যেতে বোঝা গেল।

তারপর মাহাম বেটার সঙ্গে দেখা করে আসি বলে বেরিয়ে গেলেন।

অলিন্দ-দিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন—সমুদ্রের অনেক নীচে নেমে যেতে হবে। রাজপুরীর আনাচে কানাচে বিশৃঙ্খলার ছাপ। এসময়ে এমন এক বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে, যা সবার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে। সেইজন্যে অস্থির হলে হবে না, স্থিরভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে।

বাদশাহ আকবরকে যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, স্থায়ী আসন দিতে হবে তাঁর গর্ভজাত পুত্র আধমকে। যা কিছু কৌশল অবলম্বন করবেন সবই ঐ আধমের জন্যে। তাঁর আর কি? তিনি মেয়েলোক, জীবনের আশা আকাঙ্খা তাঁর সব গেছে, এখন শেষদিনের আশায় স্পন্দন গোনা।

এই কথাগুলি চিন্তা করতে করতে যখন তিনি আকবরের কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন তাঁর আগেই পুত্র আধম বাদশাহের কাছে কেদারায় বসে নানান খোসগল্প শুরু করে দিয়েছে। সেখানে আছে সেই পূর্ব পরিচিত মুনিম খান। মুনিম খানের এখন সাহস বেড়েছে, কারণ তার নিজের লোক এসে পড়েছে বলে। এই শিহাবউদ্দীন মুনিম খান মাহাম আনাঘার জামাতা। মাহামের কন্যাকে শাদী করে মুনিম খান এদের পরিবারকে গৌরবান্বিত করেছেন। কিন্তু মাহাম আনাঘা একে পছন্দ করতেন না। লোকটি ধূর্ত হলেও বুদ্ধিতে স্থূল প্রকৃতির বলে তার ওপর কোন আস্থা ছিল না। তাছাড়া লোকটি

ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী, অকর্মন্য। উচ্ছৃঙ্খলতার সন্ধান পেলে কর্তব্য শৈথিল্য প্রদর্শন করতো। এইজন্যে একে বাদশাহের কক্ষে দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। আর একজন সেখানে ছিল, তাকে তিনি চিনতে পারলেন না।

মাহাম আনাঘা কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আকবরের সাথে সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আকবর ধাত্রীমাকে কুর্ণিশ করতে যেতে মাহাম তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ফেলে বললেন—জিও বেটা। তুমি এখন হিন্দুস্থানের বাদশাহ, এখন তোমাকেই আমাদের তসলিম করা উচিত। এখন তুমি বয়েসে নবীন নয়, এখন তুমি ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সমস্ত মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

আকবর লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করলো। তারপর মাথা তুলে সলজ্জভঙ্গিতে বললো—তবু তুমি আমার আম্মি! তোমার আশীর্বাদ আমার পাথেয়। তোমার স্নেহ আমার হৃদয়ের শক্তি।

হঠাৎ মাহাম উচ্ছ্বসিত হয়ে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখ্ বেটা দেখ্—এর কাছ থেকে শিখে নে কি করে কথা বলতে হয়! বাদশাহের পুত্র বাদশাহের মতই সওয়াল। বংশের যে ঐতিহ্যে এদের রক্তের স্রোত প্রবাহিত—তার ধারা যাবে কোথায়?

তারপর তিনি ফিরলেন সেই অচেনা ব্যক্তির দিকে। তারপর অনুসন্ধিৎসু চোখে বললেন—একে তো চিনতে পারলাম না?

তখন সেই ব্যক্তি কুর্নিশ করে বললেন—আমি পীর মহম্মদ শেরওয়ানি।

মোল্লা পীরসাহেব? মাহাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ বিবিসাহেবা।

কিন্তু আপনার একি হাল হয়েছে? আপনার সেই লম্বিত দাড়ি কোথায়? সেই আলখাল্লা পোষাক? তাছাড়া আপনি

ছিলেন ধর্মোপদেষ্টা। ধর্ম উপদেশ দিয়ে মানুষকে ত্রাণ করাই আপনার পেশা ছিল। এখন দেখছি আপনি সবার মাঝেই নেমে এসেছেন! ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!

পীরমহম্মদ আর কোন কথা না বলতে পেরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এক সময় নিম্নস্বরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সে মোল্লা পীরের মৃত্যু হয়েছে বিবিসাহেবা!

আকবর তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বললো—আম্মি, সে অনেক কথা। তুমি এখন বিশ্রাম নাও। পরে জানতে পারবে। পীরসাহেব তকদীরের চক্ররে পড়ে সব হারিয়েছেন। খোদাতাল্লার অভিপ্রায় কার ওপর কেমন বর্তায়, সে খোদাই জানে।

মাহাম শুধ্ আকবরের কথা শুনে হাসলেন, তারপর বললেন—বেটা জালাল, তোমার সঙ্গে যে আমার আলাদা একটু বাতচিত আছে!

মুনিম খান ও পীরমহম্মদ বাদশাহকে সেলাম দিয়ে চলে গেল, আধম তখনও দাঁড়িয়ে থাকলো। তাই দেখে মাহাম কঠোরস্বরে বললেন—তুমিও চলে যাও আধম। জালালের সঙ্গে আমার অতি গোপনীয় কিছু সলাহ আছে।

আধম রুষ্টকণ্ঠে বললো, আমার শোনবার অধিকার নেই!

না। মাহাম ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আধমের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আধম এ দৃষ্টির অর্থ জানতো, তাই একান্ত অনুগতের মত কক্ষ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

মাহাম আধমের গমন পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর আকবরের দিকে ফিরে বললেন—আমার এই পুত্রটি সম্বন্ধে তোমাকে দু একটি কথা বলে দিই। ওকে তুমি আপন মেহনতে নিজের মত করে নেবে। আমার পুত্র বলে বলছি, কখনও পূর্ণভাবে বিশ্বাস করবে না। তবে তৈরী করে নিতে

পারলে তোমার পরম সহায়ক হবে। আমি চাই তুমি তাকে পাশে নিয়ে তোমার ধারায় তাকে গড়ে তুলবে।

আকবর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো—তাই হবে আম্মি।

তারপর মাহাম বিবি অন্য কথায় এলেন, বললেন—যে কথা বলবার জন্যে এখন তোমার কাছে এসেছি। এই বলে মাহাম আনাঘা আবার চুপ করলেন। তারপর ভাবতে লাগলেন, কিভাবে আকবরের কাছে উত্থাপন করবেন? এখন আকবর অনেক বড় হয়েছে। আগের মত আর শিশু নয়। বুদ্ধিও বেশ বাদশাহের মত। তার কাছে হঠাৎ এমন কোন সমস্যা তিনি উত্থাপন করবেন না, যাতে বিরাগভাজন হয়ে যান।

তাই সোজাসুজি কোন সমস্যা উত্থাপন না করে অন্য কথা শুরু করলেন। বললেন, শুনলুম, তুমি দুটি সিংহ-সিংহীকে বধ করেছ। সাবাস বাহাদুর বটে। তোমার গুণের কথা আগ্রায় প্রবেশ করেই শুনতে পেয়েছি। এমনি না হলে মরদের তাকত কি? শুনে আমার কি যে আনন্দ হয়েছে? কিন্তু তোমার মা বড় দুঃখ করছিলেন। তুমি এমনি এক নওজোয়ান হয়ে বড় অস্থিরতার পরিচয় দিচ্ছ। কতকগুলি ঝুট আওরতের কথা চিন্তা করে নিজের অমূল্য জীবন বরবাদ করছো। তোমার মত এক শক্তিমান নওজোয়ানের কি এমনি সব বাজে চিন্তা শোভা পায়? তোমার ওপর আমাদের কত আশা, তুমি গড়বে সোনার হিন্দুস্থান। উত্তর থেকে দক্ষিণে মুঘল সাম্রাজ্যের বিজয় পতাকা উড়বে। বিস্তৃত অঞ্চলের শক্তিধর রাজপুরুষেরা তোমার বশ্যতা স্বীকার করে মুঘলের অধীন হবেন। তৈমুর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাবর যে হিন্দুস্থানে প্রথম মুঘল পতাকা স্থাপন করেছিলেন, তুমি তারই ওপর রচনা করবে বিরাট প্রতিষ্ঠা। আমরা সকলে সেই দিনের আশায় আছি। তোমার মা বেগমসাহেবা সমস্ত চক্রান্ত থেকে তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে দিনরাত মেহনত করে চলেছেন।

আকবর এই সময় কিছু বলতে গেল কিন্তু মাহাম তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—আমি তোমায় তিরস্কার করতে আসিনি বেটা। তুম্‌হরা আম্মি কো পেয়ারের ইন্তেজারে থোড়া কুছ বাত। গোসা নেহি! তুমি যদি গোসা কর তাহলে আমি আবার ফিরে যাব। তোমার মা একেলা, কই উনিকো পাশ নেহি যে তোমার মাকে কোন সাহায্য করে। বহুৎ মুসিবাদ মে পড়া হ্যায় বেগমসাহেবা। আমি তাকে সামান্য সাহায্য করতে এসেছি।

তারপর হেসে বললেন—বেটা, গোসা মাত করো। তুমি হিন্দুস্থানের বাদশাহ। আমরা নগন্য আওরত। আমরা হারেমের অন্ধকারে বসে হাহুতাশ করতে পারি কিন্তু তুমি অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে শত্রু নিধন করে লাখো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব পেতে পারো, তাই তোমাকে আমাদের কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মাহাম আনাঘা আকবরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করলেন।

আকবর তখন ভাবছিল। চিন্তার রেখাগুলি তার মুখের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ব্যথার চিহ্নও জেগেছিল। তাই দেখে বোধ হয় মাহাম চুপ করলেন।

আকবর ভাবছিল, সত্যিই কি সে অন্যায় করে চলেছে? কিন্তু কি সে অন্যায়? হৃদয়ে মহব্বতের জন্ম হওয়া সে কি অন্যায়? তাতে কি পৌরুষ জলাঞ্জলি যায়? কিন্তু শিবানী যদি তাকে পেয়ার দিত, দিত সান্নিধ্য তাহলে যে সে দুনিয়ার সমস্ত কিছু জয় করতে পারতো। আজ এই যে হতোদ্যম হয়ে নির্জনে অশ্রুত্যাগ করে চলেছে, এ যে সেই প্রত্যাখানের বেদনা। আজ সম্রাট আকবর জীবন শুরুতেই পেয়েছে আঘাত। এ যে কিছুতে সে ভুলতে পাচ্ছে না। কাকে সে বোঝাবে, তার এই বেদনার আর্তি? আগুন জ্বলতে সে দেখেছে কিন্তু মনে যে আগুনের শিখা ধিকি ধিকি জ্বলে, তা তো কোনদিনও সে জানতো না। তার এ বেদনা কাউকে বলার নয়, মা, ধাত্রীমা, আত্মীয়ারা কেউ

বুঝবে না। তারা বাইরেটা দেখেই বিচার করে কিন্তু মনের কথা কেন বোঝে না ?

আকবরের চোখ দিয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সে মাথা নত করলো।

তাই দেখে মনে মনে মাহাম আনাঘা নিরুৎসাহ হলেন। তারপর ভিন্নপন্থা অবলম্বনের জন্যে কোমলস্বরে বললেন—কিছু তক্‌লিফ দিয়ে থাকি, . আম্মিকে মাফি করদেও বেটা। তোমার দর্দের কথা তো আমি জানি না !

আকবর তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে বললো—কই তক্‌লিক নেই আম্মি ! বেশক মেরে জিন্দেগীকা মউৎ। তুমি আচ্ছা বাতই বলেছ, আমি চেষ্টা করছি নিজেকে ইনকার করতে। হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। মেরে আম্মি কো বলো, আকবর তাঁর মনে দুখ্‌ দেবে না। তাঁর সম্মান রাখবে। তাঁর ইজ্জত সবচেয়ে উঁচু করতে সে কোশিস করবে। ইনসাফ জো চ্যাতেহে, উসকো টুকরা টুকরা করকে জমিন ক্যা উপর ফেক্‌ দেউঙ্গে।

এ যে অভিমানের কথা মাহাম বুঝলেন, তারপর একটু থেকে বললেন—মা তো তোমার ভালো করার জন্যেই চিন্তা করেন বেটা !

হঠাৎ আকবর আর নিজেকে রুখতে পারলো না। চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললো—ভাল আমার সবাই চায় আম্মি, আমিও তো ভালো হবার জন্যে কোশিস করি কিন্তু জিন্দেগী যে আমাকে ভালো হতে দেবে না, তা আমি কি করবো ?

মাহাম সান্ত্বনা জানিয়ে বললেন—স্থির হও বেটা। অস্থির হয়ো না। তোমার তক্‌লিক আমি বুঝতে পাচ্ছি। এক কাজ কর, একটি শাদী কর। তোমার পূর্বপুরুষরা অধিকাংশই কিশোর বয়সে শাদী করেছেন। যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় যে প্রবৃত্তির প্রকাশ হয়, তার নির্বাণের জন্যে এই কৌশল উৎকৃষ্ট। তোমার পিতামহ বাল্যবিবাহকে প্রশয় দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ভারতবিজয়ী

সম্রাট বাবর শাহ। তিনি উচিত মনে করেছিলেন বলেই এই অস্থিরতাকে কমানোর জন্যে শাদীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁকে তুমি বুদ্ধিহীন বলতে পারবে না। তোমার পিতাও যুবকবয়সে বহু বেগম গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর আজীবনের সংগ্রামে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নি। তোমার মা তাঁর অনেক পরের বেগম। আমার অভিমত যদি গ্রহণ কর, তাহলে একটি শাদী কর। শায়েদ বহুৎ লেড়কী এখানে এসেছে। তোমার মার ইচ্ছা, শাহজাদা হিন্দালের বেটি রুকমি তোমার যোগ্য। তার সুরত আসমানের মত, আঁখির রোশনী সমুদ্রের স্থির জলের মত। লাবণ্য ঢল ঢল এমন আওরত খুব কম দেখা যায়। তুমি যদি অনুমতি কর, তাহলে শাদীর আয়োজনের ব্যবস্থা করতে বলি।

আকবর নিরুত্তরে শুধু মাহামের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে বুঝতে পারলো, তাকে নিয়ে যেন কি এক ষড়যন্ত্র চলছে। মা যে কথা বলতে সাহস করেন নি, ধাত্রীমা সে কথা বললেন। কিন্তু শাদীই মনে হয় করা উচিত। শাদী করলে বোধ হয় শিবালীকে ভোলা যাবে। তাকে এখন ভোলার জন্যেই যে তার প্রচেষ্টা।

হঠাৎ সে বললো—বেশ, শাদী করবো।

মাহাম আচমকা আকবরের সমর্থনে খুশি হয়ে গদগদ ভাষায় বললেন—তুমি সাচমুচ আচ্ছা লেড়কা। দেখবে শাদীর পর সব অস্থিরতা কমে যাবে।

আকবর শুধু ম্লান হাসলো। কোন কথা বললো না।

২৪

সম্রাট আকবর শাহের শাদীর রোশনাই জ্বলে উঠলো।

আগ্রার প্রাসাদপুরী উৎসবের জাঁকজমকতায় নতুন রঙবেরঙের বসন পরিধান করলো। আলোর মালায় স্নান করলো প্রাসাদের অলিন্দগুলি। নহবতখানায় সারা দিনরাত ধরে মালকোষের সুরে সানাই জেগে থাকলো। সলমা চুমকি, কিংখাবের বসন পরিধান করে নারী পুরুষেরা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাদশাহের শাদী, এর আলাদা একটা রাজসিক ব্যবস্থা। তাছাড়া মুঘলরা উৎসব করতে জানে। মুঘলদের আমীর ওমরাহের শাদী হলে যে জাঁক-জমকতা হত, তার চেয়ে শতগুণে বর্দ্ধিত হল।

আগ্রার পথ দিয়ে শুধু তাঞ্জাম ছুটে আসছে! তাঞ্জাম কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, প্রাসাদ ফটকদ্বার উন্মুক্ত, শুধু ঢুকে যাও। দেশবিদেশ থেকে অশ্বের পিঠে, হাতির পিঠে সওদা আসছে। অঢেল শুধু দ্রব্যসামগ্রী। অনেক আরো অনেক জিনিস দরকার। সাতদিনের উৎসব। আত্মীয়স্বজন, মেহমান, শরিফ আদমিতে প্রাসাদের কক্ষগুলি ভরে যাচ্ছে। শুধু প্রাসাদকে নিয়ে উৎসব নয়, তামাম আগ্রা শহর যেন উৎসবে মেতেছে। অস্থায়ী সব আবাসস্থল সৃষ্টি হচ্ছে শহরের যত্রতত্র। তোরণদ্বার তৈরী হয়েছে বিচিত্র সব মখমলের কিংখাব বসনে।

যেন বসন্তের পূর্ণ আগমন হয়েছে আগ্রার আকাশে বাতাসে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলকাকলিতে পুষ্প বাগিচা মুখর। গোলাপের বাগিচায় সেদিন যেন নতুন সৌরভের মাতন শুরু হয়েছে। ওরাও জেনেছে একটা নতুন কিছু সৃষ্টি হবার মুহূর্ত। কৃত্রিম ঝরনা-

ধারায় যেন নিঃসরণের গতি। গোলাপ জলের প্রস্রবণের ধারায় অবিরাম স্রোত। মধুমক্ষিকা গুণ গুণ সুরে গান ধরেছে।

গান ধরেছে আরো অন্তঃপুরের যৌবনবতী রমণীরা। বিশেষ করে কামরান-কন্যা হাজী ও গুল-ইজার, আসকারীর বেটি আমীর তাছাড়া আছে উমরি, গুলজার-ই, সহেলী, কুলসম, রেহানা, কাবুলী, অনেক অনেক মেয়ে। মেয়ে তো নয় যেন এক একটি হীরকখণ্ড। যেখান দিয়েই খল খল নিনাদে চঞ্চল হরিনী, ঢলে ঢলে চলেছে, সে স্থান আলোকিত হয়ে উঠছে। মানুষ খুঁজে বের করেছে রত্নের সন্ধান। হীরকের শুভ্রজ্যোতি, চুনির রক্তরঙ, পান্নার নীলাভদ্যুতি, মুক্তার সামুদ্রিক অলংকরণ সব যেন এই যৌবনবতী আওরতের সামনে ম্লান। এরা যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, যেন বিজলী চমকে ওঠে। এরা স্থির নয়, এদের প্রাণে আছে স্পন্দন, এরা নড়ে চড়ে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে সৌন্দর্যের চমক সৃষ্টি করতে পারে।

রুকমির সঙ্গে বাদশাহের শাদী। রুকমি সৌভাগ্যবতী। রুকমির আওরত জীবন সার্থক।

এর জন্যে কারো মনে দুঃখ নেই। ভাইজান শুরু করেছে শাদী করতে। ভাইজানের মর্দানা তাকত এসেছে। শিরায় জওয়ানের খুন। এখন আর ভাবনা কি? বেগম হওয়ার পথ প্রশস্ত। বেগমের স্বাদ বাদশাহ পেলেই আবার তৃষ্ণা জাগবে। তখন আবার বহিনদের মধ্যে খোঁজ করবে। এই কথা ভেবেই সবাই উল্লসিত। বাদশাহের বেগম হতে পারলে অনেক সুখ। আওরত জীবনের সর্বোচ্চ আসন কেউ রুখতে পারবে না। সবচেয়ে জমকালো কক্ষ, সেরা মূল্যবান পোষাক, অঢেল জড়োয়ার গহনা তার ওপর বেগমের জন্যে আলাদা খানা। রাজসরকারের খাতে বাদশাহের জীবনধারণের তালিকার মত বেগমদের জীবনধারণ, সেই জন্যে প্রতিটি মেয়ে চায় বেগম হতে। অন্তত আরামের এই বেহেস্ত আর কোন পদমর্যাদায় মেলে না। ইসলামের কানুনে

আত্মীয় বহিন ভাইকে খসম্ চিন্তা করতে পারে, তাতে কোন পাপ নেই, বরং নিজেদের বংশের মধ্যে থাকতে পারাটা পরম গৌরবের।

সেইজন্যে কামরান, আসকারী, হিন্দালের কন্যারা নবীন বাদশাহের মহব্বত আশা করে।

রুকমি পেল বেগমের পদ। রুকমি যাক্ সর্বাগ্রে, তাতে ক্ষতি কি? এরপর তাদের সৌভাগ্য এলে তারা বেগমী ছাড়পত্র পেলে দেখাবে কে বাদশাহের হৃদয় অধিকার করে? সবারই মনে একটি সুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার নজীর।

আস্তে আস্তে একদিন সেই শুভক্ষণটি এগিয়ে এল। এগিয়ে এসে যমুনার তীরে প্রাসাদের অলিন্দের উঁচু সোপানে আকাশের একটি উজ্জ্বল তারার মত স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

রবিওল-আউয়াল মাস। জুম্মারাত। পূর্ণিমা রাত। রূপোর থালায় বসে রজতকুমারী যমুনার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। তার পরণে রজনীর মোহিনী বসন। যামিনী বিভাবরী। কন্দর্প তার সখি সমভিব্যাহারে এসে দাঁড়িয়েছে এই অলিন্দের সোপানে।

বাদশাহের প্রথম বিবাহ রাত্রের মিলন কক্ষ বিশেষ দক্ষ শিল্পীর পরিকল্পনায় প্রস্তুত হয়েছিল। এবং এমন অভিনব বুঝি সচরাচর দেখা যায় না।

পরিকল্পনা অধিকাংশ আব্বাস আলি বলে এক পারসিক শিল্পীর। মুনিম খান এই শিল্পীকে যোগাড় করেছেন। মাহাম ও হামিদা বানুর ইচ্ছায় পুত্রের রাজসিকতা বজায় রাখতে এই মিলন কক্ষটি সজ্জিত হচ্ছিল। আকবর এতে কোন মতামত প্রকাশ করে নি, তবে তাকে কক্ষ নির্বাচন করতে বললে সে যমুনার তীরের অংশই নির্বাচন করেছিল। সে ঐ স্থানের কক্ষগুলি সবচেয়ে পছন্দ করতো তার কারণ যমুনার নীলাভ রূপ তাকে মুগ্ধ করতো

বলে। তাছাড়া আসমানের উন্মুক্ত ভাবটি ও তার চিত্তের প্রসারতা বর্দ্ধিত করতো।

হিন্দুরা যাকে বলে ফুলশয্যা। ফুল কুসুমের নরম জমিনে শয়ন করে রমণী পুরুষের সেই চিরচরিত মিলনের অমৃতময় লোকে সৃষ্টির কুমকুম রচনা করা। আকবরের জন্যে সেই ফুলশয্যাই তৈরী হল।

যমুনার প্রশস্ত নীলাভ জলরাশি ও আসমানের প্রতিচ্ছায়াকে কেন্দ্র করে একটি কক্ষের দেয়াল চারটি আবোরিত হল গোলাপ ও পদ্মের বাহার দিয়ে। ছাতের খিলান থেকে ঝুড়ি নামলো বেল, জুই, টগর, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলের একত্র সমাবেশে। ফুলগুলি তাজা রাখবার জন্যে গুপ্ত প্রস্রবনের ধারা সৃষ্টি হল। আতরের খসবু দিয়ে কক্ষের বাতাস বিভোর করা হল। মৃগনাভি, কস্তুরী, গুগ্‌গুলের সুবাসে আরো জোরালো হল সুবাসের মাতোয়ারা। সবচেয়ে অভিনব হল গবাক্ষ দিয়ে রজত পাতের ওপর জ্যোৎস্নাকে ধরে কক্ষের মধ্যে আলোছায়ার সৃষ্টি করা। তার জন্যে অবশ্য তিথির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। পূর্ণিমা তিথি না হলে ঐ অভিনব আলো পরিবেশনের পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যেত।

বাদশাহ যাতে পালঙ্কের ফুলশয্যায় শুয়ে প্রিয়জনের উষ্ণসান্নিধ্যে জ্যোৎস্নার অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে খোয়াবের কথা মনে করেন সেইজন্যে অদ্ভুত একটি কৌশলে একখানি সুপরিকল্পিত দর্পণ পালঙ্কের ঠিক বিপরীতে ছাতের বিশেষ খিলানের নীচে সংস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া যৌবনের উন্মাদনাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করার জন্যে কক্ষের নীচে যমুনার স্রোতে বিশেষ আলোড়নের ব্যবস্থা হয়েছে। যমুনার জলোচ্ছ্বাস অস্বাভাবিক এক মাতনে সারা রাত্রি ধরে উতাল পাতাল করবে। যমুনাকে এমনি ক্ষেপিয়ে তোলার পিছনে কি পরিকল্পনা ছিল বোঝা গেল না, তবে দেখা গেল সেদিন যমুনা শান্ত স্থির নয়, শুধু ফুলে ফুলে গর্জন করে

ক্ষিপ্তফণা তুলে পারের বুকে আছড়ে পড়ছে। যেন পাগলা হাতি ক্ষেপে গিয়ে হঠাৎ সবকিছু লয় করে দিতে চাইছে, কিম্বা সমুদ্রের অশান্ত গর্জনের সেই সীমাহীন উদ্দামতা বুঝি এসেছে যমুনার বুকে। যমুনা বুঝি আর নিজের বাসনাকে ধরে রাখতে পাচ্ছে না!

অভিসার কক্ষের প্রহরিনী নিযুক্ত হয়েছে সেরা আটটি মাসুম রূপসী। তাদের পরিধানে নেই কোন পর্যাপ্ত বসনের ঘেরাটোপ। বক্ষে সামান্য সূক্ষ্ম মসলিনের কাঁচুলী। তাতে উত্তুঙ্গ বক্ষসৌন্দর্য আরো প্রকট। অটুট দেহসৌষ্ঠবের ভেতর থেকে উদগ্র কামনার বাসনা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। আটটি রূপসীর এই স্বল্প বসনের প্রহরা যেন অনেক চিন্তা করে স্থাপন করা হয়েছে। একখণ্ড বস্ত্রখণ্ডের টুকরো শুধু পরে তারা কক্ষের আটটি অংশে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের আর কোন করণীয় নেই। তারা শুধু অভিসারের নীরব সাক্ষী হয়ে কক্ষের মধ্যে কন্দর্পের পঞ্চশরের কাজ করবে।

বাদশাহ যাতে এ রাত্রে এতটুকু অবসন্ন না হয়। যাতে তার প্রথম যৌবনপ্রাপ্ত মনে রমণীর কামনাই উদগ্র হয়ে ওঠে, তার জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা। রাজ-রাজড়াদের ব্যাপার। যাকে উপলক্ষ্য করে এত আয়োজন, তার গুরুত্ব সব নয়। বাদশাহ তার নব পরিণীতাকে দেখে শুধু উত্তপ্ত হবেন না, সেই উত্তপ্ত ভাবকে যাতে আরো বর্দ্ধিত করা যায়, তার জন্যে নানান ইন্ধন।

তবে সেই রাত্রিটি এগিয়ে আসার আগে শাদীর দিনের প্রত্যুষের ঘটনা কিছু লিপিবদ্ধ যোগ্য।

অন্তঃপুরে ভরে আছে নিমন্ত্রিত জেনানারা। এসেছে কাবুল, কান্দাহার, লাহোর, গোয়ালিয়র, দিল্লীর দুর্গ থেকে বহু আত্মীয়স্বজন। প্রাসাদ বহির্বিভাগেও অতিথির শেষ নেই।

হামিদা ও মাহাম এক দাঁড়ে দুই পক্ষীর মত সর্বদা পরামর্শ

করে চলেছেন। শুভকাজটি সম্পন্ন হলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন। কোথায় যেন একটা বিরাট বাধা মাথা উত্তোলিত করে আছে। অবশ্য এ অনুমান আশঙ্কার। আতঙ্ক শুধু আকবরকে নিয়ে। ওদিকে বৈরাম খান সাহেব আসেন নি। তাঁর তিন বেগম এসেছে। সলিমার ভবিষ্যৎ ভাল নেই বলে সে আসতে পারে নি।

বৈরাম খান গেছেন কিছু ফৌজ সঙ্গে নিয়ে তিনটি মীর্জাকে দমন করতে। মীর্জা ইব্রাহিম হোসেন, মীর্জা মহম্মদ হোসেন, মীর্জা মামুদ হোসেন। এরা চাঘতাই শাখারই লোক। এরাও হিন্দুস্থানে এসেছিল রাজ্য জয় করতে কিন্তু সমরখন্দ ও ফরঘনাতে গোলমাল সৃষ্টি করলেও বাবরের মত তারা হিন্দুস্থানে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নি। তবু চেয়েছিল কিছু জায়গীর বুঝি এরা পাবে কিন্তু না পাওয়ার জন্যে যত্রতত্র বিদ্রোহ করেই চলেছিল। এমনি মীর্জা অনেক ছিল।

পাঞ্জাবের মধ্যে এই তিনজন দেশীয় লোককে ক্ষেপিয়ে তোলার খবর পেয়ে বৈরাম খান তাদের শায়েস্তা করতে ফৌজ নিয়ে ছুটেছেন।

এ খবর আগ্রাতে এসে পৌঁছেছিল কিন্তু পাছে আকবরের কানে গেলে সে ক্ষেপে উঠে উৎসব বন্ধ করে দিয়ে খানসাহেবের পশ্চাৎ-ধাবন করে, এই ভয়ে মাহাম হামিদাকে এই সংবাদ চেপে যেতে বললেন। মাহামের কথানুযায়ী রাজদফতর সেই সংবাদ গোপন করলো।

তবু বুঝি বাধার শেষ নেই।

হঠাৎ বান্দা এসে হামিদা বানুকে জানালো, বাদশাহ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

হামিদার সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে মাহামের দিকে তাকালেন।

মাহাম মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। আকবর যখন দেখা করতে চাইছে, তখন নিশ্চয় কোন অভিযোগ আছে। হয়তো সেই

অভিযোগের মধ্যে সে জানাবে শাদীর আয়োজন বন্ধ করতে কিন্তু তা এখন কেমন করে হয়? সমস্ত হিন্দুস্থানের চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে গেছে, মুঘল সম্রাট আকবর শাহের শাদী। নিমন্ত্রিত লোকে লোকারণ্য রাজপুরী। এ সময় যে শাদী বন্ধ করা যায় না, এখন যে কোন হুকুমই আয়ত্বে নেই সে কথাই আকবরকে বোঝাতে হবে। এ শাদী বন্ধ করলে অগণিত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, তখন রাজ্য পরিচালনাতেই ক্ষতি হবে।

মাহাম ভবিষ্যতের ঘটনার একটা পরিণতি ভেবে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তবে এ তার অনুমান। তারপর হামিদাকে সাহস দিয়ে বললেন—আকবরকে আসতে আজ্ঞা দিন বেগমসাহেবা।

হামিদার হুকুম নিয়ে বান্দা চলে গেলে মাহাম হামিদাকে সাহস দিয়ে বললেন—আপনি ভীত হচ্ছেন কেন বেগমসাহেবা? আকবর একেবারে বুদ্ধিহীন নয়, আপনি জানেন। সে এমন কিছু মর্জি প্রকাশ করবে না, যাতে শাদী বন্ধ হয়ে যায়। আমরা তো চাইছি কোনরকমে শাদীটা হয়ে যাক্। শাদীর পর বেগমের সান্নিধ্য পেয়ে সব পুরুষই যে তার অভিমত পরিবর্তত করে, আপনিও জানেন, আমিও জানি। আর আমাদের পুত্রের মর্দানা জমানা যখন এই শুরু হল।

হামিদা মনে কি এক ভয় নিয়ে মুখে ম্লানস্বরে বললেন—খোদা জানে শেষ পরিণতি কি? আকবর যে কেমন করে সুস্থ হবে? কবে তার মন সুস্থির হবে, একমাত্র ঐ উপরের আল্লাই জানে।

এই সময় আকবর এসে কক্ষে প্রবেশ করলো।

দুজনেই আকবরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আকবর দুজনকে সেলাম করে তারপর মস্তক অবনত করে বললো—আমি শুধুমাত্র মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

উত্তর দিলেন মাহাম আনাঘা, কোমলস্বরে বললেন—জালাল, আমি কি তোমার মা নয় ?

আকবরের মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। শুধু বললো—বেশ, আপনার সামনেও আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারি। আমি একবার রাজপুত লেড়কীর সাথে শেষ দেখা করতে চাই।

হামিদা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—কেন ? কেন ? তার সঙ্গে আবার তোমার কি দরকার ? ভাবো, সে মরে গেছে।

কিন্তু মাহাম শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—বেটা জালাল, না দেখা করলে কি হয় না ?

আকবর দৃঢ়স্বরে বললো—না, দেখা আমাকে করতেই হবে। তার সাথে দেখা করার ওপর শাদীর হুকুম নির্ভর করছে।

হামিদার রাগ চড়ে গেল, ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—সেই বিধর্মী এক ঝুট্ আওরতকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

মাহাম তাড়াতাড়ি হামিদাকে থামিয়ে দিয়ে আকবরকে কোমলস্বরে বললেন—বেটা, তোমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করা কি অন্যায় হচ্ছে না ? আজ রাজপুরী ভর্তি অগণিত নিমন্ত্রিত মেহমান রমণী পুরুষ। শাদী যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবেছ ? ক্ষতি তোমারই বেশী হবে। তোমার কোন ক্ষতি হোক্, এই দেখবার জন্যেই কি আমরা জিন্দা থাকবো ?

কিন্তু মাহাম আনাঘার কথায় কোন কাজ হল কিনা বোঝা গেল না। আকবর পূর্বের মেজাজেই বললো—যদি রাজপুত লেড়কীর সঙ্গে দেখা না করতে দেওয়া হয়, তাহলে শাদী বাধ্য হয়েই বন্ধ হবে। তার সঙ্গে ফয়সালা নাহলে আমি কোন কাজেই এগিয়ে যাবো না। আপনারা আমাকে শাদী দিতে চাইছেন, আমার ভালোর জন্যে কিন্তু আমার ভালো যে হবে না, সে আমিই বুঝতে পাচ্ছি। আপনারা আমার গুরুজন, কোন কটুকথা বলতে আমার মুখে বাঁধে। একবার আমার সঙ্গে তাকে দেখা করতে

অনুমতি দিন, আমি শেষ ইচ্ছা তার জেনে নিয়ে শাদীর ইন্তেজাম করবো।

মাহাম আনাঘা হামিদার দিকে তাকালেন, তারপর আকবরকে বললেন—ধর যদি সেই রাজপুত লেড়কী তোমার অনুরোধ রক্ষা করে তাহলে কি তুমি এই শাদী বন্ধ করে দেবে?

আকবর নির্লিপ্তভঙ্গিতে বললো—আমি জানি সে তা করবে না, যদি করে তাহলে তুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী খুশি হবো। অন্তরের নিবীড় আশ্বাস যদি তুর্জয়কে জয় করতে পারে, তার চেয়ে সান্ত্বনার আর কিছু নেই।

কিন্তু সে তো নষ্টা এক আওরত!

একথা শুনে আকবর মাহাম আনাঘার মুখের ওপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, তারপর বললো—আপনাদের সামনে এসব কথা আলোচনা করতে আমার লজ্জা আসে, তবু যখন আপনারাই সে সাহস দিলেন, তবে বলি তাকে আমি যখন আশ্রয় দেবার জন্যে অন্তঃপুরে মায়ের কাছে পাঠাই, সে ছিল নিষ্পাপ। একটি নিষ্পাপ মেয়েকে কোন দস্যু যদি হঠাৎ লুণ্ঠন করে তার ইজ্জত হানি করে তাহলে দোষ কার? মেয়েটির দেহে হয়তো কলুষিত হয়েছে কিন্তু মন তো নষ্ট হয় নি! আমি সেই মনের আকাঙ্খা করি। সে আওরত যদি সত্যিই লোভী হত তাহলে আমার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেত কিন্তু সে তা সমর্থন করে নি। নিজে রোদন করে ব্যর্থ বেদনার হাহাকারে নিজেকে আহুতি দিয়েছে, তবু বাদশাহের তীব্র আকাঙ্খাকে সমর্থন করে, নষ্টদেহ সমর্পণ করে লোভের পরিচয় দেয় নি। আমি তাকেই একবার শেষ জিজ্ঞাসা করতে চাই। আওরত তুনিয়াতে অনেক আছে, আমি বাদশাহ, আমার জীবনের প্রত্যাশা অপূরণ থাকবে না। কিন্তু এমন জেনানার দেখা আর কোথায় পাবো?

মাহাম এইসময় বললেন—কিন্তু সেই আওরতকে বেগম করলে তোমার রাজ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি হতে পারে।

কারণ!

কারণ তুমি কানুন মানো না। স্বেচ্ছাচারকে প্রশয় দাও। খামখেয়ালী। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব। তোমার অনুকরণে প্রজারাও খামখেয়ালী হবে। তখন অরাজকতা জাগতে বেশী দেরী হবে না। মানুষের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু থাকবে না।

হঠাৎ দেয়ালে টাঙানো একটি তীক্ষ্ণধার তরবারী টেনে নিয়ে আকবর হাতের মুঠিতে ধরে বললো—এর শক্তি কি কেউ স্বীকার করবে না?

মাহাম হেসে বললেন—সামনে ভয়ের অভিনয় করবে, পিছনে তোমার সমালোচনা করবে।

আকবর মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তার বুদ্ধি তখনও অতো প্রখর হয়নি, শুধু নিজের ইচ্ছাই প্রবল, সেখানে কোন কানুন নেই—এই কথাই সে বেশী করে বুঝতো—তাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার নিজের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করলো না।

তখন শিবালীর মুখটিই তার মানস পটে ভেসে উঠছে।

মাহাম আনাঘা বুঝলেন, আকবর বয়েসে তরুণ হলেও নিজের কর্তব্যে অটল। তাকে কোন যুক্তি দিয়েই টলানো যাবে না। তাই হামিদার দিকে ফিরে বললেন—পুত্রের ইচ্ছাকেই মেনে নিন বেগমসাহেবা। আমরা যে তার মঙ্গলের জন্যে কিছু করছি, এ আকবর বুঝতে চায় না। তারই রাজ্য, তারই রাজত্ব। সিংহাসনে সে বসে প্রজাদের জয়ধ্বনিই নেবে। আমরা চিরকাল অন্তঃরালের মানুষ, অন্তঃরালেই থাকবো। বাদশাহ যদি নিজের বুদ্ধির দোষে রাজ্য হারায়, আমাদের কি করবার আছে? আমরা একদিন তারই কর্মের ফলে নির্যাতিতা হব, এই যখন তার বাসনা, তখন আর বলার কিছু নেই।

আঘাত দিতেও আকবরের অটলতা এতটুকু নম্র হল না। সে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকলো।

হামিদা বেগম নীরবে কাঁদছিলেন, চোখের জল মুছে বাঁদীকে আহ্বান করলেন, তারপর তাকে আদেশ দিলেন—রাজপুত লেড়কীর কাছে নিয়ে যাও।

আকবর চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে রুদ্ধস্বরে বললো—মেরে গোস্তাখি মাফি কর দেও আম্মি।

কোন উত্তর অপর তরফ থেকে উচ্চারিত হল না।

আকবর নিঃশব্দে বাঁদীর পশ্চাদ্ধাধন করলো।

মাহাম এগিয়ে গিয়ে হামিদার কর ধারণ করে চাপাস্বরে সান্ত্বনা জানিয়ে বললেন—বেগমসাহেবা চিন্তার কিছু নেই। বেয়াদপ সন্তানকে কি করে বশে আনতে হয়, তা আমার জানা আছে। আমার আধম এর চেয়ে কম বেয়াড়া নয়, সে এখন আমার হুকুমে ওঠানামা করে।

হামিদা কাতর হয়ে বললেন—কিন্তু আকবর যদি শাদী না করে!

মাহাম বললেন—সে করবে না এ কথা তো বলে নি! তবে রাজপুত লেড়কীর সাথে সাক্ষাতের পর বোঝা যাবে, তার পরিণতি।

তারপর মাহাম চতুর্দিকে তাকিয়ে হামিদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি বললেন।

হামিদার মুখখানি মুহূর্তে উজ্জ্বলতা ধারণ করলো, তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন—তুমি এসেছিলে বলেই আজ আমি সাহস পাচ্ছি। না এলে কি যে করতাম, ভেবে পাচ্ছি না।

আকবর তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেই রাজপুত লেড়কীর সামনে। আজ তার একচোখে যা কিছু দৃষ্টি, অন্য চোখটিতে কালো একটি পর্দা টাঙানো। সিংহের সেই থাবায় কক্ষচ্যুত হওয়া মণিটি এখন স্বঅবস্থায় ফিরেছে। তবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয় নি, দৃষ্টিও ফেরে নি।

শিবালী বাদশাহের সেই আবোরিত চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। সে শুনেছিল রাজকুমার ছুটি সিংহের কাছে প্রাণ সমর্পণ করতে গিয়েছিলেন, তারপর অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়ে বহু মানুষের প্রশংসা কুড়িয়ে ফিরে এসেছেন কিন্তু একটি চোখ বোধ হয় চিরতরে গেছে। কুমারের আবোরিত চোখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে সমবেদনা প্রকাশ করলো। কিন্তু মুখে কিছু বললে পাছে দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যায়, বাদশাহ তার মনের কথা জেনে পাছে তার প্রতি আরো আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন, এই ভেবে শিবালী মাথা নত করে থাকলো।

একদিনে এই বদ্ধকক্ষে বসে সে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। দিল্লীর অন্তঃপুরে যাকে বালিকা বলে তুচ্ছ করা হয়েছিল, এখানে যেন তার অনেক মূল্য বেড়ে গেছে। এর কারণ কি সে জানে না। তবে একথা তার কানে গেছে, নবীন বাদশাহ মহব্বতের আকর্ষণে প্রমোদকক্ষের সব আনন্দ বরবাদ করেছে। এখন সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিরহীর মন নিয়ে অলিন্দে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সব খবর অবশ্য বাঁদীরাই উপযাচক হয়ে দিয়েছে। সে কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নি। বাঁদীরা খুশি হয়ে বলেছে—বিবিজী, তুমি বড় সৌভাগ্য নিয়ে ছুনিয়াতে এসেছ। তোমাকে পেয়ার দিয়ে নবীন বাদশাহ দিল্ মুজরিম করেছেন। তুমি বড় ভাগ্যবতী জেনানা।

শিবালী কোন উত্তর দেয় নি। শুধু মনে মনে ভেবেছে, এ কথা শোনার আর তার কি অধিকার আছে? আকবর পেয়ার দিয়েছে, সে সেই পেয়ার আর গ্রহণ করতে পারে না। এখন সে দলিত এক শুষ্ক কুসুম। সব আনন্দের বাইরে এক ইজ্জতহারা নষ্টা আওরত।

আর ভাবতে পারে নি। চোখে জল এসে মন ভারী হয়ে

গেছে। আজ শুধু কান্না, এ তার কি হল? কেন দস্যু তার ক্ষণিক সুখের জন্যে একটি অবলা বালিকার সব আশা আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে দিল।

এর মধ্যে একদিন বেগমসাহেবা এলেন, এসে বললেন—লেড়কী, তুমি জিন্দা আছো? কিন্তু তুমি বড় ফন্দিবাজ আওরত আছো। আমার লেড়কার সাথে কেমন করে মিললে বুঝতে পাচ্ছি না। যাই হোক যদি কোন কু মতলব করে থাকো, তাহলে সে মতলব ছাড়ো। এখন নাস্তাপানি করে নাও। বেশী চালাকি কর না, কান্না বন্ধ করে আমার হুকুম তামিল কর। আমার লেড়কাকে ঘায়েল করবে না, সে তোমার মত বহু আওরতকে আসরফি দিয়ে কিনতে পারে। তুমি ভুলে যেও না, তুমি একটি ঝুট আওরত। তোমার মত আওরতের স্থান আমাদের হারেমে নয়, পথের আবর্জনায়। এখন তোমার প্রশস্ত পথ খোলা আছে, চাঁদনী চকের বাজারে গিয়ে ব্যবসা করা। কসবীর ব্যবসা। বহু মরদের ভোগের নৈবেদ্য হয়ে জীবন ধারণের তপস্যা।

এই বলে হামিদা বানু হাসলেন।

আর শিবালীর নত মুখের সেই চাবুকের কালো চিহ্নের ওপর আবার রক্ত ঝলকে উঠলো। এত অহঙ্কার! নিজে আওরত হয়ে অন্য একটি আওরতকে এমনি তাচ্ছিল্য! সেই মুহূর্তে শিবালীর ইচ্ছে হয়েছিল—বেগমসাহেবার মুখের ওপর চপেটাঘাত করতে। বারবনিতা কে? কসবী কে? সে যদি ঐ উপাধি-ভূষিতা হয়, তাহলে তো রাজ অন্তঃপুরের সবাইকে গিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে?

কিন্তু সে সেদিনও কোনকথা বলতে পারে নি, শুধু নীরবে মাথানত করে বসেছিল—একবার ভেবেছিল, মাথা তুলে সরোষে বলে, আপনি কি সাচ্চা কোন আওরত? তাই যদি হন তাহলে কি করে এত দম্ভের পরিচয় দিচ্ছেন? আপনার গলতিই তো আমাকে

নষ্ট হতে সাহায্য করলো। কিন্তু ভয় করলো, যদি আবার সেই ক্ষমতার দম্ভে প্রহারের সুযোগ নেন।

সৎমাও ছোটবেলা থেকে মারধোর করে আসছেন, বাইরে বেরিয়ে অপরের কাছেও সেই আচরণ। জীবনটাই যেন মার খাবার জন্যে জন্মেছিল।

তবু মনে মনে একটু সুখ, একজন তাকে পেয়ার করে। সেই একজন অন্য কেউ নয়, হিন্দুস্থানের সেরা বাদশাহ আকবর শাহ। লোকটি বিধর্মী, মুসলমান কিন্তু মনে তার আছে দরদভরা প্রেম। প্রেমই মানুষের ধর্মান্ধতাকে চূর্ণ করে দেয়। ঈশ্বর মানুষকে ধর্ম দিয়ে পাঠান নি তো! মানুষ সবই এক। মানুষই করেছে তার ভেদাভেদ। সেই মানুষের কল্যাণরূপ প্রেমের ছদ্মবেশে নির্বাণের মন্ত্রপাঠ করেছে। মনে মনে শিবালীও প্রেম দিয়েছে। রমণী মনের নিবিড় সেই প্রেমোচ্ছ্বাস নীরবে সোহাগ পরিয়েছে। তবে তা গোপনে, একমাত্র সে ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। বক্ষে ফুটেছে কলি। অলি তাই গুঞ্জরণ করে যায় নিভৃতে। কিন্তু সে এত বিলম্বে যে আজ তার কোন সার্থকতা নেই। আজ জীবন উৎসর্গীত শুধু মৃত্যুর জন্যে। বেওয়া বিধবারও পুনরায় শাদী হয়, তবু তার যে স্বীকৃতি আছে শিবালীর নেই।

সে কোন এক জাতকুলহীন কামনাপ্রদীপ্ত পুরুষের মুহূর্তের ভোগ্যা হয়ে ইজ্জত দান করেছে, তার যদি কোন স্বীকৃত থাকতো তাহলে হয়তো সে সম্মান পেত কিন্তু মানুষের বিচারে আজ সে পরিত্যক্তা।

শিবালী এই কদিন ধরে অনেক ভেবেছে কিন্তু কিছুতেই মনের কাছ থেকে সমর্থন পায় নি। তাদের দেশে ধর্ষিতা হলে পঞ্চায়েতের বিচারে আগুনে দগ্ধ হতে হয়, মনে হয় সেই পন্থা অনেক সুখের। আজ যে জীবনের কোন প্রয়োজন নেই, সে জীবন গেলেই তো ভাল হয়!

কিন্তু কোথায় যেন একটু বাঁচবার বাসনা। কোথায় যেন একটু রঙের স্পর্শ! কার যেন নিবীড় সান্নিধ্য! কার যেন উষ্ণ নিঃশ্বাসের বাতাস, বক্ষের স্পন্দনের ধ্বনি সে বার বার উপলব্ধি করে।

তাই তার ক্রন্দনের মধ্যেও স্বস্তি জেগে ওঠে। বার বার তার মনে হয়, একজন তো তার সদাজাগ্রত চোখ দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে!

ভ্রাতা তাকে সবচেয়ে পেয়ার করতো, সেই ভ্রাতার সঙ্গে সে বাড়ী ছেড়েছিল, আজ আর একজনকে সে পেয়েছে।

এমনি সময় জানতে পারলো তার প্রিয়জনের শাদী, সে সঙ্গে সঙ্গে বড় খুশি হল। প্রিয়জনের সুখেই তো তার সুখ! সত্যিকারের ভালবাসার মধ্যে পাওয়ার চিন্তা থাকে না, যারা পেতে চায় তারা দেহের আবর্তেই ঘোরাফেরা করে। যারা হৃদয় দিয়ে সোহাগ ছড়িয়ে দেয়, তারা দিয়েই যায়—গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না।

শিবালী বদ্ধকক্ষে বসে তাই বড় খুশি হয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ তার সেই প্রেমাস্পদকে কক্ষে দেখে কেমন যেন মুষড়ে গেল। মন তার ডুকরে কেঁদে উঠে বলে উঠলো, আজ সে কেন এল? কি অভিপ্রায় নিয়ে আজ এই উৎসবের শুভক্ষণে এই কক্ষে এসে উপস্থিত হল? সে তো বেশ ভালই ছিল, নীরবে হৃদয় দান করে মহব্বতের সুখতিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা—এর নাম যাই হোক—এর মধ্যে নেই কোন ঝুঁকি! আজ যদি সে কোন কাতরতা প্রকাশ করে, সে তো আর কঠোর হতে পারবে না। তার হৃদয় যে আপ্লুত হয়ে কারো সান্নিধ্য কামনায় ব্যাকুল। কিন্তু সে যে ভুলতে পারে না, তার বর্তমান অবস্থা কি? পবিত্র এক আশাবাদী যুবককে নিজের মালিন্য দিয়ে কেমন করে আচ্ছন্ন করে দেবে? প্রাণ থাকতে যে তা হবার নয়।

তাই বিরাট শঙ্কা নিয়ে আবার মাথা নত করে থাকলো।

আকবর সেই এসেছিল, আজ শেষবার এল। এখানেই দেবে আজ যবনিকা। তাই অনেকক্ষণ ধরে শিবালীকে প্রাণভরে দেখে, চাপাস্বরে বললো—একটু মুখটা তোল শিবালী ভাল করে দেখি। আজ তোমার সাথে আমার শেষ মোলাকাত। জিন্দেগী ভর যত দিন বেঁচে থাকবো তোমাকে কভি না ভুলবো। আজ আমি চেয়েছিলাম পেয়ারের বিরুদ্ধে জুলুমকে বেত্রক্তিয়ার করতে কিন্তু মেরে খোদা আমাকে জখম করে দিল। মহব্বত আমার জীবনে এল না। কোন আওরত আর আমার হৃদয়ে পেয়ারের মদৎ পাবে না! শুধু তাদের প্রতি কর্তব্যই হবে আমার সারাজীবনের কর্ম।

তারপর আকবর উদগত অশ্রুকে সংবরণ করবার জন্যে কিছু সময় থেমে অন্যদিকে ফিরে থাকলো। তারপর বললো—আজ আমি শাদী করতে চলেছি। জানি না, সে আওরত কিসের প্রত্যাশা নিয়ে আমার বেগম হতে আসছে। শুনেছি সে আমার আত্মীয় বহিন। তার কোন অপরাধ নেই। তাকে আমার বেগম করে দিয়ে আমার স্বভাবের এই চঞ্চলতা মন্দগামী করবার জন্যে আমার মায়ের প্রচেষ্টা কিন্তু আমি তাদের কেমন করে বোঝাবো দিলের বিরুদ্ধে জুলুম চলে না। দিল এক্ কাচ কী পেয়ালা! ভেঙে গেলে তো আর জোড়া যায় না! দিলের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গেলে নিজের' তাকতই কোরবানি যায়, নজরানা কিছু মেলে না।

এতক্ষণ শিবালী মাথা নত করে অশ্রুত্যাগ করছিল, আর শুনছিল এক প্রেমিকের ব্যর্থ উচ্ছ্বাসের হাহাকার। আজ আর কোন গোপনতা নেই। আজ সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেউ আর সরমকে আশ্রয় করে সঙ্কোচে নিরুত্তর নেই। আজ এমন জায়গায় তারা পৌঁছে গেছে, যার পরিণতিই দুজনের শেষ পরিণাম। তাই প্রেমিকের কথা শুনে বার বার শিহরিত হয়ে সংযম হারাতে

লাগলো। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বার বার তার মনে হতে লাগলো, নিজেকে সঁপেই সে দিয়ে দিবে। যাক্ যা হবার শেষ পর্যন্ত হবে। নিজের জন্যে তো সে কোন আকাঙ্ক্ষা করছে না, অপরের জন্যে আত্মত্যাগ। তাছাড়া একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, যার ক্ষমতায় একদিন সারা হিন্দুস্থান বিরাট সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল হবে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে এমনি আহত করার তার কি ক্ষমতা? সে এক নগন্য রমণী হয়ে এত বড় স্পর্দ্ধাই বা মনে ধারণ করবে কেমন করে? কিন্তু পরক্ষণে স্মরণ পড়লো হামিদাবানুর কথা। তাঁর অপমানজনক কথাগুলি মনে এলে যেন সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে যায়। সে এই রমণীকে যথেষ্ট ভয় করে। তাছাড়া এই ধরণের রাজপুরীতে দৌলতের পরিবেশে বিদেশী এই রমণীদের চালচলন সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ। তাঁদের মনের তলের খোঁজ সে পায় না। তার সংমাকে ছাড়া পৃথিবীর কোন রমণীর স্বভাব সে জানতো না। সংমার মনের বিক্ষোভেরও সে অর্থ করতে পারতো। কিন্তু এই রাজপুরীর পরিবেশে এসে এখানকার সবকিছুই কেমন যেন দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। শুধু এই রাজকুমারের আন্তরিকতাই তার কাছে স্পষ্ট কিন্তু স্পষ্ট হলেও আজ ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে নীরবে নিজেকে নিঃস্ব করে প্রার্থনাকারীকে চিরজীবনের মত ফিরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু তারপর তার কি হবে? তার যে শেষপর্যন্ত কি পরিণতি হবে, সে তা জানে না। যদি ভাইজান ফিরে আসে তাহলে তার সঙ্গে আবার ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সে যদি না আসে? ভাইয়েরও যদি তার মত কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে? কিম্বা এরা যদি ভায়ের সঙ্গে মিলতে না দেয়? এদের এই রাজপরিবারে শুধু ষড়যন্ত্র, কারো ভাল কেউ চায় না—এই সে দেখে আসছে। তাই তার মনের মধ্যে শুধু সংশয়ই জাগে। বুঝি এদের এই রাজসিক বন্দীজীবন থেকে কখনও বাইরে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হবে

না। ভাগ্য এরই আবর্তে ঘুরে ফিরে ঠোক্কর খেয়ে এখানেই শেষপর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে।

তবু তার প্রিয়জনকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। কোন উপায় নেই।

শিবালী হঠাৎ দু'চোখে শ্রাবণের ধারা নিয়ে আকবরের ব্যথিত মুখের ওপর তুলে ধরলো, উদ্দেশ্য যদি মুখের ভাষাতে সব কথা স্পষ্ট না হয়, তাহলে মনের ভাষা পড়ে তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাদশাহ। তুমি আমার আলেমপনা। তুমি আমার হৃদয়ের রাজা। তুমি আমার ঈপ্সিত পুরুষ। শাদী যখন দুনিয়ার নিয়মে সম্ভব নয়, তখন অন্য দুনিয়ার নিয়মে তুমি অন্তরে অন্তরে আমাকে বেগম করে নাও। মিলন আমাদের হয়ে গেল স্বর্গীয় মিলনের অনুপ্রেরণায়। যুগে যুগে যে মিলনের দ্যুতিতে নারী-পুরুষের সম্বন্ধ প্রগাঢ় হয়, সেই মিলন আমাদের আঁকা হয়ে থাকলো। আমাদের মিলনে নহবত-খানায় সানাই বাজলো না, অলিন্দে অলিন্দে আলোর রোশনাই জ্বললো না কিন্তু একজায়গায় এমন এক সুর, এমন এক আলো জ্বললো—যা অপার্থিব জগতেই সম্ভব। তবু তুমিই আমার খসম্। বিধাতার লিখনে নারীর ললাটে যে ষষ্ঠী পূজোর দিন স্বামীর ছায়া সৃষ্টি হয়, সেই ছায়াই তুমি আমার।

এ কথাগুলি সে সময় বোধ হয় শিবালীর মনের মধ্যে এসেছিল। যদি নাও এসে থাকে তবে তার মনের সে সময়ের রূপই তাই ছিল। কিন্তু শিবালী হঠাৎ কাতরস্বরে বললো—রাজকুমার, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি শাদী করুন। শাদী করলে মনের অস্থিরতা কমে যাবে। আমাকে ভুলতে পারবেন।

আকবর হঠাৎ অস্থির হয়ে বললো—কখনও আমি তোমায় ভুলতে পারবো না। আমি যদি ভুলি তাহলে আমি ঝুট্, আমার মহব্বত ঝুট্। সমস্ত জিন্দেগী ধরে শুধু তোমার কথাতেই আমার সারামন ভরে থাকবে। যদি বিশ্বাস না কর তবে তার প্রমাণ নাও।

এই বলে অতর্কিতে আকবর নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছোরা তুলে নিয়ে হাতের ওপর আঘাত করলো।

শিবালী ছুটে এসে বাধা দিতে গেল কিন্তু তার আগেই আঘাত প্রাপ্ত স্থান থেকে শোনিতধারা বেরিয়ে হাতটি পিচ্ছিল করলো।

রক্ত দেখেই শিবালী অসংযত হয়ে পাগলের মত বললো—একি করলে তুমি রাজকুমার?

আকবর চোখ তুটি বুজে স্ফুরিতস্বরে বললো—আমার বিশ্বাস, আমার কসম, আমার সাচ্চা মহব্বতের খুন দিয়ে পেয়ারের ছবি আঁকলাম বিবি।

কিন্তু আমি যে বিনিময়ে কিছুই দিতে পারলুম না।

সবই দিতে পারো, নিজেকে সঁপে দিতে পারো। বাদশাহকে খুশি করতে পারো। তাকে প্রাণ দিতে পারো।

না, না পারি না, পারি না—কিছু আমি পারি না! আমি একটি নষ্টা রমনী। আমি আমার অপবিত্র দেহ নিয়ে মন্দিরের সোপানে উঠতে পারি না। ঠাকুরকে পূজা দিতে পারি না। প্রণাম জানাতে পারি না। সে অধিকার ঈশ্বর আমার কেড়ে নিয়েছে।

শিবালী ছুটে গিয়ে কক্ষের অন্যপ্রান্তে দেয়ালের জমিনে মুখখানি চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

আকবর দাঁড়িয়ে থাকলো অর্থহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ। তারপর সজ্ঞানে ফিরে বললো—শিবালী, শোনো আমি তো বলেছি, তুমি ঝুট্ নও—তুমি যদি ঝুট্ হও তাহলে সারা তুনিয়ার সমস্ত আওরত ঝুট্। আমি তোমাকে ইজ্জত দেব। তুমি একবার হুকুম দাও—তারপর আর তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। জোর করে একজনকে অধিকার করা যায় কিন্তু তার মন পাওয়া যায় না। আমি তোমার মন পেতে চাই' শিবালী।

হঠাৎ শিবালী ঘুরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে রুদ্ধস্বরে বললো—তুমি যাও রাজকুমার চলে চাও। আমাকে আর লোভ

দেখিও না। আমি আর সংযম ধারণ করতে পারবো না, আমিও তো মানুষ ওগো! তুমি যাও। তুমি শাদী করে সুখী হও—এই আমার প্রার্থনা। আমারও ভালবাসা তুমি পেয়েছ। ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, আর আমাকে নীচে নামতে বলো না। সকলের অবমাননা আমি সহ্য করেছি কিন্তু তোমার অবজ্ঞা সহ্য করতে পারবো না।

আকবর তবু কিছু বলতে গেল।

শিবালী বাধা দিয়ে হাত জোড় করে বললো—আর নয়, এবার যাও।

আকবর বানবিদ্ধ শাবকের মত আহত দেহ টেনে টেনে বাইরে বেরিয়ে এল। আওরতদের একি চরিত্র? এই চরিত্রের যে কোন হদিশই মেলে না। এমনি রহস্যময় চরিত্রই বুঝি বিধাতা আওরতদের দিয়েছেন। সলিমাকে সে দেখেছে। সলিমার চরিত্রের কোন তল খুঁজে পায় নি। সে কেন বৈরাম খানকে ভালবেসে শাদী করলো, আজও রহস্য! অথচ তার মত রূপসী মেয়ে খুব বড় একটা দেখা যায় না। খানসাহেবের বেগম লল্লাও একটি বিচিত্র চরিত্র। লল্লা স্বামীর ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা ত্যাগ করেছে, অথচ তারই পত্র সে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিল। মা হামিদা, ধাত্রীমা জিজি, বিবিরূপা, মাহাম আনাঘা প্রত্যেককে সে দেখেছে, তাঁদের চরিত্রও সে বুঝতে পারে না। মা হামিদা পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করেন, অথচ পুত্রের ইচ্ছাকে তিনি সেলাম জানান না। উপযুক্ত পুত্রের রাশ টেনে ধরে তিনি নিজের পরিচালিত পথে চালাতে চান।

আর এই শিবালী।

সে যে ভালবাসে তার প্রকাশ সে গোপন রাখলো না। অথচ রাখলো না বাদশাহের অনুরোধ। লোভও তো কিছু থাকতে পারতো! রাজকোষের দৌলতের দিকে সবার লোভ। সেরা ভাগ্যবান পুরুষ ও ভাগ্যবতী রমণী সবারই চোখের তলায় লুণ্ঠনের

সাহারা—অথচ শিবালীকে সে সব দিতে চাইলো কিন্তু সে বিনিময়ে দিল প্রত্যাখান। কিছুতে সে বুঝতে পারলো না এই প্রত্যাখানের অর্থ।

শিবালী ইজ্জত হারিয়েছে। দস্যু যদি অতর্কিতে লুণ্ঠন করে তার নারীরত্ন কেড়ে নিয়ে থাকে, তার জন্যে দায়ী কি সে নিজে? তাছাড়া আকবর ভাবে, এই ইজ্জতহানির কোন অপরাধ শিবালীর নেই। তাছাড়া যদিও কোন অপরাধ হয়ে থাকে, সে অপরাধ আকবর নিজের স্কন্ধে নিয়ে শিবালীকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু সে তা স্বীকার করলো না। নিজে বরবাদ হল, প্রেমাস্পদের জীবন বরবাদ করে দিল।

হঠাৎ আকবরের চিন্তাধারায় ছেদ পড়লো। সে জেনানামহলের ভেতরের অলিন্দ দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছিল। মন তার বাইরে ছিল না, ছিল অন্তরের গভীরে। শিবালীর প্রত্যাখান তাকে বেদনার শেষমুহূর্তে উপনীত করেছিল।

আচমকা কে যেন তার গতিরোধ করলো। ওড়না দিয়ে পদ্মের মত মুখখানি ঢাকা। ওড়না সরাতেই বেরিয়ে এল একখানি ঢলঢলে মুখ। দুটি চঞ্চল্ দৃষ্টির বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে হাসলো সেই অপরিচিতা মুক্তার মত দাঁতগুলি মেলে। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে বললো—সেলাম আলেকুম জাঁহাপনা। আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না?

আকবর অভিভূতের মত সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকলো।

আলিমনের নাম কখনও বেগমসাহেবার কাছে শোনেন নি, আমি সেই আলিমন। আলিমন আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো।

আকবর এবার সহজ হল, বললো—তা তুমি অত হাসছো কেন?

আলিমন হাসি প্রশমিত করে বললো—হাসছি কি সাধে? ভাবছি, হিন্দুস্থানের বাদশাহেরও আজ কি দুরবস্থা?

কেন, কি হয়েছে ?

কি হয়েছে, সে কি আপনিও জানেন না ? রাজপুত লেড়কী আপনার পেয়ার প্রত্যাখান করলো, এদিকে রুকমি বিবি বেগম হতে চলেছে ! ওদিকে মাহামবিবি ও বেগমসাহেবা সলাহ্ করে রাজপুত লেড়কীকে ছুনিয়া থেকে সরানোর ব্যবস্থা করছেন। শুধু রাজপুত লেড়কী মৃত্যু গ্রহণ করবে না, আজই রাত্রে ফরিদ আবার যাবে তার কাছে। ঠিক যেমনি সে একদিন বেগমসাহেবার নির্দেশে আমার কক্ষে গিয়েছিল।

আকবর আলিমনের কথা শুনে চমকিত হল, ক্ষুদ্ধস্বরে বললো—ঠিক তুমি জানো, ফরিদ এ কাজ করবে ?

ঝুট্ বলায় আমার স্বার্থ ?

ফরিদ কখন যাবে শিবালীর কাছে ?

ঠিক আপনি যখন রাত্রে সুখমহলে প্রবেশ করবেন, তখন।

মুহূর্তে আকবরের মুখমণ্ডল কঠিনাকার ধারণ করলো। একটু সময় নিয়ে তারপর বললে—তুমি এসব ষড়যন্ত্র কি করে জানলে ?

মাহামবিবি ও বেগমসাহেবা রুদ্ধকক্ষে বসে সলাহ্ করছিলেন, আর ফরিদকে ডাকতে আমার সন্দেহ হয়েছিল বলে আড়ি পেতে শুনেছি।

তারপর আলিমন স্বগতোক্তির মত অথচ বেশ একটু অস্ফুটস্বরে নিজেকেই বললো—কেন এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাশ করে দেব না ? তারা আমার কি করলো ? কেন খেয়ালের বশে আমাকে বলি দিল ? আজ ঐ ফরিদের বাচ্চা আমার পেটে দিন দিন জীবন্ত হয়ে উঠছে। কত আশায় ভরা জীবন ছিল, সে আশা আজ বরবাদ। পরিবর্তে এখন ঘৃণায় নিজের দেহই অবহেলিত। অথচ এমনি কোন্ ইবলিস কা বাচ্চা সে পেটে নিতে চেয়েছিল ? যার কোন পরিচয় নেই, যার কোন স্বীকৃতি নেই ! বাঁদীদের কত বললাম, কোন দাওয়াই দিয়ে আমার পেটের শয়তানটাকে স্তব্ধ করে দাও

কিন্তু তারা বললো—বেগমসাহেবার হুকুম নেই। বেগমসাহেবা বলেছেন—ফরিদের সঙ্গে তার শাদী হবে।

শাদী? অন্যায় করে উপকারের প্রত্যাশা! অনুতপ্ত হয়ে খেসারত দেবার চেষ্টা! তাই বলে ঐ কামবক্ত ফরিদ হবে তার খসম্! মরে গেলেও না। একটি মরদহীন শিরদাঁড়া ভাঙা কুজো কুৎসিত মানুষ। মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে, সে হবে স্বামী?

ভাল বিচারই বেগমসাহেবা করেছেন। কোথায় বাদশাহের বেগম হবে সে, তা না হয়ে এক নগন্য বান্দার কুৎসিত লালসার শিকার হল? একেই বলে নসীব। একেই বলে দুনিয়ার বেইমানী বিচার।

তারপর ম্লান হেসে আকবরের দিকে তাকিয়ে আলিমন বললো—জাঁহাপনা, দুনিয়াতে সবাই জন্মায় ভালভাবে বাঁচবার জন্যে কিন্তু সকলে কি ভালভাবে বাঁচতে পারে? আপনার তো কিছুরই অভাব নেই, তবে কেন আপনি অস্থির হয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আরামকক্ষের আরাম কেদারায় শুয়ে মেওয়া আঙুরের সরাব পান করতে পারেন না?

আকবর সবই জানতো আলিমনের সম্বন্ধে। আলিমনকে কখনও সে দেখেনি। প্রথম দেখে অভিভূত হল, কিন্তু দুঃখিত হল আলিমনের কথা স্মরণ করে। মা কেন আলিমনকে নষ্ট করেছিলেন, তার কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন, এখন বুঝলো সে কৈফিয়ৎ ঠিক যুক্তিযুক্ত হয় নি। মা কেমন করে নিজে আওরত হয়ে একটি বাচ্চা লেড়কীকে ফরিদের মত কামবক্তের হাতে সঁপে দিলেন!

ফরিদ তার রোষ থেকে বেঁচেছিল, শুধু তার মানসিক দ্বন্দ্বের সংঘাতের জন্যে। এবার ফরিদ শাস্তি পাবে, আর সে চরম শাস্তি। মা এসে বাধা দিলেও সে কোন কথা শুনবে না।

তাই আলিমনের দিকে চেয়ে বললো—ফরিদকে শাস্তি দিলে তুমি খুশি হবে?

আলিমনের চোখের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো—অবশ্যই খুশি হবো।

আকবর তারপর ইতস্তত করে বললো—কিন্তু ফরিদের বাচ্চা!

আলিমনও কোন সরমের পরিচয় দিল না, বললো যে বাচ্চার কোন পরিচয় নেই, তার প্রতি আমার কোন মমতাও নেই।

বেশ, আজ রাত্রেই ফরিদের জান খতম হয়ে যাবে।

আকবর আর সেখানে দাঁড়ালো না, এমন কি আলিমনের সেলাম গ্রহণ না করেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে জেনানামহল পরিত্যাগ করে চলে গেল। শাহী দুনিয়ায় আজ শুধু ষড়যন্ত্র ও জুলুম। শিবালীর মত একটি নিষ্পাপ আওরতকেও এরা চক্রান্ত করে কোথায় নামাচ্ছে?

হায়রে মাতৃস্নেহ? পুত্রের ভাল করতে গিয়ে তার মা কোথায় নেমে যাচ্ছে?

তারপর শাদী হয়ে গেল। শাদীর আনন্দে সমস্ত প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে নারীপুরুষের কোলাহল সোচ্চার হল। নহবত-খানায় নানান রাগে প্রহরে প্রহরে সানাই বেজে চললো। বাদশাহের শাদী, শুধু মজলিশের পর মজলিশ। মিলে গেছে রমণী ও পুরুষেরা আনন্দের উষ্ণ সাগরে। রঙমহলে শুধু নাচ চলেছে।

আগ্রার প্রাসাদ দ্বার সাতদিন ধরে উন্মুক্ত। একবারও সেই লৌহ ফটক বন্ধ হয়নি। শুধু গুপ্তচরেরা শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে রেখেছে, কোন শত্রু ছদ্মবেশে প্রাসাদে না প্রবেশ করে বসে। তাঞ্জাম আসছে, যাচ্ছে। হাতির পিঠে, ঘোড়ার পিঠে মানুষও আসছে, আসছে অনেক নানারকম সওদা। দেশবিদেশ থেকে বণিকরা এসে তাদের দ্রব্যসম্ভার বেচে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম

নেই। সেরেস্তার কাজ শতগুণে বেড়ে গেছে। নতুন নোকরীতে কত লোক যে বহাল হল তার ইয়ত্যা নেই।

আসমানে শুধু নানাজাতের পারাবতের আনন্দ ভ্রমণ। কামান গর্জে উঠছে। মুহুর্মুহু কামানের নিনাদে সমস্ত উৎসব যেন আরো গাঢ়, আরো ঘন হয়ে উঠছে।

তারপর এক সময় রাত্রি এগিয়ে এল। আলোর ফুলঝুরি আসমানে উঠলো। পলতোলা আলোর ঝাড়ে আরো রঙবেরঙের বাতি ঝুললো।

পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠলো। তার জ্যোতি রজত পাত্রে ধরে বাদশাহের মনে নতুন রোমাঞ্চ জাগাবার জন্যে সেই অভিসার কক্ষে বিতরণ করা হল। যমুনার বুকেও অশ্রান্ত গর্জন। যেন যৌবনের উদ্দামতা সীমাহীন হয়েছে যমুনার।

আকবর যথানিয়মে অভিসার কক্ষে প্রবেশ করলো কিন্তু মন আজ সারাদিন থেকে অন্যমনস্ক। ফরিদকে তুবার সে দেখেছে। ফরিদ তাকে দেখে সেলাম করে সরে গেছে। আকবর বুঝেছে, ফরিদ নিজের দুর্বলতায় আহত। সেইজন্যে সামনে দাঁড়াতে চায় না। আকবর ইচ্ছে করলে ফরিদকে ডেকে তিরস্কার করতে পারতো কিম্বা রাত্রের ষড়যন্ত্র ভেঙে দিয়ে তাকে সাবধান করতে পারতো কিন্তু তা সে করেনি। কারণ তার অন্য মতলব আছে।

ফরিদকে একেবারে সামনাসামনি পাকড়াও করতে হবে। তখন আর কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু থাকবে না। তারপর জানে খতম। বেইমান কমবক্ত কত বড় সাহস শরীরে ধরেছে তাই সে দেখবে। তাকে অস্বীকার করে, আর কারো হুকুম শোনার শাস্তি চিরতরে দিয়ে দেবে।

কিন্তু অভিসার কক্ষে প্রবেশের পর যত রাত্রি এগিয়ে যাচ্ছে, তার ভয় জেগে উঠছে। যদি আলিমনের কথা মত ফরিদ তিন প্রহরে না গিয়ে দু'প্রহরে গিয়ে উপস্থিত হয়? না, না, তা

কিছুতে হতে পারে না। ফরিদকে শিবালীর কক্ষে প্রবেশের আগেই খতম করে দেবে। শিবালীর করস্পর্শের ক্ষমতা যাতে তার না হয়, তার মত ব্যবস্থা করবে।

এসব ভাবনা তার অভিসার কক্ষে প্রবেশের আগে।

কক্ষে প্রবেশ করবার আগে সে বিশ্বস্ত একটি অনুচরের মারফতে একটি বাঁদীকে শিবালীর কক্ষের ওপর সতর্ক পাহারা দিতে বলেছে, কোন সন্দেহ জাগলেই যেন শীঘ্র খবর পাঠিয়ে দেয়।

মন তার সত্যিই অন্যমনস্ক ছিল। অভিসারের মত মেজাজ ছিল না, প্রথম বেগমের সান্নিধ্য কামনায় যে সুখস্বপ্ন থাকে, তা আকবরের মধ্যে একটুও নেই। জুলুম করলে কি কোন কিছু করতে ইচ্ছা জাগে? শাদীই তো তাকে জুলুম করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ না বলতে পারেনি এইজন্যে যে গুরুজনদের অসম্মান করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। অন্তত মুখের সামনে বেয়াদপি করার মত দুঃসাহসী সন্তান সে নয়।

সেইজন্যে তাকে শাদী করতে হয়েছে কিন্তু শাদী না হয় হুকুমের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, অন্যান্য কর্তব্য নিশ্চয় তার ইচ্ছাধীন! সেই অনিচ্ছাই তাকে এই রাত্রে অভিসার কক্ষে প্রবেশ করতে এতটুকু উৎসাহ দেয়নি, তবু নিয়ম পালনের জন্যে সে প্রবেশ করলো। কিন্তু প্রবেশের মুখে হঠাৎ কক্ষের বিশেষ অভিনব সজ্জা দেখে সে চমকিত হল। আটটি যুবতী রমণী উদ্ভিন্ন প্রকট দেহ মেলে সরমহীনা স্বল্পবসনে কক্ষের চতুর্দিকে ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর এক ঐশ্বরিক আলো পড়ে আরো তাদের মোহনীয়া করেছে।

যে কোন পুরুষের চিত্তই এই দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত হত কিন্তু আকবরের সেই মুহূর্তে মনে হল, তাকে মোহে আচ্ছন্ন করবার জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা। যদি কোন অবস্থায় সে নয়া বেগমকে প্রতারিত করে, সেইজন্যে বহু সলাহ্ করে তারপর এই আয়োজন করা হয়েছে।

মনে মনে সেই কথা ভেবে আকবর ম্লান হাসলো। ওঁরা যদি জানতেন তার মনের বর্তমান অবস্থা, তাহলে এই আয়োজনের চেষ্টা করতেন না।

সমস্ত কক্ষটিকে রকমারী ফুলের গুচ্ছ দিয়ে সাজানো হয়েছে, যেন মনে হয় কুসুম বীথিকায় ভুল করে কেউ ঢুকে পড়েছে। সুন্দর একটি মেহগনি পালঙ্ক, তারও ওপর ফুলের শয্যা। অন্য সময় হলে আকবর খুব খুশি হত। ফুলের প্রতি তার চিরকালের অনুরাগ। এক জায়গায় অনেক ফুল দেখলে সে উল্লসিত হয়। রক্তবর্ণের গোলাপ ফুল তার সবচেয়ে প্রিয়। নানা জাতের গোলাপ এনে সে বাগিচায় বুনবে, এমনি একটি আশা চিরকাল সে পোষণ করে আসছে।

কিন্তু এদিন ফুলও তাকে আকর্ষণ জাগালো না।

কক্ষের মধ্যে নানা জাতের সুবাস ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিষ্টি সুবাসে সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নভাব জাগে কিন্তু আকবরের মাথাটায় ঝিম ধরলো কিন্তু কোন আচ্ছন্নতা এল না।

পালঙ্কের ওপর চকমকী বসনের ঘেরাটোপে যে নিঃশব্দে জবুথবু হয়ে বসেছিল, তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আকবর ধীর পায়ে বাইরের অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালো।

চাঁদের সুষমা কি সুন্দর যে রূপের জ্যোতি বিকীরণ করেছে? এ রাত্রে শুধু হারিয়ে যেতে ও হারিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। এ রাত্রে শুধু সেই মানসী প্রিয়ার কথা, যে প্রথম যৌবনের শুভদিনটি থেকে বুকের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, যাকে পাওয়ার জন্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করতেও নিরুৎসাহ জাগে না।

সুষমা সুষুপ্তির আমেজ সৃষ্টি করে, নতুন এক অভিনব পরিবেশের সৃষ্টি করে তারপর প্রহরের প্রতিটি সোপান পার হয়ে হয়ে শেষে শেষমাসে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তখন সেই রাত্রির চোখে

অবসাদের গ্লানি। ক্লান্তিতে নেমে আসে তার চোখে ঘুম। তারপর ভোরের আলো পূবাকাশে রঙের পসরা নিয়ে উদয় হয়।

রাত্রি যদি পৃথিবীতে না থাকতো ? তাহলে মানুষের জীবনের এই আকর্ষণ বোধহয় থাকতো না।

কিন্তু সে কথা এখানে অবান্তর, তখন আকবর ভাবছিল অন্য কথা! আজ রাত্রের পরিবেশ তার মধুর। প্রথম বিবাহিত জীবনের আনন্দ তার পরতে পরতে কিন্তু কি বিচিত্র জীবন প্রবাহ—সেই আনন্দে তার মনে নেই বরং মনে হচ্ছে তাকে কেউ প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে, সে ভয়ে কাঁপছে।

এদিকে একটি কর্তব্য তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে একটি মনের আবেদনে সে উৎপীড়িত। ফরিদ আজ শিবালীকে পুনরায় বেইজ্জত করবে! না, না শিবালীকে বাঁচানোর জন্যেই সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে। কোন কর্তব্য নেই।

ছুনিয়ার ইতিহাসে লিখিত হবে নতুন একটি কথা। সম্রাট আকবর শাহ প্রথম বিবাহিত জীবনের সুখ পরিত্যাগ করে তার মনের আবেদনেই সাড়া দিয়েছিল। রুকমি নতুন বেগম, মুখখানি সে দেখেছে। আম্মির নির্বাচনের তারিফ করতে হয়। সম্রাটের বেগম হতে গেলে বেহেস্তের খুবসুরত দরকার, রুকমির তা আছে। তার যদি এই অবস্থা না হত তাহলে সে এই বেগমের সান্নিধ্যে এই রাত্রে নতুন এক সুরের জন্ম দিতে পারতো।

কোথায় যেন বীণে আহীর ভৈরো রাগ বেজে চলেছে।

আকবর অলিন্দ থেকে সরে এসে ধীর পায়ে কক্ষের মধ্যে দাঁড়াল। পালঙ্কের ওপর জমকালো বসনের আড়ালে ওড়নার অবগুণ্ঠন টেনে যে বসেছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে বললো—তুমি কেন তক্‌লিক ভোগ করছো ? রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়ো।

মুহূর্তে সেই অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়ে নয়া বেগম ফিরলো, তার ছু'চোখে অশ্রু টলমল করছে।

আকবর সেই দেখে বিস্মৃতি হয়ে বললো -কিঁউ তৌম রোতি হ্যায়? কি হয়েছে তোমার? কাঁদছো কেন?

নতুন বেগম দু' চোখের জল মুছে মাথাটা নীচু করে থাকলো।

আকবর আরো যেন অবাক হয়ে গেল, সে কান্নার কারণ বুঝতে না পেরে বললো—আমি কি তোমাকে কোন দর্দ দিয়েছি?

নতুন বেগম মাথা নাড়লো।

তবে?

নতুন বেগম চুপ করে রইলো।

বলো। চুপ কেন আছো? আমি তো সহজে কাউকে কোন ব্যথা দিই না। আমি নিজের ব্যথাতেই ব্যথিত। নিজের ভাগ্যের চক্করেই নিজে ঘুরপাক খাচ্ছি, সে আমার বরবাদী জিন্দেগী, তাই বলে আমি কাউকে নফরৎ করেছি, এ অভিযোগ তো কেউ করবে না!

রুকমি বেগম এবার মুখ খুললো। নিম্নস্বরে বললো—আপনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন, তাহলে বেগমসাহেবার আমার ওপর গোসা হবে।

এইজন্যে তুমি কাঁদছিলে?

রুকমি মাথা নাড়লো।

আকবর ভাবতে লাগলো, তারপর বললো—তোমার ওপর আমার কর্তব্য আছে কিন্তু আজ কোন কর্তব্য রক্ষা করা সম্ভব নয়।

কেন নয়? হঠাৎ রুকমি পালঙ্ক থেকে নেমে এসে বাদশাহের হাত ধরলো।—আমি কি কোন অপরাধ করেছি? তবে আমি কেন আমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হব?

আকবর নয়া বেগমের মুখ থেকে এমনি নির্লজ্জের মত কথা শুনে ছিটকে গেল দূরে, তারপর ব্যঙ্গ করে বললো—আমার আম্মি আমার জন্যে উপযুক্ত আওরতই নির্বাচন করেছেন! উপযুক্ত বাদশাহের উপযুক্ত বেগম।

তারপর আদেশের ভঙ্গিতে বললো—যাও শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। এই আদেশ অবহেলা করলে চিরতরে নির্বাসন লাভ করবে। তখন তোমার বেগমসাহেবা কোন উপায়েই বাতলাতে পারবে না।

আকবর কেমন যেন ঘৃণা অনুভব করলো। তার প্রথম বেগম অদ্ভুত নির্লজ্জ। সত্যিই সে নির্লজ্জ না আম্মির নির্দেশের জন্যে ভয়ে তার মুখ খুলে গেল, আকবর বুঝতে পারলো না। তবু তার খারাপ লাগলো। ভয়ে মানুষ অনেক কিছু করে বলে নিজের স্বভাব ধর্ম পরিত্যাগ করবে ?

রুকমি আদেশই পালন করেছিল।

তবু তার ওপর খুশি না হয়ে আকবর আবার অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই প্রকৃতির বিচিত্ররূপ। যমুনা অশ্রান্ত স্রোতে তীরের বুকে আছড়ে এসে পড়ছে। নীল জলের বুকে রাশি রাশি শ্বেতশুভ্র ফেনা।

রাত্রের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করেছে।

আজ সবই আয়োজিত ছিল। একটি নতুন জীবনের জন্মের জন্যে থরে থরে সবই উপকরণ সজ্জিত। নয়া বেগমও অনেক প্রত্যাশা নিয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিল। শুধু আকবরই যা ভগ্নযন্ত্রে, সুরহীনকণ্ঠে পারলো না নতুন সঙ্গীতে কণ্ঠ মিলিয়ে দিতে। তাই সবই হল ব্যর্থ।

কতক্ষণ যে এমনিভাবে প্রহর যাপনা হয়েছে, কে জানে ? হঠাৎ রাত্রি তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আকবর চমকিত হয়ে ছুটে চললো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। উদ্ধত মুষ্টিবদ্ধে তার একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। সে অলিন্দের পর অলিন্দ, প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ, কক্ষের পর কক্ষ, মহলের পর মহল অতিক্রম করতে করতে ছুটতে লাগলো।

উৎসব তখন সমান ছন্দে এগিয়ে চলেছিল, তবে রাত্রি শেষযামে

ঢলে পড়েছিল বলে কিছু স্তিমিত হয়ে আসছে। নেমে আসছে ক্লান্তি। বর্তিকাতে আর আগের মত প্রজ্বলন শক্তি নেই, প্রায় নিভু নিভু নিষ্প্রভ দ্যুতি। সেইজন্যে আলোকিত অলিন্দে অন্ধকার নেমে আসছিল।

আকবরের হাতে উদ্ধত ছুরিকা ছিল বলে কেউ কেউ চমকালো। কেউ কেউ তাকে হঠাৎ চিনতে না পেরে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। যারা চিনলো, তাদের মুখ শুকোলো। কিছু একটা ঘটবার আতঙ্কে শিহরিত হল। কেউ কেউ আবার বাদশাহের পিছু নিল। রক্ষী প্রহরীরা হঠাৎ খাপ থেকে তরোয়াল খুলে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল।

আকবরের কিন্তু তখন কোনদিকে খেয়াল নেই। সে মনে মনে ভাবছিল শিবালীকে, আর ক্রুদ্ধভঙ্গিতে চিন্তা করছিল ফরিদকে। ফরিদ যদি সত্যিই শিবালীর কক্ষে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।

আলিমন মিথ্যা কথা বলবে মনে হয় না। তার চোখের তলায় আকবর প্রতিহিংসার আগুন ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলতে দেখেছে। সে বতলা চায়। সে চায় ফরিদের মৃত্যু। সেইজন্য সে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁশ করে দিয়েছে। যদি না ষড়যন্ত্র আকবর জানতে পারতো, তাহলে শেষ পরিণাম কি হত? আলিমনকে সেইজন্যে আকবরের সেই মুহূর্তে বড় ভাল লাগলো।

এমনি সময়ে সে দেখতে পেল ফরিদের মত একটি মুজদেহ, একরকম হামাগুড়ি দিয়ে জেনানামহলের পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পথটি প্রায়ান্ধকার। দূর থেকে ঠিক কাছের জিনিস ঠাহর হয় না। কাছে গেলে তবে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। তাছাড়া সে পথে কোন প্রহরী ছিল না, এমন কি কোন বাঁদীরও আনাগোনা নেই। শুধু দূরে একটি ঘুলঘুলির মধ্যে একটি রজতপাত্রের ওপর স্ফটিকস্তম্ভের

আলো আঁধারীতে একটিমাত্র আলোর স্ফুলিঙ্গ। তাতে ঐ অন্ধকার গলিপথ খুব আলোকিত নয়।

আকবর আরো এগিয়ে গেল পা চালিয়ে। শুধু ফরিদের কাছ থেকে একটু দূরত্বের ব্যবধান রাখলো কিন্তু ফরিদ এত দুঃসাহসী যে পিছু ফিরে সভয়ে একবারও দেখছিল না। অবশ্য দেখলে সে কাউকে দেখতে পেত না। আকবর তেমনিই এক আত্মগোপনের আশ্রয় নিয়েছিল।

ফরিদ কোন তৎপরতার পরিচয় না দিয়ে বেশ আমীরি চালে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল। আকবর অনেক পূর্বেই ফরিদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো কিন্তু সে অপেক্ষা করছিল শুধু সঠিক জানতে যে ফরিদ ঠিকই শিবালীর কক্ষে ঢুকতে চায় কিনা! একটি পুরুষের এত রাত্রে একটি রমণীর কক্ষে ঢোকার অর্থ কি— সে কেউ না বলে দিলেও আজ আকবর বেশ বুঝতে পারে।

তাই অপেক্ষায় আছে ফরিদের গতিবিধি কোন্‌দিকে? এই যখন ভাবছে, হঠাৎ দেখলো ফরিদ থমকে দাঁড়িয়েছে। আর সামনেই শিবালীর সেই কক্ষ। শিবালী কি এখন ঘুমিয়ে আছে?

ফরিদ এইবার করলো কি হঠাৎ ছুটে শিবালীর কক্ষে ঢুকে গেল।

আকবর আর দ্বিরুক্তি না করে সেও এগিয়ে গিয়ে কক্ষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কক্ষে আলো ছিল।

শিবালী বোধ হয় নিদ্রিত ছিল। ফরিদ এগিয়ে গিয়ে তার পালঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে আকবর পিছন থেকে তার কণ্ঠ চেপে ধরে পালঙ্ক থেকে তুলে আনলো।

এই সময় শিবালী আতঙ্কে উঠে বসে এই দৃশ্য দেখে অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করে উঠলো।

ফরিদ তখন বড় বড় চোখ করে আতঙ্কে আকবরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপছে।

হুজুর, আমার কোন গোস্তাখি নেই, বেগমসাহেবার হুকুম আমি তামিল করতে এসেছি।

চুপ। আকবর চাপাস্বরে হুঙ্কার দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

আকবরের হাতে সিংহের মত শক্তি। সে একহাতে ফরিদের কণ্ঠ চেপে ধরেছিল, অন্য হাতে উদ্ধত ছুরিকা। আলোতে ছুরিকা ঝকমকিয়ে উঠলো।

ফরিদ বুঝতে পারলো বাদশাহের কবল থেকে পরিত্রাণ নেই। তাই সে আতঙ্কে আর্তনাদ করে বলে উঠলো—জনাব আমার কসুর কি?

কিন্তু তার কথা শেষপর্যন্ত অসমাপ্ত থাকলো, আকবরের তীক্ষ্ণ ছুরিকা ফরিদের বুকের ওপর নেমে এল। একটা আঘাত নয়, বার বার অনেকগুলি আঘাত। যাতে আর না জিন্দা থাকে সেই জন্যে একেবারে শেষ স্পন্দনটুকু পর্যন্ত থামিয়ে দিল। রুধিরাক্ত নিস্পন্দ দেহ যখন হর্ম্যতলে ঢলে পড়লো তখন পরিশ্রান্ত দেহে আকবর শিবালীর দিকে তাকালো।

শিবালী তখন আতঙ্কে আকবরের ভয়ঙ্কর মুখের ওপর তাকিয়ে আছে।

কিন্তু আকবর তখন কেমন যেন উত্তেজনার শেষ মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছেচে। সমস্ত শরীর দিয়ে তার ঘর্ম নির্গত হচ্ছিল। কামিজ ভিজে চুবুচুবু।

এই সময় হঠাৎ আকবর একটা কাণ্ড করলো, শিবালীর ছোট্ট দেহটি নিজের দুই হাতের বন্ধনীতে তুলে নিয়ে কক্ষত্যাগ করলো।

জেনানামহল দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে চললো কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কি জন্যে হঠাৎ শিবালীকে তুলে নিয়ে এল, কিছুই বোঝা গেল না। আকবরের মনের তলে তখন কোন ঝড় ছিল

না, ছিল শুধু এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। তবে কি শিবালীকে সে হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি হত্যাই করতে চায়, তবে কেন বাইরে নিয়ে এল? কক্ষের মধ্যে কি ফরিদের সাথে মৃত্যু সংঘটিত করতে পারতো না? তাহলে হত্যা নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য। শিবালীর উপর পাশবিকতা চরিতার্থ করার জন্যেই হয়তো আকবর তাকে তার খাসকক্ষে নিয়ে চলেছে। বোধ হয় তার আদিম সেই প্রবৃত্তি আর ঘুমিয়ে থাকে নি, যার জন্যে এত কাণ্ড তা. ওপর বলপ্রয়োগ করে তৃপ্তি পাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র এক পশু সেই ক্ষুধিত শ্বাপদের লোলুপ জিহ্বাতে লালসার আকাঙ্ক্ষা প্রবল।

এ অনুমান নয়, মনে হল এই কল্পনাই ঠিক। আকবরের মহব্বত তাকে দিয়েছে কামনার পরিণতি। সে অনেক করে নিজেকে রোধ করেছিল। মহব্বতের মিঠে মৌতাতে লালসার প্রবৃত্তি চাপা ছিল কিন্তু যখন না পাওয়ার বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করলো, তখনই বিপরীতটা জেগে উঠলো। তাছাড়া শাদীর পর অভিসার কক্ষের রোমাঞ্চ তাকে শিহরিত করেছিল কিন্তু অন্য আওরতের কথা তখন মনে নেই, জেগে ছিল শুধু শিবালীর আকৃতি, শিবালীর প্রত্যাখান। তাই ফরিদ পাশবিকতা চরিতার্থ করতে যেতে তার সঙ্কোচের দ্বার মুক্ত হল। মনে হল, যদি সে মহব্বতের মুসিবাদে পড়ে শিবালীর দেহভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, তবে একদিন কেউ না কেউ তার পেয়ারী চিজকে কোন জোয়ান মরদ নিঃশেষ করে দেবে, যেমন আজ ফরিদ দিচ্ছিল! আজ শিবালী তার নাগালে ছিল বলে সে তাকে বাঁচাতে পারলো কিন্তু যখন নাগালের ভেতরে আর না থাকবে?

তবু এ অনুমান। এই কথাগুলি চিন্তা করে আকবর তাকে নিয়ে যাচ্ছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই, শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই আকবরের বর্তমান আচরণের সমালোচনা।

এই সময় হঠাৎ একটি আলোময় চৌমাথার মুখে হামিদাবানু, পাশে মাহাম আনাঘা ও আরো দুজন বয়স্কা অন্তঃপুরিকা দাঁড়িয়েছিলেন।

আকবরের বুকের ওপর তখনও শিবালীর ছোট্ট দেহটি দুটি হাতের মাঝে ধরা। শিবালীর মুখে তখন কোন কথা ছিল না। সে বোধ হয় অবাক হয়ে রাজকুমারের আচরণ লক্ষ্য করছিল। পরিণতি কোনদিকে তার বোঝার অগম্য। তাই নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিল। আর ভাবতেও বোধ হয় ভাল লাগছিল না, এ রাজপুরীতে ঘটনা অনেক। তাই অনাগত ঘটনার আশঙ্কায় আগে যেমন শিহরিত হত, আজ সে শিহরণ নেই। এইমাত্র একটি লোককে রাজকুমার হত্যা করলো, কেন করলো সে জানে না? আবার তাকে কেন রাজকুমার এমনিভাবে নিয়ে যাচ্ছে তাও অজ্ঞাত। রাজকুমারের আজ শাদী হয়েছে। কোথায় এখন সে নতুন বেগমের সান্নিধ্যে কাটাবে, তা না করে এমনি সব কাণ্ড করে চলেছে। তবে তার বিশ্বাস ছিল রাজকুমার এমন কোন কাজ করবে না, যাতে তার ক্ষতি হয়?

আকবর মাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। মুখে তার কোন কথা নেই।

হামিদাবানু শুধু পুত্রের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বললেন—বেটা, আওরতকে নামিয়ে দিয়ে আপনার মহলে গিয়ে আরাম কর। তোমার আজ শাদীর রাত্রি। এ রাত্রে তোমার বাইরে বেরিয়ে আসা একেবারে উচিত হয়নি।

তারপর শিবালীর দিকে তাকিয়ে বললেন—ঝুট্ ঐ লেড়কী, যেদিন থেকে এই রাজপুরীতে ঢুকেছে, আমার বেটার দিল সেদিন থেকে বিগড়ে দিয়েছে।

বিদ্রোহ! হ্যাঁ বিদ্রোহ ছাড়া মাথা তোলার কোন উপায় নেই। এত শাসন, এত জুলুমের কোন অর্থ হয় না। মন যা চায় না,

সেই কাজ করতে এই গুরুজনদের জুলুম, আর মন যা চায় সেই কাজ করতে এরা দেবে না। কেন দেবে না? অথচ ফরিদকে দিয়ে এই লেড়কীর আবার বেইজ্জত করতে পাঠানো হল। সে যদি না জানতো, তাহলে এতক্ষণে এই লেড়কীর অবস্থা কি হত? মায়ের ওপর, ধাত্রীমায়েদের ওপর কোন প্রতিবাদ করতে তার মন চায় না, কেমন যেন মনে হয় গুরুজনদের কার্যের প্রতিবাদ করলে তার জীবনে অভিশাপ লাগবে ঝিন্তু এঁরা তো তাকে মান্য করতে দেবে না!

তাই আকবর হঠাৎ শিবালীকে মাটির ওপর নামিয়ে দিয়ে রুখে দাঁড়ালো। কিছু বলবার জন্যে হঠাৎ চীৎকার করে সেই শেষরাত্রে নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করার চেষ্টা করলো! কিন্তু ঠোঁট দুটি নড়লো কিন্তু কোন ভাষা এল না। কেমন যেন ভাষাহীন একটা বিদঘুটে শব্দ কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি সে ঠোঁট দুটি চেপে ধরলো। আবার চেষ্টা করলো কিছু বলবার জন্যে কিন্তু সেই পূর্বের মত অবস্থা হল। ঠোঁট দুটি শুধু থর থর করে কাঁপলো, কোন কথা বের হল না।

এই সময় হামিদাবানু আবার বললেন—যাও আকবর, নয়া বেগম তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে করে খোয়াবের চক্করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভুলে যেও না, তার প্রতি তোমার লাখো লাখো কর্তব্য আছে।

আকবর নিঃশব্দে মাতৃ আজ্ঞা পালন করলো।

সে মাথা নত করে ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করে সেই জাঁকজমকপূর্ণ কক্ষের দিকে এগিয়ে চললো। শিবালীর দিকে একবার ফিরে চাইবারও তার ক্ষমতা থাকলো না। কেমন যেন সে আদেশ পালিত বান্দার মত এগিয়ে চললো।

কেন এমন হয় তার? কেন সে এমনি নিঃস্ব হয়ে কারুর মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে পারে না!

এমনি উপলব্ধিবোধ যখন তার :) আবার জাগলো, হঠাৎ তার গতি রুদ্ধ হল, সে ফিরে দাঁড়িয়ে সেই পূর্বের জায়গায় ছুটে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল, কোথাও কেউ নেই। কিছুক্ষণ আগে যে এখানে কত লোক ছিল, এখন সেস্থান শূন্য। শূন্য এক বিরাট নিস্তব্দতা মুখব্যাদন করে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবালী! শিবালী!

চীৎকার করে চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি তুলে আকবর ডেকে উঠলো। কিন্তু প্রতিধ্বনি তার পাথরের দেওয়ালে ঠোক্কর তুলে ফিরে এল, পরিবর্তে কেউ সাড়া দিল না।

আকবর সেই নিস্তব্দ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে শিশুর মত হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। এ আমি কি করলাম? নিজের অক্ষমতায় শয়তানদের হাতে রাজপুত লেড়কীকে তুলে দিলাম? নিজের চুলের মুঠি ধরে নিজের গালেই থাপ্পড় মারতে মারতে আকবর টলতে টলতে চলতে লাগলো।

তারপর সেরাত্রে আর কেউ তাকে রুকমির সান্নিধ্যে ফিরে যেতে দেখেনি।

রাত্রের আর কয়েক দণ্ড যে সে কোথায় থাকলো কেউ জানে না। পরদিন সকালে সকলে দেখলো, বাদশাহ আকবর যমুনার কিনারের একটি প্রস্তরময় চাতালের ওপর একান্ত দীনের মত নিদ্রিত। ভয় হয়, যদি চাতাল থেকে কোনরকমে একটু সরে যেত, তাহলে একেবারে পাঁচ মানুষ সমান নীচে যমুনার জলে আছড়ে পড়তো।

হামিদাবানুর কাছে খবর গেল, তিনি বললেন—বেটা যেখানে নিদ্রা যাচ্ছে, নিদ্রা যাক্, শুধু সেখানে দুজন নফরকে প্রহরাধীনে রেখে দাও, যাতে না বাদশাহ যমুনার অতল জলে তলিয়ে যায়।

হামিদার নির্দেশই পালিত হল।

হামিদা তখন বেশ নিশ্চিন্ত, আর তার কোন ভাবনা নেই। মাহাম বিবি সত্যিই একজন বুদ্ধিমতী রমণী। সঙ্গে সঙ্গে সেই

দণ্ডেই শিবালীর শেষ বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। শিবালীর এখন খণ্ড খণ্ড দেহ যমুনার স্রোত দিয়ে এতক্ষণে অনেক দূরে।

বেটা ঘুমিয়ে থাক। রাজপুত লেড়কীর দেহের খণ্ডগুলি আরো আরো দূরে ভাসতে ভাসতে চলে যাক্। তারপর বাদশাহের ঘুম ভাঙুক।

রাজপুরীর মধ্যে কঠিন আদেশ প্রচারিত হয়েছে যে কেউ বাদশাহকে রাজপুত লেড়কীর পরিণামের কথা বলবে, তার দেহ ঐরকম টুকরো টুকরো হয়ে দরিয়ার পানিতে মিশে যাবে—সুতরাং সাবধান, হুকুম কেউ অবমাননা করবে না।

সুতরাং সকলে চুপ করে গেছে।

কিন্তু একজন চুপ করে নেই, তাকে বেগমসাহেবা ভুলেছিলেন বলেই সে বাইরে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল, আর মনে মনে সে একটা দারুণ কিছু চিন্তা করে প্রতিহিংসায় উল্লসিত হচ্ছিল—সে হল আলিমন।

আকবর তখনও গভীর ঘুমে অচেতন। মুখের ওপর তার প্রত্যুষের সূর্যরশ্মি পড়েছিলো, মুখখানি দেখাচ্ছিল বড় শান্ত, বড় মধুর। আকবর কি তখন সত্যিই শান্তির মধ্যে বিরাজ করছিল?

২৫

তারপর কয়েকদিন পরের ঘটনা।

থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে দিন চলতে লাগলো। আকবর আবার নিজেকে গুটিয়ে নিল নিজের কক্ষের পরিধির মধ্যে। বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখলো না। একেবারে নিরবচ্ছিন্ন জীবনের গাড্ডায় পড়ে অন্য কিছু চিন্তা করতে লাগলো। এমন কি নয়া বেগমের বার বার এত্তেলা আসতেও কোন সাড়া দেয় নি। না, কোন কর্তব্য নেই। শাদী সে করেনি, জুলুমের শাদীতে নেই কোন মোহের আকর্ষণ। তাকে এখন যারা বাচ্চা বলে ভুল করছে, তারা এক বিরাট ভ্রান্ত পথে চলেছে।

কেউ না বললেও সে বুঝতে পেরেছে, শিবালী আর এ পৃথিবীতে নেই। শিবালী অক্ষম বাদশাহের শক্তিহীনতায় প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে। সেইদিন রাত্রেই সেই মারাত্মক বিচার সমাপ্ত হয়েছে। শিবালী চলে গেছে তুনিয়ার অন্যপ্রান্তে। আর তাকে ডাকলেও সাড়া মিলবে না। কিন্তু শিবালীর এই মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী ?

আকবর আজ একান্তে বসে চোখের জলে সেই কথা ভাবে। প্রথম মহব্বতের পরিণতি জীবনে যে মাধুর্যের আস্বাদন দিয়েছে, তা কখনও সে কোনদিনও ভুলবে না। শিবালী আজ নিহত হয়নি, সে জেগে আছে বাদশাহের এই তরুন বক্ষে। বাদশাহ যদি কখনও বিরাট তুনিয়ার কল কোলাহলে হারিয়ে যায়, জীবনে নতুন নতুন পটপরিবর্তন শুরু হয়, তবু সেই রাজপুত লেড়কীই থাকবে মানসী প্রিয়া—সেখানে আর কোন রমণী স্থানলাভ করতে পারবে না। তার ছায়াতে যদি আর কারো জন্ম হয়, সে কথা স্বতন্ত্র।

আজ স্বীকার করতে আকবরের কোন দ্বিধা নেই, সে রাত্রে

ফরিদকে হত্যা করে শিবালীকে নিয়ে বাদশাহ রাজপুরী ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল শিবালী প্রতিদানে ভালবাসা দান করেছে কিন্তু রাজপুরীর চক্রান্তের জন্যে সে ভয়ে রাজকুমারের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে পারছে না। এই কথা ভেবেই বাদশাহ তাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল কিন্তু তা আর তার কপালে হল না।

নসীব কিছু নয়। আকবর আজ নসীবের দোহাই দেয় না, সে ভীরু, কাপুরুষ, গুরুজনদের প্রতি তার একটা অস্বাভাবিক দুর্বলতা তাকে শক্তিহীন করে দিয়েছে।

সেদিন যদি একটু সে বলপ্রকাশ করতো, তাহলে শিবালী এমনিভাবে জান কোরবাণী দিত না। শিবালীর মৃত্যুর জন্যে সেই দায়ী।

আজ সে একা কক্ষে বন্দী জীবন গ্রহণ করেছে, সেই নিঃসঙ্গ জীবনে শুধু শিবালীর আর্তচীৎকারই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! বার বার যেন সে চাপা কান্নায় সমস্ত শান্তি বিঘ্নিত করে তার কানের কাছে বলে চলেছে, রাজকুমার তোমার ভীরুতায় আমার জীবন নৃশংসভাবে শেষ হল। আমি তো মরতে চাই নি বাদশাহ, তবে কেন আমার মৃত্যু হল? আমি যে অনেক অত্যাচার সহ্য করেও তোমাকে পেয়ার দান করেছিলাম, সেই পেয়ারের কি শেষপর্য্যন্ত এই পরিণাম? তুমি নিজের মহব্বতের সামগ্রীকে রক্ষা করতে পারলে না, তবে কিসের তুমি বাদশাহ? একটি প্রাণ রক্ষা করতে যার ক্ষমতা নেই, সে কি করে হাজার হাজার প্রাণ রক্ষা করবে?

শিবালী মরে নি। শিবালী যেন দেহটি ত্যাগ করে আত্মার স্বরূপটি এই অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। শিবালী তার অন্তরে বসে অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে শুধু তার অক্ষমতাই প্রকাশ করে চলেছে। সে আরো যেন বলছে, তুমি যাকে বাইরের জীবনে পাও নি, অন্তরে সে সমাহিত হল। এবং অন্তরের সঙ্গে বেইমানি

করে তাকে পরিত্যাগ কর না। আমার ক্ষমতা আমি প্রকাশ করেছি, তোমার ক্ষমতা তুমি প্রকাশ করতে পারলে না।

তুমি বাদশাহ হয়ে যা পারলে না, আমি তাই পেরেছি।

এইসব কথাই মনের মধ্যে সদাসর্বদা গুঞ্জরণ করে। এক এক সময় তার সঙ্গে কথা বলতে আকবরের ভাল লাগে, আবার এক একসময় মনে হয়, এ সব ভেবে কি হবে? ইহজীবনে যে তার সঙ্গিনী হল না, একটা অপার্থিব জীবনের সঙ্গ প্রার্থনা করে কি হবে? কি লাভ সেই সঙ্গ প্রার্থনায়? তাই তার দারুণ এক অভাব বোধ হয়।

মাঝে মাঝে কক্ষে এসে তার মধ্যে উৎসাহ জাগানোর চেষ্টা করে দুজন—আধম খান ও পীরমহম্মদ। আরো হয়তো অনেক ইয়াররা আসতে চায় কিন্তু তারা সাহস পায় না কক্ষে প্রবেশ করতে।

আধম খান বলে—বাদশাহ তোমার মধ্যে কোন মজলিশের খুন নেই। আওরতের মত দিনরাত পর্দানশীনা হয়ে মহব্বতের চক্করে ঘুরে বেড়াচ্ছ? মরদের দিল কি এমনি কমজোরি হওয়া উচিত? আমি যদি বাদশাহ হতাম, তাহলে দিনরাত বিলাসকক্ষের মখমলে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে নয়া নয়া আওরতের হুকুম ফরমাইস করতাম। মরদকা দিল আনন্দের জন্যে। আওরতকা মাসুমী জান ভোগকা লিয়ে। এ খোদার মর্জি। আল্লাহর বিচারে আমরা খোদ এক্ এক্ সম্রাট।

পীরমহম্মদ এখন আর ধর্মের কথা আওড়ান না। তিনি নেমে এসেছেন, মাটির জমীনে। লজ্জালী তাকে যে জগতের সন্ধান দিয়েছে, সে জগত তাকে নতুন পথের নিশানা দেখিয়েছে। ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের চেয়ে প্রবৃত্তির দাস হওয়া অনেক সুখের—এই বোধ যখন তাঁর মধ্যে জেগেছিল, তখন তিনি চেয়েছিলেন লজ্জালীকে কিন্তু বড় বিলম্বে সে প্রার্থনা প্রকাশ হয়েছিল। রাজকানুন তাকে কোন প্রশয় না দিক্, বেগমসাহেবা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাও

বড় বিলম্বে। তখন লজ্জালী শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে অন্ধ-প্রকোষ্ঠে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। সেই আহত লজ্জালীকেও পীরমহম্মদ কাছে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, জোরু যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাকে কি ত্যাগ করা যায়? ওকে আমার জন্যে উৎসর্গ করা হোক কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করে নি।

লজ্জালী তারপর মরে গেছে কিন্তু পীরমহম্মদের নতুন করে জন্ম হয়েছে। এখন তিনি আর পুস্তক অধ্যয়ন করেন না, ধর্মের কথা শুনিয়ে মানুষকে পরমার্থ লাভের চেষ্টা করান নয়। এখন তিনি লম্বিত দাড়ি নির্মূল করেছেন। আগে ছিল আংরাখা পোষাক, এখন দেহে উঠেছে সৈনিকের পোষাক। তিনি অস্ত্র চালাতে অভ্যস্ত হয়েছেন। বাহুতে শক্তি ধরে মুষ্টিযুদ্ধ করেন। সবচেয়ে বড় উপাধি হয়েছে, প্রমোদের সুযোগ পেলে আর কিছু মনে থাকে না। সেইজন্যে আধম খান হয়েছে সঙ্গী। উপযুক্ত মানুষের উপযুক্ত দোস্ত।

আধম খান সময় পেলেই সরাব পান করে বুঁদ হয়ে থাকে, আর জেনানা মহলের দিকে হাত বাড়ায়। জেনানা মহলের দিকে গতিবিধি তার সব সময়ে। কারুর কিছু বলবার উপায় নেই, মাহাম আনাঘা তখন রাজপুরীর সর্বেসর্বা। তাঁর পুত্রকে কেউ কিছু বলে কি শেষকালে গর্দ্দান যাবে? তাই নীরবে সকলে আধমের অত্যাচারই সহ্য করে চলেছিল।

আর তার সঙ্গী হয়েছেন পীরমহম্মদ। পীরমহম্মদের বয়স যেন এর মধ্যে আরো কমে গেছে। আধমের বয়েসের সঙ্গে তার বয়েসের মিল। আধমের স্বভাবের সঙ্গে তার স্বভাবের মিল। আধমের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির সাথে তার প্রবৃত্তির মিল।

যেখানে আধম সেখানে পীরমহম্মদ।

সেই পীরমহম্মদ একদিন এসে বললেন—জনাব বাদশাহ, জীবনটাকে ভোগ করে নাও। আমি চিন্তা করে দেখলাম, যারা

জীবনে ভোগের সুযোগ পায় না; যারা দুর্বলচিত্ত নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, তারাই দুঃখের আবর্জনা বহন করে। তাই তুমি এই নিঃসঙ্গতা পরিহার করে রঙমহলের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দাও। সেখানে পাবে শান্তি, লাভ করবে স্বস্তি আর সমস্ত চিন্তার উর্ধ্বে উঠে এক অন্য জগতে ডুবে থাকতে পারবে।

আকবর পীরসাহেবের কথাটার মধ্যে কোথায় যেন আলোর মশাল দেখতে পেল। তাছাড়া পীরসাহেবের জীবনই এখন একটা সমস্যা। তিনি কি ছিলেন, আজ কি হয়েছেন? একদিন শিক্ষকের গাম্ভীর্য নিয়ে এই পরিবারে প্রবেশ করে শিক্ষাদানের বৃত্তি নিয়েছিলেন। তাঁকে আকবর ছোটবেলায় খুব ভয় করতো। এখন আর ভয় করে না। এখন তার মনে হয়, পীরসাহেব ঠিক পথই অবলম্বন করেছেন। খোদার উপদেশ শুনিয়ে, মানুষের পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করে, তাদের পবিত্র করবার চেষ্টা করে লাভ কি? যে কথা কিতাবে লেখা আছে, সে কথা কিতাবেরই ভাষা, তার সঙ্গে মানুষের জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

কোরাণ শরীফে লেখা আছে নির্বাণের তত্ত্বকথা! সেগুলি প্রত্যহ একবার করে আবৃত্তি করলে মনের শুদ্ধি ফেরে। কিন্তু মন যাদের পবিত্র হতে চায় না, তাদের এই বাণীর মর্মকথা পাঠ করে লাভ কি?

তাই পীরসাহেবের বর্তমান উপদেশ তাকে খুশি করলো। সে বুঝলো, জগতে চাওয়ার উপরে প্রাপ্যের একটা অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে। তার চাওয়া একটু বিচিত্র ছিল, তাই এই দুঃখভোগ তার পাওনা হল। এবার চাওয়াটুকু একটু নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে এলে হয়তো প্রাপ্যের একটা মানদণ্ড নিরূপিত হয়।

কিন্তু শিবালী? তাকে তো সে কোন অবস্থায় ভুলতে পারবে না!

সেইজন্যে আরো কয়েকদিন আকবর শিবালীর স্মৃতি নিয়ে

কক্ষের মধ্যে বন্দীজীবন যাপন করলো তারপর হঠাৎ একদিন সমস্ত থমথমে প্রাসাদ প্রকম্পিত করে হুকুম প্রচারিত করলো মজলিশের জন্যে রঙমহল সাজাতে।

এবার বুঝি সেই তরুণ বাদশাহের নতুন ভূমিকা দুনিয়া দেখবে। তেমনি এক নতুন আয়োজনে বাদশাহ গা ভাসিয়ে দিল।'

রক্তবর্ণ আসমানের বুকে কামনার রঙের মত সূর্যদীপ্তি ধক্‌ধক্ করে জ্বলতে লাগলো। বাতাসে বুঝি এল এক নবজীবনের নতুন আমন্ত্রণ। চঞ্চল বাতাসের এলোমেলো বিক্ষিপ্ত জীবনে আবার শিহরণের স্পর্শ যুক্ত হল। আলোর প্রতিফলনে যেন নতুন স্ফুলিঙ্গের জন্ম। পতঙ্গ এসে আলোর পাশে পাশেই ঘুরে নিজেকে মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মৃত্যু বুঝি এড়ানোর সাধ্য তার নেই। তেমনি কুসুম বাগিচায় মধুমক্ষিকার আনাগোনা। প্রতি পলে পলে শুধু গুঞ্জরণই সোচ্চার হয়ে উঠলো। অথচ এই মধু-মক্ষিকার আগমন না হলে নতুন কুসুমের জন্ম হবে না।

সৃষ্টি স্থিতি নয়, তার বিবর্তন আবর্তিত পথে শুধু ঘুরছে। জন্মকে কেন্দ্র করেই যেন যত বিলাসের উপকরণ। বিপনীতে সাজানো আছে বিলাসের উপকরণ, মানুষের ইচ্ছাতেই সেই উপকরণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। জন্ম শুধু তার কেন্দ্রবিন্দুতে রক্তিম স্ফুলিঙ্গ নিয়ে জেগে থাকে।

আকবর নিজের খাসকক্ষ পরিত্যাগ করে প্রমোদকক্ষে গিয়ে চিরস্থায়ী আস্তানা নিল। পাশে বসলো আধম খান ও পীরমহম্মদ। তারপর ছিল অগণিত মোসাহেবের দল।

সরাবের স্বর্ণভৃঙ্গার এল। এল আতরের খসবু দেওয়া গোলাপী সরাব। আরো লোক ছুটলো লাহোর, দিল্লী, কাবুল, কান্দাহার, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে সরাব আনতে। সরাব না হলে রঙ হবে কেমন করে? চোখে রঙ লাগলেই তো বুকের জমিনে রঙের ছোপ পড়বে। তখনই মজা হবে দারুণ।

নর্তকী এল কাশ্মিরী কার্পেটের ওপর ঝাড়ের আলোর নীচে। তার পরণে খাটো ঘাঘরা, গায়ে খাটো জামা। তার বক্ষের সুউন্নত স্তনযুগল সূক্ষ্ম কাঁচুলীর বন্ধনে ঢাকা নেই। নাচের ছন্দে ছন্দে সেই বক্ষ উদ্বেলিত হচ্ছে, আর পুরুষের রক্তে আন্দোলন সীমাহীন হচ্ছে। তাছাড়া অনাবৃত নিটোল পা দু-খানিতে যেন হরিণীর চঞ্চলতা।

আধম খানের উল্লাসটাই রঙমহলে সোচ্চার। ভোগ ও ভালবাসার এই শ্রীক্ষেত্রে এসে সে যেন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ছিল কোথায় এক দুস্থ পরিবেশে, সে পরিবেশ তার কাছে অযোগ্য ছিল। এখন তার উপযুক্ত পরিবেশই সে আহরণ করতে পেরেছে। তাছাড়া মাতার এখানে একটা বিরাট আধিপত্য তাকে স্বাধীনতা প্রকাশে সাহায্য করেছে।

জেনানামহলের দ্বার তার কাছে অবারিত। কোন অন্তঃপুরিকাই তার কাছে পর্দানশীন নেই। বরং বাঁদীরা তার আগমনে লোলুপ হয়ে মস্করা করে।

বাদশাহের দুজন আত্মীয়াকে সে সোহাগ দান করেছে। তারা শাদীর ইন্তেজারী চেয়েছিল কিন্তু আধম ওদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। শাদী করে কে বেগমের চোখরাঙানি শুনবে? তার চেয়ে সাময়িক সুখ আহরণ করে সরে পড়াই ভাল।

আসকারীর এক কন্যা বুলহাজম ও কামরানের এক কন্যা হাজী, তারা বেগম কর্ত্রীর কাছে শিকায়ৎ করতে গিয়েছিল। সেখানে ছিলেন মাহাম। মাহাম এখন সব সময়ে হামিদার পাশে থাকেন।

দুজনের অভিযোগ শুনে মাহাম বললেন—তোমরা কি এখনও পবিত্র আছো? যাও বেটার দিল আচ্ছাসে জখম করে দাও। পারতো বাদশাহ আকবরকে জমিনের উপর নামাও। তোমাদের নসীব আচ্ছা হয়ে যাবে।

বেগমসাহেবা কোন কথা বললেন না।

অগত্যা দুজন অপমানিত হয়ে মাথা নত করে নিজেদের কক্ষে ফিরে গেল।

এসব অনেক পূর্বে ঘটেছিল, এখন আধম খান আকবরের পূর্ণ সাহায্য পেয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বোঝা দায়।

অন্তঃপুরে যেন যুবতী রমণী রাখা মুস্কিল হয়ে উঠলো।

আকবরের হুকুম মানতেই হবে। আর আধম খান হুকুম পেলেই হয়। এই সব হুকুম শীঘ্র তামিল করতে তার মত সক্ষম কেউ নেই।

আকবরের মনের গ্লানি ছুটে যেতে লাগলো। রমণী সম্ভোগে তার মনের জড়তা অপসারিত হল। সে সেই উৎসবে মিশে গেল। সমারোহে হারিয়ে গেল।

আর এদিকে তখন আর এক সমস্যা উদয় হল। রাজপ্রাসাদে কোন যুবতী আওরতকে লুকিয়ে রাখা মুস্কিল হয়ে পড়লো। যেখানেই সে থাকুক তাকেই আকবরের কক্ষে আসতে হবে।

অথচ আকবরের বেগম রুকমি একটিবার বাদশাহকে কাছে চায় কিন্তু যে ডেকে ডেকেই পায় না।

রুকমি নেমে গিয়ে বললো—আমার মাসুম ইজ্জত, আমাকে গ্রহণ করবেন না কেন? আমি আপনার বেগম হয়েছি বলেই কি এই তাচ্ছিল্য?

কিন্তু কে উত্তর দেবে? বাদশাহ তখন বেহুঁশ হয়ে রঙমহলের কক্ষে পড়ে আছে।

একদিন রুকমি ছদ্মবেশে সেই কক্ষে গিয়ে ঢুকলো।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো—কে?

আমি এক আওরত।

কি চাও?

বাদশাহের পেয়ার।

বাদশাহ নেশাজড়িত চোখে অট্টহাস্য হেসে বললো—পেয়ার বাদশাহ করতে জানে না, ভোগ করতে জানে। যদি ভোগ্যা হতে চাও তবে আরো কাছে সরে এস, আমি তো বেশীদূর এগোতে পারবো না, তাহলে পড়ে যাবো। দেখছো না সরাব আমাকে কেমন কাবু করে দিয়েছে!

রুকমি এগিয়ে গেল।

কক্ষটিতে তখন আলো অন্ধকার ছিল। আকবর শুয়েছিল এক-রকম শিথিল দেহে পালঙ্কের দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায়। অন্য কেউ আর তখন কক্ষে ছিল না, শুধু একটি বাঁদী নিঃশব্দে বাদশাহকে সরাব পরিবেশন করে যাচ্ছিল।

রুকমি এগিয়ে এসে তাকে ইসারায় চলে যেতে বলে বাদশাহের পাশে ঘন হয়ে বসলো।

বাদশাহ চক্ষু নিমীলিত করে রুকমির একখানি হাত টেনে নিয়ে প্রশস্ত বুকের ওপর রাখলো। তারপর জড়িতস্বরে বললো—শুধু ভোগ করে যাই তোমাদের। যদি ভোগের মধ্যে সান্ত্বনা মেলে তাই আমার প্রার্থনা। কিন্তু শান্তি পাই কই? সান্ত্বনা যে রমণী-সম্ভোগেও প্রাপ্ত হই না। শুধু শরীর নষ্ট হচ্ছে, তাকত কমে যাচ্ছে। অকর্মন্য হয়ে শেষপর্যন্ত যে কি করবো, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।

তারপর একটু থেমে বললো—যাকগে এসব কথা আর এখন ভাবি না। দেখি, তোমাদের মাঝে আছে কিসের অমৃতময় আনন্দ! মরদ তোমাদের জন্যে কেন এত উন্মত্ত হয়ে ওঠে তারই পরীক্ষা করতে বসেছি?

এই বলে বাদশাহ রুকমির মুখখানি ধরে নিজের চোখের সামনে নিয়ে এল। হঠাৎ আকবর চমকে উঠলো মুখখানি দর্শনে। আলো অন্ধকার ছায়ার মধ্যেও সেই মুখখানি চিনতে আকবরের এতটুকু কষ্ট হল না।

চেনার সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ মুখখানি ছেড়ে দিয়ে অস্বাভাবিক-স্বরে গর্জন করে উঠলো—কেন তুমি এখানে এসেছ? কে তোমায় আসতে ফরমাইস করেছে!

রুকমি মাথা নত করে কেঁদে ফেললো। স্বামীর ভৎর্সনায় তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হতে চাইলো। তাই সে কাতর হয়ে বললো—জাঁহাপনা, কেউ আমাকে ফরমাইস করেনি, আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছি।

কিন্তু কেন এসেছ?

এই অভিযোগে রুকমি চুপ করে থাকলো। কি করে সে স্বামীকে বলবে, তোমার অবহেলাই আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে। তুমি অন্য মেয়েকে নিয়ে মজলিশ করবে, তাদের আনন্দ দেবে, তুমি আনন্দ পাবে। আর আমি তোমার বেগম হয়ে সে সুখের এতটুকু পাবো না! বেগম হয়েছি বলেই কি অপরাধ করেছি? বেগম না হলে নিশ্চয় তোমার লুব্ধদৃষ্টি থেকে আমি পরিত্রাণ পেতাম না। সেইজন্যে এসেছি, বেগমের অধিকার সৃষ্টির জন্যে আসিনি। বাদশাহের একটু সুখ, একটু সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে এই আমার দুঃসাহসিক আগমন। যদি অন্য রমণী বলেও তুমি ভুল করে আমাকে একটু গ্রহণ কর। সেইটুকুই যে আমার স্মৃতি হবে। কিন্তু তুমি আমাকে চিনে ফেললে।

এই সময় বাদশাহ আবার ক্ষুব্ধভঙ্গিতে বললো—কেন তুমি এসেছ, তার উত্তর দাও! না'হলে উচিত সাজা তোমার জন্যে আমি ফরমাইস করবো।

তখন রুকমি ক্রন্দনমুখী মুখখানি তুলে বললো—আমি কি আপনার বেগম হয়েই অপরাধ করেছি? আমার প্রতি আপনার কি কোন কর্তব্য নেই?

না, নেই। তুমি চলে যাও এখান থেকে। ভবিষ্যতে কখনও এমনি প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে প্রতারিত করতে আসবে না!

কেন আসবো না? রুকমি এবার রুখে দাঁড়ালো। আমি আপনার বেগম নয়। আপনার সোহাগ, সান্নিধ্য পাবার অধিকার কি আমার নেই?

না, না, নেই। বলছি তুমি চলে যাও। আকবর আবার গর্জন করে উঠলো। কে তোমাকে শাদী করেছে? আমাকে যদি জুলুম করে কেউ কিছু করিয়ে নেও, তার মুসিবাদ কি আমাকে পালন করতে হবে?

তাহলে আমাকে অন্য রমণী জ্ঞানে গ্রহণ করুন।

না, সে হতে পারে না।

তবে আমি কি করবো?

তুমি জাহান্নমে যাও, আমার জানার দরকার নেই।

আমি আপনার বেগম, এ পরিচয় তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

এবার আকবর ব্যঙ্গ করে বললো—রাজদফতরের জাবেদা খাতায় লেখা থাকবে তোমার নাম। বেগম বলে তুমি মাসোহারা পাবে। আমার গুরুজনরা এই অধিকারটুকু দিয়ে তোমায় সৌভাগ্যবতী করেছে। হয়তো ভুখা নিয়ে হারেমে বসে তুচ্ছ আওরতের মত নসীবের ওপর করাঘাত করতে, সে জায়গায় বেগম হয়ে বিলাস জীবন নিয়ে আচ্ছা খানা খেয়ে আয়াসের মধ্যে জীবন যাপন করবে।

তখন রুকমি ক্ষিপ্ত হয়ে ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বললো—সেই রাজপুত লেড়কীই আপনার দেমাগ খারাপ করে দিয়ে গেছে।

মু সামালকে বাত কহো। এই বলে হঠাৎ আকবর রুকমির গালে ঠাস্ করে চড় মারলো।

চড় খেয়ে রুকমি গালে হাত চেপে ধরে সেখানে আর একদণ্ড থাকলো না, ছুটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আকবর অনুতপ্ত হল। আওরতকে

সে প্রহার করলো? ছি, ছি, সে এক জানোয়ার হয়ে
কিন্তু রুকমি শিবালীর কথা বলে তাকে আঘাত করলো কেন? সেও তো যথেষ্ট অন্যায় করলো; সে হঠাৎ তুসরা আওরতের ছদ্মবেশে এসেই সব গণ্ডগোল করে দিল। মাথাটায় হঠাৎ উত্তেজনা জাগিয়ে তাকে ওমনি জানোয়ার করে তুললো।

রুকমির জন্যে তারও যে মনের মধ্যে আপসোস আছে, অন্তত সেই সান্ত্বনাই তাকে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রুকমিকে কিছু বলবার আগেই সে বাজে বাজে মস্তক উত্তপ্ত করা কথা বলতে লাগলো। তাছাড়া তার রঙমহলে ঢুকে এই সময়ে তাকে ছদ্মবেশে দেখেই আকবরের মেজাজ চড়ে গেল। না চিনতে পারলে হয়তো রুকমি অন্য রমণীর মত তার সান্নিধ্যে ভোগ্যা হত, তাহলে চরম অপমানিত হত আকবর নিজে। কারণ বেগমকে অস্বীকার করলেও লোকচক্ষে যে অস্বীকার করতে পারবে না, সে তা জানতো। তাই তাকে ওমনিভাবে গ্রহণ করার মধ্যে সেই অপমানিত হত।

রুকমি পরিত্যাজ্যা হয়েছিল শুধু এই জুলুমের শাদীর জন্যে। তা না হলে তার দোষ কোথায়? তবে মেয়েটি যেন বড় বেশী লোলুপ। স্বামীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায়ের জন্যে নিজের আসন থেকে নামতেও রাজী। এমনি এক সস্তা মেয়েকে সে কি করে বেগম বলে স্বীকার করে? যার মন দৃঢ় নয়, প্রবৃত্তি সংযমী নয়, যে নিজের সম্মান ভুলে নীচে নামতে চায়, সে হবে বাদশাহের প্রিয়তমা?

সেই মুহূর্তে আকবর রুকমিকে মনের আসন থেকে আরো এক ধাপ নামিয়ে দিল। মরুক এবার বেগমের মাসোহারা নিয়ে বাদশাহের তাচ্ছিল্যে শুষ্ক হৃদয়ে।

এই সময় চুপিসারে আধম এসে কক্ষে প্রবেশ করলো। চাপা স্বরে বললো—ইয়া আল্লা বাদশাহ, খেল্ খতম হুয়া।

আকবর তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরলো।

আধম উল্লসিত হয়ে বললো—শেখ মুল্লার বিবিকে ধরে নিয়ে এসেছি। মুল্লার দুজন নফর বাধা দিতে এসেছিল, তাদের জানে খতম। মুল্লা ছুটেছে কাজীর কাছে। বিচার চাই। জুলুমের কৈফিয়ৎ চাই। গজবের হিসাব চাই। কাজি তাকে তেড়ে দিয়েছে। বলেছে—আমি মজবুর। বাদশাহ যার দখল চায়, তার অধিকার তুমি ত্যাগ কর শেখ সাহেব।

উপায় না দেখে বিবির শোকে শেখসাহেব বাদশাহের নোকরী ত্যাগ করে মুসাফির হয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ। এ দুনিয়ার মালিক যাকে ! চাইবে, তাকে গুম করে রাখা বড় শক্ত। আধম নিজের খুশিতে নিজেই হাসতে লাগলো।

আকবরের মেজাজ ভাল ছিল না। এই কিছুক্ষণ আগে রুকমি কক্ষে ঢুকে তার মেজাজ খারাপ করে দিয়ে গেছে। তাই আধমের উল্লাসে তার বিরক্তি জাগলো, বিরক্ত হয়ে বললো—বকবক না করে সেই নফরের বিবিকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

আধম হঠাৎ বাদশাহের বিকৃত কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়ে হাসি প্রশমিত করলো, তারপর বললো—আমি কি কোন বেয়াদপি করে ফেললাম ?

না না, তুমি যাও। সেই লুটে আনা বিবিকে এখানে তুরন্ত পাঠিয়ে দাও।

আধম মনে মনে বাদশাহের মতলব বুঝতে পেরে আর বিলম্ব না করে সরে পড়লো। বাইরে বেরিয়ে শুধু সে বললো—বেটা বাদশাহ দাঁড়াও, নিশানা ঠিক করি, তারপর তোমার রমণী ভোগ করা চিরতরে ঘুচিয়ে দেব।

শেখ মুল্লার বিবি হল বাদশাহের ভোগের শিকার।

এই বিবি সাকিনাকে আকবর দেখেছিল একদিন তাঞ্জামের রুদ্ধ দরজার ফাঁকে। তখন আকবর ছিল আগ্রা দুর্গের পরিখার

ওপর দাঁড়িয়ে। আসমানে ছিল গোধূলির রক্তরাগ। পড়েছে প্রখর ম্লান আলো ধরিত্রীর চতুর্দিকে। যেন দর্পণের প্রতিফলনে বিজলীর রোশনাই ছড়িয়েছে সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে।

আকবর পারাবত ওড়াচ্ছিল পরিখার উঁচু সোপানে দাঁড়িয়ে। ফরিদের মৃত্যুর পর নতুন প্রহরী পারাবতের জন্যে নিযুক্ত হয়েছে। রহমৎ তার নাম। নামের সঙ্গে রহমতের চেহারার মিল আছে। ঠিক বিপরীত তার অর্থ। রহমৎ যেমন বিশাল, তেমনি মজবুত তার পুরুষ গড়ন। শরীরে কোন দয়ামায়া নেই, দেখলে মনে হয়, অথচ রহমতের অর্থ কৃপা। রহমতকে প্রথম দেখে তার নাম শুনে আকবর পারাবতের প্রহরী নিযুক্ত করেছিল।

সেই রহমৎ সেদিন পাশে দাঁড়িয়েছিল, দিচ্ছিল হাতে তুলে এক একটি চিড়িয়া। আর আকবর প্রত্যেকটির সৌন্দর্য পরীক্ষা ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছিল মেঘের দূর সীমানায়। পারাবতগুলি শিক্ষিত। উপরে উঠে গিয়ে ডিগবাজী খেয়ে খেয়ে বাদশাহকে নানা রকম ক্রীড়া প্রদর্শন করে দূর উজানে আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

বাদশাহ কবুতরদের এই ক্রীড়া দেখতে ভীষণ উল্লাস অনুভব করতো। যে চিড়িয়াটি যেদিন উড়তো না বা একটু উড়ে আবার কাছে এসে বসতো, তাকে আকবর সেদিন সঙ্গে সঙ্গে ধরে তরবারীর আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিত। আর যেদিন সবগুলি কথা শুনতো, সেদিন তার মেজাজ দারুণ খুশী হয়ে উঠতো।

এদিনও বাদশাহের মেজাজ খুশি ছিল। বাদশাহ আসমানের দিকে তাকিয়ে চিড়িয়াগুলির ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করছিল।

এমন সময় হঠাৎ তার চোখ দুটি দুর্গের বাইরে পথের ওপর ন্যস্ত হল।

একটি তাঞ্জাম চলেছে বাহকের কাঁধে। তাঞ্জামটি বেশ বাহারে। সেইজন্যে স্বভাবত দৃষ্টি পড়ে যায়। কিন্তু বাদশাহের সেই জন্যে দৃষ্টি পড়েনি। বাদশাহের চোখ গেছে তাঞ্জামের দরজার ফাঁকে।

রুদ্ধ দরজার স্বল্প অংশ ফাঁক করে একখানি অতীব সুন্দর মুখ সাতৃষ্ণ দুই নয়নে বাইরের শোভা দর্শন করছে। তার চুলের মধ্যভাগের সিঁথি দিয়ে একখানি হীরার অলঙ্কার কপালের শুভ্র-জমিনে রাখা আছে। পরিখা থেকে সেই পথের সীমানা কম দূরত্ব নয়। তবু বাদশাহের দৃষ্টি সেখানে বিভ্রম ঘটায় নি। ঠিক জহুরীর মত জহরকে চিনে নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে রক্ষীকে ডাকলো—এই, ঐ জেনানা কৌন হ্যায়! কাঁহাসে আতি হ্যায়, কাঁহা যাতা হ্যায়! কিস্‌কা ঘরকা জলুস! সব পাত্তা লে আও।

রক্ষী সেলাম পেশ করে বললো—হুজুর, ও শেখ মুল্লা কো জেনানা হ্যায়। শেখ সাহেব দফতরকা এক পুরানা নাজিম। উসি ঘরকা জেনানা। হরবকত রোজ এইসি সময় মে বড় মসজিদ নামাজ পড়নেকে লিয়ে য্যাতি হ্যায়।

সে সময়ে আকবর আর কিছু বললো না। সে শুধু এক মনে তাকিয়ে থাকলো তাঞ্জামটির গমন পথের দিকে। তারপর দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেলে মনে মনে একটি মতলব ঠিক করে নেমে এল পরিখা থেকে।

তখন তার চোখের ওপর ভেসেছিল সেই দুটি চঞ্চল চোখের দৃষ্টি। আর একখানি মাধুর্যে ভরা ঢল ঢল মুখ ও কপালের ওপর সেই হীরার অলঙ্কারটি। আর কিছু সে সেই বিবির দেখতে পায়নি। কিন্তু না দেখলেও যেন নব দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মহব্বত নয়। আর মহব্বতের মুশকিলে বাদশাহ পড়তে চায় না। এখন শুধু ভোগ, রমণীসম্ভোগ। রমণীকে এখন প্রবৃত্তির গোলাম করে শুধু একবারের জন্যে শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়। ·বাদশাহ তখন এই মনের মোকামে ঢুকে শুধু বাসনার প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছে। ভাল যাকে সে বেসেছিল, সে দুনিয়ার চক্করে পড়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আর সে ভাল বাসবে না। ভালবাসা বড় নির্মম। বড়

দিল জখম করে দিয়ে যায়। এখন আওরতকে দেখে সে বাসনার কথাই মনের মধ্যে জাগায়। সামান্য মুহূর্তের সুখের জন্যে কিছু পেয়ারী বাত। কিছু কবুতরের মত কথা আউড়িয়ে বেয়াড়া রমণীকে সবশে আনে—ব্যস্।

ফিরে এসে সে আধমকে কাছে ডাকলো, তাকে বললো—ঐ সুরতবালীকে আমার চাই। শেখ মুল্লাকে লাখো আশরফি কবুল কর। যদি না রাজী হয়, তবে ফৌজ পাঠিয়ে দিয়ে লুটে নিয়ে এস। গজব ক্যা হুশিয়ারী বহুৎ মেহনতসে হ্যোতি হ্যায়।

কিন্তু আধম মতলব দিল অন্য। বললো—জনাবের প্রথম নিশানা কাজে লাগবে না। কেউ তার বিবিকে এত সহজে বাদসাহের লালসার জন্যে ছেড়ে দেবে না। লাখো রূপেয়া কেন রাজকোষের সমস্ত ধনদৌলতের বিনিময়েও না।

তবে ?

আধম বললো—জনাবের দোসরা নিশানাই কাজে লাগবে। লুটে আনতে হবে।

কিন্তু তাতে যদি ঝামেলা বাড়ে ?

কহি ফ্যায়াদা নেহি। দো চার খুন হো য্যায় তো ক্যয়া হ্যায়।

আধম তার কথা রেখেছিল। পরের কাহিনী কারুরই আর অবিদিত নেই।

•

এই সময় দুজন বাঁদী এক রকম জোর করে টানতে টানতে সেই সাকিনা বিবিকে বাদশাহের কক্ষে দিয়ে গেল।

বাদশাহ এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। তাকালো সাকিনার দিকে। তার নিশানা ভুল হয়নি দেখে মনে মনে খুশি হল। তারপর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে সাকিনাকে বললো—উঠো বিবি, জুলুম না করে দিল খুশিতে আমার পেয়ারের ইন্তেজারে নিজেকে সঁপে দাও।

সাকিনা কার্পেটের ওপর একান্ত অসহায়ার মত মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছিল। হঠাৎ সর্পিনীর মত আকবরের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বললো—এ কৌন জুলুম বাদশাহ আপনার? একটি শরীফ পরিবারের জেনানা মহল ভেঙ্গে দিয়ে রমণীর ইজ্জত নিয়ে খেলা করতে আপনার সরম হয় না?

না। আকবর আবার দৃঢ়স্বরে বললো—না। শাহী বাদশাহের দিলে সরম বলে কিছু নেই। যে আওরত, সে আওরতই। তাকে ভোগ করাই এখন বাদশাহের কাজ। যখন আমি বালক ছিলাম, তোমরা তখন আমার লালসার খোরাক হওনি। এখন আমার মধ্যে খুনের ইসারা, দেহের মধ্যে কামনার শয়তানগুলি চীৎকার করছে। তাই তোমাদের আমি পতঙ্গের মত দলে পিষে রস টেনে নিতে চাই।

তখন সাকিনা বললো—বাদশাহ, আপনি কি তাহলে মা-বহিনকেও আপনার লালসার কবল থেকে মুক্তি দেবেন না?

হঠাৎ আকবর চমকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো—কি বললে?

তারপর তার চোখ দিয়ে শুধু উত্তপ্ত লাভা যেন গলে গলে পড়তে লাগলো। যেমন সে পূর্বে সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছিল, তেমনি ধরণের মূর্তি করে দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ সাকিনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তারপর আর কি? কিছুক্ষণ অনেকে চীৎকার শুনলো কক্ষের বাইরে থেকে। তারপর আর কোন শব্দ থাকলো না। বরং চতুর্দিকে নেমে এল এক গাঢ় তন্ময়তা।

হামিদা মাহামকে বললেন—পুত্রের শেষপর্যন্ত একি হল? এরকম করলে যে শেষকালে রাজ্যে বিদ্রোহ জাগবে।

মাহাম হেসে বললেন—কিছু করেনি বহিন। বাদশাহ এবার পুরোদস্তুর বাদশাহ হয়ে উঠছে। বরং এক কাজ করি, তাকে আরো সুযোগ দিয়ে আমরা কিছুদিনের জন্যে দিল্লীতে ঘুরে আসি।

হামিদা বুঝতে পারলেন না মাহামের উদ্দেশ্য। তাই বোবার মত অর্থহীনদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মাহাম হেসে তারপর বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিলেন—পুত্র আজ জওয়ান হয়ে উঠেছে, তার জোয়ানী কিসমৎ এখন লালসার আগুনে ফুটছে। সেই লালসার মেহেরবাণীতে হাজারো পতঙ্গ এসে এসে পুড়ে মরবে, এতে আর বিচিত্র কি? আপনি ও আমি মা, আমরা পুত্রকে বাচ্চা বলেই মনে করি, তাই তার এই পরিণত মানুষের মত বিলাস দেখে লজ্জা অনুভব করি। তাই বলছি, কিছুদিন তাকে সুযোগের প্রশ্রয় দান করে আমরা দিল্লীতে গিয়ে বাস করি। বাদশাহ পুত্রও এতে সঙ্কোচ পরিহার করবে, আর আমাদেরও কোন লজ্জা থাকবে না।

হামিদা তার উত্তরে বললেন—কিন্তু পুত্র সব দফতরের কর্ম-চারীদের জেনানা লুট করে নিয়ে আসছে, এতে যে ভবিষ্যতের অশান্তিকে প্রশয় দিচ্ছে। আমার কেমন যেন ভয় করছে, এরকম করলে রাজ্য রাখা দায় হয়ে পড়বে। শেখসাহেব এসে কিরকম করে কেঁদে বাদশাহের ওপর অভিসম্পাত জ্ঞাপন করলেন। আমার তো মুখে কথাই এল না। যা অন্যায়, তার বিরুদ্ধে কোন কথাই যে মুখে আসে না। শুধু তুমি না থাকলে শেখসাহেবকে বুঝিয়ে

তাড়ানো যেত না। আজ তুমিই আমার ভরসা! এত আত্মীয়-স্বজন হারেমের মধ্যে আছে, কেউ আমার সপক্ষে কথা বলে না। শুধু তুমিই সব লজ্জা আমার ঢেকে দিয়ে আমাকে রক্ষা করে চলেছ। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই।

মাহাম লজ্জিত হয়ে বললেন—এতো আমার কাজই বেগম বহিন! বাদশাহকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি, মাতৃ-সুধা পান করিয়ে তার শিশুকাল রক্ষা করেছি—তার প্রতি আমার কোন কর্তব্য থাকবে না!

কিন্তু আরো তো অনেক ধাত্রী-মা আছে, তাদের এই মমতাবোধ কোথায়? এক জিজি বিবির মমতা ছাড়া আর সকলে চাকরীর সর্তই পালন করে। তবু জিজি বিবির মমতার কথা বললে তার পুত্রশোকের কথা এসে যায়। সে যদি তার পুত্রকে না হারাতো, তাহলে কি এই গভীর মমতার আকর্ষণ বোধ করতো?

মাহাম নিজের সম্বন্ধে প্রশংসা শুনে তাড়াতাড়ি হামিদাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওসব কথা থাক বেগম বহিন। সকলের কি সব রকম ক্ষমতা থাকে? মা অনেকেই হয়, বাচ্চা সবারই গর্ভে আসে, তবে মাতৃত্ব সবার মধ্যে জাগে না। তাই হয়তো বাহান্ন জন বাদশাহের ধাত্রী-মা শুধু চাকরীই করেছে, দিয়েছে বক্ষের সুধা, সে সুধা নিজের পুত্রকন্যাকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। কেউ নিজের বক্ষসুধা চাকরীর খাতিরে বিক্রী করে? তাই গোলামীই বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে স্বাভাবিক মমতাবোধ। বাদশাহের প্রতি আমার আধমের মতই মমতা। আধম অন্যায় করলেও যেমন সাংঘাতিক শাস্তি দিতে পারি না, তেমনি বাদশাহ।

হামিদা বললেন—তবু তুমি আজ এসে পড়েছিলে বলে আমি অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি। না হলে কি যে হত, আজ আমি ভাবতেও পারি না। এক একটি বিপদ এসে যখন আমাকে দিশেহারা করেছে, তোমার ক্ষুরধার বুদ্ধির কৌশলে সুন্দর ভাবে

তার সমাধান করেছ। আলিমন যেরকম ভাবে মহলের মধ্যে অত্যাচার শুরু করেছিল, আমি তো ভয়ে কি করবো ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না। তুমিই তাকে অদ্ভুত ভাবে জব্দ করে বিষ দাঁত ভেঙে দিয়েছ। সে চেয়েছিল তার গর্ভের অসামাজিক পয়দাকে অস্ত্রোপচারের দ্বারা নষ্ট করতে, এবং সেই জন্যে সে হাকিমের সাহায্য নিয়ে সলাহ করছিল।

এই সময় মাহাম বললেন—হ্যাঁ বহিন, লেড়কীটি বড় বেয়াদপ ছিল। তাকে শায়েস্তা করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এখন বাছাধনের আর মুখে বাত নেই। শুধু কান্না সম্বল করে এখন বাচ্চার চাঁদমুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এই পয়দাকে বাঁচাতে যে মেহনত করতে হয়েছে, তার তুলনা নেই। লেড়কীটি কিছুতে সেই অসামাজিক পয়দাটাকে গর্ভে রাখবে না। নিজে বিষ খেয়েও তার জন্মরোধ করবে এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তাকে কয়েকটি সর্দার জেনানার হেফাজতে রেখে অনেক করে আয়ত্বে আনি, তারপর পয়দা হয়ে যাবার পর এখনও নজর রাখতে হয়েছে। তবে এখন আর বিশেষ নজর দেবার দরকার নেই, মনের মধ্যে মাতৃত্ব জেগে উঠেছে, এখন সেই তার বাচ্চাকে নিজে রক্ষা করবে। আর কিছুদিন যাবার পর মাতৃত্ব বেশ গাঢ় আকার ধারণ করলে তখন—। এই বলে মাহাম আনাঘা এক ক্রুর হাসি প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন—একটা ছোট শিশুর ধুকধুকুনিটা টিপে দিতে কত সময় আর লাগবে! বেয়াদপ লেড়কীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাই সংঘটিত হয়েছে। যেমন আপনার প্রতি সে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, তার উচিত বিচার! তারপর মাহাম আনাঘা বললেন—বহিন, আপনি যদি চান, তাহলে আরো মারাত্মক কিছু চিন্তা করতে পারি!

হামিদা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন—না না বহিন, যথেষ্ট শাস্তি আলিমন পেয়েছে। আর তাকে শাস্তি দিও না। বাচ্চা লেড়কাটা তার কাছেই থাক, তাকে আর সরিয়ে আঘাত দিও না।

বেচারী বড় আশা নিয়ে একদিন আমার শুশ্রূষায় বড় হয়ে উঠেছিল। তার প্রতি আমারও যে অনেক কর্তব্য ছিল!

এই কথা শুনে মাহাম কিছুক্ষণ হামিদার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মনে মনে বিরক্ত হয়ে মুখে সহজ ভাব ধারণ করে বললেন—আপনার যা অভিরুচি তাই হবে বেগমসাহেবা।

তবু যেন পরিবর্তনটুকু লুকোনো গেল না। মাহামের মনের অবস্থা ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু হামিদা সেদিকে মন দিলেন না। তাঁর নিজের সমস্যা এত বেশী গভীর যে অন্যদিকে মন দেবার মত তাঁর অবস্থা নয়। তাছাড়া কারুর ওপর এখন বেশী নির্যাতন না হয়, সেদিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

শুধু কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন—তাহলে দিল্লী যাওয়াই ঠিক হল বহিন!

মাহাম সহজ হবার চেষ্টা করে বললেন—যদি আপনার মত বিরোধ না হয়, তাহলে আমার অসমর্থন নেই।

হামিদাবানু স্মিতহাস্যে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মাহাম কক্ষের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে ফেটে পড়লেন। মানুষটির যত ভাল করি, সে তত তার উদ্ধতভাব বজায় রাখে। সম্রাজ্ঞী হয়ে যেন মাটিতে আর পা পড়ে না। অথচ প্রত্যেকটি বিপদ থেকে তাকে অদ্ভুত কৌশলে বাঁচিয়ে চলেছি। তাতে আমার কি লাভ? শুষ্ক কতকগুলি কৃতজ্ঞতার বাত কানে কাছে গুঞ্জরণ করা হয়। অথচ আধমকে দফতরে বিশেষ একটি পদ দিতে অনুরোধ করি, তখন তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে তা নাকচ করে দেন। কেন? এ ধরণের আচরণ করার কি অর্থ হয়? আমার আধম কি রাজসরকারের একটি বিশেষ পদ পাবার যোগ্য নয়! সে এখনও বাচ্চা আছে। আর একটু উমর বাড়ুক তারপর আবেদন

করলেই হবে। বাদশাহ বাচ্চা বলে যেন সবার পুত্রই বাচ্চা আছে! এই ধরণের আচরণ কিছুতে বরদাস্ত হয় না।

মাহাম আনাঘার মত সংযমী রমণীও জ্বালায় ছটফট করতে করতে কক্ষময় ছুটে বেড়ালেন।

তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পৈশাচিক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—অধৈর্য হওয়ার কি আছে? বাদশাহ আকবর এখন প্রমোদ তরনীতে ভাসতে ভাসতে আমীর ওমরাহদের বিবি ধরে নিয়ে আসছে, তাকে সাহায্য করছে তারই বেটা আধম। বেটা আধমকে সে খুব সতর্ক করে এগিয়ে যেতে বলেছে, যেন কোন অপরাধ সহজে না তার ঘাড়ে পড়ে যায়। তবে ছেলেটাও বড় বেয়াদপ, তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। কোন সময়ে বাদশাহের সঙ্গে আওরতকে কেন্দ্র করে কলহ লাগিয়ে দেবে।

মাহাম মনে মনে আবার হাসলেন—সে যা করে করুকগে যাক। এদিকে তার কবলে জেনানামহল সম্পূর্ণ আয়ত্বে এসেছে। দিল্লীতে গিয়ে এবার আসল কাজে নামতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। বড় শত্রু ঐ খানখানান সাহেব। সে আরো বেশী ধূর্ত। তাকে একবার গদি থেকে নামাতে পারলেই সব কষ্টের লাঘব হয়।

এখন দিল্লীতে প্রবেশের আয়োজনই সম্পূর্ণ করতে হবে, এবং অতি সত্বর।

তারপর একদিন জেনানা মহলের অনেককেই সঙ্গে নিয়ে হামিদাবানু দিল্লী চলে গেলেন। যাবার সময় আকবরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। আকবর তখন সরাব পান করে বেহোঁশ হয়ে রঙমহলের কার্পেটের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। কেউ তার ঘুম ভাঙাতে সাহস করলো না।

অতি প্রত্যূষে এই গমনের আয়োজন হয়েছিল। ভোরের

আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি তাঞ্জাম ও ফৌজ বেরিয়ে পড়লো আগ্রা ফটক ছেড়ে।

হামিদাবানু পুত্রকে এই অবস্থায় ছেড়ে কিছুতে যেতে চান নি। মাহাম বললেন—একি আপনার মমতা বেগম বহিন! বেটা মরদ হয়েছে, সে আর বাচ্চা নেই, তাকে একটু স্বাধীনতা দেবেন না!

হামিদা চোখের জল সঙ্গোপনে মুছে বললেন—সে যে বড় অস্থির বহিন! আব্বার মত শরীরে রাগ পেয়েছে, আবার পেয়েছে দারুণ মমতা। কখনও ক্ষেপে গিয়ে সিংহের সঙ্গে লড়াই করে, আবার কখনও মমতায় গলে গিয়ে বদ্ধকক্ষে বসে রোদন করে, সেইজন্যেই আমার বড় চিন্তা।

মাহাম হামিদার হাতটি চেপে ধরে বললেন—কোন ভয় নেই বেগমসাহেবা! আমি যখন আপনার কাছে আছি, সব বিপদ থেকে আপনাকে আমি উদ্ধার করবো। তারপর মনে মনে ছলনাময়ী মাহাম বললেন—যাতে তোমার সর্বনাশ হয়, সেই চেষ্টাই আমি করবো?

ছুনিয়ায় কি রমণী শাসন কখনও সৃষ্টি হয় নি? সিংহাসনে কখনও কি কোন রমণী বসে রাজত্ব করে নি?

সেই মুহূর্তে যদি মাহামের মনের কথা কেউ শুনতে পেত?

না, সে সম্ভাবনা ছিল না। বিধাতার ইচ্ছায় মানুষের এই একটি স্বাধীনতায় কেউ কখনও হাত দিতে পারে নি। মনের কথা মনের মধ্যেই গুমরোয়, আর তার প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অন্তরালে লালিত হয়।

হামিদা যদি একবার তাঁর সঙ্গিনীর মতলব বুঝতে পারতেন! কিন্তু বুঝতে পারলেও বা তিনি কি করতেন? অসহায় হয়ে পুত্রের নিরাপত্তার জন্যে হা হুতাশ করতেন!

তাঞ্জামগুলি বাহকের কাঁধে, দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। আগে ও পিছুতে রক্ষী ফৌজ। মাঝে মাঝে সামনের ফৌজগুলি 'হুশিয়ার, তফাৎ যাও' রবে চীৎকার করে উঠছে।

রৌদ্র মাথার ওপর ওঠার আগেই অনেক এগিয়ে যাবার কথা, সেইজন্যে যত জলদি যাওয়া যায় তারই চেষ্টা এরা করছিল।

বাদশাহী সড়ক ধরে তাঞ্জামগুলি এগিয়ে চলেছে। পথচারী যারা পথ দিয়ে নিজের কাজে যাচ্ছিল, তারা হঠাৎ সচকিত হয়ে বৃক্ষের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছে।

বাদশাহী জেনানা যাচ্ছে পথ দিয়ে। তাঞ্জামের মধ্যে তারা আবদ্ধ থাকলেও তাদের আবরু রক্ষা করা পথচারীর উচিত। তাছাড়া অহেতুক শাহী ফৌজ কোন বেয়াদপি চিন্তা করে পথচারীকে ক্ষিপ্ত অশ্বের মুখে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতে পারে, এই চিন্তা করেই পথচারী দূর থেকে ফৌজের হুশিয়ার শব্দ শুনে বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

সে সময়ে সাধারণ ভারতবাসীর প্রাণ ফৌজের অত্যাচারের ভয়ে শিহরিত হত। একে তো প্রত্যহ রাজ্য জয়ের ফিকিরে নতুন নতুন দল এসে দেশ আক্রমণ করছে। একপ্রস্থ সাধারণ জীবন বিপর্যস্ত। নতুন নতুন সম্রাটের আইন-কানুনে জীবন ধারণের প্রণালী প্রত্যহই পরিবর্তিত হচ্ছে। তার ওপর গৃহস্থ জীবনে সর্বদা লুঠপাটের আতঙ্ক। কারো ধনদৌলত, কারো ঘরের সুন্দরী বৌ, কারো যুবতী কন্যা—কার যে কপালে কখন কি ঘটবে কেউ বলতে পারে না! সর্বদাই প্রত্যেকে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করছে।

ইদানীং আবার এক নতুন আতঙ্ক হয়েছে, যার ঘরে যুবতী বধূ বা কন্যা আছে, তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এ আতঙ্ক চিরকালই ছিল, তবে বর্তমানে আরো প্রবল! শাহী ফৌজ দিনরাত টহল দিয়ে ফিরছে, কার ঘরে খুবসুরত যুবতী লুকোনো আছে। আগে ফৌজীরা নিজেদের জন্যে মাঝে মাঝে কারও যুবতী মেয়ে লুঠ করত কিন্তু এখন স্বয়ং বাদশাহের জন্যে আওরত লুঠ হচ্ছে। তাই জাঁকজমক আড়ম্বরেই বাদশাহের জন্যে আওরত লুঠে

আনা হচ্ছিল। কোন গোপনতা নেই, প্রকাশ্য পথ দিয়ে তাদের তাঞ্জামে করে বিশেষ সম্মান দিয়ে আনা হচ্ছিল।

এমন কি যাদের ঘর থেকে লুঠে আনা হল, তাদের কাঁদবার পর্যন্ত উপায় নেই, তাহলে আবার নির্যাতন। হয়ত তরোয়ালের এককোপ। মুণ্ড ধড় থেকে ছেড়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। শুধু রক্তের স্রোতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকলো।

মেয়েটি চলে গেল বাদশাহের হারেমে। তাকে কিছুতে লুকিয়ে রাখা গেল না। অথচ তাকে যে লুকিয়ে রাখার কত চেষ্টা হয়েছিল! ঘরের বাইরে তাকে একবারও বের করা হয় নি। পুকুরে জল আনতে পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। এমন কি এ বাড়ীতে যে কোন মেয়ে যুবতী হয়ে উঠেছে, সে সন্ধানও কেউ জানে না। অথচ একদিন শাহী ফৌজ এসে বাড়ী ঘেরাও করলো।

তল্লাসী চললো ঘর থেকে ঘরের জিনিস তচনচ করে। হয়তো অনেকক্ষণ সময় লাগলো খুঁজে বের করতে। বাড়ীর পুরুষেরা নির্যাতন ভোগ করতে লাগলো। তবু কারুর মুখে রা নেই, যদি মেয়েটিকে কোনরকমে বাঁচানো যায়!

শেষকালে হয়তো একটি বৃহৎ জালার মধ্যে মেয়েটির সন্ধান মিললো।

খবর ঠিকই শাহী ফৌজ পেয়েছিল। কটি আশরফির বিনিময়ে প্রতিবেশী সংবাদটি পরিবেশন করেছে।

কী নৃশংস এই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক!

অথচ হয়তো যে প্রতিবেশী এই সংবাদ সরবরাহ করেছিল, তারই ঘরে আছে একটি সুন্দরী যুবতী বধূ। সে নিজের ঘরেরটি বাঁচাবার জন্যে শাহী ফৌজের সাথে মিতালী করলো কিন্তু এত করেও শেষপর্যন্ত তার ঘরেরটি রক্ষা পেল না। একদিন শেষরাত্রে ফৌজ হানা দিয়ে শয্যা থেকে বধূকে তুলে নিয়ে আগ্রা রওনা হয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে বাদশাহী তাঞ্জামগুলি পথ দিয়ে চলেছিল।

দেশের লোক সকলেই জানে, এই তাঞ্জামগুলির মধ্যে কারা আছে। বাদশাহী জেনানাদের সম্ভ্রম নষ্ট করা বুঝি স্বয়ং ঈশ্বরেরও ক্ষমতার বহির্ভূত। অথচ এই সব অবরোধ বাসিনীদের তাঞ্জাম থেকে বের করে পথিমধ্যে ইজ্জতহানি করতে পারলে যেন সবচেয়ে বেশী দেশবাসী খুশি হত। মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধের সমাপ্তি বুঝি এতেই মিটতো।

কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, এই বোধ সকলের ছিল বলে তাই বুক ফুলিয়ে শাহী তাঞ্জাম জেনানা সম্ভ্রম নিয়ে প্রচণ্ড শব্দ জাগিয়ে সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছিল।

হামিদা আলাদা একটি তাঞ্জামে বসেছিলেন, সঙ্গে ছিল তুজন পরিচারিকা। তাঁর তাঞ্জামটি একটু বিশেষ ধরণের। দেখলেই মনে হয়, রাজমাতা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠা বলে তাঁর বিশেষত্বটি এই তাঞ্জামের মধ্যে দিয়ে প্রচার করেছেন।

মাহাম হামিদার তাঞ্জামে স্থান পান নি। তাঁকে কৌশলে অন্য তাঞ্জামে উঠতে আজ্ঞা করেছেন বেগমসাহেবা। হাজার সখ্যতা সৃষ্টি হলেও তো তফাৎ অস্বীকার করা যায় না। তিনি রাজ-মহিষী, কত বড় সম্মান তাঁর, আর মাহাম সামান্য একজন বেতন-ভোগী কর্মচারী।

তাঞ্জাম চলেছে তুলকি চালে।

হামিদা রুদ্ধ দরজার মধ্যে তখন আলিমনের কথা ভাবছেন। বেওকুব লেড়কীটিকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভাল হত। বেচারী জান পয়চান দিয়ে এখন অসামাজিক এক বাচ্চার চাঁদমুখ থেকে দিন গুজরান করছে! তাকে তিনি সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু মাহামই বাধা দিল, বলল্লো—বেগমসাহেবা, ও এখানে থাকুক। ও আর সহজে মরতে চাইবে না দেখবেন।

কিন্তু কি যেন হামিদার কেবলই মনে হচ্ছে, আলিমনকে

সঙ্গে রাখলেই বুঝি ভাল হত। একজন মনের মত কেউ নেই, যার সঙ্গে ভাল কিছু সলাহ করেন। মাহাম অবশ্য যথেষ্ট তাকে সাহায্য করে চলেছে কিন্তু বড় নির্মম মাহাম, তার মনে কোন দয়ামায়া নেই। কিন্তু তিনি এতো নির্মমতা তো চাননি!

সেইজন্যে এমন কাউকে তাঁর দরকার যার মধ্যে দয়া আছে। আলিমনের তিনি শাদী দিতে চান। নিজের অবিচারের প্রতিকার করতে চান তিনি। এমন এক নওজোয়ান তার দরকার, যে জেনে শুনেও আলিমনকে গ্রহণ করবে। সেই নওজোয়ানকে তিনি প্রচুর ধনরত্ন ও জাগীর দেবেন।

দিল্লীতে ফিরে এ সম্বন্ধে একবার খানসাহেবের স্মরণ নিতে হবে। খানসাহেব হয়তো ইচ্ছে করলে তেমনি একটি নওজোয়ানকে যোগাড় করে দিতে পারবেন। কিন্তু সেখানেও সন্দেহ, খানসাহেব তাঁর কথা রাখবেন কি না।

বহুদিন তাঁরা দিল্লী ত্যাগ করে আছেন। এতদিনে খানসাহেবের মতিগতি কেমন হয়েছে কে জানে? তাঁর বেটা আব্দুর রহিম কত বড় হয়েছে, তাও জানা নেই। খানসাহেব পিতৃত্ব প্রাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি দিল্লী ত্যাগ করেছিলেন, এখন সেই মানুষ পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়ে কিরকম প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাও কৌতূহলের বিষয়।

সলিমা কি মা হয়ে আরো সুন্দর হয়েছে?

হামিদার মনে তখন দিল্লী প্রাসাদের চিন্তাই জেগে উঠলো।

রুকমি বেগমসাহেবার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল কিন্তু হামিদা তার মতলবে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিতাড়িত করেছেন। বলেছেন—তুমি আওরতজীবনে সুরতই পেয়েছ, পুরুষের দিল বরবাদ করবার ক্ষমতা পাও নি। আমার বেটার তুমি বেগম হলে। সবচেয়ে সেরা সম্মান তোমায় দান করলাম, তার বিপরীতে তুমি কি করলে? আমার পুত্রকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিলে।

এমন করে বেগমসাহেবা কখনও রুকমিকে তিরস্কার করেন নি। তখন রুকমি নিজের জ্বালাতেই নিজে ক্ষতবিক্ষত। তার ওপর আবার বেগমসাহেবার কাছ থেকে তিরস্কার পেতে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। ঝরঝর করে জল তার চোখ দিয়ে বের হয়ে পড়লো।

বেগমসাহেবা, আমি বহুৎ মেহনত করেছি কিন্তু পারি নি। বাদশাহ আমাকে ঘৃণা করেন।

কেন করেন, তুমি কি আওরত নও?

জী বেগমসাহেবা কিন্তু আমি তাঁর বেগম বলেই তিনি আমাকে নফরৎ করেন। এমনি কোন আওরত হলে বোধ হয় এই অবজ্ঞা করতেন না।

হামিদা জানেন সে কথা কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি রুকমির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। আকবর তাঁর ওপর কথা না বলতে পেরেই এই পন্থা নিয়েছে, তা তিনি জানেন। শাদী সে করতে চায় নি, বাধ্য হয়ে তাকে শাদী করতে হয়েছে। এই বোধটা প্রকাশ করার জন্যেই সে রুকমিকে প্রত্যাখান করেছে।

কিন্তু সে কথা জানলেও তিনি মনের নিভৃতে লুকিয়ে রাখলেন! পরিবর্তে রুকমিকে দোষী করে তাকে আরো আঘাত দিয়ে শক্তি জাগাতে চাইলেন, যাতে রুকমি কোনরকমে আকবরের মন জয় করলে অন্তত তাঁর প্রতি সেই অবজ্ঞা ভাবটা অপসারিত হয়।

এ রাজত্বের নিয়ম। রাজনীতির কৌশল। নিজেদের ব্যবহারিক জীবনও এই নীতির আবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাই হামিদা দিল্লী যাবার প্রাক্কালে রুমকিকে ধিক্কারে জর্জরিত করে তাকে আরো জাগিয়ে দিয়ে গেলেন!

মনে রেখো তুমি আমার বেটার শাদী করা বেগম। আমি নিজে হাতে তোমার সঙ্গে বেটার শাদী দিয়েছি। বেটা যদি আমার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়, তার ছন্যে তুমি দায়ী হবে। তোমাকেই

আমি দোষী করবো এই ভেবে যে তোমার রূপের আকর্ষণে আমার বেটাকে তুমি মুগ্ধ করতে পারনি। তোমার রমণীজীবনের সেই ধিক্কার কেউ মোচন করতে পারবে না। তুমি শাহজাদা হিন্দালের কন্যা বলেই আমি তোমায় এই সম্মান দিয়েছিলাম। তোমার পিতার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার দানস্বরূপ এই অনুগ্রহ। এই দয়া না প্রকাশ করে যদি অন্য কোন যুবতীকে এই সম্মান দিতাম, তাহ'লে হয়তো সে আমার বেটার প্রিয়বেগম হয়ে একদিন তার যোগ্য সম্মান অধিকার করতে পারতো।

তারপর হঠাৎ ক্ষুদ্ধ ভঙ্গিতে চীৎকার করে বললেন—ধিক্ রুকমি তোমার জীবনে! পারো না অধিকার ছিনিয়ে নিতে কারুর কাছ থেকে? শক্তি যাদের নেই তারা যে নিঃসহায় দুর্বল হয়ে দুনিয়ার অভিশাপ কুড়োয়, একি জানা নেই? বলপ্রয়োগ করবে। অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্যে কৌশল করবে কিন্তু অনুরোধ করবে না। দুনিয়াতে অনুরোধের কোন মূল্য নেই। কাতর প্রার্থনার কেউ দাম দেয় না। কাতর প্রার্থনা যারা প্রকাশ করে, তারা দুর্বল বলেই এই আচরণকে প্রশ্রয় দেয়।

রুকমি শুধু কাঁদতে কাঁদতে মাথা নত করে নিম্নস্বরে বললো—আপনি আমায় উপদেশ দিন মালকিন, আমি কেমন করে বাদশাহকে সবশে এনে তার সমস্ত মানসিক অস্থিরতা দ্রবীভূত করবো!

উপদেশ! হঠাৎ হামিদা রুকমির শিশুসুলভ কথায় হেসে উঠলেন—তুমি নিতান্তই বুদ্ধিহীনা লেড়কী! খোদা তোমায় শুধু অসামান্য রূপই দিয়েছেন, দেন নি আর কোন ক্ষমতা! তোমার দয়িতকে তুমি কি করে সবশে আনবে, তার জন্যে আমি দেব উপদেশ? যাও, রুদ্ধকক্ষের মধ্যে আজীবনের বন্দীত্ব নিয়ে শুধু কান্নাকেই সম্বল কর। আমার বেটা বড় দাম্ভিক ও অহঙ্কারী মরদ, সে যে কেন তোমাকে গ্রহণ করে নি, এবার বুঝতে পাচ্ছি।

রুকমি তাড়াতাড়ি আর্তস্বরে বললো—আপনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন বেগমসাহেবা। আমাকে এমন করে অভিশাপ দেবেন না। আমি বার বার চেষ্টা করেছি বাদশাহকে আকৃষ্ট করতে কিন্তু পারি নি। বেগমের আসন থেকে নেমে সামান্য এক কসবীর মত তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে গেছেন, যেই আমাকে চিনতে পেরেছেন, ওমনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে।

তারপর রুকমি একটু কঠিনস্বরে বললো—আপনি জানতেন মালকিন যে এই শাদী সুখের হবে না! তবু জেনে শুনে কেন আমার জীবনটা নষ্ট করলেন, বুঝতে পাচ্ছি না। জনাবের মনে সেই রাজপুত লেড়কীর ছায়াই জেগে আছে, সেখানে আর কারও স্থান হবে না, এ বেশ স্পষ্ট।

হামিদা এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নের জন্যে প্রস্তুত হলেন। আর নয়। এবার আসল জায়গায় রুকমি এসে গেছে। সাপের ফণা ধীরে ধীরে তুলতে আরম্ভ করেছে, এবার ছোবল দেবে, দারুণ ছোবল।

তবু তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন, বললেন—তুমি কি বেগম হবার আশা মনে পোষণ কর নি? আমি তোমার আশাই পূরণ করেছি।

রুকমি বোধহয় ফেটে পড়বার উপক্রম করছিল।

এই অবসরে হামিদা সেস্থান ত্যাগ করে পলায়ন করলেন। শুধু যাবার সময় বলেছিলেন—আজ যাও রুকমি, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

দিল্লী যাবার আগের দিন রাত্রে এই কথোপকথন চলেছিল। তার পরদিন উষার প্রাক্কালে যাত্রারম্ভ। সুতরাং হামিদাকে আর রুকমির মুখোমুখি হতে হল না।

২৭

এবার মাসখানেক এগিয়ে যেতে হয়।

মাহামের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। বৈরাম খান মক্কায় যাবার ব্যবস্থা করছেন।

একটি রমণীর পক্ষে এই কৃতকার্য বড়ই চমৎকারিত্বের পরিচায়ক। সেদিন দিল্লীতে আসার পূর্বে মাহাম আনাঘা এই শপথই করে বেরিয়েছিলেন যে, রাজত্ব কায়েম করতে হবে। আর রাজত্ব কায়েম করতে গেলে বৈরাম খানকে তাঁর আসন থেকে সরাতে হবে।

সেদিন মনে মনেই ছিল সেই সঙ্কল্প। আজ আর তা গোপন নেই। আজ সকলেই জানে, কার বুদ্ধিতে এই রাজত্বের হঠাৎ পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

অবশ্য প্রত্যক্ষ লোকে দেখছে, সমস্ত ক্ষমতা রাজমহিষীর কবলে চলে যাচ্ছে। এখন আর মহিষী শুধু অন্তঃপুরের কর্ত্রী নয়, এখন তাঁর হুকুম বড় বড় আমীর-ওমরাহরা পর্যন্ত স্বীকার করছেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, উজীর, নাজীর, কোতোয়াল, সিপাহ-শালার, মীরবক্সী, মীরসামান, মীরআদল তারপর আমীল, বিতিকৃচি, পোতদার, ওয়াকিয়ানবীশ, কুফিয়ানবীশ প্রভৃতি কর্মচারীরা হঠাৎ রাজমহিষীর হুকুম মানতে লাগলেন। চিকের আড়ালে হামিদাবানু ও তাঁর একটু দূরত্বে মাহাম আনাঘা।

বাইরে থেকে এক একটি প্রশ্ন যায়, হামিদাবানু মাহামের মুখের ওপর দৃষ্টিস্থাপন করেন, আর মাহামা আনাঘা উত্তর পেশ করেন। সেই উত্তর হামিদা বাইরে দণ্ডায়মান ফৌজদারকে জানান। ফৌজদার সেলাম ঠুকে সেই হুকুম নিয়ে চলে যায়।

এ আচরণ এই বর্তমানে শুরু হয়েছে।

বৈরাম খানসাহেব কি করে তাঁর ক্ষমতা হারালেন, এ সম্বন্ধে অতীতে চলে যেতে হয়।

মাহামের দিল্লীতে আসার কারণ সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত আছেন। মাহাম দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজপ্রাসাদের আবহাওয়া পরিমাপ করতে লাগলেন। রাজ্যের বাতাস কোনদিকে বইছে একবার আন্দাজ করে নিয়ে নিজের জাল ছড়িয়ে দিলেন।

সে সময় খানসাহেবের ঔদ্ধত্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়ে সুযোগ সন্ধান করছিল। রাজপ্রাসাদের মধ্যে চাপা বিদ্বেষ বাষ্পের আকার নিয়ে শুধু থম থম করছিল।

মাহাম আনাঘা শুধু হামিদাবানুকে একবার পরীক্ষা করে নিলেন। তাঁর নিজের মতলবের কথা কিছু প্রকাশ করলেন না, শুধু হামিদাবানুর মনের কথা জানবার চেষ্টা করলেন। বেগমসাহেবা খানসাহেবের সম্বন্ধে কি আশা মনে পোষণ করেন, জানবার জন্যে একদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে মাহাম বিবি হামিদা বানুর সামনে দাঁড়ালেন, এবং বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বেগম বহিন, আপনার সঙ্গে কিছু সলাহ করবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি। আপনি খানসাহেবকে কতটুকু বিশ্বাস করেন?

হামিদাবানু মাহামের কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেন না। তাই বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি জানতে চাও, আমি বুঝতে পাচ্ছি না বহিন? তোমার মতলব একটু স্পষ্ট করে প্রকাশ করলে খুশি হব।

খানখানান সাহেব আপনাদের পরিবারের দোস্ত। তার এখন যে কর্মক্ষমতা দেখছি, তাতে আমার ধারণা হচ্ছে, তিনি পূর্ণ অধিকার কায়েম করার জন্যে ষড়যন্ত্র করে চলেছেন। তাছাড়া আপনাকে আগেই বলেছিলাম, খানসাহেব নিজের পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কিছু গরবর করার চেষ্টা করবেন।

হামিদা একান্ত অসহায়ের মত বললেন—আমি তো সে ধরণের কিছু দেখতে পাচ্ছি না মাহামবিবি। তুমি কি দেখেছ বা আন্দাজ করেছ, আমাকে সবিস্তারে বলো। তাছাড়া আমার মনে হয়, তুমি অযথা সন্দিগ্ধ হয়ে দেমাগ বিলকুল খারাপ করছো।

এ কথায় মাহাম বিবি বড় বড় চোখ করে বললেন—আমি অযথা দেমাগ খারাপ করবো কেন বেগমসাহেবা? রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে চাপা একটা গুমোট লক্ষ্য করেছেন, না? সবাই কি যেন বলতে চায়, অথচ ভয়ে বলছে না। তাদের যদি একবার সাহস দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো তারা আসল কথা পেশ করে ফেলে।

হামিদা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন—কই না, আমি তো সে ধরণের কিছুই দেখছি না! সলিমা এল, বাদশাহের শাদীতে না যেতে পারার জন্যে মাফি চেয়ে গেল। আগের মত আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলো। তার হাতের কাজকরা একটি ওড়না আমায় উপহার দিল। তার বেটাকে দেখালো। তাকে কোলে নিলাম দেখে প্রচুর খুশি হল। খানসাহেবের অন্যান্য বেগমেরা এল, তারা তবিয়ৎ কেমন আছে জানতে চাইলো। আরো মহলের অন্যান্য রিস্তাদার মহিলারা দেখা করে গেল। চিকের আড়াল থেকে রাজকর্মচারীরা কেউ কেউ কুশল জিজ্ঞাসা করলো—কই তাদের কারুর মধ্যে তো কোন দেখলাম না! যদি কোন গুমোট থাকতো, তাহলে কি তার একটুও ইঙ্গিত আমি পেতাম না! বরং মনে হল, তারা সকলে খুব আরামে আছেন।

মাহাম মৃদু হেসে বললেন—বিবিসাহেবা, মানুষের মুখের আকৃতি দেখে ও কথা শুনে যদি মনের কথা বুঝতে পারতেন, তাহলে দুনিয়ায় এত গোলমাল থাকতো না। এই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের আসল রহস্য। আপনার ভ্রান্ত ধারণা কতখানি অসত্য তার একটা প্রমাণ আমি দিচ্ছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনার চিন্তার বাইরে কতকিছু ঘটে যাচ্ছে।

এই বলে মাহাম হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কক্ষে একজন স্থূলকায় বাঁদীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

হামিদা দেখলেন, তাঁর স্বামীর যুগের এক প্রৌঢ়া জেনানা সর্দার। একে বেশ মনে আছে হামিদার এইজন্যে যে এর নামও ছিল হামিদা। মহিষী এর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন জেল্লা।

জেল্লা এসে কক্ষের মাঝে সেলাম করে দাঁড়ালে হামিদা কোমল-স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কি খবর সর্দারনী!

মাহাম সাহস দিয়ে বললেন—সর্দার বলো তুমি আমাকে যা বলেছ।

জেল্লা বললো—আমার সরম আসে বিবিজী। এসব বড় আদমিদের সওয়াল, আমি কি করে বলবো?

হামিদা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বললেন—ভনিতা রেখে ঝটপট যা জানো বলো, আমার ধৈর্য থাকছে না।

মাহাম সাহস দিয়ে বললেন—কসুর কি সর্দার? তুমি যা জানো বল না। তুমি তো এ পরিবারের পুরোনো লোক, ভয় পাওয়ার কি আছে?

জেল্লা ভয়ে ভয়ে হামিদার মুখের দিকে চেয়ে বললো—বেগমসাহেবা, প্রাসাদের চতুর্দিকে বড় গোলমাল বয়ে চলেছে। দেওয়ান সাহেবের ওপর কেউ খুশি নয়, তাছাড়া দেওয়ানসাহেব গোপনে গোপনে কিছু কর্মচারীকে হাত করে বাদশাহের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। তিনি বলছেন, আমরা কেন উচ্ছৃঙ্খল বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করবো? বাদশাহ আয়াসের মধ্যে দিন কাটাবেন, আর আমরা মেহনত করে রাজকোষের দৌলত বাড়িয়ে যাবো? তাছাড়া দেওয়ানসাহেব এখন পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বহু ধনরত্ন লাহোরে পাচার করছেন। সেদিন তিনজন ঘোড়সওয়ার কটি পুলিন্দা সঙ্গে কোথায় গিয়েছিল, জানতে চাইলেই সব ঘটনা জানা যাবে। তাছাড়া রাজস্বের হিসাবরক্ষক বিতিক্‌চিকে জিজ্ঞেস

করলে জানতে পারা যাবে, তার হিসাব ঠিক আছে কিনা। কই সেদিন খানসাহেব যে মীর্জাদের দমন করে এলেন, তাদের জাগীরগুলি এখন কার অধীনে ?

খানসাহেবের নয়া বিবি সলিমা বেগম এখন সব সময় বলছেন, মুঘল বংশ যদি রক্ষা হয়, তাহলে আমার রহিমের কল্যাণেই রক্ষা পাবে। এ ঔদ্ধত্য অন্য কেউ সহ্য করতে পারে, কিন্তু বেগম সাহেবা, আপনাদের নিমক খেয়ে কি করে বরদাস্ত করি !

হঠাৎ হামিদা অনেক কষ্টে সংযম ধারণ করে ধমক দিয়ে বললেন—তুমি যাও জেল্লা, যথেষ্ট হয়েছে।

জেল্লা তাড়াতাড়ি সেলাম পেশ করে অদৃশ্য হল।

মাহাম কোন কথা বললেন না, শুধু হামিদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

আর হামিদা বিস্ময়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন—একি সত্যি ?· না, কারো চক্রান্ত ! জেল্লা সর্দারণী সত্য কথা বললো, না কারো দ্বারা নিযুক্ত হয়ে এই কল্পিত কাহিনী তাঁর কাছে পেশ করে গেল ! কিছু বুঝতে পারলেন না হামিদা।

মাহাম আগেই বুঝেছিলেন, বেগম মহিষী জেল্লার কথা অবিশ্বাস করেছেন। তাই কিছুক্ষণ সময় নিয়ে হামিদার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—'আরো যদি প্রমাণ চান, তাহলে তাও সংগৃহীত আছে বেগমসাহেবা !

হঠাৎ হামিদা মাহামকে আক্রমণ করলেন—এই প্রমাণ দিয়ে তোমার স্বার্থ কি মাহামবিবি ?

মাহাম হামিদার অতর্কিত আক্রমণে চমকে উঠলেন, তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সহজ করে মৃদু হেসে বললেন—আপনার উপকারের জন্যে এই মেহনত বেগমসাহেবা ! আপনি আমার সাহায্য চান বলেই এই তকলিভ স্বীকার করে প্রমাণগুলি সংগৃহীত

করেছি। তাছাড়া বাদশাহকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি বলেই তার জন্যে এই প্রচেষ্টা।

হামিদার বলতে ইচ্ছা হল, 'অতো মেহনতে তোমার কাজ নেই মাহাম' কিন্তু তা না বলে হামিদা সেই মুহূর্তে শুধু চুপ করে থাকলেন।

তখন মাহাম ধীরে ধীরে একটি একটি কুসুম সংযোজিত করে বৃহৎ মালা গাঁথার চেষ্টা করতে লাগলেন। কোমলস্বরে বলতে লাগলেন—বহিন বেগমসাহেবা, আপনাকে বোঝানো আমার বাতুলতা, তবু না বলে উপায় কি? আজ আপনার চোখ যদি ফুটিয়ে না দিই, তাহলে ভবিষ্যতে যে আপনি আমাকেই দোষী করবেন! আর আমিও তীব্র অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে শুধু আফশোষ করবো। বেটা আকবরের বহু মেহনতের এই সিংহাসন, এ যদি পরহস্তগত হয়ে আমাদের আবর্জনার মত পথে নেমে যেতে হয়, বেইমানদের ক্রীড়াপুতলী হতে হয়, এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু থাকবে না। সেদিনকার কথা চিন্তা করতে পারছেন বিবিসাহেবা! চোখের ওপর ভেসে উঠছে, খানসাহেব সিংহাসনে বসে সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে আমাদের সকলকে কুত্তার মত মনে করেছেন। আর আমরা একটু অনুগ্রহের জন্যে তার কাছে কাতর মিনতি করছি। আকবর আমাদের সবচেয়ে পেয়ারী বেটা, খানসাহেবের হুকুমে জল্লাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে। সে বাঁচবার জন্যে মরীয়া হয়ে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে, বলছে, জনাব আমি সিংহাসন চাই না। চাই না রাজ্য ও রাজত্ব। আমি শুধু বাঁচতে চাই। মুসাফিরের মত জীবন ধারণ করে বাঁচতে চাই। একটুকরো তণ্ডুল রুটির জন্যে দেশ থেকে দেশে ভিখ্ মেঙে বাঁচতে চাই।

কিন্তু খানসাহেব তবু তাকে বাঁচতে দিলেন না। বরং আরো নৃশংসভাবে হত্যার জন্যে নিজে বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে থেকে জল্লাদকে হুকুম করলেন—মুণ্ডটি এক কোপে নামাবে না, যেন পাঁচ, ছয়

আঘাতের প্রয়োজন হয়! অপরাধ, তার পিতা একদিন আমার দোস্তী স্বীকার করে আমাকে পরিবারের আতালিক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস। মানের বিরুদ্ধে বেইমানি।

হামিদা শুনতে শুনতে চোখ দুটি বন্ধ করে কান চেপে ধরেছিলেন। তারপর হঠাৎ স্ফুরিতস্বরে বললেন—মাহামবিবি, বন্ধ কর তোমার সওয়াল, আমি আর শুনতে পাচ্ছি না। আমার চেতনা কেমন যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার দৃষ্টি কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

মাহাম মনে মনে খুশি হয়ে তারপর মুখে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করে বললেন—অস্থির হওয়ার কি আছে বিবিসাহেবা? এ তো আর ঘটেনি, ঘটতে পারে। আমি শুধ ভবিষ্যতের চিত্রটি আপনার চোখের ওপর তুলে ধরছিলাম।

হামিদা আর্তস্বরে বললেন—না না—এ ঘটনা যাতে না ঘটে, তারই ব্যবস্থা কর বহিন। যদি এতবড় সাংঘাতিক চক্রান্ত গোপনে রাজ্যের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তা ভাঙবার পথ কোথায় মাহাম বহিন?

মাহাম আশ্বাস জ্ঞাপন করে বিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন—চিন্তার কোন কারণ নেই বেগমসাহেবা! এখানে বুদ্ধিই সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে, আপনি আমার পাশে থাকুন, আমি এই অন্তঃপুরে থেকেই চক্রান্ত ভেঙে দিচ্ছি! খানসাহেব জানেন না, এখন বেগমসাহেবার পাশে কে আছে? যখন জানবেন, তখন আর পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবেন না। শুধু আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি একটু কঠিন হয়ে নিজেকে ধরে রাখবেন হঠাৎ কেউ ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন না। তারপর দেখুন, ষড়যন্ত্রকারীদের শেষ পরিণাম কি হয়?

হামিদা নিরুপায় হয়ে সায় দিয়ে তারপর আর্তস্বরে বললেন—আমার বেটার কিছু হবে না তো!

মাহাম শুধু হাসলেন।

যদি আমার অসমর্থনে কোন কাজ করেন, তাহলে শেষপর্যন্ত কি হবে বলতে পারি না! কারণ বুদ্ধির কৌশলে সবকিছু উলটে দিতে হবে। একটু বেচাল কিছু করলেই বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে।

হামিদা বললেন—না, না আমি তোমার অভিমত না নিয়ে কোন কাজই করবো না। তবে দেখো যেন কেউ মারাত্মক কোন শাস্তি না পায়।

এরপর মাহাম আসল কাজে অবতীর্ণ হলেন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন অন্তঃপুরের আরো গভীরে। অন্তঃপুরেই আছে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ। আগে অন্তঃপুর অধিকার করতে হবে। যারা একটু বেয়াড়া ধরণের, তাদের উদ্ধত ফণা নামিয়ে দিতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে তাদের তোমাদের স্বাধীনতা হস্তান্তরিত। জবানা বদল হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং হুসিয়ার। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু অধিকারে আনতে হবে।

তিনি লক্ষ্য করেছেন রক্ষী, সিপাহী, শাস্ত্রি, পাহারাদার, বাঁদী বান্দা, নফর, গোলাম, খিদমতগার, মশালচি, বকাওলবেগী জেনানা সর্দার প্রভৃতি কর্মচারীরা সব খানসাহেবের ওপর অসন্তুষ্ট। এদের মধ্যে অনেকেই খানসাহেব কর্তৃক অত্যাচারিত হয়েছে।

মাহাম সর্বপ্রথম এই সুযোগ নিলেন, এদের সকলকে নিজে হাত করলেন। এদের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেলেন। এরাই সারা প্রাসাদের সমস্ত কিছু জানতো কারণ এদের অবলম্বন ছাড়া কারুর এক পাও নড়বার উপায় নেই। সমস্ত প্রাসাদটাই যেন এদের নিয়ন্ত্রাধীনে চলতো।

মাহাম এদের অধিকার করে প্রথমে এদের প্রতিটি প্রভুর মানসিক অবস্থার খোঁজ নিতে লাগলেন। একটু চাপ দিতেই

অন্তঃপুরে বসেই মাহামের কাছে সমস্ত হিন্দুস্তানের খবর চলে এল। এমন কি খানসাহেবের মহলের সংবাদ পর্যন্ত।

এই সংবাদ যোগাড় করেই তিনি হিসাব করতে বসলেন, কে কে খানসাহেবের বিরুদ্ধে? তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে অভিযোগগুলি সংগ্রহ করতে লাগলেন। অনেক নতুন ধরণের অভিযোগ তাঁর হাতে এল, যেগুলি প্রকাশ করলে খানসাহেবের আর মাথা তোলার উপায় থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা করলেন না। শুধু হামিদাবানুর সামনে উপস্থিত করে, তাকে উত্তেজিত করে তুললেন।

হামিদাবানু শুনেই বললেন—এতবড় নিমকহারাম এই বেসরম আদমি! এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ তাঁর শরীরে নেই!

মাহাম তাড়াতাড়ি হামিদাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন—বহিন, অস্থির হবেন না। মনে রাখবেন, তাঁরাও দলে খুব কম নয়। ঘুণাক্ষরেও আমাদের জানতে দিলে হবে না যে আমরা কিছু করছি। তাহলে তাঁরা চালাক হয়ে যাবে, আর ষড়যন্ত্র ধরা পড়বে না।

বৈরাম খান হয়তো কিছু কারচুপি করছিলেন, পুত্রের জন্যে কিছু করা হয়তো বিচিত্র নয়। হাতে এত দৌলত পেলে কারই বা মাথা ঠিক থাকে? তাছাড়া পরে পুত্রের ভবিষ্যতের জন্যেও হয়তো কিছু চিন্তা করছিলেন। রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে অনেক বেয়াদবকে শায়েস্তা করতে হয়, লোক তো দরবারে কম নয়? পরে তারা যে শত্রু হয়ে সুযোগ বুঝে ছোবল দেবে, এতে আর বিচিত্র কি? সেইজন্যে এরাই হয়েছিলেন খানসাহেবের শত্রু, এবং তার সংখ্যাও খুব কম নয়।

মাহাম চেয়েছিলেন খানসাহেবের অপসারণ! একটি রাজ্য এই লোকটিকেই সরাতে পারলেই হাতে আসে। এখানে ছলনাময়ী মাহামের স্বার্থটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাই তিনি খানসাহেবের দোষগুলি তুলে ধরে দু'মুখী কাজ করতে লাগলেন।

কেউ যদি তখন জানতো মাহামের মনের আসল ইচ্ছা। জানলে অবশ্য শিহরিত হত কিন্তু তখন জানবার কোন উপায়ই ছিল না। সকলে জানলো, বাদশাহের রাজ্য নিরাপদ করবার জন্যেই ধাত্রীমায়ের এই চেষ্টা। আর রাজ্য সুশৃঙ্খলার মধ্যে এনে কর্মচারীদের সুখসুবিধা দেখবার জন্যেই এই চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কথা শুনে অধস্তন কর্মচারীরা আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলো। খানসাহেবের কর্তৃত্বাধীনে থেকে বেতন বৃদ্ধির পরিবর্তে শুধু নির্যাতনই উপহার মেলে। সে কর্তৃত্বের যত তাড়াতাড়ি অবসান হয়, ততই মঙ্গল।

মাহাম ধীরে ধীরে রক্ষীদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুললেন। রক্ষীরা একদিন সমস্ত আদেশ অমান্য করলো। খানসাহেব ছুটে গিয়ে কয়েকটিকে শায়েস্তা করলেন। কটিকে উলঙ্গ করে বেত মারলেন, কটির চোখ উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে অন্ধ করে দিলেন। কটিকে গাছের ওপর ঝুলিয়ে নিচে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। প্রাসাদের মধ্যে সে এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হল।

অন্যান্য রাজন্যরা এই আচরণে আরো ক্ষিপ্ত হলেন।

মাহাম আনাঘা মনে মনে হাসলেন।

বাঁদীদের মধ্যেও এমনি আদেশ অমান্যের মন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে একজন সাহসিনী সলিমার পুত্র আব্দুর রহিমকে ধাক্কা দিয়ে পাথরের ওপর ফেলে দিল। আব্দুর রহিমের মাথা ফেটে শোনিত গড়াতে লাগলো। সলিমা তাই দেখে আছড়ে পড়লেন মাটিতে। হাকিম এল, দাওয়াই দিল। হয়তো আরোগ্য হয়ে যাবে কিন্তু খানসাহেব সেই বাঁদীর শাস্তি কবুল করলেন, প্রকাশ্যে বেইজ্জতের হুকুম।

বৈরাম খান তখনও বুঝতে পারছিলেন না, কে এদের পিছনে থেকে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলেছে? তাঁর যে রাজত্বের কাল অন্তিম-

মুহূর্তে এসে পৌঁছেচে, সে বোধশক্তিও তখন তাঁর হয় নি। তিনি তখনও আগের মেজাজেই কাল কাটাচ্ছেন।

অথচ দিল্লীর প্রাসাদের চতুর্দিকে ক'দিনের মধ্যে যেন হুলুস্থুল লেগে গেল। অন্তঃপুরে বিশৃঙ্খলা, নিজামতে অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কার্যে শৈথিল্য, খানসাহেবের ঔদ্ধত্যে আমীর ওমরাহরা ক্ষিপ্ত—সব কেমন যেন কদিনের মধ্যে শুরু হল।

খানসাহেব এদিকে শায়েস্তা করেন, অন্যদিকে আগুন জ্বলে ওঠে। আবার সেদিকের আগুন নির্বাপিত করেন, অন্যদিকে আবার শুরু হয়। তারপর দেখা গেল চতুর্দিকে আগুন লেগে গেছে।

অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ।

হামিদার কাছে শুধু আবেদন। প্রাসাদের মধ্যে কলবর উঠলো, আমরা বাদশাহের দরবার চাই। তার কর্তৃত্ব চাই।

হামিদা মাহাম আনাঘার দিকে তাকালেন। মাহাম আনাঘা নিঃশব্দে হামিদাকে শান্ত হতে বললেন।

এমন অবস্থা হল, দফতরের কর্মচারীরা বেগম মহিষীর আদেশ পালন করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হল।

মাহাম হামিদাকে ভার গ্রহণ করতে বললেন। চিকের আড়ালে চললো রাজকার্য। খানসাহেবের হাত থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল।

কিন্তু হামিদা যেন বুঝতে পারলেন সব। কার চক্রান্তে গতি পরিবর্তিত হল বুঝতে পেরে তিনি মনে মনে আহত হলেন। এত-দিনের অভিভাবক বৈরাম খানের এমনি দুরবস্থায় তাঁর মনের মধ্যে পীড়া উপস্থিত হল। অথচ মাহামকে স্পষ্ট কিছু বলতে পারলেন না। কারণ মাহামের চেয়ে বুদ্ধিতে যে তিনি অনেক দুর্বল, এই-কথা ভেবেই মনে মনে শঙ্কিত হলেন।

মাহাম যে কি চায়, তাই তিনি এখনও জানেন না। সে

আকবরের রাজত্ব নির্ঝঞ্ঝাট করবার জন্যে এত মেহনত করছে, তা তাঁর ঐ মুহূর্তে মনে হল না। তখন তাঁর মনে হল, খানসাহেব এই রমণীর চেয়ে অনেক সাধু। খানসাহেব যদি কোন চক্রান্ত করেন, তবে তা মেনে নিতেও অনুশোচনা জাগে না, কারণ তিনিই একদিন এই রাজ্য শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, আর আজ পর্যন্ত তা রক্ষা করেছেন অনেক ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে। তিনি যদি নিজের পুত্রের জন্যে এই রাজ্য হস্তগত করেন, তবু সান্ত্বনা মেলে কিন্তু মাহাম আনাঘা? তিনি কি জন্যে এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে রাজ্য কায়েম করতে চান?

তবে কি তাঁর নিজের ইচ্ছা হয়েছে হিন্দুস্তানের সিংহাসনে বসবার? এই ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে তাহলে বড় সাংঘাতিক সে ইচ্ছা! কিন্তু কেমন করে তিনি মাহাম আনাঘাকে পথ থেকে সরাবেন? সে শক্তি তাঁর কোথায়? এ সময় আকবর কাছে থাকলে ভাল হত! কিন্তু সে থাকলেই বা কি হত? সে কি রাজ্যের এই বিষময় অবস্থা বুঝতো? তাছাড়া তার মধ্যে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাই অগাধ, মায়ের কাছ থেকে ষড়যন্ত্রের কথা শুনে ধাত্রীমা মাহামকেও কিছু বলবে না, খানসাহেবকেও না। বরং পরিবর্তে বলবে—যে রাজ্য নিয়ে এত সমস্যা তা রক্ষার কোন আবশ্যকতা নেই। যে দৌলত শুধু বিপদে চালিত করে, সে দৌলত যত তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে ভাল লাঘব করে, ততই মঙ্গল।

ঐ এক পুত্র! কি যে স্বভাব নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে, বোঝা মুস্কিল।

হামিদা সমুদ্রের ওপর একখণ্ড তৃণের মত দিশেহারা হয়ে হঠাৎ নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দারুণ অসুখ। সংজ্ঞা থাকলো না।

রাজবৈদ্য ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

প্রাসাদের মধ্যে আবার কানাকানি চলতে লাগলো। খানসাহেব

নিশ্চয় এর মধ্যে কোন কলকাটি নেড়েছেন। না'হলে হঠাৎ সুস্থ মানুষ মহিষী কেন অসুস্থ হয়ে পড়লেন?

মাহাম আনাঘা এই অবসরে অবাধ স্বাধীনতা পেলেন। আরো ষড়যন্ত্র, আরো বিক্ষোভ, আরো ভয়ঙ্কর কিছু করে প্রাসাদের মানুষগুলিকে শানিয়ে তুললেন।

মাহাম চাইলেন, খানসাহেব যেন এই অবসরে পাতপাড়ি গুটিয়ে স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে মানে মানে সরে পড়েন। তার জন্যে তিনি অত্যাচারের মাত্রাও বর্দ্ধিত করলেন।

কিন্তু বৈরাম খান গেলেন না, তিনি যে খুব সহজে যাবেন, তার কোন ইঙ্গিতও ফুটে উঠলো না।

অগত্যা মাহামকে অন্য পন্থা নিতে হল।

এদিকে তখন হামিদার অসুখ ঘোরালো পথে ধাবিত হয়েছে।

মাহাম বুঝলেন, আকবরকে আসতে বলতে হয়। তাই নিজামত থেকে সরকারী পত্র যাবার আগেই তিনি নানান কথার ব্যঞ্জনে খতটি পূর্ণ করে আগ্রায় লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে লেখা ছিল, পুত্র। আমি আর এখানে থাকতে পাচ্ছি না, তুমি এখানে এলে আমি তোমার মুখ শেষবার দর্শন করে মক্কার পথে রওনা হব। তোমার মা যে কারণের জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমারও অবস্থা সেইরূপ।

পত্র চলে গেলে তিনি মুঘল অধীকৃত স্থানের শাসনকর্তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে খানসাহেবের নামে অভিযোগ পেশ করতে বললেন। খানসাহেব কোন লোকেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন না, সকলেই তাঁর অত্যাচারে জর্জরিত। একটু উৎসাহ পেতেই প্রত্যেক শাসনকর্তাদের কাছ থেকে লোক এসে প্রাসাদে অপেক্ষায় থাকলো। উদ্দেশ্য, বাদশাহ দিল্লীতে এলেই অভিযোগ পেশ করা হবে।

মায়ের অসুখ। বাদশাহ কি আর চুপ করে থাকতে পারেন? খত পৌঁছতে যা দেরী হয়েছিল।

মাহাম আনাঘার খতটি হাতে আসতে আসতেই সরকারী ফরমানটি এসে হাজির। আকবর আর দ্বিরুক্তি করলে না। কে সঙ্গে যাবে কে যাবে না, এ সব বিচার তার মাথায় থাকলো, অশ্বের ওপর উঠে বসলো। ছুটে এলেন পীরমহম্মদ, হুজুর একা যাওয়া নিরাপদ নয়, আমি সঙ্গে যাই। আকবর কোন কথা বললো না, পীরমহম্মদ কিছু দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে আকবরের সঙ্গী হলেন। অন্তঃপুর থেকে আর একজন এগিয়ে এল, আলিমন। সে বললো, মেহেরবানি করে সম্রাজ্ঞীর বেমারিতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন বাদশাহ। বেগমসাহেবা আমাকে বচপন থেকে বড় করে তুলেছেন, তার রোগশয্যায় আমি তাঁর পাশে না থাকলে এখানে থেকে আমি মরে যাবো।

আকবর একটু চিন্তা করে বললো—তোমার লেড়কা, তার কি অবস্থা হবে?

আলিমনের মুখের ওপর রক্ত ছলকে উঠলো, বললো—এখানে অনেক ধাত্রী আছে বাদশাহ, সে তাদের হেফাজতে থাকবে। এখন সেই ইবলিশকা বাচ্চার জান কোরবানী গেলেই আমি খুসী হব।

আকবর আর কোন কথা বললে না, আলিমনকে নিজের অশ্বে তুলে নিলে। তারপর যাত্রা শুরু হল। অশ্বের গতি হল প্রচণ্ড। তিনদিনের পথ একদিনে অতিক্রম করতে হবে, এমনি দ্রুততা তার অশ্বে জেগে উঠলো। সঙ্গে পীরমম্মদ ও দেহরক্ষীরা সমতা রক্ষা করতে লাগলো।

শুধু আধম যাওয়ার জন্যে কোন আগ্রহ দেখালো না। সে তখন খাসকক্ষেই মশগুল। সে নতুন খোয়াবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে

খানদানী আওরতের স্পর্শে নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ আকবরের বেগম রুকমি তখন আধমের সোহাগের ইন্তেজারে আবদ্ধ।

আকবরের বিনা অনুমতিতে এই ব্যবস্থা হয়নি, বাদশাহের সমর্থনেই দুই রমণীপুরুষ উভয় উভয়ের সঙ্গে মিলে গেছে।

হামিদাবানু ও মাহামের আগ্রা পরিত্যাগের পর আরো অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আকবর আলিমনকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। সেই নসীবহারা কন্যাকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে না দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে এসেছে আপন শয্যায়।

অবশ্য এর পূর্বে আলিমন একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

মাহাম বলেছিলেন, আলিমন মাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়ে সন্তানের মুখ দেখে সব ভুলবে কিন্তু তা ভুল। মাহামের অনুমান, মেয়েরা মা হলেই সব দুঃখ ভুলে যায়। অবশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে এই প্রকৃতিই প্রধানত দেখা যায় কিন্তু আলিমনের মাতৃত্ব কোন্ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল? সেইটুকু ভুল করেছিলেন বলে মাহামের অনুমান ব্যর্থ হয়েছিল।

আলিমন অবশ্য মা হয়েছিল কিন্তু সে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়নি। অতর্কিতে যে অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছিল সে অধিকার তাকে খুশি না করে ঘৃণাই দিয়েছিল। সেই ঘৃণাই তার পুত্রের ওপর বর্তেছিল। নিজের গর্ভে সৃজিত বলে কোন অধিক মায়া তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি।

তাই হামিদা প্রাসাদ ত্যাগ করলে সে একদিন আত্মহত্যার সুযোগ নেয়। অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা কৌশল ছিল!

খবরটা আকবরের কানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে মায়ের এই গলতি। মা এই আলিমনকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করে তার সঙ্গে শাদীর জন্যে

তৈরী করছিলেন হঠাৎ মায়ের নিজের ভুলে মেয়েটির জোয়ানি বরবাদ হয়ে গেছে। আজ সে ফরিদের বাচ্চা কোলে ঝুটি মাতৃত্ব নিয়ে বদ্ধকক্ষের বিষাক্ত আবহাওয়ায় বসে হাহুতাশ করছে।

তাও বুঝি তার সহ্যের অতীত হয়েছে। এখন আত্মহত্যা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইছে।

আকবর আর বিলম্ব করলো না, আলিমনের কাছে ছুটলো।

আলিমন নিজের কক্ষেই ছিল। আকবর গিয়ে কক্ষের মাঝে দাঁড়ালো। আজ আলিমন সেজেছে অপরূপ সাজে। বাদশাহী দৌলতের হাজারো চকমকি তার কমনীয় দেহের থরে থরে সাজানো। নতুন এক মসলিসের বসন দিয়ে রক্তাভ দেহের সুকুমার তনু আবোরিত করেছে। হীরা, চুনি, পান্নার অলঙ্কারে দেহের সুষমা আরো খোলতাই। আরো মধুর, মুখের লাবণ্য ঢল ঢল আদলটি। ঠোঁটদুটি যেন কত তৃষ্ণার ব্যাকুলতায় শিহরিত। আঁখির মাঝে কালো দুটি তারায় কত কামনার আর্তি। বক্ষের যৌবনসীমায় কত সুখের সমুদ্র উচ্ছ্বাস ঢেউ সৃষ্টি করে ফুলে ফুলে উঠছে।

এই রত্নকে বেসরম ফরিদ শয়তানের পাশবিকতা দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে। না, তার কোন মূল্য নেই। সেই একটি মুহূর্তের পাপে এই রত্ন ধূলার স্বর্গে অবহেলিত হতে পারে না।

সে তার মায়ের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে। আলিমনকে বেশক সেই সুখসান্নিধ্য দেবে, যাতে সে বাঁচতে পারে। বাঁচবার সাধ তার আরো দীর্ঘ হয়। কামনা বাসনা পূরণ হলে নিশ্চয় আলিমন অতীত দুঃখ ভুলবে কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়লো, শিবালীকেও তো সে এমনি সম্মান দিতে চেয়েছিল! তবে সান্ত্বনা, শিবালীর মত অন্য মেয়ে নয়। আলিমন নিশ্চয় তার আবেদন নাকচ করবে না।

তবু ভয় থাকলো। ভয়ে ভয়েই সে জিজ্ঞেস করলো—লেড়কী,

আমি যদি তোমায় সুখের ইন্তেজারে সৌভাগ্য দান করি, তাহলে কি তুমি তোমার মৃত্যু রোধ করবে ?

আলিমন এই চাইছিল। আলিমন সেই জাতের রমণী, যে আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করতে জানে। একদিন এই রমণীই বেগম মহিষীর মুখের ওপর থুতু ছিটিয়ে দিয়েছিল। তবু তার প্রতিহিংসা দেহের মধ্যে ধকধক আগুনের মত জ্বলছিল। সে চেয়েছিল আকবর তাকে সোহাগ দান করুক। আর সেইজন্যে সে বেগমসাহেবা চলে যাবার পর আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। আত্মহত্যার কথা শুনলে বাদশাহ চমকিত হবে, আর সে তখন মায়ের অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাইবে।

আলিমনের মনোস্কামনা পূর্ণ হল।

তবু একটু ভনিতার দরকার, না হলে বাদশাহের বুঝতে পারার সম্ভাবনা।

তাই আলিমন বললো—সে হয় না জাঁহাপনা। তাছাড়া বেগম মহিষী জানলে গোসা করবেন।

হঠাৎ আকবর ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলো—খাঁমোশ, বেশক আমি বাচ্চা লেড়কা নয়। আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। মা আমার বচপনের হুকুমদারী ছিলেন, আজ আমি মরদ, আমি বাদশাহ। আমি কারো জুলুম মানতে চাই না। তুমি রাজী আছো কিনা বলো!

আলিমন অগত্যা মাথা নত করলো। তারপর সলজ্জভঙ্গিতে বললো—বাদশাহের পেয়ার কে চায় না জাঁহাপনা? সে সৌভাগ্য যদি আমার হয়, তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আর মরতে চাইবে না তো!

আলিমন নিরুত্তরে মাথা নাড়লো।

তারপর আকবর হারিয়ে গেল আলিমনের উত্তপ্ত সুখসান্নিধ্যে। নিজে কিছু নিল, আলিমনকে কিছু দিল। সোহাগের সুখসান্নিধ্যে

আলিমন জানতে পারলো, আকবর যদি তাকে বেগম করতে পেত, তাহলে সবচেয়ে সে খুশি হত। কিন্তু নসীবের ভেল্কিবাজী। আর সবই ভবিতব্য।

আলিমন কি তখন বেগম হবার সাধও মনে পোষণ করছিল না? সে কথা পরে আলোচ্য।

তখন শুধু দিন ও রাত্রি। আর আলিমন ও আকবর। তুটি তৃষিত প্রাণের কামনা বাসনা বুঝি সমুদ্রের অসীম উত্তালতা নিয়ে ছাপাছাপি। তার বুঝি শেষ নেই। নেই কোন ক্লান্তি।

আলিমন পেয়েছে তার ঈপ্সিত পুরুষকে। তার যুবতী দেহের কানায় কানায় আজ ভাদ্রের জলোচ্ছ্বাস। হোক এ আদিম প্রবৃত্তি তবু এরই মাঝে যে আছে সমস্ত সুখের আর্তি। এর জন্যেই তো পুরুষ নারীকে চায়, আর নারী পুরুষকে চায়।

ফরিদ যে স্বাদ দেহে পুরে দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল বিষ। অমৃত যে এ স্বাদের মধ্যে আছে, তার খোঁজ বাদশাহের নিবিড় সান্নিধ্যে মিললো।

আকবর তখন কিছুই ভাবছে না। কটি মাসের মধ্যে সে বহু রমণীকে ভোগ করেছে, বহু রমণীর অনিচ্ছার বন্ধনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে তুলে নিয়েছে তাদের নিজের অঙ্কে। তবু যেন সম্ভোগের স্পৃহার ক্লান্তি নেই। আলিমন নিজে থেকে দিয়েছে, সে দেওয়ার মধ্যে বুঝি অন্য এক আকর্ষণের মোহ আছে। কোন বলপ্রয়োগ নেই, নেই কোন দস্যুতা। রাত্রের মোহিনী মায়ায় চন্দ্রের সুষমা অবলোকন করতে করতে তুজনের মধ্যে মোহ জেগে ওঠে। বিহঙ্গের মত তারা কত সুখের কথা বলে, তারপর সব স্তব্ধ হয়ে যায়।

রাত্রি নেমে আসে ধীরে ধীরে গভীরে। আলিমন নিজেই একটি একটি করে বসন মোচন করে। শুধু রাত্রি নয়, দিনের মুহূর্তগুলিও তারা নষ্ট করে না।

ঠিক এমনি সময় রুকমি গবাক্ষের জাফরি দিয়ে বাইরের আসমানের দিকে উঁকি মারে। তার মনেও যেন কি এক ইসারা জেগে উঠেছে। আজ তার নারীজীবন ব্যর্থ। আওরতের সবচেয়ে বড় সম্মান সে পেয়েছে কিন্তু পেয়ে লাভ কি হয়েছে? শাদীর কর্তব্য বাদশাহ পালন করেন নি! তার কুমারী দেহ আজও অটুট। কেউ তাকে চিহ্নিত করে নি। সেইজন্যে বুকে জ্বালা অসীম। দেহের প্রতিটি অংশে কি যেন এক অসীম শূন্যতা ঘুরে ঘুরে ফিরছে। বাদশাহের বেগম হবে বলে কত আশা ছিল কিন্তু বেগম হয়ে আরামে থাকবার জন্যেই কি বাসনা ছিল? কোন আওরত শুধু কি ঐ খুশক আরামই চায়?

বাদশাহের পৌরুষই যে কাম্য ছিল।

না, আর চিন্তা করে কি হবে? যা হবার সে তো হয়ে গেছে। এখন বর্তমানে কর্তব্য কি? তাই রুকমি অন্য কিছু ভাবছে।

আধম খান কদিন ধরে জেনানা মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কক্ষের কাছে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে। রুকমি জাফরীর ফুটোয় চোখ দিয়ে আধমের দিকে লক্ষ্য করেছে। কিছু ভুলে গেছে কিম্বা কি মনে পড়ছে না এমনি ধারা মুখ করে আধম খান দাঁড়িয়ে থাকলে আসলে তার দৃষ্টি অন্য অর্থে ঘোরাফেরা করছে। পুরুষের চোখের দৃষ্টির অর্থ সব আওরতের মনেই ধরা পড়ে, যতই পুরুষ হাজার কৌশল অবলম্বন করুক।

কিন্তু লোকটির দুঃসাহস তো কম নয়! সে বাদশাহের বেগমকে লালসার জমিনে নামাতে চায়? বাদশাহের ক্ষমতা কি সে ভুলে গেছে?

কিন্তু আস্ফালনই বৃথা। সকলেই জানে বাদশাহের বেগমের বর্তমান অবস্থা কি? তাই হয়তো সুযোগ বুঝে আধম খান হাত বাড়িয়েছে। তবু কি আধম খানের ঔদ্ধত্য নয়? কিন্তু কে সেই

ঔদ্ধত্যের বিচার করবে? হয়তো বাদশাহের কাছে খবর গেলে তার সুরাহা হবে না।

তবু রুকমি অনেক ভেবেছিল। ভাবনার গভীরে নেমে গিয়ে অনেক অশ্রুপাত সে করেছিল কিন্তু কি সে পেল? তার নারী জীবন আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। তার কামনা বাসনা শুষ্ক হয়ে শুধু অবহেলাই জীবনে এসেছে। পেয়েছে অবশ্য বেগমের খাসকক্ষ, পরিচর্যার জন্য অনেকগুলি বাঁদী, ভাল খানা আসে রসুই ঘর থেকে। মহলের লোকেরা তাকে বেগম বলে সম্বোধন করে কিন্তু কি লাভ এতে? এই সম্মানের কি মোহ আছে? আজ সেই সম্মান যে শুধু ব্যঙ্গ বলেই মনে হয়।

তাই সে হঠাৎ অনেক অশ্রু ত্যাগ করে মত পরিবর্তন করলো। সে বাদশাহকে শিক্ষা দেবে। তাঁর অবহেলার চরমতম শাস্তি সে প্রয়োগ করবে। বাদশাহ কি তাঁর শাদী করা বেগমের এই আচরণে মর্মাহত হবেন না? অন্তত সম্মানের জন্যেও হয়তো হতে পারেন। এই অনুমান করেই একদিন রুকমি নিজে এগিয়ে গেল আধম খানের কাছে।

আধম খান চরিত্রবান পুরুষ নন। বরং চারিত্রিক শুচিতা তার কিছুই ছিল না। বাদশাহকে আওরত সংগ্রহ করে দিতে দিতে তারও অনেক উপরি পাওনা হত। জাত বিচার কিছু ছিল না। আকবর আলিমনকে গ্রহণ করতে তার হঠাৎ বড় নেশা জেগে ওঠে। অবশ্য এ ঔদ্ধত্য বাদশাহ নিজেই জাগিয়েছিল।

আর আধম খানও জানতো, বাদশাহ যার প্রতি আকাঙ্ক্ষিত নয়, তাকে সে কোনদিনও চাইবে না। তাছাড়া আধমের হঠাৎ রুকমির ওপর নেশা জাগলো তার কারণ অসাধ্য সাধন করতে। বাদশাহের বেগমকে গ্রহণ করার পিছনে একটা দারুণ তৃপ্তিবোধ আছে, আর যখন বেগম এখনও স্পর্শহীনা রয়েছে।

তবু আধম আর একটু দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করলো। বাদশাহের

কাছে গিয়ে বর্তমান ইচ্ছাটি প্রকাশ করলো। কারণ মাহামের কথা ও ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আধম এই কাজ করলো।

আকবর শুনে চমকে উঠলো। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে আধমের গালে চপেটাঘাত করতে গেল কিন্তু একটা কথা মনে পড়তে নিজেকে সংবরণ করে নিল। মায়ের দেওয়া সব উপহারই সে ধীরে ধীরে এমনি পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে শেষ করেছে। বেগম কে? শাদী কে করেছে? সে করেনি, তার প্রেতাত্মা শাদী করেছে। মায়ের আদেশ পালন করে যে সুবোধ বালকটি, সেই শাদী করেছে! সম্মুখে যে সে মাকে অপমান করতে পারে না, সেইজন্যেই সে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

সেই বেগম নামধারিণী রমণী আজ তার সমস্ত শান্তি হরণ করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় স্বীকার করে নিতে কিন্তু পরক্ষণে মনের মধ্যে জেগে ওঠে বিক্ষোভ। না কেন স্বীকার করবে? নিজের পৌরুষে কোথায় যেন আঘাত লাগে!

তবু সেদিন আধম অসম্ভব কথা বলতে তাই সে চমকে উঠেছিল। তারপর হঠাৎ সে হুকুম দিয়ে বসলো—যাও সেই অবহেলিতাকে তোমার কামনার আগুনে প্রাণ দান কর!

আধম চলে গেলে আকবর হঠাৎ শূন্য কক্ষ কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলো। এ বেশ ভালই হল। আলিমন মায়ের শাস্তি পেয়ে আত্মহত্যা করতে এগিয়ে গিয়েছিল, তাকে গ্রহণ করে মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করলাম। এদিকে যে মেয়েটিকে মা রাজ্যের সবচেয়ে বড় সম্মান দান করলেন, তার আজ পরিণাম কি? মা শুনলে যে অবস্থায় পরিণত হবেন, তা এখন চিন্তার বহির্ভূত।

আকবর বোধহয় মায়ের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্যে আধমের এমনি অসম্ভব প্রত্যাশা হঠাৎ মেনে নিল। তাছাড়া রুকমির ওপর কোন মায়াই তার জাগেনি বরং ঘৃণা জেগেছিল। রুকমির চাহিদা ছিল প্রকট। শাদীর রাত্রের কাহিনী কখনও আকবর

বিস্মৃত হয়নি। রুকমির সেই নির্লজ্জ চাহিদা একটা সামান্য কসবীর মত আজও মনে হয়।

যেটুকু সঙ্কোচ আকবরের ছিল, তা হল বেগম বলে। অন্তত বেগমের পদমর্যাদার জন্যে তাকে ভাবতে হয়েছিল। তার জন্যে একটু চিন্তা কিন্তু সে চিন্তাও পরে সমুদ্রের জলে ধুয়ে যায়, জেগে ওঠে তীব্র প্রতিহিংসা।

তারপর সব ভুলে যায় আকবর। আলিমন তাকে সব ভুলিয়ে দেয়। আলিমন সব শুনে বলে, অন্যায় আপনি কি করেছেন? যা বলপূর্বক গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, আপনি ক্ষমতাবান একজন বাদশাহ হয়ে সজ্ঞানে তা গ্রহণ করবেন কেমন করে? আর যা আপনার নয়, তার ভালমন্দের দায়িত্বও আপনার নয়।

শুধু কৌশল। আলিমনের মনেও হামিদবানুর ওপর প্রতিহিংসা! আলিমন নিজের বরবাদী জীবনের কথা কখনও ভোলেনি। তাই বাদশাহ পরিবারের যত অনিষ্ট হয়, সেইদিকে তার লক্ষ্য। বাদশাহের বেগমের এমনি পরিণতিতে সে এত খুশি হল যে, আকবর তাকে যখন প্রথম গ্রহণ করতে চেয়েছিল তখনও এত খুশি হয়নি।

এমনি ভাবে দিনগুলি বিদায় নিচ্ছিল। হঠাৎ দিল্লী দুর্গ থেকে মাহাম ও রাজসরকারের ফরমান এল। রাজমহিষীর সাংঘাতিক পীড়া।

মায়ের পীড়া শুনে আকবর আর একটুও বিলম্ব করলো না। কেমন যেন মনের তল থেকে কান্না উঠে এল। পিতা নেই, আত্মীয়স্বজন থেকেও নেই, নেই কোন আপন পরিজন বন্ধু বান্ধব— যার কাছে নিজেকে মেলে দিতে পারবে। একমাত্র মা আছে। যার কাছে সে বিরাট অভিমান করতেও পারবে, নিজের বালকোচিত আচরণ। যার কাছে হাজার দোষ করলেও যে তিনি ক্ষমা না করে থাকতে পারবেন না। আজ তার যত বুদ্ধি বিবেক শিক্ষা-দীক্ষা স্বভাব-চরিত্র সবই যে মায়েরই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

সেই মা আজ পীড়িতা।

আকবর সব ছেড়ে দিয়ে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বসলো।

কিন্তু আলিমন বাদশাহের এই আচরণে অপমানিতা হল। বাদশাহ মায়ের পীড়ার কথা শুনে তার কথা ভুলে গেল দেখে প্রথমে সে কি করবে ভেবে পেল না, তারপর হঠাৎ তার বাসনা জাগলো বাদশাহের সঙ্গে সে দিল্লীর প্রাসাদে যাবে। দিল্লীর প্রাসাদে উপস্থিত হলে দুটি উপকার তার হবে, একটি সকলে দেখবে তার নতুন ভূমিকা। সেখানে মাহাম আনাঘা আছে, মাহাম বিবি, তার অবস্থান্তরে চমকিত হবেন। আর দ্বিতীয় উপকার, হামিদা বানু আরোগ্য লাভ করে দেখবেন, তাঁরই পালিতা কন্যা আজ তাঁর অন্যায়ের প্রতিশোধ কেমন করে নিয়েছে। হারজিতের খেলায় কার জয় এবার মুখে প্রকাশ করতে হবে না, মনের নিভৃতেই গুঞ্জরিত হবে তার আসল অভিব্যক্তি।

সেইজন্যে আলিমন আকবরের অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো। কম সৌভাগ্য নয়! বাদশাহের বুকের সান্নিধ্যে তার দেহের স্পর্শ নিয়ে একদিন এই অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে রাজপ্রাসাদে। দিল্লীর রাজ-প্রাসাদের অগণিত লোকেরা দেখবে, দেখে তারা কম আশ্চর্য্য হবে? একদিন যে মেয়েটি বেগমসাহেবার খতরনাক হয়ে হারিয়েছিল নারীত্ব। আজ সে বাদশাহের সোহাগিনী হয়ে দিল্লীতে ফিরলো?

আকবর কি এই সম্বন্ধে তখন কিছু ভাবছিল?

না, মনে হয় সে সেই সব কিছু ভাবছিল না। সে তখন অশ্বটিকে নিজের একতিয়ারে রাখবার চেষ্ট করছিল। আর মাঝে মাঝে আসমানের পশ্চিমকোণে ভয়ার্তস্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। সেখানে তখন কালো মেঘের জমাট পাহাড় আস্তে আস্তে জমে উঠছে। ঝড়ের পুর্বলক্ষণও বাতাসে সঙ্কেত সৃষ্টি করেছে। বৃক্ষের পত্র-গুচ্ছের ওপর হঠাৎ অস্বাভাবিক দোলা শুরু হয়েছে।

আকবরের অশ্বে তখন দারুণ গতি। সে গতি আরও বৃদ্ধি

করতে করতে পীরমহম্মদকে চীৎকার করে বললো—হুশিয়ার, গতি মন্থর করলে চলবে না, আমাদের এগোতে হবেই।

২৯

পথিমধ্যে বিপরীত দিক থেকে আগত এক শাহীদূত আকবরের গতিরোধ করে আর একখানি পত্র দিয়েছিল, সেই পত্রখানি প্রেরিত হয়েছে খানসাহেবের কাছ থেকে। তাতে তিনি লিখেছেন—আমি মক্কা যেতে বাসনা মনে শোষণ করি, সুতরাং অবিলম্বে তোমার রাজ্য তুমি এসে গ্রহণ করলে খুশি হব।

দিল্লীর প্রবেশের আগে পর পর তিনখানি পত্র আকবরের হস্তগত হয়েছিল। মাহাম বিবি ও খানসাহেবের পত্র দুখানির মর্মার্থ উপলব্ধি করে যারপরনাই সে চিন্তিত হল। একটা যেন কিছু গণ্ডগোল চলেছে, তা এই দূর থেকে অনুমান করা যায়। মাহাম বিবি আরো লিখেছেন, খানসাহেবের এই চক্রান্তেই বেগম-বহিন অসুস্থ হয়েছেন। এও সম্ভব হতে পারে। রাজ্য হারাবার আশঙ্কা মনে জাগলে মায়ের পীড়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় শরীর নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মাহাম ধাত্রীমাকে যেন কেমন ধূর্ত চরিত্রের মনে হয়! তিনি আসতেই যত গোলমাল শুরু হয়েছে। এতদিন আগ্রাতে থেকে এক বিপ্লব ঘটিয়ে গেছেন, দিল্লীতে গিয়ে আর ভূমিকা নিয়েছেন।

তবে খানসাহেবের আচরণও খুব বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়। তাঁর অনেক গোপন চক্রান্ত আগ্রাতে বসেই সে প্রাপ্ত হয়েছে। খানসাহেব ভুলে গেছেন বাদশাহ সব। বাদশাহের পাঞ্জা তাঁর কাছে আছে বলে তিনি রাজ্য পরিচালনা করছেন। পাঞ্জা কেড়ে নিলে তখন ক্ষমতা কোথায় থাকবে?

কিন্তু রাজ্যের এই বিরাট সমস্যা মাথায় নিতে মন চায় না। যুদ্ধ করতে, বীরত্ব প্রকাশ করতে কোন কষ্ট নেই যত কষ্ট এই রাজ্য পরিচালনা করতে। একটা বিরাট সংসারের সমস্ত ভার হাতে নিতে অনেক বুদ্ধির দরকার, সে বুদ্ধি তার এখন হয় নি। তাছাড়া উৎসাহও নেই।

খানসাহেব একদিক দিয়ে তার অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। এতদিন ধরে রাজা ও রাজত্ব পরিচালনা করে বিশ্বস্ততার কাজ করেছেন।

এবার মনে হচ্ছে, কোন পরিবর্তিন হবে।

তুটি সমস্যা, মায়ের পীড়া, রাজ্যময় বিড়ম্বনা এই তুটি চিন্তা মাথায় নিয়ে আকবর একদিন দিল্লীর প্রাসাদে প্রবেশ করলো।

মাহাম তৈরীই ছিলেন। প্রথমেই তিনি বাদশাহকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সঙ্গে আলিমনকে দেখেও মাহাম চমকালেন না। যেন এমনি একটি সম্ভাবনা তার অনুমানে ছিল এই কথা ভেবে স্মিতহাস্যে আলিমনকেও গ্রহণ করলেন।

আকবর মায়ের কক্ষে যেতে চাইলে মাহাম তাকে নিয়ে বেগম সাহেবের কক্ষে গেলেন।

হামিদাবানু তখন অনেকটা সুস্থ হয়েছিলেন। সেদিনই প্রত্যুষে তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। দেহের উত্তাপ মন্দীভূত।

আকবর কাছে যেতে হামিদা পুত্রকে হাতের নাগালে টেনে নিলেন। আকবর মায়ের শয্যার পাশে সরে গেল। হামিদার চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়লো, কোন কথা বললেন না। শুধু পুত্রের গায়ে নিজের শীর্ণহাতের স্পর্শ দান করতে লাগলেন।

এ সময়ে বেগম সাহেবার কক্ষে শুধু কটি শুশ্রূষাকারিনী ও মাহাম ছিলেন। মাহাম একসময় আকবরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর একটি নিরালা কক্ষে নিয়ে গিয়ে বললেন—বেটা আমার পত্রের নিশ্চয় মর্মোদ্ধার করতে পেরেছ? আমি

আর তোমার সংসারে সম্মান হারিয়ে থাকতে চাই না, তুমি যখন এসেছ, বেগমবহিন সুস্থ হয়ে উঠলে আমার মক্কাযাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে দাও।

আকবরের চরিত্রের সবচেয়ে বড় একটা দুর্বলতা ছিল, সম্মুখে সে কাউকে কিছু কথা বলতে পারতো না। তাছাড়া সম্মানীয় ও বয়োজ্যেষ্ঠ হলে তো নয়ই! এখানেও তাই হল। ধাত্রীমার ওপর সে বিরক্ত হল কিন্তু মুখের ভাবে তার লক্ষণ প্রকাশ হল না। বরং মাহামের মক্কাযাত্রার বাসনা শুনে হঠাৎ সে বেদনাহত হয়ে বললো—এরূপ মতলব কেন তোমার আম্মি?

ছলনার আশ্রয়ে নারী চিরকাল জয়লাভ করেছে। আর মাহাম অনেক বেশী বুদ্ধিসম্পন্না। তিনি হঠাৎ দু'চোখে শ্রাবনের ধারা নিয়ে বললেন—যেখানে কোন স্বাধীনতা নেই, যেখানে প্রাণরক্ষার জন্যে মেহনত করতে হয়, সেই দুর্বহ পরিবেশে থাকতে কার সাধ হয়? দেখছো না, তোমার মায়ের দেহ কি হয়েছে? তিনি তো ভেবে ভেবেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন? তার পুত্রের সিংহাসন যাচ্ছে, মুঘল বংশের ধ্বংস অবশ্যাম্ভাবী, সম্রাট বাবর শাহের অবশিষ্ট বৃদ্ধ বেগমরা, সম্রাট হুমায়ুন শাহের অগুণতি মেয়েলোক এদের শেষপর্যন্ত কি হাল হবে ভেবে ভেবে তিনি দিশেহারা। আজ আমারও সেই অবস্থা হয়েছে। এ পরিবারের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ না থাক্ কিন্তু আত্মিক সম্বন্ধ তো আছে! তুমি আমার সেই জালাল, আজ হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসেছ, একি আমার কম গর্ব?

এসব কথা শুনতে তখন সত্যিই আকবরের উৎসাহ ছিল না. তবু কি করবে উপায় নেই ভেবে বাধ্য হয়ে শুনছিল কিন্তু মনে মনে সে দারুণ ছটফট করছিল। মাহাম থামলে এবার সে বললো—ব্যাপার কি হয়েছে তাই তো আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছি না আম্মি?

মাহাম চোখ মুছে বললেন—আমি সে কথা মুখে আনতে পারবো না বেটা! তুমি যখন এসেছ, অন্তঃপুরে আরো অনেকেই আছেন তারাই বললেন। শুধু অন্তঃপুরে কেন বহির্বিভাগেও রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ জেগে উঠেছে।

মাহাম চলে গেলে আকবর খাসকক্ষে গেল কিন্তু অনতিবিলম্বে বান্দা এসে আকবরকে জানালো—হুজুর, খানখানান সাহেবের নয়া-বিবি সলিমা বেগম আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী!

সঙ্গে সঙ্গে আকবরের শিরদাঁড়াটি সোজা হয়ে উঠলো। কি এক অসম্ভব কথা শুনেছে এমনি বিষয় মুখের ওপর ধরে আবার বান্দাকে জিজ্ঞেস করলো—কে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী?

হুজুর, খানখানান সাহেবের বিবি সলিমা মালকিন।

মনে পড়লো এই রমণীটিকে আকবরের। যৌবনের প্রথম উন্মেষ এই আওরত হতেই তার জেগেছিল। এই আওরত একদিন তাকে 'বাচ্চা মর্দানা' বলে তাচ্ছিল্য করেছিল। আজ সে সৌভাগ্যবান আতালিক খানসাহেবের পেয়ারী বেগম। একটি লেড়কার মা হয়ে সে আরো গর্বিতা।

কিন্তু আজ সে তার দর্শনপ্রার্থী কেন? সেই সলিমাকে সে একবারই সে দেখেছিল। তারপর তার শাদী হয়ে গেছে। খান-সাহেবের সোহাগে নতুন মেয়েমানুষ হয়েছে। নতুন নতুন উপাধি। আবার শেষে হয়েছে মা। তার ছেলের বয়স এখন প্রায় দুই থেকে আড়াই। প্রায় তিন বছরের ওপর তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই নেই।

আকবর আবার ভাবলো—সলিমা কি জন্যে তার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেছে? সে কি জানে না এখন বাদশাহের নতুন পরিচয়? তার কি কর্ণে আসেনি, আগ্রায় বাদশাহ কি রকম জীবন নির্বাহ করছেন? শুনেও যদি ভয় না থাকে তাহলে বলতে হবে বেপরোয়া।

হঠাৎ সলিমাকে দেখবার জন্যে আকবরের বাসনা উদগ্র হল। মনের মধ্যে সেই প্রথম উন্মেষের রঙ।

বান্দা তখনও হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে আকবর বললো—বিবিজীকে সেলাম দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম মসলিনের ওড়না ঢাকা রমণী এসে নিঃশব্দে কক্ষের মাঝে দাঁড়ালো। রমণীটির মুখটি খুব বিশেষ দেখা যায় না, ওড়নার আবরণী দিয়ে সবটুকু ঢাকা। তাছাড়া জমকালো পোষাক, দামী দামী অলঙ্কারে সমস্ত দেহটি কেমন যেন খোলতাই।

সেই একবার মাত্র দেখা। একদিন একটি বিশেষ ক্ষণে, তাও অনেকদিন আগে। আজ সবই বিস্মৃতি। আজ সলিমারও অনেক রকম ফের হয়েছে। আকবরও সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এখন সে আওরতকে বিশেষ চোখে দেখে। এখন যমুনার স্রোতে অনেক জল, সেখানে জোয়ারের উচ্ছ্বাসও কম নয়।

কিন্তু সে সলিমার আজ আর নাগাল পাওয়া মুস্কিল। সে এখন খানসাহেবের বেগম। পিতৃবন্ধু এই আতালিক খানসাহেব হাজার অপরাধ করলেও পিতার বিশ্বাসের দোস্ত, তাঁকে অবমাননার সাধ্য অন্তত আকবরের নেই, সুতরাং সলিমাও তার শ্রদ্ধার পাত্রী।

তাই সে ইচ্ছা না সত্বেও সেলাম পেশ করে বললো—হুকুম কর বেগমসাহেবা, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?

হঠাৎ সলিমাবেগম মুখের ঘেরাটোপ থেকে ওড়নার আবরণীটা মাথার ওপর তুলে দিল। ঝলকে উঠলো এক ঝলক বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ যেন গোলাপের বর্ণ মেখে মুখ তুললো।

আকবর চমকিত হল। শিহরিত হল। নিঃশব্দে একটি চোরা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে এল।

সলিমা বোধ হয় ইচ্ছে করেই বাদশাহকে পোড়াতে এসেছিল। কি তার তখন উদ্দেশ্য ছিল বোঝা মুস্কিল? নারী চিরকালই

রহস্যময়ী। তাদের মনের কথা বোঝা ঈশ্বরেরও বুঝি সাধ্য নেই।

অন্য কেউ হলে বর্তমান স্বভাবের বাদশাহ কখনও তাকে রেহাই দিত না। এমনি কত রাজকর্মচারীর বেগমকে লুটে নিয়ে এসে আগ্রার প্রাসাদে ভোগ করেছে। আজ বাদশাহের ইন্দ্রিয়ের কোন সংযম নেই। কিন্তু বৈরাম খানকে তখনও আকবর শ্রদ্ধা করতো। শ্রদ্ধার মধ্যেই ভয়ের সম্পর্ক।

সলিমা তখন হাসছিল। মুক্তার মত শুভ্র দাঁতগুলি মেলে তাম্বুল রঞ্জিত ঠোঁটটি দিয়ে চেপে ধরে হাসছিল। হাসতে হাসতে বললো—তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায় তো জাঁহাপনা? বহুৎ দিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। তাই প্রবৃত্তি দমন করতে পারলাম না, সরম না করে চলে এলাম। এখন কত বড় হয়েছ? সেই বাচ্চা মর্দানা আজ জোয়ান হয়ে উঠেছে। শুনলুম তুমি নাকি বহু আওরতের এখন মেহেবুব হয়েছ?

আবার সেই তাচ্ছিল্য, আবার সেই অবহেলা! সলিমা যেন এমনভাবে ছাড়া কথাই বলতে পারে না। আকবর ক্ষিপ্ত হল, ক্রুদ্ধভঙ্গিতে বললো—তুমি কি এই বলবার জন্যেই এসেছ বিবি?

সলিমা অপ্রতিভ হয়ে বললো—না না এজন্যে আসিনি!

তবে তোমার আবেদন পেশ কর, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।

সলিমা আকবরের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো—আমি খানসাহেবের জন্যে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি! তোমার আতালিক খানসাহেব এক নতুন মুসিবাদের চক্রান্তে ফেঁসে গেছেন। তাঁর নামে যে সব চক্রান্ত হচ্ছে তা ঝুট। তিনি এতদিন ধরে যে রাজ্য ও রাজত্ব নিজের ক্ষমতা দিয়ে রক্ষা করে আসছেন, তা তিনি কেন লুঠে নেবেন? কেউ না জানুক, আমি তাকে জানি, তিনি কোন দুষ্ট মতলব মনে পোষণ করেন না।

আকবর সলিমা থামলে একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ দিয়ে বললো—এই জন্যে কি বেগমসাহেবা এত জলদি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ? কিন্তু চাচাকে আমি তোমার চেয়ে যত বেশী করে জানি, তুমি তার একবর্ণ জানো না। এই তকলিফ না করলেই পারতে বিবি !

আঘাতে সলিমার গণ্ডদ্বয় রক্তিম হল কিন্তু তা সামলে নিয়ে বললো—বিচলিত হতাম না, যদি তুমি খানসাহেবের কদর বুঝতে ! তাছাড়া প্রাসাদের বহু ব্যক্তি আজ একত্র হয়ে খান সাহেবের উচ্ছেদ চায়। তুমি কি একা তাদের ইচ্ছাকে কোরবানী দিয়ে খান সাহেবের বেদনা বুঝবে ?

আকবর সংযত কণ্ঠে বললো—চাচা কি তোমাকে আমার কাছে সওয়াল করবার জন্যে পাঠিয়েছে ?

না, খানসাহেব অতো নীচ প্রকৃতির নয়। তিনি এই রাজ্য, এই বৈভব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চান ?

হঠাৎ আকবরের মনে পড়ে সলিমার একটি পুত্রসন্তান আছে। তাই সে বললো--তিনি যদি চলে যান তাহলে তোমার পুত্রের ভবিষ্যৎ কি হবে ?

সলিমা সঙ্গে সঙ্গে ভারাক্রান্তকণ্ঠে উত্তর দিল—পুত্র মুসাফিরের ঝুলি নিয়ে পথে পথে ঘুরবে, তবু পিতার যেখানে অবমাননা, সেখানে পুত্রের স্থানও নেই। পিতাকে তাচ্ছিল্য করে পুত্রকে যদি রাজসরকার কোন দয়া দেখায়, সে দয়া আবর্জনার তুল্য। মানুষ সম্মানের মধ্যে বাঁচতে আশা করে বাদশাহ, অসম্মানের মধ্যে নয় !

আকবর চুপ করে থাকলো, কোন উত্তর তার মুখে জোগালো না। সে এখনও কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না, আসলে তার রাজ্যের মধ্যে কি গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে ? তার মনে হচ্ছে, খানসাহেবের রাজত্বের অবসান হয়েছে, তাঁকে এবার সরে যেতেই হবে। কেউ যখন তাঁকে চায় না, তখন জোর করে তাঁর থাকাও তো

বিপদজ্জনক! তবু সে খানসাহেবের ওপর চিরকৃতজ্ঞ, এইজন্যে যে তিনি এতদিন তার সিংহাসন সমস্ত কিছু বিপদ থেকে রক্ষা করে এসেছেন। হয়তো খানসাহেবের বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ আছে। আমীর ওমরাহরা যত চক্রান্তের সংবাদ দেবে, তার মধ্যে কিছু যে সত্যি নয়, তা সে বিশ্বাস করবে না। তবু আতালিক সেই বৈরাম খানকে সে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে। তার কেশাগ্র যাতে কেউ স্পর্শ না করতে পারে তার মত সাবধানতা। কারণ, একদিন তিনি তার রাজ্য রক্ষা করেছে।

সলিমার দিকে তাকিয়ে বললো—তুমি যাও বিবি। আমি তোমায় কোন কথা দিতে পাচ্ছি না, তবে এইটুকু করবো, খানসাহেবের কেউ যাতে অসম্মান না করে তার মত সতর্কতা অবলম্বন।

সলিমা বাদশাকে সেলাম পেশ করে, ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করে বেরিয়ে গেল।

তারপর তিনদিন ধরে প্রাসাদের মধ্যে চললো এক দারুণ বিপ্লব।

আকবর দরবারে গিয়ে বসলো। তার সামনে এসে বড় বড় খেতাবধারী কর্মচারীরা সব অভিযোগ পেশ করতে লাগলো। কাবুলের শাসনকর্তার প্রতিনিধি এসে লিখিত এক অভিযোগ পেশ করলো। তার মধ্যে মারাত্মক সব চক্রান্তের নজীর। আকবর ওয়াকিয়ানবীশের দ্বারা সেই চক্রান্ত শুনে ক্ষুব্ধ হল কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করলো না। কয়েকটি ফৌজদার এসে তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ পেশ করলো। তারা জানতে চাইলো এর বিচার হবে কিনা! রাজস্ব আদায়কারী আমীল এসে জানালো, তার দ্বারা রাজস্বের হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। বহু ঘাটতি রাজকোষে হয়েছে, তার হিসাব দেবেন দেওয়ান খানসাহেব।

তারপর অত্যাচারের নানান নিদর্শন। একটি রমণী এসে বুকফাটা আর্তনাদ করে চীৎকারে হর্ম্যতলে আছড়ে পড়লো—হুজুর, এই অন্যায়ের বিচার চাই। আপনি হিন্দুস্থানের বাদশাহ, আপনি তার ন্যায়বিচার করবেন। আমার পুত্র রাজসরকারে গোলামী করতে এসে কি প্রাণ দিতে এসেছিল? কেন সে নির্মমভাবে প্রাণ দান করলো? অপরাধ করে থাকে, গুরুতর শাস্তি দিন। তাবলে কোন আইনে নেই তার প্রাণ নেওয়া হবে।

আকবর সেই ক্রন্দনমুখী রমণীকে শুধু জিজ্ঞাসা করলো—তোমার বেটা কি দোষ করেছিল রমণী?

চুরি। সামান্য চুরি করেছিল হুজুর।

চোরের শাস্তি যে প্রাণদণ্ড নয়, আকবর জানে। শুধু মীর বক্সীর কাছে বললো—ওকে বলে দিন এর বিচার হবে।

তিনদিনই দরবার কক্ষের একপাশে বৈরাম খান বসেছিলেন।

আকবর সিংহাসনে বসে অভিযোগ শুনছিল। মাঝে মাঝে সে আড়চোখে খানসাহেবের দিকে তাকাচ্ছিল কিন্তু কথা বলতে তার কেমন যেন লজ্জা করছিল। যা কিছু উত্তর দিচ্ছিল, তা খুব নিম্নস্বরে। তার মনে হচ্ছিল এ বুঝি অন্যায়। একদিন যার সমস্ত ক্ষমতা চতুর্দিকে মাথা তুলেছিল, আজ তাকেই সবাই সুযোগ বুঝে মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে। তিনি অন্যসময়ে হলে এই দরবার কক্ষ সোচ্চার করে যারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতেন, এমন কি সম্রাট আকবরকেও কোন মান্য করতেন না কিন্তু আজ বাতাস পরিবর্তিত হয়েছে। আজ যারা তাঁর অধীন ছিল, তারা আজ দলে ভারী হয়ে নানান অভিযোগ এনেছেন এবং অভিযোগগুলি খুবই মারাত্মক। তিনি ইচ্ছা করলে সরোষে প্রতিবাদ করতে পারতেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠ যে এতগুলি লোকের কাছে কিছু নয় ভেবেই ক্ষান্ত হয়েছেন। আর তাছাড়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবেন কেমন করে?

এমন একজনও নেই যে তাঁর পক্ষ সমর্থন করে একটি কথা বলে।

তাই তিনি নির্জীব হয়ে একপাশে বসে শেষ পরিণাম লক্ষ্য করছেন। সম্রাট আকবর আজ যুবক হয়েছে। বুদ্ধি তার নিশ্চয় এখন শাসন পরিচালনার মত হয়েছে! তিনি বোধ হয় সম্রাট আকবরের বিচক্ষণতা লক্ষ্য করছিলেন।

একথা অবশ্য সে সময়ে আকবর ভাবলো। আসলে সেই সময় খানসাহেব কি ভাবছিলেন, আকবর জানে না। তবে তার সেদিন মনে হচ্ছিল, এতটা অপমান বুঝি সহ্যাতীত। আজ যদি পিতা বেঁচে থাকতেন, তাহলে কি তার দোস্তের এই অপমান সহ্য করতেন?

আকবর দরবার কক্ষের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলে, অগণিত রাজন্যবর্গ তার বিচার দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন। সহস্র সহস্র চোখ শুধু তার সিংহাসনের দিকে ন্যস্ত।

আকবর নিজের দৃষ্টি নত করে অন্তরের মধ্যে সমাসীন হলো। মাথার মধ্যে কেমন যেন তার যন্ত্রণা করতে লাগলো। বড় দারুণ সমস্যা! এতদিন এই সব সমস্যা সমাধান করেছেন ঐ যে যিনি আজ বিচারাধীন। তিনি নির্বিঘ্নে পালন করেছেন। আজ তার শাসন শেষ, সকলে চাইছে বাদশাহের শাসন কিন্তু বড় যে গুরুভার, এ ভার বহনের ক্ষমতা কোথায়? সেও যদি এতটুকু মন জুগিয়ে না চলে, তাহলে তারও এমনি অবস্থা একদিন হবে।

আকবর মাথার ওপর মুকুটের গুরু ভারটি মোচনের জন্যে পাশে দণ্ডায়মান মুকুট-রক্ষীকে নির্দেশ দিল। পায়ের নাগরাটি খুলে আবার তা পরে নিল। সে মনস্থির করতে পারছিল না, তারপর একসময় মীরবক্সীকে পাশে ডেকে চুপি চুপি কি নির্দেশ দিল।

মীরবক্সী উঠে গিয়ে বৈরাম খানকে কি বলতে তিনি আস্তে আস্তে উঠে দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করলেন।

দরবার কক্ষ এতক্ষণ স্তব্ধ ছিল কিন্তু হঠাৎ বাদশাহের এই আচরণে রাজন্যবর্গের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো।

আকবরের মুখের ওপর বিরক্তির ছায়া ঘনিয়ে উঠলো। ভুরু দুটি কুঞ্চন করে সে কিছুক্ষণ সমস্ত দরবার কক্ষটি একদৃষ্টে দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বললো—আপনারা স্তব্ধ হোন।

আকবরের কণ্ঠ ছিল মেঘসদৃশ্য। মেঘের মত ভীম গর্জনে সে সমস্ত বড় বড় যোদ্ধার কণ্ঠস্বরকেও চেপে দিতে পারতো। তার এই গর্জনে যেন হঠাৎ দরবার কক্ষে বাজ পড়লো। কণ্ঠ-স্বরের প্রতিধ্বনি সমস্ত দরবার কক্ষের মর্মর দেয়ালে অনুরনণ তুলে কয়েক মুহূর্ত সোচ্চার হয়ে থাকলো। তারপর প্রতিধ্বনি থামলে দেখা গেল কোন গুঞ্জনও নেই। সবগুলি আসন অলঙ্কিত রাজন্যরা নিশ্চুপ হয়ে পরবর্তী ঘটনার আশায় অপেক্ষামান।

আকবর তখনও উঁচু মঞ্চে দণ্ডায়মান ছিল। মনের মধ্যে তার দারুণ ক্ষোভ। কণ্ঠে বাদশাহের গাম্ভীর্য। হঠাৎ সেই আগের স্বরেই বললো—আজ আপনারা যার বিরুদ্ধে লাখো লাখো অভিযোগ আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তিনি কে? এই রাজ্য, এই রাজত্ব, এই রাজপ্রাসাদ তাঁরই ক্ষমতাবলে একদিন সুরক্ষিত ছিল। তিনি আমার শুধু উপকার করেছেন নয়, করেছেন আপনাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাহায্য। আজ যদি এই রাজ্য না থাকতো, তাহলে আপনারা কার ওপর দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ প্রকাশ করতেন? আজ আপনারা তাঁর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লাখো অভিযোগ তৈরী করেছেন। জানি না, সে অভিযোগের মধ্যে কতগুলি সত্য! তবে এইটুকু আমি বুঝি, খানসাহেবের আর এখানে থাকা হবে না। কিন্তু আপনারা এতবড় অবিবেচক যে ভুলে যান একজনের হীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার পূর্বসুনাম! আজ তাঁকে সম্মুখে

রক্ষা করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে আপনাদের লজ্জা করলো না? আমি সেইজন্যে তাঁকে দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করতে বলেছি। তবে এই নয় যে তাঁকে আমি মুক্তি দিয়েছি। বিচার তাঁর আমি করবো। এবং চরম সে দণ্ড দেব। তবে তা সাক্ষাতে দিতে পারবো না, অন্যের সাহায্যে পরোক্ষভাবে।

আকবরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। চোখে জলও এল। তাড়াতাড়ি সে দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করে দ্রুত অদৃশ্য হল।

সে এল মা হামিদার কক্ষে। হামিদা তখনও আরোগ্য লাভ করেন নি, পালঙ্কের ওপর বসে মাহামের সঙ্গে কি যেন বিষয় নিয়ে সলাহ করছিলেন।

আকবর কক্ষে ঢুকতে কথা বন্ধ হল। মাহামের দিকে একবার তাকিয়ে আকবর মাকে বললো—মা, আমি রাজ্য পরিচালনা করতে পারবো না। এখানকার প্রতিটি রাজকর্মচারী নিজেরাই মনে করেন, তাঁরা এক একজন বাদশাহ্। এই বেয়াদপ বেসরম রাজকর্মচারীর মধ্যে থেকে রাজ্য শাসন করতে গেলে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। তুমি অন্য কারুর ওপর শাসন ভার ন্যস্ত কর, তাতে আমার যন্ত্রণা লাঘব হবে।

হামিদা ম্লান হেসে ক্লান্তস্বরে বললেন—কিন্তু বেটা, পারবো না বললে তো হবে না। রাজ্য তোমার, শাসন ক্ষমতাও তোমার। বেসরম রাজকর্মচারীদের উচ্ছেদ করে নতুন রাজকর্মচারী নিয়োগ কর।

কিন্তু সে করতে গেলে তো রাজদফতর থেকে সব লোককে বিতাড়িত করতে হয়।

তাই করবে। উচিত মনে হলে তাই করা উচিত।

কিন্তু আমি অক্ষম। এই আমূল পরিবর্তনের সাধ্য আমার নেই।

হামিদা মাহামের দিকে তাকালেন।

মাহাম হামিদাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন—তাই বলে একজন শত্রুকে জেনে শুনে তো রাজকর্মের ভার দেওয়া উচিত নয়।

হামিদা বললেন—তুমি খানসাহেবের কি ব্যবস্থা করলে ?

এই কথায় আকবর আবার বিচলিত হল। তারপর বললো—কি করবো আমি এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারি নি।

মাহাম উত্তর দিলেন—কিন্তু এ তোমার অন্যায় বেটা, সামান্য এই সমস্যাটি সমাধানেও তুমি এত শৈথিল্য প্রকাশ কর ?

কঠিন উত্তর আকবরের মনে এসে গিয়েছিল কিন্তু সে তা সংবরণ করে বললো—সমস্যাটি সামান্য হতে পারে, যিনি একদিন এ পরিবারের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আমার দুর্বলতাই জেগে উঠছে।

হঠাৎ হামিদা বললেন—অহেতুক চিন্তার প্রয়োজন নেই বেটা, তুমি খানসাহেবের মক্কা যাত্রার আয়োজন কর।

আকবর 'যো হুকুম' বলে দ্রুত মায়ের কক্ষ পরিত্যাগ করলো।

নিজের কক্ষে ফিরে এসে শেখ আবদুল লতিফকে ডেকে পাঠালো। আবদুল লতিফ অনেক দিন আগ্রা ত্যাগ করে দিল্লীতে এসে ছিলেন। ছাত্রের খোঁজ বড় একটা তিনি রাখেন না, সব সময় অধ্যয়নই নিয়ে থাকেন। ছাত্র আজ চঞ্চল, সে এখন রমণী আসক্ত হয়ে যুবরক্তের উন্মাদনা পরিমাপ করছে, এখন কোন শিক্ষা মনের জমিনে স্থায়ী হবে না ভেবে তাই উপদেশ দেওয়া নিরুত্তর থেকেছেন। তাছাড়া ছাত্রও ডাকে না, তিনিও যান না। আগ্রায় ছাত্র ডেকেছিল কিন্তু কোন কাজে তিনি লাগেন নি, তাই নিঃশব্দে দিল্লীতে ফিরে এসেছিলেন। আজ হঠাৎ তাঁর ডাক পড়তে তাই তিনি চমকিত হলেন।

আর আকবর তখন ভাবছিল, এই ঠিক। সে পত্র লিখেই খানসাহেবের ক্ষমতা কেড়ে নেবে। একদিন এই মানুষটির ওপর তার কত রাগ ছিল, আজ সেই মানুষটির জন্যে তারই যেন সবচেয়ে বেশী কষ্ট জেগে উঠছে। এতদিন এই মানুষটির কত কর্ম

চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। নিজের হাতে গড়া সব সংসার, আজ সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।

এই সময় আবদুল লতিফ কক্ষে প্রবেশ করলেন। তার দিকে তাকিয়ে আকবর ম্লান কণ্ঠে বললো—শেখ সাহেব, আপনার হাত দিয়ে একজনের মৃত্যুর আদেশ লেখা হবে, আপনি কি তা করতে রাজী আছেন?

আবদুল লতিফ সবই জানতেন এবং এও জানতেন তাঁকে কেন হঠাৎ ডাকা হয়েছে! তাই তিনি বললেন—বাদশাহ, খোদার ইচ্ছায় সব ঘটনার মধ্যেই ভালমন্দের সম্পর্ক আছে। হয়তো আপনি যা করতে চলেছেন, তা তাঁর ভালোর জন্যেই খোদা আপনাকে দিয়ে করাচ্ছেন।

আকবরের মেজাজ সে সময়ে একটুও ভাল ছিল না। তাই একটু বিরক্ত হয়ে বললো—শেখ সাহেব আমার মেজাজ একেবারে শরিফ নেই। আপনি শুধু বলুন, আপনি করতে রাজী আছেন কিনা? না থাকলে আমি ওয়াকিয়ানবীশকে ডেকে কাজ সম্পূর্ণ করবো। তবে দুর্দ্দিনের সেই পিতৃবন্ধু খানসাহেবকে কোন সাধারণ লোকের লেখা আদেশ প্রেরণ করতে সম্মানে বাধে।

আবদুল লতিফ ইতস্তত করে বললেন—আমি রাজী।

আকবর বললো, তাহলে এই কথাগুলি উপযুক্ত আলঙ্কারিক ভাষায় যোজনায় লিখে দিন—আমি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বাসনা করেছি। আকবর এই সময় মনে মনে বললো, মিথ্যা কথা। আমাকে বলপূর্বক এই কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারপর আবার বললো—লিখবেন, আপনি কিছুকাল থেকে মক্কায় তীর্থযাত্রার অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন, এবার আপনি নিঃসন্দেহে মক্কা যাত্রা করুন, কোন বাধা উপস্থিত হবে না। আপনার ব্যয়ের জন্যে কয়েকটি পরগনার উপস্বত্ব মক্কায় প্রেরিত হবে।

আবদুল লতিফ লিখিত পত্রের ওপর কখন বাদশাহের সীলমোহর

করিয়ে নিয়ে গেছেন, আকবর জানে না। সে কতক্ষণ কক্ষের মধ্যে একা বসেছিলো, তাও তার অজ্ঞাত। হঠাৎ দেখলো, বৈরাম খান বাহাদুর কক্ষে প্রবেশ করছেন। একান্ত অসহায় ও দীনের মত মাথা নীচু করে আকবরের সামনে এসে সেলাম পেশ করলেন।

খানসাহেব কখনও আকবরকে সেলাম করেন নি, আজ অনুগতের মত সেলাম করতে আকবর নিঃশব্দে হাহাকার করে উঠলো কিন্তু মুখে কোন কথা বলতে পারলো না।

খানসাহেব মৃদুস্বরে বললেন—জাঁহাপনা, তোমার পত্র আমি পেয়েছি। আমি স্বেচ্ছায় আমার সব অধিকার ত্যাগ করে গেলাম। এই নাও তোমার বাদশাহী পাঞ্জা। আমাকে এই গুরু-দায়িত্ব বহনের ভার লাঘব ক'রে দিলে বলে আমি কৃতজ্ঞ হলাম। মক্কাই আমার শেষজীবনের সান্ত্বনা।

আকবর একটিও কথা উচ্চারণ করতে পারলো না। একটিও সান্ত্বনার বাক্য। মুখে তার এল না একটিও কথা, অথচ কিছু বলার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু খানসাহেব নিজের কথা বলে নিঃশব্দে কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন।

আর আকবর বাদশাহী পাঞ্জাটি হাতের মধ্যে নিয়ে ক্ষোভে দুঃখে কি এক অস্বাভাবিক চঞ্চলতার মধ্যে অস্থির হয়ে উঠলো কিন্তু বাইরে সে স্থির হয়ে যেমন বসেছিল তেমনি ভাবে বসে থাকলো। একসময় প্রকৃতস্থ হ'লে পাঞ্জাটি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল।

তারপর রাজ্যের মধ্যে আরো অনেক নতুন ঘটনা ছায়াছবির মত প্রদর্শিত হতে লাগলো।

বৈরাম খান বোধহয় অত সহজে রেহাই পেলেন না।

তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে একদিন দিল্লীর দুর্গ ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর গমনের সময় কোন তূর্যনিনাদ হল না, রাজসিক

কোন আয়োজন করে তাঁর বিদায় বার্তা ঘোষিত হল না। বরং এমন নিঃশব্দে গেলেন কেউ তাঁর শব্দ পর্যন্ত পেল না।

আজ প্রাসাদের লোকেরা সকলে তাঁর বিপক্ষে। রক্ষী, সিপাহী, বাঁদী, বান্দার বিনা সাহায্যে একটি মুসাফির পরিবার দিল্লীর দুর্গের ফটক পার হয়ে গেল। সলিমা গেল, তার পুত্র আব্দুর রহিম গেল, গেল খান সাহেবের আরো তিন বেগম। লল্লা গেল, আর গেল কয়েকটি মেয়েলোক, যারা বহুদিন থেকে খান সাহেবের সুখে দুঃখের সাথী ছিল। গেল না কোন বান্দা ও বাঁদী। রাজসরকার কোন উপযুক্ত পাহারাদারও সঙ্গে দিল না। একদিন যে ছিল সিপাহশালার, তাঁর অধীনে কত সহস্র সৈন্য, আজ তিনি অরক্ষিত ভাবে কটি মেয়েলোকের একমাত্র অধিনায়ক হয়ে মাথা নত করে অপরাধীর মত বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে কোন লোক সঙ্গে দেওয়া হল না কারণ যদি তিনি বেরিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এই সন্দেহে।

এসব ব্যাপার বাদশাহের অগোচর থাকলো, শুধু একদিন শুনলো, খানসাহেব তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে মক্কা যাত্রা করেছেন। বাদশাহ আরো জানলো না, পীরমহম্মদ একদল সৈন্য নিয়ে দূর থেকে সেই খান সাহেবকে অনুসরণ করছেন।

বিপক্ষ পক্ষ পীরমহম্মদকে এই সময় কাজে লাগিয়েছিল। পীরমহম্মদ অতীতে তাঁর প্রতিহিংসা ভোলেন নি। তাঁকে ধর্মপথ থেকে যে বিচ্যুত করেছিল, তাঁকে আজ হাতের নাগালে পেলে কোন মতেই যে ছাড়বেন না, সে সকলেই জানে। তাই পীরমহম্মদ সেই দুর্ভাগা পরিবারের পিছন পিছন ছুরিকা শানিয়ে চললেন। বাইরের উদ্দেশ্য প্রকাশ থাকলো, খান সাহেবের বিদ্রোহ করবার সম্ভাবনা আছে, যদি তিনি তাই করবার চেষ্টা করেন, তাহলে তা দমন করবেন। আসলে কিন্তু পীরমহম্মদ খানসাহেবের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে হত্যা করতে চলছিল।

এদিকে তখন খানসাহেব মক্কা যাচ্ছিলেন না, যাচ্ছিলেন লাহোরে। লাহোরে ছিল তাঁর যা কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেইগুলি সংগ্রহ করে তারপর অন্য কর্তব্য করবেন। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে বিশেষ পর্যাপ্ত রসদও ছিল না। ছিল না পুত্রের আহারের জন্যে কোন দানাপানি। আসবার সময় কেউ তাঁর সঙ্গে অন্তত সাতদিনের চলবার মত রসদও দেয় নি।

শেষ একবার তিনি হামিদা বানুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, দেখা পর্যন্ত মেলে নি। বড় নির্মম এই অবিচার।

খানসাহেবের তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। মানুষের কর্তব্য তিনি করেছেন, মানুষই যদি তাঁকে ভুল বোঝে, তাহলে কার কাছে তিনি সে দুঃখ জানাবেন!

পূর্বের তিন বেগম তাঞ্জামের মধ্যে চলতে চলতে বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন। লল্লার কণ্ঠই সোচ্চার। 'এক বেসামাল আদমি, গুছিয়ে নিতে পারে না। এতদিন একটা রাজ্যের সমস্ত ভার হাতে পেল, বুদ্ধুর মত শুধু জোয়াল টেনেই গেল। শেষ পরিণাম দেখো। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল।'

খানসাহেব অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার ছিলেন। মাঝে মাঝে বেগমদের ডাকে তাঞ্জামের কাছে যেতে হচ্ছিল। আর শুনতে হচ্ছিল গালমন্দ। শুধু সলিমা কিছু বলছিল না। সে ভাবছিল, এ কি হল? এমনটি যে হবে সে তো কোনদিনও ভাবে নি! আসবার সময় হামিদা বলে পাঠিয়েছিলেন, সলিমা ইচ্ছে হলে অন্তঃপুরে থাকতে পারে। মুঘল আত্মীয় বলে তার দাবী আছে বলে রাজসরকার তাকে মাসোহারা দিতে স্বীকৃত। সলিমা তার উত্তরে জানিয়ে এসেছে—সে ভিখারিনী নয়, স্বামীর যেখানে সম্মান নেই, সেখানে তারও কোন অধিকার নেই।

তবু সলিমা কিছু ভাবছিল। খানসাহেব একদিন যে তাকে

সম্রাজ্ঞী হবার আশা দিয়েছিল কিন্তু একি হল? আজ রাজ-অন্তঃপুর থেকে পথের ধূলায়!

এমনি সময়ে দিনের আলো নিভে এল। একটি বনের ধারে এসে দলটি থমকে দাঁড়ালো। রাত্রিবেলা গভীর অরণ্যে ঢোকা সমীচিন নয় জেনে খানসাহেব সেখানেই তাঁবু ফেললেন। তারপর তাঞ্জাম বাহকদের বিশ্রাম নিতে বলে কিছু আহার্যের সন্ধান করতে লাগলেন।

এমনি সময় অতর্কিতে পীরমহম্মদ খানসাহেবকে আক্রমণ করলেন। সেই সন্ধ্যার আঁধারে দুজনের অসিযুদ্ধ প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে আরো সৈন্য কোথা থেকে এসে খান-সাহেবকে ঘিরে ধরলো। খানসাহেব বন্দী হলেন।

বৈরাম খান বন্দী অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন—আমার প্রতি এরূপ আচরণ করবার কারণ?

পীরমহম্মদের ইচ্ছে ছিল খানসাহেবকে হত্যা করতে কিন্তু কৌশলটি ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলেন না বলে আপসোস করছিলেন। ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—যাবার কথা ছিল মক্কায়, লাহোরে যাচ্ছিলেন কেন? বিদ্রোহ ঘোষণার মতলব করা হচ্ছিল বুঝি!

বৈরাম খান বললেন—আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাহোরে আছে, তা সংগ্রহ না করলে আমি মক্কায় যাব কেমন করে?

কিন্তু তাঁর উত্তরে আর কেউ কান দিল না। কান দিল না কেউ বেগমদের কান্নায়। এমন কি ছোট্ট বাচ্চা লেড়কা আব্দুর রহিমের ভয়ার্ত আতঙ্কেও কেউ থমকে দাঁড়ালো না। সৈন্যেরা তাদের পরিবৃত করে পাহারা দিতে দিতে আবার দিল্লীর দিকে এগিয়ে চললো।

মুঘল শাসনের বিচারে বিদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। পীরমহম্মদ বোধ হয় এই মতলব করেই খানসাহেবকে বন্দী করে নিয়ে চললেন।

এই সময়ে আকবর দিল্লী ছেড়ে আগ্রায় আবার ফিরে যেতে চাইছিল। তার ভাল লাগছিল না দিল্লী। খানসাহেবের উচ্ছেদের জন্যে শুধু তার মন খারাপ ছিল না। কেমন যেন প্রাসাদটি তার অচেনা মনে হচ্ছিল। মা যেন আরো পালটে গেছেন। পালটে গেছেন মাহাম আনাঘা। মাহাম আনাঘাই এখন রাজ-দফতরের সব। বাদশাহী পাঞ্জা হাতের মুঠিতে নিয়ে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে বড় বড় রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

এ সবের জন্যেও আকবরের মন খারাপ লাগছিল না। দৌলতের প্রতি তার লোভ নেই, ক্ষমতার প্রতিও নেই তার কোন আকাঙ্ক্ষা। তার খারাপ লাগছিল আলিমনের সাথে তার দেখা হচ্ছিল না বলে। আলিমন এর মধ্যে একবার লুকিয়ে এসেছিল—বাদশাহ. পালাও পালাও। এখানে থাকলে বেগমসাহেবা কিছুতে তোমার সাথে আমাকে দেখা করতে দেবে না।

সেইজন্যে আকবর পালাতে চায়।

ঠিক সেইসময়ে পীরমহম্মদ বন্দী বৈরাম খানকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

বিদ্রোহী খানসাহেবের এবার শিরশ্ছেদ হবে। প্রাসাদের চতুর্দিকে জনরব ছড়িয়ে পড়লো।

তখন আকবর তার খাসকক্ষে। আকবরও শুনলো সেই দারুণ ঘটনা। আরো শুনলো, খানসাহেব মক্কার পথে না গিয়ে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বালাবার চেষ্টা করছিলেন, পথিমধ্যে পীরমহম্মদ কর্তৃক ধৃত হয়ে বন্দী হয়েছেন।

বৈরাম খানসাহেব বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন? আকবর কেমন যেন শুনে চমকিত হল। তার মনে হল, এও কি সম্ভব? যাঁর হাতে একদিন সব কর্তৃত্ব ছিল, তিনি সেদিন ইচ্ছে করলে তো সব আত্মসাৎ করতে পারতেন! কিন্তু প্রাসাদের সবার মুখে যখন এককথা, তখন তার মতের মূল্য কি?

যাই হোক, যা হবার হবে। তার যখন এখন কোন দায়িত্ব নেই, যারা দায়িত্ব বহন করছেন, তাঁরাই বুঝবেন। সে এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর হল না।

মা হামিদাই একসময় কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন—আকবর, শুনেছ বোধ হয় খানসাহেব বিদ্রোহী হতে গিয়ে ধৃত হয়েছেন! মুঘল কানুনে বিদ্রোহের শাস্তি প্রাণদণ্ড। তুমি সেই দণ্ডাদেশ দাও।

আকবর মুখখানি অন্য দিকে ফিরিয়ে বললো—আমি পারবো না। কাজী আছে, মীর আদল আছে, তুমি আছো—তোমরাই এর বিচার কর। আমি তো আমার পাঞ্জা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমাকে আর কেন এই রাজনৈতিক চক্রান্তে প্রবেশ করতে বলছো?

হামিদা হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বললেন—না, তোমাকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। খানসাহেবের বিচার আমি যাকে তাকে দিয়ে করতে দেব না। তিনি সম্মানীয় ব্যক্তি, আজ বিদ্রোহ করেছেন বলে সামান্য অপরাধীর পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না!

আকবরের কণ্ঠে হঠাৎ তাচ্ছিল্য ঝলকে উঠলো—এইটুকু অনুগ্রহ তাঁর প্রতি না করলেই কি হত না মা? যে অপরাধী, সে অপরাধী। অপরাধের শাস্তিই তার প্রাপ্য। সেখানে সাধারণ অসাধারণের প্রশ্ন ব্যঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হামিদা বানু পুত্রের কথায় চমকিত হলেন, তারপর একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—তুমি কি বলছো, আমি বুঝতে পাচ্ছি না আকবর! তুমি কি খানসাহেবকে মুক্তি দিতে চাও?

আকবরের মুখ তখনও অন্যদিকে ফেরানো ছিল, বললো—আমি কিছুই চাই না। আমি কে?

হামিদা বললেন—তুমি কেউ নও বললে তো তোমাকে ত্যাগ

করবে না। তুমি হিন্দুস্তানের বাদশাহ। তুমি দিল্লীর সিংহাসনে একচ্ছত্র অধিপতি। তুমি মুঘল বংশের ঐতিহ্য।

আকবর এবার সত্যিই একটু বিরক্ত হল, ক্ষুব্ধস্বরে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো—না, না, আমি কেউ নই। আমি কিছু হতে চাই না। আমার ক্ষমতার যেখানে মূল্য নেই, আমাকে যখন সকলের মনতুষ্টি করে চলতে হয়, তখন আমাকে সবকিছু থেকে রেহাই দিলেই খুশি হবো।

হামিদা এবার কাছে এগিয়ে এসে গাত্রস্পর্শ করে সস্নেহে বললেন—আকবর, শান্ত হও। অন্তত খানসাহেবের ব্যাপারটার সমাধান করে তুমি আগ্রায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

হঠাৎ আকবর কেমন যেন বিক্ষোভের শেষপর্যায়ে উপনীত হয়ে পাক খেতে খেতে মায়ের দিকে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালো, তারপর করুণস্বরে বললো—খানসাহেবের ব্যাপারটার সমাধান কি আমাকে দিয়ে না করলে নয়? যিনি বাল্যকাল থেকে আমাকে মানুষ করে আসছেন, যাঁকে পরমাত্মীয় ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না, তাঁর অপরাধের শাস্তিবিধান আমায় করতে হবে?

হামিদা বললেন—তুমি বাদশাহ, তুমি ছাড়া কে এর বিচার করবে? তাছাড়া অপরাধীকে ক্ষমা করা অন্তত সম্রাটের কানুনে নেই, সে যত বড় আত্মীয়ই হোক।

মা তুমিও এ কথা বলছো? আজ যদি সম্রাট পিতা বেঁচে থাকতেন?

হামিদা বারেক মাথা নত করলেন, তারপর মাথা তুলে বললেন—আকবর অপরাধীর বিচার আমি চাই। এ ছাড়া এ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রশ্ন আশা করি না। তুমি বাদশাহ, তুমি এর বিচার করবে।

হুকুম!

হামিদা ইতস্তত করে বললেন—হ্যাঁ তাই।

বেশ বাদশাহের মতই বিচার করবো, সেখানে কারো ঔদ্ধত্য মানবো না। আমার খুশি বাদশাহের খুশি সেই হবে বিচার।

হামিদাবানু আর কোন কথা বললেন না, পুত্রের মুখের দিকে একবার জ্বলন্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করে কক্ষ ত্যাগ করে অদৃশ্য হলেন।

তারপর দরবার কক্ষ। বৈরাম খানের বিচার। তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

বাদশাহ সিংহাসনের অপর আসীন। মুখখানিতে তার গাম্ভীর্য থম থম করছে। অগণিত রাজন্যরা স্ব স্ব আসনে বসে আছেন।

এমন সময় আইন ব্যাখ্যাকার মুফতি খানসাহেবের অপরাধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে দরবার কক্ষের অগণিত ব্যক্তিদের শুনিয়ে দিল।

তার পরক্ষণেই আকবর পীরমহম্মদের দিকে তাকালো—পীর-সাহেব, আপনিই একমাত্র সাক্ষী, যিনি জানেন, খানসাহেব বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। আপনি কি আজও ধর্মের দোহাই দিয়ে সত্য কথা বলেন?

পীরমহম্মদ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচলিত হলেন। কিছু বলতে গেলেন কিন্তু বাদশাহের তীব্রদৃষ্টির কাছে মাথা নত করলেন।

এবার আকবর গর্জে উঠে বললো—সত্য কথা বলবেন। আপনার ভাষণের ওপর একজনের দণ্ডাদেশ নির্ভর করছে। আপনি কি স্বচক্ষে খানসাহেবকে বিদ্রোহ করতে দেখেছেন?

পর পর আক্রমণ! পীরমহম্মদ বাদশাহের সামনে কি বলবেন ভেবে পেলেন না। শুধু বললেন—না, তা দেখি নি। তবে তিনি মক্কার পথে যাচ্ছিলেন না, যাচ্ছিলেন লাহোরের দিকে।

আকবর খানসাহেবের দিকে ফিরলো—আপনি কেন লাহোরে যাচ্ছিলেন খানসাহেব?

আমার কাছে ছিল না এক কপর্দকও। আমি যাচ্ছিলাম কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাহোরে আছে, তা উদ্ধার করতে।

আকবর পীরমহম্মদের দিকে ফিরে বললেন—একথা অসত্য প্রমাণ করতে পারেন ?

পীরমহম্মদের মুখে কোন কথা নেই।

আকবর হঠাৎ গর্জে উঠে বললো—তাহলে আপনি কার চক্রান্তে প্রলোভিত হয়ে খানসাহেবের পিছু ধাওয়া করেছিলেন ? আর কে এমন মিথ্যা কথা বলে বিদ্রোহ চক্রান্ত সাজাতে বলে দিয়েছিল ? পীরসাহেব, আপনি একদিন এই রাজ্যের সর্বোচ্য পদ ধর্মোপদেষ্টা উপাধি অলঙ্কৃত করেছিলেন, আজ আপনার এই পরিণাম দেখে বিস্মিত হচ্ছি। তবে আপনি সাবধান থাকবেন, ভবিষ্যতে এমন আচরণ আর কোনদিন দেখলে কানুন আপনাকে রেহাই দেবে না।

তারপর আর কি ?

আকবর রাজদফতর থেকে প্রচুর দৌলত ও রসদ দিয়ে আড়ম্বরে খানসাহেব ও তাঁর পরিবারবর্গকে মক্কা যাত্রা করিয়ে দিল। কারো কোন তোয়াক্কাই সে করলো না। সে বাদশাহ তার ক্ষমতাই পালিত হবে। তার ক্ষমতাই সব, এমনি অধিকার প্রকাশ করে সব কিছু সম্পন্ন করলো। এমন কি খানসাহেব যাতে নির্বিঘ্নে মক্কায় পৌছতে পারেন, তার মত সঙ্গে রক্ষী পর্যন্ত দিয়ে দিল।

বৈরামখান তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে যাত্রা করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে আকবর এবার আগ্রার পথে রওনা হল। সঙ্গে কিন্তু আলিমনকে নিতে ভুললো না।

দৌলতের ভাণ্ডারের মধ্যে কাউকে বসিয়ে দিয়ে যদি বলা যায়, সাবধান থেকো তোমার মাথার ওপর ছুরিকা দোদুল্যমান থাকলো একটু অসাবধান হলেই মস্তক দ্বিখণ্ডিত হবে—যাকে বলা হল তার অবস্থাটা বিবেচনা করলেই আকবরের বর্তমান পরিস্থিতি বোঝা যাবে। আর আকবর তা মনে মনে বেশ উপলব্ধি করলো বলেই দিল্লী থেকে আগ্রায় পালিয়ে এল।

এ বরং ভাল। বড় বড় সমস্যার মধ্যে মাথা না গলিয়ে এই নির্জন প্রাসাদে যমুনার স্রোতের সঙ্গীত শুনে, রমণীদের উষ্ণ সান্নিধ্যে সরাবের মৌতাতে বেহুঁশ হয়ে থাকা অনেক ভাল। এর চেয়ে আয়াস আর কিসে আছে? ধনীলোকের সন্তান হওয়া এই মজা, অন্তত খানার জন্যে উদয়াস্ত মেহনত করতে হবে না। চাইলেই খিদমতগার নিয়ে আসবে স্বর্ণময় রেকাবের ওপর চুমকি তোলা রঙীন কাপড়ের আবরনী দেওয়া ভাল ভাল সুখাদ্য খানা। বকাওলবেগী যে খানা পরীক্ষা করে বাদশাহকে খেতে দেয়। খানার মধ্যে বিষ মিশ্রিত থাকলে তা ধরা পড়ে। বিষমিশ্রিত খাদ্য কি আর ধরা পড়ে না? তবে তা আর বাদশাহের কাছ পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

আজ এ সমস্যা মামুলি। সেই বিষ মিশ্রিত খানা দেবার কারুর ক্ষমতা নেই কিন্তু বাতাসে বিষ ছড়িয়ে রাখবার লোকেরও অভাব নেই। বাদশাহের জীবনে যখন কোন দুঃখ নেই, তখন বিষের ক্রিয়ায় যন্ত্রণা পাক। দুঃখ নেই এটা বাইরের পরিচিতি, হয়তো সাধারণ লোকের জীবন ধারণের মত কষ্ট নেই কিন্তু আছে আরো বিবিধ সমস্যা ও সেই সমস্যার যন্ত্রণা।

আকবর আগ্রার খাসকক্ষে বসে আবার অভিজ্ঞলোকের মত ভেবে চলেছে। আজকাল আলিমনকেও তার ভাললাগে না। দিল্লী থেকে ফেরার পর কেমন করে যেন তার প্রমোদ উন্মত্ত মন স্থির হয়ে গেছে। আবার সেই নৈঃশব্দের শূন্যতা তাকে কুরে কুরে খেতে শুরু করেছে।

কি বিচিত্র এই জীবন প্রবাহ? যদি কখনও তাকে নিয়ে ইতিহাস লেখা হয়, তাহলে কি জীবনের এই প্রারম্ভিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবে? সম্রাট আকবর প্রথম শাদী করেছিলেন বলপ্রয়োগের আশ্রয়ে। তাঁর প্রথম বেগম সম্রাটের দ্বারা অবহেলিতা হয়ে অন্যপুরুষের সংসর্গে জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে।

আকবর আগ্রায় এসে দেখেছে, এখনও আধম ও রুকমির মোহ-মুক্তি ঘটেনি, তারা এখনও পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ অনুভব করে।

কিন্তু বাদশাহের মোহ কেটে গেছে, তার চৈতন্য হয়েছে, এ সে কি করেছে? এত বড় আদেশ সে কেমন করে দিল? তারই জন্যে নির্বাচিত রমণী, মোল্লার সামনে কবুল করে গ্রহণীয়, তাকে সে এগিয়ে দিল এক লম্পট দুশ্চরিত্র কামবক্তের লালসার শিকার হতে? দোষ কার? অন্তত দোষ সেই বেগমের নয়? সে স্বামীর সোহাগ চেয়ে বিফল হয়ে আজ বাধ্য হয়ে অবৈধতার আশ্রয় নিয়েছে। বেগম নয় বলে যাকে অস্বীকার করলো, শাদী নয় বলে যার গুরুত্ব উপলব্ধি করলো না—আজ যেন মনে হচ্ছে, অস্বীকার করলেও মানুষ তা আমল দেবে না। তারা বলবে, বাদশাহেরই বেগম আজ অন্যপুরুষের আসক্তিতে লিপ্ত। বাদশাহ অক্ষম বলে বেগমের এই ব্যভিচারে বাধা দিতে পারে নি। সম্রাট আকবরের প্রথম বেগম রাজ্যের বিড়ম্বনায় অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত।

দুর্ণাম। সুনাম যার নেই দুর্ণামেও তার ভয় নেই, তবু দুর্ণামের ঘৃণ্য ভয়াবহ আতঙ্কময় স্বরূপটি মনে এলে দেহ জ্বালা করে ওঠে।

আকবর সেই চির স্রোতস্বিনী যমুনার নীল স্রোতের প্রবাহের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বহুকালের সেই ব্যাকুলদৃষ্টি। প্রকৃতির এই লীলাসৌন্দর্য দেখার বুঝি তার ক্লান্তি নেই। যখনই সে মানুষের বিক্ষুব্ধ জীবনের টানাপোড়েনে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, তখন আসমানের নীল জমিনে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে, কিম্বা এই যমুনার অশ্রান্ত স্রোতে। আগ্রার প্রাসাদের কোলে যমুনার এই দর্শন খুবই নিকটবর্তী। এবং এখানে যমুনার প্রসারতা আরো বিচিত্রধর্মী। অলিন্দে দাঁড়ালেই যমুনা কাছে চলে আসে। তাই আগ্রা বাদশাহকে সব সময় কাছে টানে।

আকবর অলিন্দ দিয়ে ঝুঁকে যমুনার দিকে তাকিয়েছিল। কেমন যেন মনের মধ্যে জ্বালার প্রদাহ। হঠাৎ সেখান থেকে চীৎকার করে বান্দাকে ডাকলো। একটি লোক সেলাম করে এসে দাঁড়ালে আকবর বললো—আধম সাহেব কো সেলাম দেও।

জী সরকার। বান্দা চলে গেলে আকবর নিজের কর্তব্য মনে মনে ঠিক করে নিল।

আজ পাঁচ দিন সে প্রাসাদে এসেছে। আধম খান একবারও তার সামনে আসে নি। বান্দাকে জিজ্ঞেস করলেই সে বলে: হুজুর, আধমসাহেব বেগম মহলে আছেন। বেগম মহলে কার কাছে আছে আকবরের জানতে বাকী নেই। ওমনি তার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা জেগে ওঠে। এ তার বর্তমানের নতুন যন্ত্রণা।

সেই আধম আজ সামনে এসে দাঁড়ালো।

আকবর তার আপাদমস্তক কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলো, তারপর ব্যঙ্গস্বরে বললো—আধম সাহেব, তুমি কি জানো আজ আমি কদিন প্রাসাদে ফিরে এসেছি?

আধম বুঝতে পেরেছে তার দোষ। আর কেন বাদশাহ ডেকেছে, তাও যেন ধূর্ত অনুমান করতে পেরেছে। তবু সে অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিল—আমি জানি তুমি এসেছ বাদশাহ। শুধু

তবিয়ৎ ভাল ছিল না বলে আসতে পারি নি। এক একসময় অবশ্য বান্দার কাছে খবর নিয়েছি, তখন বাদশাহ আলিমন বিবির সাথে ব্যস্ত থাকাতে বিরক্ত করিনি।

কিন্তু আকবর আধমের উত্তরে সন্তুষ্ট হল না। ক্ষুব্ধস্বরে বললো—আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কর না আধম খান। আমি জানি তুমি সবসময়ে এখন কোথায় থাকো। তারপর আদেশের ভঙ্গিতে বললো—তুমি আর বেগমমহলে প্রবেশ করবে না।

হুকুম!

হ্যাঁ, আমার হুকুম নয়, বাদশাহের নির্দেশ।

আধম কিছুক্ষণ আকবরের মুখের ওপর তাকিয়ে রইলো, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে দৃঢ় মুখের রহস্য পড়তে চাইলো, তারপর বললো—এ আচরণের কারণ?

আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই। যা বললাম তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

যদি না করি? আধমও বেঁকে দাঁড়ালো।

আকবর সংযত হতে হতে বললো—আমার স্বাভাবিক মেজাজ দেখেছ, অস্বাভাবিকতা দেখনি। তারপর স্বর পরিবর্তিত করে বললো—তুমি আমারই বেগমের সঙ্গে মজা করবে, আর আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে?

কিন্তু আমি তো তোমার নির্দেশ নিয়ে এই কাজ করেছি বাদশাহ!

ভুল, ভুল করেছি আমি। দারুণ সে ভুল। তখন অতোটা বুঝতে পারি নি বলে এই অন্যায় হয়ে গেছে। অল্প বয়সে পাকা অভিজ্ঞতা কোথা থেকে পাবো যে ভবিষ্যতের ছবি চোখের ওপর ফুটে উঠবে? এখন তারই আক্কেল সেলামী দিচ্ছি। আধম খান তুমি যদি আমার নির্দেশ না মানো, তাহলে চরম দণ্ডের জন্যে প্রস্তুত

থাকবে। আমি যা হারিয়েছি তা তো ফিরে পাবো না কিন্তু আর এগোতেও দেব না।

এই বলে আকবর হতবুদ্ধি আধম খানের সামনে থেকে দ্রুত সরে গেল।

কিন্তু সরে সে গেল না, সে সেই মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছলো বেগম মহলে রুকমির কক্ষে।

রুকমি হঠাৎ এতদিন পরে বাদশাহকে দেখে চমকিত হল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে প্রকৃতস্থ করে নিল।

আকবর গম্ভীর হয়ে চুপ করে রুকমির দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখতে লাগলো তার বেগমের পরিবর্তন। একদিন এই রমনীই তার একটু সান্নিধ্যলাভের জন্যে কত চেষ্টা করেছে। আজ সে অন্য পুরুষের স্পর্শে ধন্যা। সত্যিই কি রুকমি তাতে খুশি হয়েছে? কিন্তু সে জানার আপাতত কোন প্রয়োজন নেই। হুকুম হুকুমই। বেগম বলে কোন অধিকার নয়, তার প্রাসাদে বসে ব্যভিচার চলবে না। যদি তার হুকুমের অবমাননা হয়, তাহলে উপযুক্ত শাস্তি নেমে আসবে শিরে।

বাদশাহ কথা বললো, গম্ভীরস্বরে বাদশাহী ভঙ্গিতে বললো— আধম খানকে তুমি আর কক্ষে প্রবেশ করতে দেবে না।

রুকমি শুনে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো, বললো—কেন, মনে বুঝি লেগেছে খুব?

বাজে বক বক কর না। বাক্ সংযত করে কথা বলবে।

যদি না করি?

উপযুক্ত শাস্তির জন্য তৈরী থাকবে।

শাস্তি! আবার রুকমি খিল খিল করে হেসে উঠলো, তারপর হাসি প্রশমিত হলে বললো—শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন বাদশাহ!

হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। ব্যভিচারের আচরণ এখানে চলবে না। যদি চালাতে চাও তাহলে এখান থেকে চলে গিয়ে চালাবে।

এখানেই চালাবো। বাদশাহের চোখের সামনে চালাবো। বাদশাহের দেহে যদি মানুষের রক্ত থাকে, সেই রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেবো! আজ হঠাৎ এই হুকুম কেন? মনে বুঝি বড় লাগছে? কিন্তু একদিন আমি যখন একটু সান্নিধ্য লাভের জন্যে মিনতি করেছিলাম, সেদিন কোথায় ছিলেন?

খাঁমোশ! বাঁদী বাঁদীর মত থাকবে। আকবরের সেই চোখ দুটি আবার বড় হয়ে উঠলো। সিংহকে যে ক্ষুধিত চোখে বধ করেছিল, তেমনি অগ্নিময় দৃষ্টি স্ফুরিত হয়ে উঠলো।

আমি বাঁদী নয় বেগম।

কিন্তু রুকমির কথা আর শেষ হল না। আকবরের দুটি লৌহময় বজ্রবাহু প্রসারিত হয়ে এগিয়ে গেল ধীরে। লক্ষ্য রুকমির কণ্ঠনালি।

আতঙ্কে রুকমি চীৎকার করে উঠলো।

কিন্তু আকবর বাহু প্রসারিত করেও এগিয়ে গেল না, দুটি থাবার দ্বারা কণ্ঠনালি চেপে ধরতে গিয়ে স্পর্শের আগেই সে সরিয়ে নিল এবং চাপা অথচ ক্ষুব্ধস্বরে বললো—আমাকে চেনো না তুমি! এর পর এগিয়ে গেলে পৃথিবী থেকে লোপাট হয়ে যাবে। তখন আর ভোগের বাতি জ্বালাতে পারবে না।

তারপর আকবর ফিরে এল নিজের খাসকক্ষে।

আধম খানকে কোথাও পাঠাতে হবে। অন্তত এ প্রাসাদ থেকে কিছুদিনের জন্যে তাকে না সরালে এ সমস্যার সমাধান হবে না। আধম যদিও ভয়ে সংযত হয়, রুকমি হবে না, সে বেপরোয়া।

আকবর সেই সময় আধমকে কোথাও পাঠাবার মতলব করতে লাগলো।

ঠিক এই মুহূর্তে দ্রুতগামী অশ্বারোহী আগ্রায় এসে বাদশাহকে জানালো—বৈরাম খানসাহেব নিহত হয়েছেন। শুধু তিনি নন, তার তিন বেগম, রক্ষীরা, বাহকেরা সকলে। শুধু প্রাণে বেঁচেছে সলিমা-বিবি ও তাঁর পুত্র আব্দুর রহিম।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আকবর দারুণভাবে চমকে উঠলো—কে? কে এ কাজ করেছে? সেই আততায়ী ধরা পড়েছে কিনা আমাকে বলো, আমি তার জান টুকরো টুকরো করে কুত্তাকে দিয়ে ভক্ষণ করাবো?

অশ্বারোহী যে সংবাদ এনেছিল সে বাদশাহের ক্রোধে হঠাৎ কেমন যেন ভীত হল, বললো—হুজুর হত্যাকারী ধরা পড়ে নি।

আমি জানি সে ধরা পড়বে না। তারপর বাদশাহ চীৎকার করে ডাকলো—এই কে আছিস্, আমার ঘোড়া নিয়ে আয়, পোষাক দে, আর একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারী—দেখি কে সেই হত্যাকারীকে রক্ষা করে?

এইসময় অশ্বারোহী বললো, হুজুর, আরো আমার কিছু নিবেদন আছে।

আকবরের তখন শোনার মত ফুরসৎ ছিল না। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললো—বলো, তোমার আর যা কিছু বলবার আছে!

হুজুর খানসাহেবকে মুবারক নামে এক আফঘান যুবক হত্যা করেছে। সে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। তার পিতাকে একসময় খানসাহেব মচ্ছিওয়ারায় হত্যা করেছিলেন। এখন বাগে পেয়ে সে প্রতিশোধ নেয়।

মিথ্যা কথা! এ আমি বিশ্বাস করি না। আকবর গর্জে উঠলো।

অশ্বারোহী বললো—হুজুর দিল্লী থেকে লোক পাটানে গিয়েছিল। সেই মুবারককে ধরবার অনেক চেষ্টা চলছে।

আকবর হঠাৎ রাগ প্রশমিত করে ক্লান্তস্বরে বললো—সৈনিক, তুমি জান না এর পিছনে কি চক্রান্ত আছে? কিন্তু আমি জানি, খানসাহেব রাজরোষে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁকে একবার চক্রান্ত করে হত্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল, আর সে চক্রান্ত কেন হয়েছিল তাও আমি জানি। সেদিন খানসাহেবকে প্রাসাদ থেকে রক্ষা করে মক্কার পথে পাঠিয়ে দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারি নি, তখন মনে

হয়েছিল, নিজে যদি গিয়ে মক্কায় পৌঁছে দিয়ে আসতাম তাহলে ভাল হত।

অশ্বারোহী আর কোন কথা বললো না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

আকবর জিজ্ঞেস করলো—কতখানি পথ খানসাহেব গিয়েছিলেন?

রাজপুতানা অতিক্রম করে অনিলহরার পর পাটান, সেখানে হত হয়েছেন?

এমন জায়গায় হত্যা করা হল, যেখানে দ্রুত অশ্বে পৌঁছতে গেলে বেশ কিছু সময় লাগবে? তারপর আকবর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—দুঃখ করার আর কিছু নেই। এ জানাই ছিল। কিন্তু জেনেও নিরুপায়। তাকেও হয়তো এমনি কোনদিন ষড়যন্ত্রের ফাঁশে বদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হবে।

এই সময় রক্ষী এসে জানালো অশ্ব তৈরী হয়ে গেছে। আকবর তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্তন করে নিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে কি ভেবে আধম খানকে ডাকতে পাঠালো। আধম এলে বললো—আমার সঙ্গে তোমাকে দিল্লী যেতে হবে।

আধমের প্রতিবাদ করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বাদশাহের মুখের দিকে চেয়ে আর সাহস করলো না।

দিল্লীপ্রাসাদ।

আকবরকে খবর কেউ দেয় নি কিন্তু তাকে দেখে অনেকে চমকিত হল। হামিদাবানু বললেন—বেটা, তুমি বিশ্রাম নষ্ট করে কেন এ সময়ে?

আকবর বুঝলো যে অশ্বারোহী তাকে সংবাদ পরিবেশন করেছে, সে এঁদের প্রেরিত দূত নয়। অন্য একটি শুভানুধ্যায়ী দল তাকে এই সংবাদ জানিয়েছে। তাই সে গোপন করে গেল দূতের উপস্থিতি।

শুধু সে বললো—আমি একবার খানসাহেবের বিবির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

হামিদাবানু চমকে উঠলেন। তারপর পুত্রের দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—তুমি কি করে জানলে খানসাহেবের বিবি ফিরে এসেছে?

মাকে আঘাত দেবার বাসনা আকবরের ছিল না কিন্তু নিরুপায় হয়ে ম্লান হেসে বললো—আমি যে বাদশাহ হয়ে জন্মেছি মা!

হামিদার মনে বোধ হয় সে স্পর্শ লাগলো না, বললেন—কিন্তু তুমি সলিমার সঙ্গে দেখা করে কি করবে?

দরকার আছে।

কি দরকার আমাকে কি বলা যায় না?

না।

এই সময় মাহাম বিবি কক্ষে প্রবেশ করলেন, আকবরকে দেখে সহাস্যে বললেন—জালাল যে হঠাৎ! তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায় তো বেটা! আরামকে লিয়ে গিয়া রাহা, ইতনা জলদি ক্যায়সে লোট আয়া।

আকবর কোন উত্তর দিল না।

হামিদা মাহামকে বললেন—আকবর খানসাহেবের বিবির সঙ্গে দেখা করতে চায়!

মাহাম চমকালেন না, সহাস্যে বললেন—বেশ তো, দেখা করবে এতে আর দোষ কি? তাছাড়া জালাল যে সে লোক তো নয়, স্বয়ং বাদশাহ, সে সবার সঙ্গেই মোলাকাত করতে পারে।

হামিদা মাহামের কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না, বিরক্ত হয়ে বললেন—কিন্তু।

মাহাম সঙ্গে সঙ্গে কথাটি ধরে বললেন—এতে কিন্তুর কিছু নেই বেগমবহিন। সদ্য বেওয়া রমণীর শোক যদি আকবর একটু

উপশম করে দিতে পারে, তা তো ভালই। আমি বরং এতে উৎসাহই দেব আকবরকে।

সেইসময় আকবরের দারুণ একটা ইচ্ছা করলো, এই দুই রমণীকে বেঁধে কারাকক্ষে নিক্ষেপ করতে। কিন্তু এঁরা যে তার অতি আপনার। এঁদের কিছু বলার সাধ্য তার নেই।

হামিদা এইসময় বললেন—আকবর তুমি আজকাল বড় বেশী একরোকা হয়ে উঠছো। বাদশাহ হতে গেলে যে সংযমী হওয়া উচিত, এ ক্ষমতা তোমার একেবারে নেই।

হঠাৎ আকবর গর্জে উঠলো—আমাকে কি এখনও শিশু মনে কর মা? খানসাহেবকে কে হত্যা করালো?

মাহাম তাড়াতাড়ি আকবরের কাছে এসে তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—জালাল, স্তব্ধ হও। মায়ের কথায় কি রাগ করতে আছে? আমরা তোমার গুরুজন, তাছাড়া রমণী, আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা বর্তমানের দুনিয়ার কি বুঝি? তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি খানসাহেবের বিবির কক্ষে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

এই বলে মাহাম একরকম জোর করে আকবরকে নিয়ে হামিদার কক্ষ পরিত্যাগ করলেন।

অলিন্দ দিয়ে চলতে চলতে মাহাম আকবরকে বললেন—যা হয়ে গেছে তার জন্যে মনে কোন ক্ষোভ রেখো না। খান-সাহেবের শত্রু ছিল অনেক, মরবে একদিন এ জানা কথা। তবে আমাদের কেউ মারে নি এই যা রক্ষা। কে এক মুবারক সে তার পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। বেচারী সলিমার জন্যে কষ্ট হয়। জোয়ান বয়স, শেষপর্যন্ত যে কি করবে তাই চিন্তা! আবার ছেলেটাও বেঁচে আছে। তবে তার জন্য ভাবনা নেই। যখন এখানে এসে পড়েছে রাজসরকার থেকে তাঁর পালনের ভার বহন হবে।

তারপর চতুর্দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আকবরের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপাস্বরে বললেন—বেটা, বলতে মুখে সরম আসে। আমাদের সমাজে নিকা করবার তো প্রচলন আছে। সলিমা বড় খুবসুরত আওরত, তাকে তুমি ইচ্ছে করলে বেগম করে নিতে পারো। বাদশাহের বহুশাদীতে তো দোষ নেই !

তারপর মাহাম থেমে বললেন—আমি শুধ্ বলছিলাম এইজন্যে যে, খানসাহেবের বিবির একটা হিল্লে হয়। বেচারী এর মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে একেবারে শুখিয়ে গেছে !

এইসময় সলিমার কক্ষ এসে গেল। মাহাম আকবরকে কক্ষে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন—আমার কথাটা একটু চিন্তা কর জালাল।

কক্ষের মধ্যে সলিমা তার বাচ্চা লেড়কাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসেছিল। কিছুক্ষণ আগে বোধ হয় কাঁদছিল, এখন আর চোখে জল নেই তবে জলের দাগ চোখের কোণে ছিল।

আকবরকে দেখে তাড়াতাড়ি সলিমা উঠে দাঁড়াতে গেল কিন্তু আকবর তাড়াতাড়ি তাকে উঠতে নিষেধ করলো।

কি সান্ত্বনা জানাবে ? কি দিয়ে বোঝাবে এই সদ্য শোকপ্রাপ্তা রমণীকে ? মনে পড়লো আকবরের একদিনের কথা। সেদিন এসেছিল এই রমণী স্বামীর জীবন ভিখ মাঙতে কিন্তু তাকে আকবর কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ? আজ যে তারই সবচেয়ে লজ্জা ! সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি।

তারপর এই কিছুক্ষণ পূর্বের মাহাম আনাথার কথা মনে পড়লো। কিন্তু তা কি করে হয় ? তাছাড়া এই রমণী সম্মতই বা হবে কেন ? খানসাহেব এই মাত্র মরেছেন। সলিমা ছিল খানসাহেবের পেয়ারের বিবি। কিন্তু যদি সলিমা সম্মত হয়, তাহলে বেশ ভাল হয়। সে সলিমাকে বেগম করতে পারলে দুনিয়াতে আর কিছু চাইবে না।

নসীব যে হঠাৎ এমন গতি পরিবর্তিত করবে কে জানতো ?

সলিমাকে পাবার প্রত্যাশা তার আজকের নয়। সেই কিশোর বয়স থেকে। প্রথম যৌবনের উন্মেষই যে তার জেগেছিল, সলিমা হতে। আজ মেহেরবান খোদা সে সুযোগ তাকে হঠাৎ দিয়ে দিল। সলিমা যদি সম্মত হয় তাহলে খানসাহেবের অনেকখানি উপকার করা হবে। খানসাহেব আততায়ীর হাতে প্রাণটা দিল, তার জন্যে যে গুণাহ সেই অপরাধ তার অনেকখানি নাকচ হবে তার বিবিকে সম্মান দিলে। অবশ্য অন্য বেগমরা ফিরে এলে সে দিতে পারতো না, সলিমার জন্যে তার কিছু করতে যে সব সময়ে দিল্ আগ্রহান্বিত হয়। এখন সলিমার মর্জি।

আকবর তাকালো আবার সলিমার দিকে। সলিমা সেই আগের মতই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে।

এবার আকবর বললো—আমার সান্ত্বনার কোন ভাষা নেই বিবি। আমি খানসাহেবের মৃত্যুর কথা শুনে চমকে গেছি।

সলিমা মাথাটি নত করলো। হয়তো তার চোখে জল এসেছিল।

আকবর আবার বললো—সবই আল্লার মর্জি সলিমা! এত বড় একজন শায়েদ আদমি কি রকম কবুতরের মত জানটা দিলেন!

আকবর ভাবলো সলিমা হয়তো রাজচক্রান্তের কথা বলবে। বাদশাহের গাফিলতির দোষ দেবে কিন্তু কোন অভিযোগই সলিমা পেশ করলো না, শুধু পুত্রের কপালের ওপর উড়ে পড়া চুলগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে দিল।

একটি পরামর্শ আমার নেবে?

আকবরের কণ্ঠে হয়তো অন্য ধরণের এক আমেজ ছিল, সলিমা তার নত মুখখানি তুলে বাদশাহের দিকে চাইলো। সলিমা সুন্দরী, খুব সুন্দরী। এখনও তার যা রূপ আছে তা অনেক আওরতকে পরাজিত করতে পারে। যৌবনের কানায় কানায় এখনও থৈ থৈ জল। তাকালো যখন চোখের কটাক্ষে জেগে উঠলো মৌতাতের আমেজ। অবিন্যস্ত চুলগুলি উড়ে উড়ে কপালের শুভ্র জমিনের

ওপর পড়েছিল, তাতে যে কি শোভা হয়েছিল বলবার নয়। সমস্ত দেহটি কি এক ছন্দময় হয়ে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। আকবরের মধ্যে হঠাৎ পৌরুষ চেতনা জাগ্রত হল। ভোগের স্পৃহা জেগে উঠলো। মনে মনে সে বললো—বেশক এই জেনানাকে এই ফুরসতে লাভ করতে হবে। তবে বলপ্রয়োগে নয়, ধীরে ধীরে মনের মধ্যে আকর্ষণ জাগিয়ে। এই জেনানা-ই একদিন তাকে বাচ্চা মর্দানা বলে উপহাস করেছিল। সেদিন আর আজ অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। এখন বাদশাহ নওজোয়ান। জোয়ান বক্ষের উষ্ণ সান্নিধ্যে বহু রমণীকেই সে এই বয়সে ভোগ করেছে, তবু স্পৃহা অদম্য। এ স্পৃহার বুঝি শেষ নেই। এ তৃষ্ণা বুঝি দুনিয়ার সমস্ত সমুদ্রের পাণি পান করলে পূরণ হবে না।

পেয়ার নয়, বেগমের কবুল দিয়ে সলিমাকে আপনার করবে। এত বড় সম্মান কি সলিমা নাকচ করবে? মনে হয় না। সে জানে, তার এখনকার অবস্থা বড় সঙ্গীন। বাদশাহের হারেমে স্থান হবে বটে তবে সে বড় দীনার মত। অনুগ্রহের দান ছাড়া মিলবে না কোন সোহাগ। তার ওপর পুত্রের ভবিষ্যৎ। অন্তত পুত্রের জন্যেও তাকে ভাবতে হবে।

তাই বুকে বড় আশা নিয়ে আকবর বললো—সলিমা যা হবার সে তো হয়ে গেছে, এখন তুমি নিজের ও তোমার পুত্রের জন্যে কিছু ভেবেছ?

সলিমা মাথা নেড়ে বললো—না সে কিছু ভাবে নি।

পুত্রের ভবিষ্যৎ, তোমার অবশিষ্ট জীবন!

সলিমা নিম্নস্বরে বললো—বেগমসাহেবা এখানেই থাকতে বলেছেন।

আমি থাকার জন্যে বলছি না। খানসাহেব এই রাজবংশের পরমহিতৈষী ছিলেন, যতদিন এ রাজবংশ থাকবে, ততদিন তোমার ও পুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। আমি তা বলছি না। বলছি

সে বাঁচার মধ্যে অনুগ্রহ আছে। তুমি কি কোন সম্মানের বাঁচার প্রত্যাশা কর না?

সলিমা বাদশাহের শেষ কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

আকবরের মনে তখন সাহস উদগ্র হয়েছে। সে গতি সংবরণ করলো না। বললো—আমি যদি তোমাকে সম্মানের মধ্যে বাঁচতে সাহায্য করি, তাহলে কি তুমি রাজী হবে না?

সলিমা তবু হতবুদ্ধির মত বাদশাহের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

আকবর এবার স্পষ্ট হল—আওরতকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ার অর্থ তাকে শাদী করা, আমি খানসাহেবের মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

সলিমা কোন কথা বললো না, মুখটি আবার নামিয়ে নিল।

আকবর আবার বললো—তুমি চুপ করে থেকো না সলিমা। তোমাকে অবহেলিত হতে দিতে চাই না বলে এই নিবেদন। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছো তোমার বেটাকে খানসাহেবের মত সম্ভ্রান্ত করে তুলতে হবে। তার জন্যে অনুগ্রহের দানে তার উপযুক্ত শিক্ষালাভ হবে না। আমার পুত্রের সম্মান পেলে তার সে অসুবিধা থাকবে না। তাছাড়া তোমার বয়সও এখন খুব বেশী নয়। শুধু শুধু তুমি কেন জোয়ান মনকে কোরবাণী দেবে?

সলিমা হঠাৎ বললো—আমি রাজী বাদশাহ।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আকবরের শরীরের মধ্যে দারুণ হিল্লোল বয়ে গেল।

সেখানে আর অপেক্ষা না করে বাইরে এসে সত্বর শাদীর আয়োজনের জন্যে আদেশ দিল। একদিনও আর বিলম্ব নয়। আবার কোথেকে ঝঞ্ঝাট এসে পড়বে কে জানে? এমন কি মৃত-স্বামীর জন্যে মুসলমান সমাজে কি নিয়ম ছিল, সদ্যবিধবা কতদিন পর যেন নিকায় বসতে পারে, এসব কোন প্রথাই আকবর মানলো না।

হামিদা বানু এই শাদীতে খুশি হলেন না। কিন্তু মাহাম খুশি হলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বললেন—জালাল বড় বুদ্ধিমান ছেলে, সে আমার কথা রেখেছে। খানসাহেবের বেওয়াবিবি জোয়ানী শরীর নিয়ে উচ্ছন্নে যেত, সে তাকে বাঁচিয়েছে।

মাহাম সলিমার সাথে আকবরের শাদীতে রাজী হল শুধু অন্য-কারণে। সেকথা অন্তরালেই থাকলো। সলিমার প্রতি আকবরের দুর্বলতার কথা মাহাম জানতেন। এখন শাসন ক্ষমতার প্রায় পুরোপুরি তাঁর হাতে এসে পড়েছে। এই সময় আকবরকে একটু অন্যমনস্ক করে রাখা দরকার। তাই এই চালটি চেলে বাজীমাৎ করে দিলেন।

সেই জালে ধরা পড়ে বাদশাহ এখন সলিমার চিন্তায় বিভোর হল। সে এই বিশেষ কৌশলটি ধরতে পারলো না। আর তার তখন ধরার মত মনের অবস্থাই ছিল না।

সেই সলিমা। যাকে পাওয়ার আশা সেই কিশোর বয়েস থেকে। প্রথম যৌবনের উন্মাদনা এই রমণী হতেই জেগেছিল। সে কথা আজও আকবর ভোলে নি।

শাদী হয়ে গেল। বিশেষ আড়ম্বর কিছু হল না। আকবর করতে দিল না। হামিদাও উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। শুধু মাহাম নিজের ক্ষমতায় এই বেওয়াশাদীতে উৎসবের যা কিছু আয়োজন করলেন।

সলিমা আবার নবপরিণীতার সাজে সজ্জিত হল।

আর আকবর তখন মনে মনে খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে হাস্য সংবরণ করছে। বাচ্চা মর্দানা আজ জোয়ান তাকত পেয়ে সেই রমণীর দর্প চূর্ণ করলো কিন্তু তার মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগছে হঠাৎ আকস্মিক এই পরিবর্তনে। কি করে যে এই শাদী সম্ভব হল, এখনও তার মতলবের বাইরে!

যাই হোক শাদীর উৎসব শেষে সেই মিলন রাত্রি এসে গেল।

আজ আকবর শাদীর কর্তব্যে আগ্রহান্বিত। এই প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন রুকমির সঙ্গে এই মিলন মুহূর্তটি ছিল। সেদিন আকবর তখন শিবালীর জন্যে চিন্তিত। তাছাড়া যে শাদী তার ইচ্ছায় হয় নি, তার প্রতি তার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আজ পূর্ণ সেই ইচ্ছা তার দেহের অনুতে অনুতে আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন করলো।

এখানে সলিমার ইচ্ছার কোন গুরুত্ব থাকলো না। সলিমা গৌণ। সলিমার যৌবনপুষ্ট দেহটাই কাম্য। আর আকবরের সেই কবুল, খানসাহেবের মৃত্যুর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত, একটি যুবতী বেওয়ার বরবাদী জিন্দেগী সম্মানিত করা, খানসাহেবের পুত্রের ভবিষ্যৎ—এ সব দায়িত্ব বুঝি এখন পিছনে সরে গেছে। কৌশল করে সেই চিরবাঞ্ছিত সলিমাকে পাওয়ার জন্যেই বাদশাহের আশা ছিল। তাই সেই মিলন রাত্রিটিকে সাক্ষী রেখে আকবর পূর্ণতৃপ্তিতে নেমে গেল এক উষ্ণসমুদ্রের প্লাবনে।

শুধু সে রাত্রিই নয়, তারপর কয়েক রাত্রি কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, কেউ জানে না। শুধু মাঝে মাঝে ছন্দ নষ্ট হয়েছে, সলিমার পুত্র আব্দুর রহিমের অত্যাধিক আবদার, কক্ষে এসে সে মায়ের কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বাদশাহের মুখে বিরক্তির ছায়া জেগে উঠেছে। মনে মনে আকবর ভেবেছে খানসাহেবের স্মৃতি মুছে দিলে কেমন হয়? কিন্তু বেইমানীকে সে প্রশ্রয় দেয় না, তাই বিরক্ত হলেও আব্দুর রহিমের সেই অত্যাধিক মাতৃআকাঙ্ক্ষা অনেক সংযমের মধ্যে সহ্য করেছে।

একদিন আকবরের কানে গেল, মা তাকে লম্পট বলেছেন। আর দ্বিরুক্তি না করে সে সলিমা ও তার ছেলেকে নিয়ে আগ্রাপ্রাসাদে চলে গেল। যাবার সময় সে আধমখানকে সঙ্গে নিতে ভুললো না। আধমকে সে ভোলে নি। আধম তার বেগমকে নষ্ট করেছে। সঙ্গে

এবার আরো একজনকে সে নিল, পীরমহম্মদ। পীরমহম্মদ ও আধমকে একসঙ্গে নিয়ে সে যেন কিছু তখন ভাবছিল।

৩১

আকবর আগ্রার প্রাসাদে ফিরে এলেও তার মন কিন্তু দিল্লীতে পড়ে থাকলো। একটু অন্য চিন্তার ইঙ্গিত তার মধ্যে জেগে উঠেছে। তার রক্তের মধ্যে কোথায় যেন সচেতনতা। পূর্ব-পুরুষের রক্তের ধারায় যে রাজত্ব করবার নেশা, সেই নেশা যেন জেগে উঠছে। আগে যে শাসন ক্ষমতার গুরুভার তাকে শক্তি দিত না, এখন যেন সেই শক্তি তার জেগে উঠতে লাগলো। তার রাজ্য কেউ শাসন করবে, এ বরদাস্ত নয়। তাছাড়া এখন জেনানা শাসনই চালু হয়েছে। অন্তঃপুরের জেনানারা দরবারের কর্ত্রী। বিশেষ করে মা ও ধাত্রীমা মাহামবিবি প্রধান। মা এত সাহস করতেন না, মাহাম বিবির সাহায্য পেয়ে এত শক্তি হয়েছে। না'হলে কার প্ররোচনায় খানসাহেব নিহত হলেন, এ আর অজানা নেই।

সেখানেই সে গোপনে শুনেছে, মালব জয় করার জন্যে তোড়জোড় চলছে। মালব এখন কার অধীনে তার জানতে বাকী নেই। মাণ্ডবের অধিপতি এখন পাঠান বীর সুজায়াত খানের পুত্র সুলতান বজবাহাদুর। বজবাহাদুর এখন রাজ্যশাসনে যতো না আগ্রহী সঙ্গীতের প্রতি তার ততো আকাঙ্ক্ষা। অপূর্ব সঙ্গীতের কথা তার কাছেও অবিদিত নেই। একটি তসবীরওয়ালী একদিন রাজপ্রাসাদে এসে বজবাহাদুর ও তার বেগম রূপমতীর যুগল ছবি বিক্রী করতে এসেছিল। রূপমতীর শুধু রূপ ছিল না, তারও মধ্যে

সঙ্গীতের মূর্ছনা ছিল। বজবাহাদুর সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। রূপমতীর মত এক অভিনব নারীরত্ন পেয়ে তিনি মুগ্ধ।

আকবর সেদিন ঈর্ষান্বিত হয়েছিল কিন্তু মালব কেড়ে নেবার কোন মতলব করে নি। আজ দিল্লীর রাজদফতরের গোপন মতলব জেনে সে মনে মনে আহত হল।

রূপমতীর রূপ তাকে একদিন মুগ্ধ করেছিল। নারীর রূপ পুরুষ দেখলে যে অনুভূতি জাগে, আকবরের মধ্যে তা জেগেছিল কিন্তু বজবাহাদুরের দিল জখম করে ছিনিয়ে নিতে বাসনা হয় নি। তাছাড়া আকবর নিজে সঙ্গীত পিপাসু। সেই মালবদম্পতি সঙ্গীতজ্ঞ জেনে সে খুশি হয়েছিল। তার বরং ভবিষ্যতের বাসনা ছিল, একবার সেই মালবদম্পতিকে আমন্ত্রণ করে সাড়ম্বরে তাদের গীতসুধা উপভোগ করবে।

কিন্তু এখন শুনছে মালব আক্রান্ত হবে মুঘল সৈন্যের দ্বারা।

হঠাৎ সে মতলব করলো, দিল্লী থেকে বাহিনী প্রেরণের আগে সে তার নিজস্ব বাহিনী মালবে প্রেরণ করবে এবং বজবাহাদুর যদি সন্ধিস্থাপন করেন, তাহলে তার পূর্বাভিলাষ জ্ঞাপন করবে। আর যদি সন্ধি না করেন তাহলে যুদ্ধ কিন্তু সে যুদ্ধ আধম খান ও পীরমহম্মদ পরিচালনা করবে। যদি তারা যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহলে রাজসরকারের পুরস্কার তাদের প্রাপ্য। আর যদি যুদ্ধে নিহত হয়, তাহলে দুটি শত্রু ধ্বংস হবে। রুকমির পরিণাম যে কিছুতে ভোলা যায় না। পীরমহম্মদও কোন অংশে কম নয়। এই ধার্মিক পুরুষের বর্তমান প্রকৃতি এতো জঘন্য হয়ে উঠেছে যে সহ্যাতিরিক্ত। তাছাড়া পীরসাহেব একদিন খানসাহেবকে হত্যা করতে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

নিজের হঠাৎ প্রাপ্য কৌশলে আকবর চমকিত হল। সে বুঝতে পারলো, তার অন্য এক অভিনব রাজশক্তি তার ভেতরে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। সে তখনই আধম খান ও পীরমহম্মদকে

ডাকতে পাঠালো। ওরাই দুজনে এক বাদশাহের নিজস্ব বাহিনী নিয়ে গোপনে মালবের দিকে রওনা হবে। তার নিজেরও সঙ্গে থাকলে ভাল হত কিন্তু সদ্যপ্রাপ্ত সলিমাকে এখন ছেড়ে যেতে ইচ্ছে নেই। এখনও সলিমার কাছ থেকে পাওয়ার অনেক কিছু আছে। সলিমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উষ্ণতাপের সীমাহীন দাহ। সলিমা শুধু দেয় না, গ্রহণও করে অনেক কিছু। আজ সে বুঝতে পাচ্ছে খানসাহেব কিসের মজা পেয়ে দিনরাত সবকিছু ভুলে থাকতেন। সেও তো ভুলছে অনেক কিছু। আগের মত আর যৌবনের অস্থিরতা তাকে পাগল করে না। বর্তমানে আর কোন নারীর প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা জাগে না। সলিমার সান্নিধ্য পেয়ে সে বুঝেছে দুনিয়াতে সব রমণীর প্রকৃতি এক নয়। রমণীর দেহ হয়তো এক কিন্তু তাদের ভিন্ন ভিন্ন আচরণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন আচরণে অভিনব সোহাগ। সলিমা শুধু তাকে সান্নিধ্যই দেয় না, মায়ের মত স্নেহের স্পর্শ দিয়ে পৌরুষের শক্তিকে জাগ্রত করে। সলিমা পরামর্শ দেয়, বলে, বাদশাহ, তুমি প্রকৃতস্থ হও। নিজের সিংহাসনে নিজে বসে অধীনকে হুকুম কর। অশান্ত মন নিয়ে আর বিক্ষোভ সৃষ্টি করে নিজে দগ্ধ হয়ো না। লোকে তোমাকে আড়ালে কি বলে জানো—অপদার্থ?

সেইজন্যে আকবরের চেতনা জাগছে। পূর্বপুরুষের রক্ত তার শরীরে প্রবাহিত। তারা যোদ্ধৃবংশের লোক। মাথা কখনও তারা নত করেনি। অসির ঝনঝনানিতে দুর্বলকে বশ করে মস্তক উত্তোলিত করেছে। এতকাল বালক ছিল বলে সে নিজেকে অক্ষম মনে করতো, আজ তো আর সে লজ্জা তার নেই। তাই নয়া বেগমের পরামর্শ তার মনে নতুন ভাবের সঞ্চার করেছে। এবার সে নিজের রাজত্ব নিজেই শাসন করবে।

সেইজন্যে মালবের পথে বাহিনী প্রেরণ করবে রাজসৈন্য যাবার পূর্বে। সুশিক্ষিত বাদশাহী সৈন্য ছুটে চলবে ধুলার ঝড় উড়িয়ে

দুর্দ্দাম বেগে। সকলে সচকিত হয়ে দেখবে বাদশাহ মুঘল শাহনশা আর ঘুমিয়ে নেই, সে সজাগ হয়েছে সে প্রচণ্ড হয়েছে, সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে কারুর আর মাথা তুলবার উপায় থাকবে না। মাণ্ডবগড় আক্রমণ করবার কোন বাসনাই তার ছিল না। সঙ্গীতসাধক বজবাহাদুর, সৌন্দর্য পিয়াসী বায়াজীদ নর্মদা নদীর বুকে জ্যোৎস্না কুহেলী জড়ানো বিস্ময়ভরা রাত্রে কিন্নরকণ্ঠি গায়িকা ও নর্মসহচরীদের নিয়ে সুরের ইন্দ্রজাল বুনতে বুনতে সারাজীবন ধরে প্রমোদতরণীতে ভেসে ভেসে বেড়াক। প্রিয়সঙ্গিনী সুরসম্রাজ্ঞী রূপমতীর বাহুলোরে আবদ্ধ হয়ে তার কণ্ঠের সুধারসে আচ্ছন্ন থাক সেই মাণ্ডুরাজ—তার সেই স্বপ্ন ভেঙে দেবার কোন পরিকল্পনাই বর্তমানে ছিল না।

অন্তত খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যগুলি জয় করার পূর্বে মাণ্ডু সে আক্রমণ করতো না। বজবাহাদুরকে সুলতান বলে সে শ্রদ্ধা করে না। শ্রদ্ধা করে সঙ্গীতজ্ঞ বলে। সেইজন্যে দাক্ষিণাত্য অভিযানের পূর্বে তার কথা সেইসময় ভাববে বলে আলাদা করে রেখেছিল। এমন কি তার মনগত ইচ্ছা ছিল, যদি কখনও মালবের দিকে যায় সে, তাহলে মাণ্ডুঅধিপতির আতিথ্য নিয়ে সঙ্গীত উপভোগ করে আসবে। যে পুরুষের মধ্যে এমনি সঙ্গীতের মূর্ছনা, না জানে তার হৃদয় কত কোমল!

আকবর নিজে সঙ্গীতপিয়াসী, তাই সঙ্গীতময় পুরুষকে আপন হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা করতো।

কিন্তু সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হল। বজবাহাদুরের রাজকোষে আছে অপর্যাপ্ত ধনরত্ন, অতুল ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দিল্লীর ভাণ্ডারে এনে পূর্ণ করবার জন্যে রাজন্যদের এই মালব অভিযান।

আকবর এবার যুক্ত করলো তার অভিযানে শুধু অতুল ঐশ্বর্যই হাতের নাগালে আসবে না, সে নিয়ে আসবে এক দুর্লভ রত্ন, যা দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়ে পাওয়া যায় না, বজবাহাদুরের

সঙ্গীত প্রিয়া রূপমতী বেগমকে। রূপমতী শুধু অন্তঃপুর আলো করবে না, দরবারের শোভা অলঙ্কিত করে অন্তঃপুরের বিশেষ অংশ থেকে তার সঙ্গীত সুধা পরিবেশন করবে। যেমন মালবে সুরের ইন্দ্রজালে নর্মদার স্রোত নৃত্যছন্দে বয়, তেমনি যমুনা বইয়ে আবেশ শিহরণ গতিচ্ছন্দে।

এইসময় আধম খান ও পীরমহম্মদ কক্ষে এসে বাদশাহকে সেলাম করলো। বাদশাহ গোপন পরামর্শে বসলেন সেনানায়কদের নিয়ে। এর মধ্যে আধম খানের অধীনে এক বাহিনী ছিল ও পীরমহম্মদের অধীনে অন্য এক! দুজনের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল বাদশাহের নিজস্ব বাহিনী। তারা গোপনে আজই রাত্রে মাণ্ডবগড়ের দিকে রওনা হবে। এ সংবাদ দিল্লীতে গোপন থাকবে। সমস্ত অস্ত্রসস্ত্র, কামান, রসদ সব আগ্রা থেকে নেওয়া হবে! এবং প্রাসাদের দুর্গাধ্যক্ষ মুনিম খান ব্যতিত এই সংবাদ কেউ জানবে না। জয় হলে সবাই জানবে, জয় না হলে কাউকে জানানো হবে না।

তারপর বাদশাহ বললো রূপমতীর কথা। বজবাহাদুরের হারেমে আছে অনেক রূপসীর হাট, আর আছে ধনভাণ্ডারে অতুল ঐশ্বর্য। সব উদ্ধার করে আনতে হবে, বিশেষ করে সেই সঙ্গীতরসিকা রূপমতীকে। বাদশাহ মৃদু হেসে বললো—অবশ্য অন্যান্য রূপসীগুলি তোমাদের।

আধম খান এই কৌতুকে হাসলো না। সে তখন ভাবছে, বাদশাহ কি সত্যিই মালব জয় করতে পাঠাচ্ছে? না, অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? রুকমির কথা কি বাদশাহ ভুলে গেছে? কিছুদিন ধরে আধম খান কেমন যেন সন্দিগ্ধ রোগে ভুগছিল। যতদিন ধরে সে বাদশাহকে দেখছে, বাদশাহ কখনও গুণাহ ক্ষমা করে না।

যাই হোক, ভাবনাই সম্বল, উপায় কিছু নেই। বাদশাহের

মুখ থেকে যখন আদেশ প্রচারিত হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে! না হলে আবার আক্রোশের মাঝে পড়তে হবে। ওদিকে মায়ের অবস্থা কি বোঝা যাচ্ছে না। মা দিল্লীর প্রাসাদে বসে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। সৈন্য, অর্থ, ক্ষমতা, শাসনভার সবই করায়ত্ত। প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাগুলিই তিনি পেয়েছেন কিন্তু সে ক্ষমতা অদ্ভুত ক্ষুরধার বুদ্ধিতে প্রাপ্ত, কেউ তাকে দেয় নি। আমীর-ওমরাহরা এখন মায়ের হুকুমে সবকিছু পালন করছে। তবু মা শেষবার দেখা হতে সাবধান করে দিয়েছেন—বেটা, আমি তোরই জন্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। তবু এখনও বিপদ কাটে নি। সাবধানে থাকবে। বেগমসাহেবা শাহীজেনানার ইজ্জত নিতে খুব ক্ষেপে আছেন।

তবু আধম ভাবলো—একবার যদি মায়ের সঙ্গে দেখা হত? তাহলে অন্তত এই অভিযানের সম্পর্কে একবার পরামর্শ করে নিত কিন্তু বাদশাহ সে সুযোগ দিচ্ছে না, আজ রাত্রেই ফৌজ নিয়ে রওনা হতে হবে।

আধম খান চুপ করে আছে দেখে আকবরের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। তার স্বর হল আরো গম্ভীর ও আদেশপূর্ণ—আধম খান, মনে রেখো আমার আদেশ বাদশাহের আদেশ। অবমামনা করলে শাস্তি অনিবার্য, আর যদি যুদ্ধ জয় করতে পারো তাহলে দরবারের উচ্চপদ অলঙ্কৃত করবে। তোমাদের ওপর আমি অনেকখানি নির্ভর করে মালব দখল করতে পাঠালাম।

তারপর সেদিনই গভীররাত্রে অপর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আধম খান ও পীরমহম্মদের কর্তৃত্বাধীনে বিরাট এক রেশালা বাহিনী এগিয়ে চললো। নিকষ কালো অন্ধকারের মাঝে দুর্গতোরণের ওপর বাদশাহ তাদের বিদায় জানালো। বাহিনীর প্রথম সারিতে থাকলো বাদশাহের সুশিক্ষিত সৈন্যরা, তাদের পরিচালনাধীনে শেখ

আবদাল্লা বলে এক বীরপুরুষ। আকবর তাকে প্রচুর বিশ্বাস করতো, সেইজন্যে তাকে দিল সর্বপ্রথমে। তারপর পীরমহম্মদ ও সর্বশেষে আধম খান। দুজনের ওপর বিশ্বাস করেও বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলেন না, সে কথা তিনি আলাদাভাবে আবদাল্লাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সমস্ত বাহিনী নিঃশব্দে দুর্গ পরিত্যাগ করলে, কামানের গাড়ী রসদ বোঝাই অশ্বগুলি চলে গেলে বাদশাহ মনের মধ্যে এক শান্তি গ্রহণ করে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন।

রাত্রি তখন বেশ গভীর। প্রাসাদপুরী নিঝুম হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে কিছু মশালের আলো জ্বলছিল তাতে যা কিছু মৃদু আলোর বিচ্ছুরণ।

আকবর পয়দালে এসে সলিমা বেগমের কক্ষে ঢুকলেন। অন্ধকারে কক্ষের বাইরের বারান্দায় তখনও সলিমা দাঁড়িয়েছিল। বাদশাহ বেগমকে কক্ষে না দেখে অনুমানে বারান্দায় গিয়ে পিছন থেকে সলিমার কাঁধে হাত দিলেন।

সলিমা নিঃশব্দে বাদশাহের পেয়ার উপভোগ করে মৃদুস্বরে বললো—আজ আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হলাম। পুরুষের মতই আজ বাদশাহ কাজ করতে গর্বে আমার বুক ভরে যাচ্ছে। যার বাহুতে আছে অসীমশক্তি, হৃদয়ে আছে অদম্য সাহস, যে ইচ্ছে করলে সমস্ত দুনিয়াটা মুঠির মধ্যে পুরে আয়ত্ত করতে পারে—পূর্বের প্রকৃতি দেখে সত্যই বিস্মিত হতাম। আজ আমার সে বিস্ময় গেছে। এখন মনে হচ্ছে, আমি সাচমুচ এক শক্তিমান পুরুষের পেয়ারীবেগম।

আকবর মৃদুহেসে সলিমার স্তুতি গ্রহণ করলো, তারপর বললো—তোমারই মদতে বিবি। এমন করে কে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে? তুমি আজ আমার সেই লুপ্তশক্তিকে টেনে বের করেছ বলে এই সাহস ও উদ্যম। এ তোমারই দান।

সলিমা কোন কথা বললো না, সে তখন অন্ধকারে অলিন্দ দিয়ে দূরে প্রাসাদের উচুঁ মিনারগুলি দিকে তাকিয়েছিল। মেঘের বিচিত্র আবর্তন তখন চন্দ্রের চতুর্দিক ঘিরে। সলিমা আসমানের দিকে তাকিয়েই ভাবছিল, চন্দ্রের মতই বাদশাহের জীবন! শুধু অস্থির জীবনের আবর্তে বহু মানুষের আনাগোনা। আজ বাদশাহ তার কত কাছে কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী। দুদিন পরে বাদশাহের মন আবার কোথায় চলে যাবে?

সলিমার বুক চিরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

আকবর তখন অন্যকথা ভাবছিল, বেগমকে নিরুত্তর দেখে বললো—ভেতরে যাবে না?

সলিমা মাথা নেড়ে বললো—যাবো। তারপর বললো—একটা কবুল আজ করবে? আমার রহিমকে তুমি তোমার ছায়ায় মানুষ করবে। সে যেন ঠিক তোমার মত হয়। আর যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, সে যেন তোমার প্রহরাধীনে থাকে।

আকবর আহত হয়ে বললো—কিন্তু এ কথা কেন আজ বেগম? আমি তো তোমায় কথা দিয়েছি!

সলিমা বললো—কি জানি কেন ভয় করে, সে কথার বুঝি মূল্য থাকবে না?

আকবর অন্ধকারে সলিমার মুখের ওপর তাকাবার চেষ্টা করলো, তারপর দুঃখিতস্বরে বললো—কারুর কখনও বিশ্বাসের পাত্র হতে পারলাম না। এই আমার সবচেয়ে বড় ভাগ্য।

সলিমা বাদশাহের কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়ে বললো—গোসা কর না সম্রাট। তোমাকে আমি খানসাহেবের চেয়েও বিশ্বাস করি। তবু তুমি বাদশাহ। মানুষ হিসাবে তোমার তুলনা হয় না কিন্তু খোদা তোমাকে বাদশাহ করে পাঠিয়েছে। বাদশাহের জীবনে বহু মানুষের ভীড়, বিশেষ একজনের কথা ভাববার ফুরসৎ কোথায়? আজ তুমি আমার কক্ষে আসার জন্যে ব্যাকুল কিন্তু

একদিন তুমিই দেখবে তোমার আর আসতে ইচ্ছে করে না। এ তোমার গুণাহ নয়, এ বাদশাহের ধর্ম। আমি পুরোনো হয়ে আসছি, তোমার উন্মাদনাও মন্দীভূত হচ্ছে। একদিন তাও থাকবে না। সেদিনের জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই, দুঃখ রহিমের কথা চিন্তা করে! রহিম কি করে মানুষ হবে? রহিম কেমন করে বড় হবে? সলিমার কণ্ঠস্বর আদ্র হয়ে, রুদ্ধ হয়ে গেল।

আকবর চমকিত হয়ে সলিমার মুখখানি দু'হাতের নাগালে তুলে ধরলো। তারপর সহজকণ্ঠে বললো—তোমার কোন কথাই আমি অস্বীকার করবো না। তুমি অনেক বেশী বুদ্ধিমতী, তোমার শরীরেও আছে মুঘল শোণিত। মুঘল বংশের আমি নতুন বাদশাহ নয়। এর আগের বাদশাহদের জীবন ধারণ সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে। তবে আমার অনুরোধ, পূর্ব বাদশাহদের ছায়া থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমি ভাগ্যগুণে বাদশাহ হয়েছি বটে কিন্তু মনুষ্যত্বের বিবেককে জলাঞ্জলি দিই নি। বার বার আমি আমার চেতনাকে সজাগ ও তীব্র করেছি। আমার মায়ের কাছ থেকে যে প্রেরণা পাই নি, আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। হয়তো দেহগত কামনায় তোমায় অবহেলা করবো, মনের স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে আমি বার বার তোমার আশ্রয়ে আসবো। আমি কখনও ভুলবো না, তুমি আমার লুপ্তশক্তি জাগ্রত করতে সহায়িকা হয়েছিলে।

তারপর আকবর নিঃশ্বাস নিয়ে বললো—আব্দুর রহিমের জন্যে তোমার যে চিন্তা সে চিন্তা থেকে তোমাকে শুভকল্যাই রেহাই দেব। তাকে সর্বসমক্ষে আমি পোষ্যরূপে গ্রহণ করবো। সে হবে সম্রাট আকবরের পুত্র, সম্রাটের মতই তার ক্ষমতা হবে। আমি আজ নিজের আত্মার কসম খেয়ে কবুল করছি, সে হবে আমার দরবারের একজন মানীলোক!

সলিমা শুধু বাদশাহের সান্নিধ্যে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে তার প্রশস্ত বুকের ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তারপর একসময়ে তারা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলো।

রাত্রির শেষযামের প্রহর তখন নেমে এসেছে। ঢলে পড়েছে চন্দ্রিমার প্রহর যাপনা। কুসুমের জন্মের কাল আসন্ন। মধুমক্ষিকার সম্ভোগ তৃষ্ণার উন্মাদনা শেষ হয়েছে। এখন ক্লান্তির প্রহরকাল। বাগিচায় শুধু আনন্দের শিহরণে কুসুমের প্রাণে হিল্লোল। কোরক থেকে শুধু জাগছে প্রকাশ।

পরদিন সকাল থেকে কিন্তু জেনানা মহলে বেশ একটা আলোড়ন জেগে থাকলো। কে সলিমা বেগম সাহেবার সরবতে বিষ মিশিয়েছে!

গোপন থাকলো না ষড়যন্ত্র। ধরা পড়লো যে সরবতে বিষ দিয়েছিল। যে বিষ দিয়েছিল সে একজন সাধারণ বাঁদী। বাঁদী ধরা পড়তে কবুল করলো আলিমন বিবির হুকুমে সে এই কাজ করেছে।

বাদশাহের সামনে আলিমনকে দাঁড়াতে হল।

অনেকদিন পর বাদশাহ আলিমনকে দেখলো। সলিমাকে বেগম করবার আগে পর্যন্ত আলিমন ছিল বাদশাহের পেয়ারের খতরনাক। আজ আলিমনকে দেখে আকবর বিস্মিত হল। মনে পড়ল, আলিমন চেয়েছিল বেগম হতে। বলেছিল, বাদশাহ আমি তো আমার সব দিলাম। বেগমসাহেবা একদিন আমাকে তোমার বেগম করতে চেয়েছিল। তোমার কাছে আর আমি কিছু চাই না, শুধু বেগম করে দাও। আমি বাদশাহের বেগম এইটুকু উপাধি পেলেই আমার সারাজীবন চলে যাবে। আর আমি তোমার সান্নিধ্যও কামনা করবো না।

কিন্তু আকবর সেদিন কথা দিতে পারে নি। আজ সেইকথা তার মনে পড়লো। তাই জিজ্ঞেস করলো—আলিমন তুমি কেন এই কাজ করতে গিয়েছিলে? কেন আমার বেগমের প্রাণ নিতে চাও?

এতটুকু ভয় নেই আলিমনের, সে সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয়ে উত্তর দিল—বাদশাহ কি জানে না কেন? তারপর ব্যঙ্গকরে বললো—বাদশাহের বিচার অদ্ভুত। রাজপুত লেড়কী শিবালী দিল না মহব্বত, তাকে পাবার জন্যে বাদশাহ মেহনত করলো। রুকমিবিবি মাসুম ইজ্জত নিয়ে বাদশাহের বেগম হল, সে পেল না বাদশাহের সোহাগ। আমি আমার সব দিয়ে বাদশাহের প্রবৃত্তির শিকার হলাম, শুধু চাইলাম মাত্র বেগম হতে, বাদশাহ পুরণ করলো না সে আশা। এখন বাদশাহ যাকে বেগম করে সব দিল সে পূর্বে ছিল খান শাহেবের বিবি। একটি লেড়কার মা। একটি লেড়কাশুদ্ধ এক বেওবা বিবির মায়াতেই শেষপর্যন্ত বাদশাহ মজলো।

আলিমন খিল খিল করে হেসে উঠলো।

হতবুদ্ধি বাদশাহ হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠলো—খাঁমোশ! তুমি কেন বেগমকে হত্যা করতে গিয়েছিলে তাই বলো?

আলিমনও বাদশাহের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার করে বললো—হিংসায়, দারুণ হিংসায়। আমি বেগম হতে পেলাম না সেই আক্রোশে।

স্পষ্ট উক্তিতে বাদশাহ আরো প্রচণ্ড হল। অস্ফুটস্বরে বললো—স্পর্দ্ধা সীমাহীন! তারপর চীৎকার করে ডাকলো—রক্ষী! রক্ষী এলে বললো—এই বেসরম আওরত কো ঠাণ্ডি ঘরমে বন্ করকে রাখ্ দেও।

আলিমন হঠাৎ চীৎকার করে অভিসম্পাত দিয়ে বললো—দেখবে তুমি একদিন ধ্বংস হবে! শক্তির সাহায্য হয়তো শ্রেষ্ঠ সম্রাট হতে পারবে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তুমি শান্তি পাবে না। ঝুট পেয়ারের ইন্তেজারে ভুখে ভুখে তুমি সাহারা হয়ে যাবে।

রক্ষী আলিমনকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

৩২

কতদিন তারপর গত হল।

মালব থেকে এখনও কোন খবর আসে নি। বাদশাহী ফৌজ মালবে পৌঁছলো কিনা তারও কোন ঠিকানা নেই। তবে খবর এসেছে দিল্লী থেকে! হামিদা বানুর খত নিয়ে এক অশ্বারোহী এসে হাজির। কৈফিয়ৎ চেয়েছেন বেগমসাহেবা আকবরের এই আকস্মিক আচরণের।

আকবর কোন উত্তর পেশ করে নি, সে তখন আরো অন্যকিছু ভাবছিল। একটি ক্ষুদ্ররাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে হবে না, দিগ্বিজয় করতে হবে। বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চেঙ্গিজ খাঁর স্বপ্ন, তৈমুরের বাসনা, বাবর শাহের ইচ্ছা আর হুমায়ুন শাহের প্রার্থনা সে সফল করবে। খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যগুলি জয় করে বিরাট সাম্রাজ্যের পরিধি সৃষ্টি করতে হবে। আর প্রতি মানুষের সুখদুঃখের বাদশাহ হয়ে তাদের আশীর্বাদ যাঞা করতে হবে। হিন্দু প্রধান দেশ, অথচ হিন্দুরাই বিশেষভাবে অবহেলিত। ধর্মের ভেদাভেদ নিয়ে মানুষ-ধর্মের প্রতি অবমাননা, এ অন্যায়, এ ঘোরতর অন্যায়। অন্তত এক শাসনতন্ত্র হোক, একজন কর্তা হোক কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারী হবে না, সে হবে সবার পিতা। পিতা যেমন তার সন্তানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে প্রতিপালিত করে, তেমনি ভাবে রাজার কর্তব্য করা উচিত।

এই স্বপ্নই তখন আকবর দেখছিল। কেউ তাকে এই স্বপ্নের মাঝে প্রবেশ করায় নি, তার উন্মেষই তাকে কল্পনা জোগাছিল। ধর্ম হবে এক, সে ধর্মের কোন ভেদাভেদ থাকবে না। মেহেরবান আল্লাহ প্রত্যেককে একই আকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন,

তিনি তো কোন ভেদাভেদ করেন নি? তবে কেন এই উচ্চ, নীচ, ধর্মাধর্ম, ধনী দরিদ্রের শ্রেণী বিচার!

আকবর সেইজন্যে আর বসে নেই, নেমে এসেছে সৈনিকদের মাঝে, কসরতের অপূর্ব সব কৌশলগুলি আয়ত্ব করে সৈনিকদের আবার শিক্ষিত করে তুলছে।

অন্তঃপুরের গোলমালে আর তার মন নেই। এবার বাইরের পথে দৃষ্টি। তার হাতে সর্বদা একটি হিন্দুস্তানের নক্সা। কি যেন সে ভাবছে?

রুকমি বরবাদী জীবন নিয়ে শুধু কক্ষের মধ্যে বদ্ধ হয়ে সরাব পান করে চলেছে। হুঁশ সে চায় না, যেন সারাজীবনটি তার বেহোঁশ হয়ে থাকে। বেহোঁশীর মধ্যে থাকলে কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হয় না। আলিমনকে ঠাণ্ডাকক্ষ থেকে নিয়ে এসেছে সলিমা বেগম। সলিমার কক্ষেই যা একটু আসে আকবর।

আকবর এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ক্ষণে ক্ষণে তার মুখমণ্ডল ক্রোধে পশুসদৃশ হয়ে উঠছে। বেইমান আধম খান ও পীরমহম্মদের কোন ঠিকানা নেই। এ অবস্থায় কি করা সমুচিত? বাদশাহ ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছে না। সেইজন্যে তার মধ্যে অস্থিরতা প্রচণ্ড। অলিন্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ছুটে নেমে যাচ্ছে দুর্গের সিংহদ্বারের কাছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে প্রাসাদের সর্বোচ্চ মিনারে। দূরে সড়ক পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কোন ঘোড়ওয়ার দূত আসছে কিনা পরীক্ষা করছে।

তারপর রাত নেমে আসছে। বাদশাহের চোখে রাত্রিবেলা ঘুম নেই। সলিমা বুঝতে পেরে সান্ত্বনা দান করছে। বাদশাহের শিয়রে বসে তাকে আরাম দেবার চেষ্টা করছে।

এতবড় বেইমানি করবার সাহস তাদের নেই। তারা কি জানের পরওয়া করে না?

সলিমার কথায় বাদশাহের মন মানে না। তবু নিরুত্তরই

থাকে, কিছু বলে না। কে জানে? কি যে ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছে না! অন্তত একটা খবর আসা উচিত। মালব অধীকৃত না হোক, অন্তত তারা মালবে পৌঁছেচে, এই খবর। শেখ আবদাল্লাও কি তার সঙ্গে বেইমানি করলো?

এমনি সময়ে একদিন প্রত্যুষে ছজন অশ্বারোহী এসে বাদশাহের জয় ঘোষণা করে সেলাম পেশ করলো।

বাদশাহ তাদের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করলো।

একজন অশ্বারোহী এগিয়ে এসে বললো—হুজুর, মাণ্ডবগড় অধীকৃত হয়েছে। বজবাহাদুর পরাজিত হয়ে সারংগপুর রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে। ধনরত্ন সব ফৌজের অধীনে এসেছে। কিন্তু রূপমতী বেগমকে জীবিত পাওয়া যায় নি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

হঠাৎ বাদশাহ গর্জে উঠলো—মিথ্যা কথা, এ আধম খানের চাতুরী। সেই কমবক্তের দল সেখানে কি করছে?

হুজুর, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এখনও নির্যাতন চলছে।

কে নির্যাতন করতে বলেছিল? আমি মালব অধিকার করতে বলেছিলাম। বজবাহাদুরের প্রিয়তমা বেগম রূপমতীকে আগ্রাতে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্তঃপুরের দখল ও অতুল ঐশ্বর্য অধিকার করতে বলেছিলাম। এসব কে করতে বলেছিল? কেন তারা দুর্বল মানুষের ওপর অত্যাচার করছে?

অশ্বারোহীদের মুখে আর কথা যোগালো না।

কিছুক্ষণ তাদের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বাদশাহ বললো—তোমরা আমার সঙ্গে মালব যেতে পারবে?

হুজুর!

আমি মাণ্ডবগড় দুর্গে যাবো, তোমরা আমাকে অনুসরণ করতে পারবে কিনা বলো?

অশ্বারোহীরা মাথা নেড়ে বললো—জী হুজুর, পারবো।

তারপর দু'শ সত্তর মাইল পথ। সে সময় গ্রীষ্মকাল। দারুণ

খরতাপে চতুর্দিক উত্তপ্ত। সবকিছু বাধা অতিক্রম করেই আকবরের অশ্ব দুর্দ্দাম বেগে ছুটে চললো। এমন কি তার সঙ্গীরা মাঝে মাঝে সমতা রক্ষা না করতে পেরে পিছিয়ে পড়তে লাগলো। আকবরের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার তখন দৃষ্টি সম্মুখ পথে। ক্লান্তি নেই, অবসাদ এলেও সে তা পরিহার করছে। কত তাড়াতাড়ি মালবে পৌঁছনো যায়, তারই চেষ্টা সর্বদেহে।

রূপমতীকে নিশ্চয় আধম খান গুম করেছে। রূপমতীর সৌন্দর্য দেখে ঐ লম্পট পুরুষ আর তার প্রবৃত্তি দমন করতে পারে নি, সেখানেই বসে মজা লুটছে। তাই যদি হয়, তাহলে এবারই খতম হবে আধম খানের প্রাণ। রুকমির ইজ্জত নেওয়ার শাস্তি কবুল হবে।

আকবর সেইজন্যে ছুটছে দারুণ বেগে।

বাদশাহ যখন মালবে যাচ্ছিল, আর একজন মালবের পথে রওনা হয়েছেন, সে হল মাহাম আনাঘা। দিল্লীতে বসে লোক মুখে সব খবরই সংগ্রহ করেছিলেন মাহাম বিবি। তাঁর কানেও গিয়েছিল আধমের পরবর্তী কার্যধারা। রূপমতী সত্যিই আত্মহত্যা করেছে, না পুত্রের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে জীবন দিয়েছে, বুঝতে পারছিলেন না। পুত্রকে তিনি চেনেন, রূপমতীর মত একজন অপূর্ব সুন্দরী ললনাকে স্বইচ্ছায় বাদশাহের হাতে তুলে দেবে, এমন বান্দা তার পুত্র নয়। কি যে হয়েছে, কিছুই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। অথচ সত্যই যদি আধম কোন অপরাধ করে থাকে, তাহলে বিপদ সম্মুখীন। আকবর এই স্পর্দ্ধা কখনও ক্ষমা করবে না। পুত্রকে কতবার তিনি সাবধান করে দিয়েছেন কিন্তু এমনি বেয়াড়া আর কখনও দেখেন নি। তবু পুত্র বলেই বিরক্ত হয়েও ছুটে চলেছেন তাঁকে বাঁচাতে।

মাণ্ডবগড়ের দুর্গদ্বারের কাছেই দুই অশ্বারোহীর মিলন হল।

আকবর তখন মাণ্ডবগড়ের চতুর্দিকে তাকিয়ে ধ্বংসের দৃশ্য

অবলোকন করছে। পথে আসতে আসতে বহু নারী, পুরুষ শিশুর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। দেখেছে কামানের গোলার আঘাতে বহু অট্টালিকা, মসজিদ, মন্দির, ভেঙ্গে পড়ে আছে। দুর্গের ভেতর ঢুকতে গিয়েও দেখলো, কি অমানুষিক এই অত্যাচার! মনে মনে তখন সে বিস্ময়ে ভাবছিল, সুলতান বজবাহাদুর যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই পলায়িত, তবে এতো ধ্বংসের দরকার কি ছিল ?

ঠিক এমনি সময়ে তার মাহাম আনাঘার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল।

মাহাম আনাঘার মুখের ওপর জালের আচ্ছাদন ছিল, তিনি সেই আচ্ছাদন সরিয়ে দিয়ে আকবরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আকবরের ভুরুদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সে তা সংযত করে হাস্য বিনিময় করলো।

আকবর আজ মরীয়া। সে কিছুতে আধমকে ক্ষমা করবে না, এমনি তার মনের অবস্থা। তাই মাহামকে পরিত্যাগ করেই সে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল।

অশ্ব থেকে নেমে একজন রক্ষীকে আকবর জিজ্ঞেস করলো—আধম খান !

অনতিবিলম্বে আধম খান এসে আকবরের সামনে দাঁড়ালো।

রূপমতী কোথায় ?

সে আত্মহত্যা করেছে।

মিথ্যা কথা! আকবর গর্জে উঠলো। আবার তার চোখের মণিদুটো থেকে যেন গলিত লাভা বেরিয়ে আসতে লাগলো—তুমি তাকে গুম করেছ। কিম্বা তার ওপর অত্যাচার করতে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

পীরসাহেব এ সম্বন্ধে সাক্ষী আছে।

পীরসাহেবকে আমি বিশ্বাস করি না। জান দেবার জন্যে তৈরী হও। বেইমানের শাস্তি মৃত্যুই উপযুক্ত। এই বলে আকবর কোষবদ্ধ থেকে তরবারী উন্মোচিত করলো।

এই সময়ে মাহাম আনাঘা সেস্থলে এসে পৌছলেন। এসে আকবরের ক্রুদ্ধমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি মিছে আকবর আধমের ওপর দোষারূপ করছো। রূপমতী সত্যিই আত্মহত্যা করেছে। সে ছিল হিন্দু কাফের থানসিংহ রাঠোরের কন্যা। হিন্দুরমণীরা স্বামীর মৃত্যুতে দেহত্যাগ করে, রূপমতী সেই পথ অনুসরণ করেছে। আমি এইমাত্র জেনানামহল থেকে আসল সংবাদ নিয়ে এলাম।

কিন্তু এর একটু পূর্বে মাহাম আনাঘা জেনানামহলে গিয়ে যে সাংঘাতিক কাজ করে এসেছেন, কে জানবে? বজবাহাদুরের অন্তঃপুরে তখনও দুজন অন্তঃপুরিকা জীবিতা ছিল। তাদের কাছে শুনেছেন, পুত্রের অকথ্য অত্যাচার ও ব্যভিচার। রূপমতীকে সে নাগালের মধ্যে পায় নি বটে তবে অন্তঃপুরের কোন যুবতী নারীই তার লালসা থেকে রেহাই পায় নি। আকবর এই বীভৎস করুণ কাহিনী শুনলে পাছে আধমকে শাস্তি দেয়, এই অনুমানে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দুজন নিরপরাধিনী অন্তঃপুরিকাকে হত্যা করিয়ে তবে আকবরের সামনে এসেছেন।

আকবর তবু আধমকে রেহাই দিতে চাইছিল না, কিন্তু ছলনাময়ী মাহাম চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে আকবরের সামনে এসে কোমলস্বরে বললেন—বেটা জালাল, তোমার আম্মিকে কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? আধম যদি কোন অপরাধ করে থাকে, তবে তাকে ভ্রাতা সম্পর্কে এবারের মত ক্ষমা কর।

তবু আকবর তাকে ক্ষমা করলো না। হত্যা করলো না বটে তবে মালবের শাসনভার তাকে না দিয়ে পীরমহম্মদকে দান করলো।

পীরমহম্মদকে মালবে রেখে অন্যান্য বিষয়ী কার্য সাঙ্গ করে আকবর ফিরে এলো আগ্রায়। সঙ্গে নিয়ে এল তার বিস্তৃত বাহিনী। সেনানায়ক আবদাল্লা সাংরগপুর যুদ্ধে মালব সৈন্য কর্তৃক আহত হয়েছিল, তবে গুরুতর কিছু নয়, মালবেই সে আরোগ্য

লাভ করেছিল। তারই অধীনে আবার বাদশাহী ফৌজ এসে আগ্রার প্রাসাদে উপস্থিত হল। সঙ্গে অসংখ্য হস্তী পৃষ্ঠে মালবের অতুল ধন ঐশ্বর্য।

জয়ধ্বনি উঠলো আকাশে বাতাসে। জয় শাহানসা আকবরের জয়, জয় মুঘল সম্রাট জালালুদ্দিনের জয়। মুহুর্মুহু তোপ দেগে এই আনন্দ বার্তা জানানো হল।

পারাবত উড্ডীন হল আসমানের নীলিমার প্রান্ত জুড়ে। চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো পারাবতের সারি।

আকবর দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ মিনারে। সে তার জয়ঘোষণা শুনছে না, শুনছে কান পেতে বাতাসের মাঝে মানুষের ক্রন্দন। সে মালবের পথে অসংখ্য মৃতদেহ দেখেছে তার মনে কোন শান্তি নেই। মানুষ চাইছে মুক্তি, চাইছে শান্তি—বাতাসে যেন সেই হাহাকারই বাদশাহ কান পেতে শুনছেন।

কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে? কারা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রার্থনা জানাচ্ছে, তোমার সে ক্ষমতা আছে, তুমি আমাদের দাও মুক্তি। আকবর কিছুতে ভেবে পাচ্ছে না, এরা কারা? কারা তার কাছে মুক্তি চায়? অথচ মনে হচ্ছে সে বাইরে বেরিয়ে পড়লেই তাদের মুক্তি হবে।

এমনি সময়ে খবর এল জৌনপুরের শাসনকর্তা খান জামান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। জৌনপুর ছিল মুঘলদের অধীন। খান জামানের এমনি স্পর্দ্ধা দেখে আকবর নিজেই সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লো। অন্যের ওপর নির্ভর নয়, এবার স্বয়ং নিজেই সবকিছু করবে।

এক বিপুল সৈন্যের সঙ্গে স্বয়ং বাদশাহকে দেখে খান জামান ভীত হল। যুদ্ধ না করেই বাদশাহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নতি স্বীকার করলো। বিদ্রোহীর শাস্তি ক্ষমা নয় মৃত্যুদণ্ড, 'এই

কানুন লেখা আছে মুঘল আইনে কিন্তু হঠাৎ আকবর চিরাচরিত সেই কানুন ভেঙ্গে দিয়ে খান জামানকে ক্ষমা করলো।

আমীর ওমরাহরা চমকিত হল। মুঘল রাজ্যে নতুন ইতিহাস রচনা হল। এমনটি কখনও কেউ করে নি। অপরাধীকে শাস্তিবিধানই সকলে দেখে এসেছে। ক্ষমা যে করা যায় তার ক্ষমার বিপরীতে যে পরিণতি, তার দৃশ্য দর্শন করে আমীর ওমরাহরা চমকিত হল। খান জামান নিজেই লজ্জিত হয়ে বাদশাহের আরো অধীন হয়ে গেলো।

এই অসময় কাবুল থেকে আমীর শামসউদ্দীন আগ্রায় এলেন। বাদশাহ তাকে দেখে যেন বড় খুশি হলো। এমনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই মনে মনে সে আকাঙ্ক্ষা করছিল। জিজি আনাঘার স্বামী এই শামসউদ্দীন তার অপরিচিত নয়। পিতা হুমায়ুনকে একদিন চৌসার যুদ্ধের সময় রক্ষা করেছিলেন। অত্যধিক বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এই আমীর শামসউদ্দীন। নিঃসন্দেহে এই প্রবীণ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা যায়। তখনও প্রধান মন্ত্রীর পদ শূন্য ছিল। বৈরাম খানসাহেব মরে যাবার পর কেউ তখনও এ পদ পায় নি। আকবর নিঃসন্দেহে সেই পদে আমীর শামসউদ্দীনকে বসালো। শামসউদ্দীনের উপাধি ছিল আতকা খান। আতকা খান প্রধান মন্ত্রী হিসাবে সৈন্য, অর্থ, ক্ষমতা, শাসনভার প্রাপ্ত হলেন। এই বিশেষ চারটি ক্ষমতাই রাজ্যশাসনের অঙ্গ। খানসাহেব এই বিশেষ চারটি ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। আর এই বিশেষ চারটি ক্ষমতা মাহাম আনাঘা নিজের অধিকারে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতা নিজের আয়ত্বে এনে পুত্রকে প্রধান মন্ত্রী করবার চেষ্টা করছিলেন, এইসময় শামসউদ্দীনের নিযুক্তিতে চমকিত হলেন। বুঝতে পারলেন, আকবর আধমকে কিছুতে ক্ষমা করে নি। মালবের সেই ঘটনার পর বাদশাহ দারুণ সচেতন হয়ে উঠেছে।

মালবের শাসনভারও হাতছাড়া হল। এবার প্রধান রাজ দরবারের ক্ষমতাও দূরে সরে যাচ্ছে।

আকবর এই হঠাৎ প্রধান মন্ত্রীত্বে শামসউদ্দীনকে বসাতে চতুর্দিকে কেমন যেন চাঞ্চল্য লেগে গেল। দিল্লী ও আগ্রার অনেক উচ্চ-রাজকর্মচারীরা মনে মনে এই আসন আশা করেছিল, হঠাৎ এই পদ হস্তান্তরিত হতে সকলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

মাহাম আনাঘার জামাতা আগ্রার দুর্গাধ্যক্ষ শিহাবউদ্দীন মুনিম খান এই পদ আশা করেছিলেন। যোগ্যতা নিয়ে এখানে বিচার নয়, বাদশাহের ইচ্ছার ওপর এই পদ। এটা রাজকর্মচারীদের অভিমত কিন্তু আসলে যোগ্যতার বিচারেই বাদশাহ এই পদ দিতেন। আকবর অন্যায় কিছু করেনি, তবে স্বার্থপর মানুষ নিজের স্বার্থে আঘাত লাগতে ক্ষিপ্ত হল।

কিন্তু আকবর অটল। বজ্রের মত দৃঢ় তার সঙ্কল্প। কারুর কথায় কর্ণপাত নয়। সে তার নিজের কর্মধারা বুঝতে পেরেছে। তাই নিজের সঙ্কল্পে সে এগিয়ে চললো। এবার আর বিশ্রাম নয়, অহেতুক চিন্তায় দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, এবার কাজ শুধু কাজ। স্বপ্নকে সার্থক করা। কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা। কোটি কোটি মানুষের আহ্বান তাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে।

এবার মনে পড়েছে মীর আবদুল লতিফের কথাগুলি। যোগ্য মানুষ হতে হবে, নিজেকে খাঁটি করতে গেলে দগ্ধ করতে হবে। বাদশাহ হয়েছ, অনেক বড় ক্ষমতা হাতে এসেছে, সেই ক্ষমতাকে অবহেলা কর না। তুমিই পারবে নতুনভাবে দুনিয়া গড়তে। আগে নিজে শুদ্ধ হও, তারপর অন্যকে শুদ্ধ করবে। সেই শুভক্ষণটি সমাসন্ন। তার শুদ্ধি হয়েছে। বহু অবক্ষয়ের পর এসেছে বিশুদ্ধ রূপ। এখন আর বসে থাকলে হবে না। কোটি কোটি মানুষের মাঝখানে নেমে গিয়ে তাঁদের আলো দেখাতে হবে। আলোর সেই বিরাট মশাল তার হাতে। ঈশ্বরের দূত হয়ে বাদশাহের আগমন।

সেই বাদশাহ সে, তাকে দেখাতে হবে পথ। অনেক কাজ এখন হাতে।

তাই আকবরের এতটুকু বিশ্রাম নেই।

হঠাৎ সে ঠিক করলো রাজত্বের বিরাট সমস্যায় প্রবেশ করবার আগে একবার তীর্থযাত্রা করে নেবে। মনের একেবারে পূর্ণ শুদ্ধি দরকার। তাই সে আজমীরের বিখ্যাত সুফী পীর মইনউদ্দীন চিসতীর দরগায় যাবে বলে ঠিক করলো।

বাদশাহের ইচ্ছার অর্থ হুকুম। হুকুমৎ চলে গেল মহলে মহলে। আগ্রা থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে লাহোর, লাহোর থেকে কাবুল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তরুণ বাদশাহের তীর্থযাত্রার খবর। এদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

বাদশাহের সঙ্গে যাবে অসংখ্য লোক। অসংখ্য দেহরক্ষীর বিশেষ পোষাক ঠিক হল। অনেক অশ্ব, অনেক সৈন্য, অনেক তাঞ্জাম, সে এক এলাহি কাণ্ড। পথিমধ্যে যদি কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার জন্যে অপর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র। বাদশাহ এসব কিছুই নিতে চাইলো না কিন্তু ভাবলো আজমীর যেতে গেলে রাজপুতানা অতিক্রম করতে হবে, পথে যদি কেউ তার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে তবে বেঘোরে প্রাণটি দিতে হবে। তাই যুদ্ধাস্ত্র ও সশস্ত্র সৈন্য সঙ্গে নেওয়াই ঠিক করলো।

সলিমা সঙ্গে যেত চাইলো। বাদশাহ বললো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু রহিমের কথা ভেবে সে লোভ সংবরণ করলাম। আসলে তীর্থযাত্রার সময় কোন রমণীর সংস্পর্শ করবে না বলেই আকবর সলিমাকে ঐ কথা বললো। রমণী কিছু সঙ্গে গেল বটে তবে তারা বাঁদী, গায়িকা ও কিছু কর্মচারীরবেগম, যে সমস্ত কর্মচারারা সঙ্গে যাবার জন্যে মনোনীত হয়েছিল।

একদিন শুভক্ষণের প্রত্যুষে বাদশাহ বিবিধ আড়ম্বরে আজমীর যাত্রা করলো। দিল্লী থেকে হামিদা পুত্রের সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন কিন্তু আকবর তার ইচ্ছাপূরণ করে নি।

আকবর সেই তার চির পরিচিত অশ্বের ওপর বসে। সেদিন তার পরণে কোন রাজবেশ ছিল না। ছিল না মাথায় শিরস্ত্রাণ, বক্ষে বর্ম, কোষে তরবারী, কণ্ঠে মুক্তার মালা। সম্পূর্ণ নিরাভরণ বেশ। পরণে শুধু ছিল শুভ্রবর্ণের আঁটো পায়জামা ও পিরান। শুভ্রবর্ণের পোষাকে শুদ্ধিস্বরূপ নিয়ে সে দরগায় চলেছে সুফী পীর-সাহেবের দোয়া প্রার্থনা করতে। সঙ্গে অবশ্য সশস্ত্র দেহরক্ষী শুধু দেহরক্ষী নয় সেনানায়করাও আছেন। মির্জা কোকা, শেখ আবদাল্লা, কাসিম খাঁ, হোসেন খাঁ, রোস্তম আলি প্রভৃতি প্রধানেরা। তারা বাদশাহের পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে। পিছনে আছে শাহীফৌজ ও বিবিধ অন্যান্য।

সূর্য রক্তবর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। পড়েছে তীব্র সোনালীবর্ণ বাদশাহের প্রশান্ত মুখমণ্ডলের ওপর। আজ বাদশাহ যেন সম্পূর্ণ সুস্থ। মনের অন্ধকার তার অপসারিত। অনির্বাণ আলোতে মনের ও বাইরের দুনিয়া একাকার হয়ে গেছে।

মালিন্য থেকে পবিত্র পূন্যে চিস্তীর দরগায় গিয়ে তার শেষ শুদ্ধি হবে। সেই পূর্ণতার মুহূর্ত সমাসন্ন বলে তাই তার মন প্রফুল্ল হয়ে গেছে। এখন কোন বাধা যদি পথে না পড়ে তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই। আজমীর পৌঁছতে পারলেই চিন্তা দূর।

আগ্রা থেকে আজমীর বেশী পথ নয়, তবু বিপজ্জনক। কারণ পথে অনেক হিন্দুরাজা অতিক্রম করতে হবে। বিশেষ করে স্বাধীন রাজপুতানা। মেবারের রাণা উদয়সিংহ মুঘলদের চিরকালের শত্রু। বাবর শাহের সাথে সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ অবিদিত নয়। তারই পরবর্তী বংশধর উদয়সিংহ। যেন হিংস্র ব্যাঘ্র বুক ফুলিয়ে মেবারের সিংহাসনে বসে আছে। এই হিংস্র ব্যাঘ্রকে একবার আক্রমণ করতে হবে। তবে এখন নয়। এদিকে একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই তখন ঝাঁপিয়ে পড়বে। যোধপুর, জয়পুর, মেবার, চিতোর, অম্বর সব স্বাধীন রাজ্য এবং সেখানকার অধিবাসীরা দারুণ

শক্তিশালী। রাজপুত যুদ্ধের ভয় করে না, এমন কি তাদের রমনীরাও যথেষ্ট শক্তিশালিনী। তার প্রমাণ গণ্ডোয়ানার রানীমাতা দুর্গাবতী। তিনি নাবালক পুত্র বীরনারায়ণকে রাজা করে নিজেই রাজ্য পরিচালনা করছেন। তিনি নিজে অশ্বারোহী হয়ে তরবারী হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। মালবরাজ বজবাহাদুর একবার এই নারীর কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করবারও ইচ্ছা আছে। দেখতে ইচ্ছা আছে সেই বীরাঙ্গনা রমণী রণক্ষেত্রে কি করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন?

এই যখন আকবর ভাবছে, একদিন অতর্কিতে এক সৌভাগ্য তার কাছে এসে উদয় হল। অম্বররাজ বিহারীমল তার সঙ্গে এসে দেখা করলেন। রাজপুতানায় তখন অম্বররাজের বহু শত্রু ছিল, যে কোন সময়ে তার রাজ্য হারাবার সম্ভাবনা ছিল, তাই তিনি কোন শক্তিশালী রাজার সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনের আশা পোষণ করছিলেন। মুঘল সম্রাটকে নাগালে পেতে তাই আর দ্বিরুক্তি না করে পথে এসেই তার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর কন্যা দিয়ে মিত্রতা সুদৃঢ় করবার প্রস্তাব করলেন।

আকবর মনে মনে অনেকদিন থেকে হিন্দুদের আপন করতে চাইছিল। হিন্দুস্তানে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গেলে হিন্দুদের আপন করতে হবে। তাদের আপন করতে পারলে তারাও বিধর্মী বলে বাদশাহকে পরিত্যাগ করবে না। রাজ্যবিস্তারের গোপন কৌশলটি হঠাৎ আকবর আয়ত্ব করে নিয়েছিল। তাছাড়া ধর্মের ওপর তার কোন গোঁড়ামি ছিল না, বরং মানুষের কল্যাণ সাধনই তার সঙ্কল্প। কিন্তু হিন্দুদের বৈবাহিক বন্ধনে স্থাপন করবে, এ প্রত্যাশা তার ছিল না! অবশ্য শিবালীর কথা সেই সূত্রে তার স্মরণ হয়, তবে শিবালীকে সে ভালবেসেছিল, মহব্বতের ধর্মের কোন ভেদাভেদ নেই।

অম্বররাজের প্রস্তাব শুনে মনে মনে পুলকও এল, আবার চিন্তাও জাগলো। একটা দারুণ কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। নিজে মুসলমান হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব করলে মুসলমান জ্ঞাতিরা তাকে অবহেলা করবে, বলবে ধর্মচ্যুত। আবার ভাবলো, জ্ঞাতিরা তাকে সুখই বা কি দিচ্ছে? মাহাম বিবি, আধমখান, মুনিমখান, পীরমহম্মদ, নিজের মা এরা তাঁর শত্রু। বারংবার এদের বিরোধিতায় আকবর ত্যক্ত ও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এইসময় অমুসলিম মিত্রের সাহায্যই দরকার।

মনে তবু আকবরের সন্দেহ ছিল, কিন্তু যখন বিহারীমল্ল তাঁর কন্যা যুবতী যোধবাঈকে চাক্ষুস দেখালেন, তখন আর আকবরের কোন সঙ্কোচ থাকলো না। লাজনম্র যোধবাঈয়ের আনত মখ দর্শন করে আকবরের হৃদয়ে কোথায় যেন হাহাকার উঠলো? এ যে শিবালী, ঠিক শিবালীর মত মুখের আদল, তেমনি দুটি চোখ, তেমনি দেহসুষমা, রূপলাবণ্য, কেশবিন্যাস, চলার ভঙ্গি, সব সব। তবে কি শিবালী ফিরে এল অম্বররাজ কন্যা হয়ে?

আকবর অম্বররাজের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেল। মইউদ্দীন চিস্তীর দরগা থেকে ফিরে এসে এই বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে যাবে বলে কথা দিল। আগেই করতো কিন্তু পবিত্র দরগা পীরসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, এসময় বিবাহ নয়, এ সময় শুধু সাত্বিক মনে পুণ্য সঞ্চয় করা, তাই শিবালীর পাণিগ্রহণে বিরত থেকে আজমীর রওনা হল।

তারপর ফেরবার পথে অম্বররাজ কন্যা যোধবাঈকে শাদী করে আগ্রায় নিয়ে এল। এই শাদীতে বিরাট একটা পরিবর্তন সাধিত হল কিন্তু সেদিকে আকবরের ভ্রূক্ষেপ নেই। তার সঙ্কল্পেই সে অটল থাকলো।

আকবর বাদশাহ শুধু হিন্দুকন্যাকে শাদী করেই ক্ষান্ত থাকলো না, অনেক হিন্দুকে দফতরে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করলো। অম্বররাজের সাহায্য পেয়ে সে সৈন্যদের মধ্যেও হিন্দুদের প্রাধান্য দান করলো। এই সূত্রে তার বার বার মনে পড়লো নন্দন সিংকে। বেচারী স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিধর্মীর কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। তাকে কদিন নিরাপদ আশ্রয় মুঘল সম্রাট দিতে পারে নি। নন্দন সিং কোথায় গেল, আজ সে জানে না। তবে অজানারও কিছু নেই, সে রাজচক্রান্তে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

এরই মধ্যে আকবর আবার যুদ্ধযাত্রা করলো। মাড়ওয়ারের দুর্ভেদ্য দুর্গ মার্থা জয় করলো। যুদ্ধই এখন তার সাম্রাজ্য বিস্তারের সহজ পথ। যারা মিত্রতা চাইলো, আকবর তাদের মিত্রতা দিল কিন্তু যারা শত্রুতা করলো, তাদের আকবর ছেড়ে দিল না। অনেক অল্পবয়স থেকেই সে রণনিপুণ ছিল। শক্তি তার প্রাপ্ত মুঘল পূর্বপুরুষদের শোণিত থেকে। কিন্তু সে আবার একটি নতুন নীতি প্রবর্তন করলো, পরাজিত শত্রুকে মুক্তিদান করবে। যুদ্ধে বন্দী ছিল বিজেতার দাস, এই ছিল মুসলিম রাজত্বের পূর্বতন যুদ্ধনীতি। কিন্তু আকবর এই নীতি প্রবর্তন করতে চতুর্দিকে এক সাড়া পড়ে গেল। মার্থা দুর্গ জয়ের পর দুর্গ অধিবাসীদের মুক্তি দিতে তারা মুঘল সম্রাটের জয় ঘোষণা করে উঠলো।

আকবর এই ঘোষণা শ্রবণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলো, সে বুঝতে পারলো, তার স্বপ্ন এবার স্বার্থকতার পথ খুঁজে পাচ্ছে।

ঠিক এই সময় প্রাসাদে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটলো, আকবরের জীবনের সেই একটি স্মরনীয় দিন।

আধম খান আগ্রাতেই ছিল, তবে তার কোন ক্ষমতা ছিল না। সে তখন ক্ষমতা হারিয়ে এক ক্ষতবিক্ষত পশুর মত যন্ত্রণা নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তবে সাংঘাতিক কিছু করতে সাহস পাচ্ছিল না, ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাদশাহের ভয়। বাদশাহ তাকে ভুলেই গিয়েছিল। বাদশাহের তখন অনেক কাজ, ফুরসৎ কোথায়? রাজ-কার্যের মধ্যেও নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হয়েছিল, তাছাড়া অন্তঃপুরে আছে হিন্দুবেগম যোধবাঈ। যোধবাঈয়ের জন্যে আলাদা হিন্দুমহল তৈরী হয়েছে।

বাদশাহ নিশ্চিন্ত হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রীর হেফাজতে রাজকার্য। আমীর শামসউদ্দীনের কর্মনীতিতে সে খুব খুশি। যোগ্য লোক নিযুক্ত করতে পেরেছে বলে আকবর গর্বিত।

ঠিক এই সময়ে আধম খান দুঃসাহসিকতা প্রবেশ করলো। মাহাম বিবি আগ্রাতে থাকলে অবশ্য পুত্র এই সাহস করতো না, তিনি তাকে সংযত করতেন কিন্তু তিনি তখন দিল্লীতে বেগম মহিষীর কাছে। তিনিও এখন ছলনার আশ্রয় নিয়ে বিফল হয়ে শুধু প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। আধমকে আগ্রাতে রেখেছিলেন শুধু আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কিন্তু আধম এমন কোন কাজ করতে পারলো না, যাতে সে নতুনভাবে বাদশাহের স্নেহ লাভ করে।

এক একজন মানুষের স্বভাবই হয় বিরূপ, সে আক্রোশ প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, স্নেহলাভের কৌশলে অনভ্যস্ত। আধম হল সেই প্রকৃতির। একদিন নিজের জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মন্ত্রী শামসউদ্দীনকে আক্রমণ করলো। মন্ত্রী শামসউদ্দীন আকতা খান রাজপ্রাসাদে রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, পাশে উপবিষ্ট ছিল মুনিম খান। অকস্মাৎ আধম খান তার অনুচরবর্গ সঙ্গে

নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল এবং আধমের হুকুমে দুজন অনুচর শামসউদ্দীনের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করলো। শামসউদ্দীন বাধা দেবারও সুযোগ পেলেন না।

আকবর তখন অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্ন ছিল। প্রাসাদে গোলযোগের শব্দে তার ঘুম ভাঙলো। কিন্তু অতর্কিতে আধম খান উদ্ধত তরবারী নিয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করলো এবং বাদশাহকে কিছু বুঝতে দেবার আগে আক্রমণ করতে গেল।

কিন্তু নিরস্ত্র বাদশাহের বাহুতেই তো কত শক্তি! যে হাতে সে সিংহকে বধ করেছে, ক্ষিপ্ত হস্তীকে আয়ত্বে নিয়ে এসেছে, সেই হাতেই আকবর মুষ্টি তুলে আধমকে ভূতলশায়ী করলো। এক আঘাতেই আধমের সংজ্ঞা বিলুপ্ত।

প্রহরীরা ছুটে এল। আধমকে সকলে ঘিরে ধরলো। বাদশাহ ঘৃণামিশ্রিতস্বরে হুকুম দিল—ওকে হাত পা বেঁধে বারান্দা দিয়ে নীচে ফেলে দাও।

হুকুম তামিল হল। বাদশাহ তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নীচে পড়েও একেবারে আধম মরলো না। উপর থেকে ভূপতিত আধমের গোঙানি শুনে আকবর আবার আদেশ দিল, ওকে আবার উপরে নিয়ে এসে নীচে ফেলে দাও।

বারান্দার অলিন্দে তখন অগণিত রাজকর্মচারী। তারা হঠাৎ প্রতিবাদ করে উঠলো—ওকে এবারের মত মাপ করুন বাদশাহ।

আকবর তাদের দিকে ক্ষুব্ধভঙ্গিতে ফিরে তাকিয়ে বললো—ওকে মাপ করতে পারলে আমিও কম খুশি হতাম না? মাহাম বিবিকে কি জবাব দেব তা জানি না! তবে ও যা ঘোরতর অন্যায় করেছে, তার ক্ষমা নেই। আমার সবচেয়ে বড় মেরুদণ্ড, আকতা খানসাহেবকে সে হত্যা করেছে।

এইসময় রক্ষীরা আবার আধমকে ধরাধরি করে উপরে নিয়ে এসে আবার নীচে ফেলে দিল। উপর থেকে তার নিস্পন্দ

দেহের দিকে তাকিয়ে আকবর কেমন যেন নিশ্চিন্ত হল কিন্তু মাহাম বিবির কথা ভেবে তার দুঃখ হল। সেই বৃদ্ধা রমণীকে আজ কি বলে বোঝাবে কত বড় অন্যায় আধম করেছে! এতদিন অন্য কেউ হলে কবে সে মৃত্যুদণ্ড পেত কিন্তু শুধু ধাত্রীমার প্রতি শ্রদ্ধার জন্যে এই কাজ করতে সে বিরত ছিল।

মাহাম বিবিও কি কম অন্যায় করেছেন? তবু তাঁকেও ক্ষমা করতে হয়েছে। মা হামিদাকে যেমন সে ক্ষমা করেছে, তেমনি।

তারপর আকবর দফতরখানায় রক্তাক্ত শামসউদ্দীনের মৃতদেহ দেখলো। আর অন্তঃপুর থেকে জিজি আনাঘার বুকফাটা ক্রন্দন শুনতে পেল। জিজি আনাঘা আজ বেওয়া হল। জিজি বিবিও তাকে পেয়ার করতেন, আজ তাঁর এই সোহাগ হারাতে এই নিঃসন্তান রমণীর অবস্থা কল্পনা করা যায় না। তাকে কি বলে সান্ত্বনা করবে সে?

কে বেশী হারালো? মাহামবিবি না জিজি আনাঘা! মাহাম বিবি হয়তো একমাত্র সন্তানের বিহনে আত্মহারা হবেন কিন্তু জিজি আনাঘা একদিন একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোক ভুলেছিলেন স্বামীর জন্যে। আজ স্বামী হারাতে তার অবস্থা কি হল?

আকবর দফতরখানা পরিত্যাগ করে অন্তঃপুরে গেল। ক্রন্দনমুখী জিজি আনাঘার সামনে দাঁড়িয়ে কাতরস্বরে অশ্রুসজলকণ্ঠে বললো—ধাত্রীমা, আমি তোমার সন্তান, আমি সারা দুনিয়ার ক্রন্দনমুখী মায়ের সন্তান, তুমি আজ সব হারালে কিন্তু আমাকে পেয়ে কি তুমি সান্ত্বনা পাবে না? আমাকে গ্রহণ করে তুমি উঠে দাঁড়াও, শোক ভুলে আমার পাশে এসো—আকবর বলে তোমার মাতৃত্ব স্নেহ দিয়ে আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ কর, দেখবে কোন শোক তোমার নেই। তুমি একা নও, তুমি এক বিরাট পুরুষের মা, সেই সান্ত্বনা তোমাকে সমস্ত বেদনা ভুলিয়ে দেবে।

জিজি আনাঘা সত্যিই কান্না রোধ করলেন, অবাক হয়ে আকবরের

দিকে তাকিয়ে বললেন—বেটা, তুমি অশ্রুরোধ কর, সত্যিই আমি আর কাঁদবো না। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আকবরকে কাছে টেনে নিলেন।

সেই দিনই আকবর দিল্লীতে ছুটলো মাহাম বিবির কাছে। মাহাম বিবি আগেই শুনেছিলেন, তিনি পুত্রের শোকে শয্যাগ্রহণ করেছিলেন।

আকবর গিয়ে অপরাধীর মত তার শিয়রে দাঁড়ালো, নিম্নকণ্ঠে বললো—আম্মি, অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছি, দোষ হয়তো করিনি কিন্তু তোমার সোহাগ ছিনিয়ে নিয়ে তোমাকে বেদনা দিয়েছি, তুমি আমাকে শাস্তি দাও।

মাহাম নিরুত্তরে শুধু চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। আকবরেরও চোখে জল দেখা দিল, সে অশ্রুসজল কণ্ঠে বললো—আধম গেছে কিন্তু তোমার জালাল আছে। জালালের জন্যেও কি তুমি এতটুকু মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর না! আমি যে সবার পুত্র হয়ে থাকতে চাই মা। আমার এক গর্ভধারিনী কিন্তু লাখো লাখো মায়ের যে আমি সন্তান!

মাহাম সত্যিই আকবরকে ক্ষমা করতে পারলেন না। নীরব ও শান্ত হয়ে শয্যার মধ্যে অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন!

মাতাপুত্রের মৃতদেহ কুতুব মিনারের অদূরে যৌথ সমাধি নির্মাণ করিয়ে আকবর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলো।

সব উন্মত্ততার বুঝি এইখানেই শেষ হল। সব বিভেদের এই খানেই পরিসমাপ্তি। রাজদণ্ড হাতে নিয়ে আকবর সিংহাসনে বসলো।

তারপর একদিন অশ্বের উপর উঠে বসলো আকবর। পরনে রাজবেশ, মস্তকে মণিমুক্তাখচিত উষ্ণীষ। মুষ্টিবদ্ধে তরবারী, একহাতে

বর্শা, তীরধনুক, ঢাল, গুপ্তি, ছোরা বিবিধ মারাত্মক সরঞ্জাম। আর পিছনে অগণিত শাহী ফৌজ। খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলিকে জয় করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা! সেই যাত্রা তার শুরু কিন্তু শেষ হয়েছিল মৃত্যুর দিন। মরবার আগে পর্যন্ত হিন্দুস্তানের সেই সম্রাট এতটুকু বিশ্রাম নেয় নি। শত্রুকে ক্ষমা করেছে, বন্ধুত্ব দিয়েছে, আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে। আবার প্রয়োজনে নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তাকে খণ্ড খণ্ড করতেও দ্বিধা করে নি। মায়ের স্বপ্ন সে সফল করেছে। আর্তজনকে সহায় দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছে। কোটি কোটি মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে তাদের শুধু শাসনই করেনি, পিতার মত লালন পালন করে তাদের আপন করেছে। সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের মাঝে ধর্মবিরোধ লুপ্ত করে দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত প্রবর্তন করেছে। ঐক্যবদ্ধ কল্যাণের এক নতুন দিক উন্মোচন করে মানুষকে বাঁচবার অধিকার দিয়েছে।

সবার উপরে এক সঙ্গীতময় ভারতের সৃষ্টি করতে চেয়েছে। নূরউল্লা অনেকদিন দেহত্যাগ করেছিল কিন্তু তানসেন তার দরবার অলঙ্কৃত করেছিল। তানসেন, সুরদাস, বৈজুবাওরা, তুলসীদাস প্রভৃতির জন্ম তারই রাজত্বকালে। বজবাহাদুরকে কোনদিনও আকবর ভোলে নি। মীর আবদুল লতিফ অনেকদিনই স্বদেশ পারস্যে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু আকবর তারই আদর্শে দরবারে গুণীজন সমাবেশ করতে ভোলে নি। তারই সাক্ষ্য নবরত্ন সভা।

অন্তঃপুরে যোধবাঈ প্রধান মহিষী। সলিমাকে কখনও বিস্মৃত হয় নি। শুধু রুকমি বেগমের মর্যাদা পায়নি, আর আলিমন বেগম হতে পেল না। আকবর তাদের এই আশা পূরণ করলো না। কিন্তু হামিদাবানু যতদিন বেঁচেছিলেন, শান্তিতে বাকী জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর পুত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়েছে। এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সে এখন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তবে অনেক পত্নী আকবরকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা বন্ধন স্থাপন করতে

গিয়ে বৈবাহিক বন্ধন সুদৃঢ় বলে তার মনে হয়েছিল। এ বন্ধনের কোন বিভেদ নেই বলে এই পন্থা।

প্রত্যহ হাজার হাজার লোক সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি করে। তারা ভয়ে করে, না ইচ্ছায়?

শাহনাই বেজে চলে! সে শাহনাইয়ের সুর এত মধুর যে সারাদিন ধরে প্রাসাদময় তার সুর ঘুরে ফেরে। আর বিপ্লব নেই, আর বিদ্রোহ নেই। রাজকর্মচারীরা পরস্পরের সৌহার্দ্যে সর্বদা বাদশাহের জয় কমনাই করে।

কিন্তু বাদশাহর জীবনে আর বিশ্রাম মেলে নি। জীবনের আরাম চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করেছিল। শুধু কাজ আর কাজ। গভীর রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ ও প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ। উষার প্রারম্ভে প্রাসাদ জাগার আগেই বাদশাহ যমুনার তীরে চলে আসতো। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ঘাসের জমিনে হাঁটু গেড়ে বসে বাদশাহ আসমানের সেই নীহারিকার সুদূরে তাকিয়ে কাকে যেন আকুতি জানাতো। নিঃশব্দে সেই কাতর প্রার্থনার মাঝে দু'চোখে শুধু জল টলমল করতো।

বাদশাহের দুখ কি ছিল? কিছু না? যা সে চেয়েছিল সবই পেয়েছিল। কৈশোরের সেই মালিন্য আর দেহে নেই। মহব্বত পেয়েছে। শিবালীকে পাই নি বটে কিন্তু যোধবাঈ তার ছায়া নিয়ে এসে প্রিয়মহিষীর আসন দখল করেছে। ধর্মের বিভেদ দূর করতে চেয়েছিল, দূর করেছে। তার সাম্রাজ্যে প্রতিটি মানুষ আজ সুখী। কেউ যদি আজও কোন অভিযোগ করে, তার আশা কোন অপূর্ণ থাকে না।

তবু কিসের দুঃখ বাদশাহ প্রত্যহ প্রত্যুষে এসে ঐ দূরে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে নীহারিকার দিকে তাকিয়ে কাঁদে? তবে কি তার প্রার্থনা আরো শান্তি আরো স্বস্তির? মানুষের হৃদয়ের আগুন

নিভিয়ে দিয়ে ঐ স্নিগ্ধ কল্যাণ সুন্দর, মধুর রশ্মির মত হবার প্রার্থনা বাদশাহ জ্ঞাপন করতো ? কে জানে কেন প্রত্যহ বাদশাহের নিভৃতে এসে এই প্রার্থনা !

সেকেন্দ্রার সমাধির নীচে আছে সেই মানুষের নশ্বরদেহ। মাটির তলায় চিরশয্যায় শুয়ে আছে সেই মানুষ দরদীবন্ধু। কারো যদি ক্ষমতা থাকে, তাহলে তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক—কেন তুমি অশ্রুজলে ভাসতে ? কি ছিল তোমার মনের বেদনা ? কেন তুমি কোটি কোটি মানুষের ভাবনায় নিজের শান্তি পরিত্যাগ করেছিলে ? তোমার স্বপ্ন কি সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছিল !

শেষ